মণিহারীর

বিবিধ প্রবন্ধ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

"নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্মজ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

ঈশ্বর বাক্য।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম্-মেসিন্-প্রেসে,
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৫।

জয় জগদীশ হরে।

" ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি
র্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।"

তদেকতানে
তদনুচিন্তনে,
তৎ-সন্ধানে,

এই পুস্তক ও ইহার প্রতিপ্রবন্ধ স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপে

চির-চিহ্নিত

রহিল।

সূচিপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা।

খেলেনা।

মদ্যমোদক।

সাময়িদ্ জাতি।

মণিহারী।

প্রস্তাবনা।

"নারায়নং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতিঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

১২৮০

মণিহারী দ্রব্য এ পতিত ভারতীয় সমাজে আজি কালি তাবত পদার্থ; কি পবিত্র কি অপবিত্র, কি ধর্ম্ম্য কি অধর্ম্ম্য. কি নৈতিক কি অনৈতিক, কি গুরু কি লঘু, তত্ত্বাবতই তদর্থে ভেদাভেদ পরিশূন্য হইয়াছে। মাঙ্গলিক রীতি, পূজা, হোম, যজ্ঞযাগ এবং অপৌরুষেয় অনাদি গ্রন্থ ও ধর্ম্মবিদ্যার শীর্ষস্থানীয় বলিয়া যাহা গৃহীত সেই বেদাদি পর্য্যন্ত, যাহা পিতৃপুরুষগণের নিকট মুক্তির দ্বার, স্বর্গের সোপান এবং ঈশ্বরের সহ সংযোগরজ্জু স্বরূপ সম্মানিত ছিল, এখন কালমাহাত্ম্যে তাহাও বালকোচিত মণিহারী দ্রব্য— খেলেনা মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। যুগধর্ম্মে রূপান্তর কি রোমহর্ষণকর। এখনও যে উহারা সেইরূপ মুক্ত্যাদির সোপান নয়, এমত নহে; এখনও উহারা মুক্তির সোপান, স্বর্গের দ্বার, ঈশ্বরের সহ সংযোগ রজ্জু বটে, কিন্তু অন্য রকমে, অন্য মুক্তি, অন্য স্বর্গ ও অন্য ঈশ্বর লইয়া!

কিন্তু কি সে অন্য রকম—কে সে অন্য ঈশ্বর, দেখিতে ইচ্ছা?—দেখ ঐ, ছিন্ন কদলিকাণ্ডের শ্রেণিমধ্যে দিগ্‌গজ তর্কালঙ্কার, শিরোমণি, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি, কাহার প্রতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সহ অক্ষুব্ধচিত্তে বেদমন্ত্র প্রয়োগ করিতেছে; যাহা দেখিয়া অপবিত্র জ্ঞানে, পবিত্র হইতে, অনেক হিন্দুবীরকে অর্দ্ধরাত্রে গঙ্গাস্নানে পর্য্যন্ত স্নাত হইতে হয়! দেখ ঐ, অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু-

রমণী সর্ব্বজনপশ্যা, বরণডালা মাথায়, কাহার প্রতি হুলুধ্বনি প্রয়োগ করিতেছে! যাহার প্রতি প্রয়োগ করিতেছে, সে ভাবিতেছে কি? খেলেনা! যাহারা প্রয়োগ করিতেছে, তাহারা ভাবিতেছে কি?—খেলেনা! ইহা কি কেবল এই একটী দৃশ্য, তাহা নহে; নিত্য দৃশ্য; সর্ব্ব বিষয়ে এবং সবাই ভাবে খেলেনা! কোথায় শুনিয়াছ, কোন্ জাতির কে কবে, বিজাতীয়ের হেয় এবং বিদ্রূপাত্মক কৌতূহল নিবারণের জন্য স্বীয় এবং সামাজিক ও পারিবারিক গুহ্যবিষয়কেও খেলেনা ভাবাত্মক আবরণে আবরিত করিতে ব্যাকুল হয়? হয় কেবল ভারতীয় হিন্দুসন্তান! কিন্তু হিন্দুসন্তানের এ ব্যাপারে লাভ?—বিদ্রূপ এবং টিটিকারী। সে কি তদ্দরুণ কুণ্ঠিত?—তাহা নহে, ইহাতে তাহার অলোকসামান্য সৌভাগ্য জ্ঞান! ইহা সাময়িক চিহ্ন; যুগধর্ম্মে প্রায় সকলই উল্টা হইয়া থাকে, তাই বেদ খেলেনা, ম্লেচ্ছ দেবতা। বেদ, বরণডালা, যাহাই হউক; এ খেলেনা খেলায় আবশ্যক? আত্মলোপ,—আত্মসম্মান লোপের কি আরও অধম নিশান পাওয়া যায়!

লোকে বলে যে, যে কোন পদার্থ, যাহা বারেক মাত্র মানবীয় জীবন বিশেষের কোন প্রকার গুরুকর্ম্ম সাধন করিয়াছে; তাহা অবস্থান্তরে মানবান্তরে পতিত হইয়া সেরূপ গুরুকর্ম্মসাধনে এখন আর সমর্থ না হইলেও; তথাপি, তাহা যে বারেকমাত্র তদ্রূপ গুরুকর্ম্মের সাধক হইয়াছিল কেবল এই নিমিত্ত, মানব নামোচিত তাবত মানবের নিকট সে পদার্থ ভক্তিপুষ্পাবৃত ও পূজনীয় অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে। কত সহস্রবর্ষ গত হইল, গ্রীক পুরাণাদি স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে; তথাপি আজি পর্য্যন্ত এমন কোন ইউরোপীয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছ কি, যে তাহাকে খেলেনায় পরিণত করিতে সাহস পাইয়াছে। কিন্তু, ঠিক ইহার বিপরীত, আর একদিকে তাকাইয়া দেখ;—যে বেদাদি স্থানচ্যুত না হইয়া আজি পর্য্যন্ত আমাদিগের ধর্ম্মবিদ্যার শীর্ষস্থানীয়রূপে অটল রহিয়াছে, আজি পর্য্যন্ত যাহা আমাদিগের বর্ত্তমান জীবনপ্রবাহকে পরিচালিত করিতে কিছুমাত্র বিরত হয় নাই, তাহাই কি না আজি আমাদিগের হাতে এরূপ সামান্য মণিহারী পদার্থে পরিণত! মানব-প্রকৃতির কি ইহাপেক্ষা আরও অধমতায় অবতরণ করা সম্ভব? ফলত বেদাদিই যখন এরূপ খেলেনায় পরিণত, তখন আর অন্যান্য পদার্থের যে কি

শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, তাহা কি বলিবার আবশ্যক রাখে? আত্মবোধ, আত্মমর্য্যাদা যথায় এতদ্রূপ এবং সকলই যথায় মণিহারী দ্রব্য, সকলই যথায় খেলেনা; তথায় সংসারগতি যে কি প্রকার তাহা কি আর বলিব! কেবল খেলেনায় কি সংসার চলে;—সংসার, যাহা গহণগভীর ও সত্যস্বরূপ এবং সাত্ত্বিকতাই যাহার নিদান? বাঙ্গারাম বলে, চলুক না চলুক, ব্যবসাদারের তাহাতে ক্ষতি কি?—লাভ ভিন্ন ত ক্ষতি নাই। তাই, বাঙ্গারামের আজি মণিহারার হাটবাজার! মূর্খ বাঙ্গারাম, এরূপ পাগলের হাটে লাভের আশা কয় দিন, কত লাভ করিবে? অসারতায় কালক্ষয়, কালক্ষয়ে আয়ুঃক্ষয়।

প্রদর্শক, দর্শক, দৃশ্য, বিক্রেতা, ক্রেতা, ক্রিত ইত্যাদি যাহাই হউক, উদ্দেশ্য কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মশালায় নূতনত্ব প্রকটন। নূতনত্ব প্রকটন দুইরূপে, এক অধোমুখে, অপর উর্দ্ধমুখে। অধোমুখে অতি সহজ এবং রমণীয়ও বটে, শয়তানী পথ কবে না আপাত-রমণীয় হয়? কিন্তু উর্দ্ধমুখে যাহা, তাহাই এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মনিয়োজন ও কাজে লাগিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র যথায় গোলামীক্ষেত্রে এবং মানব যথায় কর্ম্মপশু, তথায় এ নূতনত্ব প্রকটনের আবশ্যকতাই বা কি, ফলই বা তাহার কোথায় এবং সম্ভবই বা তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? পরমুখাপেক্ষী আত্মমর্য্যাদাশূন্য কর্ম্মপশুর উপর, স্বয়ং শয়তান যে সেও চটা। শয়তানের রাজ্য পাপের রাজ্য বটে কিন্তু সেও আত্মবোধপূর্ণ স্বাবলম্বী ও স্বয়ং-চেতা পাপী চাহে; এরূপ, কর্ম্মপশু পরাবলম্বী গোলাম চাহে না। ফলত ইহারা দেব দানব উভয়েরই দ্বারা তিরস্কৃত এবং পরিত্যক্ত। বলিতে কি, যে শয়তানী পথ এত সহজ, তাহারও পক্ষে ইহারা অনুপযুক্ত! তাই বলি, বাঙ্গারামের এ খেলেনা ব্যবসায়েতেই বা তবে আশা কোথায়?

বিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, প্রয়োগমাত্রেই কেবল তথায় সর্ব্বদা প্রশস্ত; যথায় প্রয়োগ, প্রয়োগকারী এবং প্রযুক্ত, এ তিনই সার্থক ও সাত্ত্বিকতা পূর্ণ এবং যখন এ তিনের কোন পক্ষেই খেলেনাবুদ্ধির আভাস নাই। তাই আবার; জিজ্ঞাসা করি, এ হাটে তবে কর্ত্তব্য কি? গোলামীতে, অথবা ভদ্র কথায়, আত্মলোপে যথায় জন্ম; আত্মলোপে যথায় বৃদ্ধি এবং আত্মলোপে যথায় ক্ষয়; আত্মলোপই যথায় ত্রিবিধ পুরুষার্থের নিদান বলিয়া পরিগণিত; যথায় মহা-

রাজা হইতে মহাকুলি, মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খ, সকলেই এমন প্রভুভক্ত যে সেই গোলামী কিয়ৎ পরিমাণে বিলোড়িত হইতে দেখিলেই, ক্ষিপ্ত হয় এবং ধন পরিজন আত্ম ও সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত উপঢৌকন-দানেও তাহা অক্ষুন্ন রাখিতে কুণ্ঠিত হয় না,—বরং তাহাতে আনন্দাতিশয্য উপভোগ করিয়া থাকে, যেহেতু অন্যথা তাহা সহস্রমুখে সময়ে অসময়ে, যাহার প্রীতি জন্য তাহারও ঘৃণা উৎপাদক রূপে, ঘোষণা করিয়া ফিরিবে কেন ?—যথায় রাজার রাজত্ব, বড় বাবুর বড় বাবুত্ব, ইত্যাদি পর্য্যন্ত এই গোলামীর গহণ লীলায় উদ্ভূত ও বর্দ্ধিত এবং যথায় তত্তৎ অবস্থা ও বিষয় শোকাশ্রু উৎপাদনের কারণ না হইয়া প্রত্যুত অপরিসীম গৌরব এবং গরিমার কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে; তথায় কর্ম্মক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ও মনুষত্ব বিধায়ক উপকরণের প্রতি আদর বা তাহার মর্ম্মবোধ কিরূপে হইতে পারে ? যথাবস্থায় গা ঢালিতে যথায় অপরিমিত স্পৃহা; সংসার পথে অগ্রগমন যথায় বিষম-ত্রাশ-শঙ্কুল এবং যাহার নামে মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠে; ভোজন এবং শয়নমাত্র যেখানে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; মানবীয় প্রকৃতিতে যথায় জুয়াচুরি ও জুজুগিরি; উদাম ও উৎসাহ যথায় অপহরণে; অধ্যবসায়, আত্মবোধ ও আত্মমর্য্যাদা যথায় ক্লীব রাজভক্তি প্রদর্শনে, বচনবাগীশী যথায় মুখ্য সম্বল; নীতি যথায় পেনালকোড়ে; দেবভক্তি যথায় উদরে; এবং লোকাচার যথায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শনে; বল দেখি তথায় আর কি আশার সূত্র থাকিতে পারে,—যাহার অবলম্বনে আশ্বস্ত হইতে পারা যায় ? বাঞ্ছারাম বলে, আশার যেখানে এতই অভাব, সেখানে অনুকূল প্রতিকূল প্রয়োগ অপ্রয়োগের আবশ্যক কিছু নাই। যেমন আছে তেমনি থাকুক, যেমন চলিতে পারে তেমনি চলুক; দেখিতে না পার চক্ষু বুজিয়া থাক; অথবা আইস, এ খেলেনার হাটে যতদিন ধরিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায় খেলেনা বেচিয়া লই। দেখিতে পাইতেছ কি, আজি কালি নাটক উপকথায় সমাজ সংস্কার, উপন্যাসের ভিতর ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে ? এ আনন্দ হাটে আর কি বেচিতে চাও, এ যুঁই-চামেলি ক্ষেত্রে আর কি বীজ ছড়াইতে সাহসী হও ? আজিকার দিনে সুবেশ সুগন্ধের যত আদর, পেটের ভাতে কি তত ?

কিন্তু সহসা কি ঐ দেববাক্য অন্তরআকাশে ধ্বনিত হইল, কে, যেন

বলিতেছে,—'কাজকি তোমার "আশ্বস্ত" "অনাশ্বস্ত" লইয়া; ফলের আশায় তোমার আবশ্যক কি? চাষী হও, ক্ষমতা থাকে, তুমি অনন্ত ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সুবীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া থাক। ক্ষেত্র যাঁহার, কার্য্য যাঁহার, ফলও তাঁহার; সুতরাং ফলের বিষয় তিনি আপনিই যথান্যায় দেখিয়া লইবেন, তজ্জন্য তোমার আমার ভাবনা চিন্তা কেবল অধিকন্তু ও চিত্ত অপব্যয় মাত্র।' আবার সেই কথা!

ঠিক্ কথা! প্রকৃতিরও বিশ্রাম আছে। অর্দ্ধরাত্র জগত সুপ্ত, জীবলোক সুপ্ত, তাই এখন পিশাচকুল কিলি কিলি করিয়া চিতাভস্ম-বিলিপ্ত বিকট নৃত্য করিতেছে। প্রকৃতি শূন্যদ্বেষিণী, তাই এ অর্দ্ধরাত্রে পিশাচকুল কেবল সংযোগ স্থল মাত্র; জীবলোক সুপ্ত বলিয়াই যে জীবলোক ভারত হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নহে। যে দেশের শীর্ষস্থলে হিমাদ্রি কটিতে বিন্ধ্যাচল, মধ্যদেশে পুতসলীলা সরিদ্বরা গঙ্গা প্রবাহিত, যাহার সরোবরে "সুবর্ণপঙ্কজবনং পীয়ূষতুল্যং পয়ঃ, নানারত্ননিবদ্ধবেদিবলয়াস্তীরেষু ভূমিরুহা" এবং যথায় জননী বসুন্ধরা রত্নগর্ভা; যে দেশের বিদ্যাশীর্ষে বেদবিদ্যা; মানবশীর্ষে সূর্য্যতনয় মনু যেথানকার আদি পিতা ও বিধাতৃ কন্যা শতরূপা আদি মাতা; সপ্তঋষি যেথানকার ঋষি; রাম যেথানকার রাজা; বাল্মীকি যথাকার কবি; সত্যবতীসুত বেদব্যাস যথাকার পুরাণ-কর্ত্তা; কালিদাস যথাকার কলকণ্ঠ; শঙ্করাচার্য্য যথাকার ধর্ম্মসংস্কারক, এবং যেখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের একতৃতীয়াংশ মানবকে ধর্ম্মদীক্ষিত করিয়াছেন; সত্য সত্যই সে দেশ কখনও জীবলোক শূন্য হইতে পারে না। ফিনিকীয়, পারসীয়, কালডীয়, ব্যাবিলনীয়, আসীরীয়, মিসরীয়, রোমক, গ্রীক, এ সকল জাতি একদিন এ জগতে ছিল, কিন্তু এখন নাই; আর হিন্দু জাতি?—একদিন এ জগতে ছিল, এখনও আছে। তদ্রূপ, তত্তৎ জাতির ধর্ম্মও একদিন এ জগতে ছিল, কিন্তু এখন নাই; আর হিন্দু-ধর্ম্ম?—পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। জাগতিক ইতিহাসে, সবাই হই-য়াছে, সবাই গিয়াছে; কিন্তু হইয়াছে এবং আছে কেবল হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম। যে জাতি ও যে ধর্ম্ম এরূপ দীর্ঘস্থায়ী বা অন্য কথায় অনন্ত-স্থায়ী, তাহা কখনও জীবনী শূন্য এবং তাহাদের লীলাস্থান কখনও

জীবলোক শূন্য বা বিধাতা কর্ত্তৃক একেবারে নিগৃহীত হইতে পারে না। নিশ্চয়ই, ইহাদের উপর বিধাতৃ কর্ত্তৃকন্যাস্ত কার্য্য এখনও সমাধা হয় নাই, হইলে ইহারা অন্তর্হিত হইত; সুতরাং এখনও ইহাদের কাল প্রতিক্ষার পরিমাণ রহিয়াছে; এবং এ কাল প্রতীক্ষার শেষ ও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধিও অবশ্য একদিন হইতেই হইবে। তবে কি না এখনও অর্দ্ধরাত্র! কিন্তু নিরাশ হই ও না,—রাত্রি বিগত হইলেই দিবা আইসে।

অর্দ্ধরাত্র, জীবলোক সুপ্ত; কিন্তু প্রহরীগণ, তোমরাত সুপ্ত নহ। তবে কোথায় তোমরা? আবির্ভাব হও, প্রহরীর কার্য্য কর, পিশাচকুলের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে; চাহিয়া দেখ, মাতৃভূমির অবস্থা অতিশয় ক্ষুণ্ন হইয়া আসিতেছে। উঠ, বারেক চেষ্টা করিয়া দেখ,—উদ্ধারের উপায় স্বরূপ বারেক জীবলোক জাগ্রৎ করিতে যদি সমর্থ হও। সকর্ম্মক জাগরণে নিশা ক্ষণস্থায়ী হয় এবং নিমেষে পলায়ন করিয়া থাকে। তাই আবার বলি, সচেষ্টিত হও; শ্রম বিকলিত বা শূন্য-পুরস্কৃতে শ্রম বৃথা হইয়া যাইবে না। আমারও এ মণিহারী দ্রব্য, তোমাদিগেরই সহায়তা জন্য, প্রেত ভুলাইতে নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মহৎ সকল পদার্থেরই প্রয়োজন হয়। সাগরবন্ধনে বালুকা কণাও সফলতা লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

জয় জগদীশ হরে! প্রভু, এ মণিহারী দ্রব্য, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, এ ক্ষুদ্র কর্ম্ম, তাহাও ত তোমাতে অর্পিত হইতে পারে, সেওত তোমার, সেওত তুমি; মণিহারী বিক্রেতা কেবল উপলক্ষ্য বৈত নহে। উপলক্ষ্য অযোগ্য হইলেও, উপকরণ অযোগ্য হয় না। অতএব উহারাও সেই অনন্ত কার্য্যমূলে প্রযুক্ত হইয়া অনন্ত কার্য্যফল প্রসবে রত হউক!

যুক্তিবাদ।

১। পূর্ব্বপক্ষ।

১২৮৫।

যাহার প্রতি কোন কথা প্রয়োগ করিবামাত্র, যে দেখিলে তখনই তাহার ভালমন্দ বিচারে তোমাকে সাধুবাদ বা তদন্যতর প্রদানে উদ্যত হইল; নিশ্চয় জানিও, তাহার কাছে তোমার কথিত কথায় উদ্দেশ্য পূরণ সেই পর্য্যন্তই শেষ। আর যে দেখিবে, কথাটা স্থিরচিত্তে শুনিয়া, তখনই তাহার ভাল মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, চুপ করিয়া রহিল, সেইখানে কিঞ্চিৎ শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। সেখানে তোমার কথাবিষয়ক সার্থকতার প্রত্যাশা কিঞ্চিৎ করিলেও করিতে পার; অন্তত এটা নিশ্চয়, কথাটা সে ব্যক্তির নিকট নিতান্ত বানের জলে ভাসিয়া যাওয়ার মত বৃথা চলিয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু এ মহাবচনাবর্ত্ত বঙ্গক্ষেত্রে সে সামান্য প্রত্যাশার স্থানও অতি অল্প।

বাঞ্ছারাম আমাদের নব্যতন্ত্রের, শিষ্ট, সভ্য, বিদ্বান,—চারি পোওয়া ইংরাজীনবিশ। অতি দেশমান্য, ঘাসছোলা হইতে ঠাকুরপূজা পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মই বাঞ্ছারামের অছাপি নাই। বয়সের ভাল অর্দ্ধেক পার হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল অকর্ম্মা অর্দ্ধেক বাকি। এ হেন প্রিয় বাঞ্ছারামকে একবার জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি ত এই বহুরূপী; বলিতে পার, দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার এই তরবতর জীবনকার্য্যে কতটুকু তর্কদর্শনের প্রয়োজন বা কতটুকু তর্ক-উপপাদ্য হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে? ষড়দর্শনে তুমি সরস্বতী, তোমার কণ্ঠে কোম্‌ত, জিহ্বাগ্রে হামিল্টন, ললাটে বেন্থাম এবং মিল তোমার শিরোভূষণ। বলিতে পার ইহাদের কোনটুকু কবে এবং কি ভাবে তোমার কাজে লাগিয়াছে? যদি তুমি আইনজ্ঞ হও, তাহা হইলে তোমার উপর আমার কথা নাই, যেহেতু সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের বাজার মধ্যে আমাদিগের ন্যায় সামান্য প্রাণীর প্রবেশাধিকার নিষেধ। যদি লোকের সর্ব্বনাশে কখনও

আত্মপক্ষ পোষণের জন্য যত্নবান্ হইয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তোমার জীবনে অনেক তর্কের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল?—তোমার ফল এখনও ফলে নাই. সুতরাং আত্মপ্রতিদৃষ্টে বুঝিতে পারিবে না; অন্য কোন তথাপ্রকৃতি ও তথাবস্থ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ।

তথাপি এই যুক্তিবাদ, বা তর্কবুদ্ধিতে অবশ্যই কিছু মোহিনী শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, নতুবা নব্যজগত কি কারণে আপনাপনি সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া এই দেবমন্দিরে বলি হইবার জন্য আসিয়া থাকে? পতঙ্গের নিকট আলোকের যে মোহিনীশক্তি, নব্য জগতের নিকট যুক্তিবাদ বা তর্কদর্শনেরও তাহাই। পতঙ্গও মোহিনীশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আলোকে পুড়িয়া মরে, অপরিণামদর্শী নব্যজগতও যুক্তিবাদের নিকট আত্ম বলিদান দিয়া থাকে। ইহাদিগের নিকট যে কোন কথা, যে কোন বিষয়েরই অবতারণা কর না কেন; ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কালবিলম্ব নাই, অমনি উদ্যত "আইস তর্ক কর"। "ঊনবিংশ শতাব্দি 'রিজনের' (বিচরণাশক্তির) রাজত্ব,"—ইহাদের মতে যুক্তিবাদই সমুদয়ের মূল; ইহারই উপর নির্ভর করিয়া অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষৎকালের স্থিতি; ইহারই উপরে বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অবস্থিতি করিতেছে; ইহারই সাহায্যে নবজ্ঞান ও নববস্তুর আবিষ্ক্রিয়া; অধিক কথা কি, ইহারই কল্যাণে ঈশ্বরের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সাব্যস্ত,—নাস্তিক হইব কি আস্তিক থাকিব তাহার অবধারণ। সেই না জানি কেমন বোকা ঈশ্বর, যিনি স্বয়ং স্রষ্টা হইয়াও সৃষ্ট জীবের মস্তিষ্কায়তন হইতে আপনাকে অতীত ভাবে রাখিতে সক্ষম হয়েন না। ফলত ইহাদিগের সমগ্র জ্ঞানজীবনই এক মাত্র উপনয় প্রণালীর উপরে উপস্থাপিত এবং যে কিছু বিষয় বা জ্ঞান, যাহা এক মাত্র যুক্তিবাদ পরিমাণে অসিদ্ধ বা দুষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহ পরিত্যজ্য। আপ্তবাক্য, স্বাভাবিকী উপপত্তি, এ সকল উপহাসের স্থল। যুক্তিবাদের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার হেতুই, অধুনাতন নবীন সভ্য ভব্যবর্গের মধ্যে বর্ত্তমান পাষণ্ডপণা; সকলেই 'রিজনের' দাস! বাঞ্ছারাম, সেই জন্যই তোমার এবং তাহাদিগের সহিত আমার এই কল্লোল।

যুক্তিবাদের এই অযথা ও অপরিমিত অনুসরণ হইতে দেশ মধ্যে কি অনিষ্ট ই না উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। যাহা কিছু পূর্ব্বতন,—সেই সমাজ, সেই আচার, সেই ব্যবহার, সেই রীতি, সেই নীতি, সে সকলই এখন ঘৃণিত দূষিত ও দলিত; ঔদাস্য ও অপরিণামদর্শিতার তরঙ্গে তাহারা একে একে বিগত হইয়া যাইতেছে। যে পূর্ব্বোপার্জ্জিত স্বজাতীয় জ্ঞানসংসার আবহমান কালীক উত্তর জ্ঞানসংসারের ভিত্তি স্বরূপ হওয়া উচিত এবং যাহা ভিত্তি স্বরূপ না হইলেও কখন উত্তর জ্ঞানসংসার সতেজ ও পুষ্ট হইতে পারে না; তাহা নিশ্চিত ভাবে পরিত্যক্ত ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বভাবতে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; অথচ বিশ্বাস হেতু 'পরভাবতও' এখন পর্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; দেখিতে যাহা কিছু পাওয়া যাইতেছে, তাহা কেবল অধম ম্লেচ্ছানুকৃতি!—'রিজন' বা যুক্তিবাদের সুমহান্ ফলস্বরূপ বিশ্বাস্য এখন যাহা কিছু, তাহা কেবল স্বীয় স্বীয় অপরিসীম ও ধড়িবাজী বুদ্ধিমত্তা! আমাদের দশাও তাই আজি এমন হইয়াছে; তাই সকল বিষয়েতেই আজি ঘোর ঘূর্ণাতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছি। সকলেই এখন একা একশত, সকলেই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ কেহ নাই। কেবল যুক্তিবাদের প্রভুত্ব যথায়, তথায় বুদ্ধিও কাহার ঘরে কিছু কম থাকে না; সুতরাং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিভাগও তথায় কখন তিষ্ঠে না। অথচ সাবেক একটা কথা আছে যে, যে কোন স্থানে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিভাগই সমাজ গঠনের আদি নিমিত্ত ও মূল। জাতীয় ধর্ম্ম এখন ভগ্ন ও বিধ্বস্ত; কেহবা যুক্তিবাদের সাহায্যে একরূপ ধর্ম্ম গঠন করিয়া লইতেছে, কেহবা তাহারও অতীত পথে গমন করিয়াছে। এ গল্পটা প্রকৃত,—একদা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গ হইতেছে; একজন আধুনিক বিদ্বান্ বলিয়া উঠিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কুসংস্কার বহুকাল হইল চুকিয়া গিয়াছে। কেন চুকিয়া গেল? পৃথিবী টলিল না, পর্ব্বত উপাড়িল না, সাগর শুকাইল না, টু শব্দটি পর্য্যন্ত হইল না, অথচ সর্ব্বজাতীয় পুরুষানুক্রমে কাল পরম্পরা আগত চিরনিহিত যে কুসংস্কার, তাহা ভালয় ভালয়, সহজে সহজে, এমন অজ্ঞাতে ভাঙ্গিয়া গেল কি করিয়া? কি আশ্চর্য্য! আমরা ত আমাদিগের "নবমীতে লাউ খাইতে নাই" এই সামান্য

কুসংস্কারটা, ইহা এতকাল ধরিয়া, এত যত্নে, এত উপায়ে, নানামতে অস্ত্রপাত সহিয়াও, কোনমতে একেবারে তাড়াইয়া উঠিতে পারিলাম না! এ সামান্য কুসংস্কারেরই শক্তি যখন এই, তখন সকলের গুরুতম যে উক্ত কুসংস্কার তাহা এত শীঘ্র ভাঙ্গিল কি করিয়া;—তাহার কারণ? উত্তরে শুনিলাম,—বিদ্যালয়ে যেদিন দর্শনশাস্ত্রের পাঠারম্ভ, সেদিন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় সকল বিষয় মীমাংসিত, এবং সে সকল কুসংস্কার বিদূরিত হইয়াছে! কুসংস্কার তাড়াইবার এ অপূর্ব্ব অথচ অতি সহজ গুপ্ততত্ত্ব, নিগূঢ় সন্ধান, সকলের কি জানিয়া রাখা উচিত নয়? আগে জানিতাম ঈশ্বর, প্রকৃতি, ইহারাই প্রকৃত মহৎ; কিন্তু এখন জানাগেল বালকদিগের পাঠ্যদর্শনলেখকগণ তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর! তাহাদের প্রসাদাৎ, না করিতে পারা যায়, এমন কাজই নাই! বরণ কর্দ্দমদিগ্ধ প্রক্রিয়ায় কিছু কাট খড় লাগে, কিছু গোলোযোগ আছে, কিন্তু এ বিশ্বরচন প্রক্রিয়ায় কিছুমাত্র নাই; হয় না হয়, আমাদিগের আধুনিক তর্কচস্মায় একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। ইহার পর ঈশ্বর নিরূপণের কথা?—সেত অতি সহজ ব্যাপার! দোষ কি যুক্তিবাদের না দর্শন প্রকরণের? দোষ তাহাদের নহে; দোষ তদুভয়ের অসদ্ব্যবহারের। বলা বাহুল্য যে সেই অসদ্ব্যবহৃত যুক্তিবাদই এখানে আলোচিত হইতেছে।

আশ্চর্য্য! ঐ যে জগতের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের দার্শনিকগণ, স্ব স্ব দর্শনহস্তে, আমারই দর্শন সত্য বলিয়া, পরস্পর ঘোরতর কন্দোল আরম্ভ করিয়াছে এবং পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে, বলিতে পার ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য? ঐ যে বৈদান্তিক অন্তকে দেখিয়া রাগে ফুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"কিছু নয়, কিছু নয়, তোমাদিগের ও সব ছায়াবাজী, ও সব মায়া, কেবল অবিদ্যার খেলা"; অমনি সে কথা শুনিয়া ও'দিকে যে আবার ঐ বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার টীকি টানিয়া সরোষে বলিতেছে—"আরে, চুপ বিট্‌লে, বলিস্ কি?—নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ"; আবার ওদিকে ঐ যে, ঐ কোণে বসিয়া বিদায়লুব্ধ উদরসার নৈয়ায়িক ঠাকুর আপন মনে "পর্ব্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ" এবং আরও কত কি কথা কাটাকাটি মাথামুণ্ড বকিতেছে; পুনশ্চ অন্যদিকে আহা-

রীর বিভাগকারী শৃগালের দ্বন্দ্বে বানরের মধ্যস্থতাবৎ, ঐ যে শ্বেতাঙ্গ ভায়া কুটীলহাস্যে খরিদবিক্রয় বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল্য কষিয়া বাহির করিতেছে; বলিতে পার, উহাদিগের মধ্যে কে ঠিক, কাহার কথা সত্য? উহাদিগের আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান বা দর্শন, অথবা উহাদের অবলম্বিত তর্কদর্শন, যুক্তিবাদ, যুক্তিবিজ্ঞান, সে সকলের মধ্যে অবশ্যই কোথাও দৃষ্টিরোধ এবং তথায় সত্যের অভাব আছে; নতুবা পরস্পরের মধ্যে এত গোলমাল, এত বিরোধের সম্ভাবনা হয় কেন? যাহা সত্যে উদ্ভাবিত, সত্যে গঠিত, সত্যে পোষিত, এবং সত্যে গৃহিত; তাহা প্রত্যেকে বিভিন্নরূপে উৎপন্ন ও দৃষ্ট হইলেও, যখন ঘনিষ্টতায় আইসে, তখন পরস্পর সামঞ্জস্যসাধক ও বিরোধশূন্য ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহাদের যে সমষ্টি তাহা বিশ্বজনীন মহাসত্যের পরিপোষক হয়। সত্য পদার্থ মাত্রেরই এই পরিচয়; অসত্য পদার্থই কেবল বিরোধী হইয়া থাকে এবং কুকুরের ন্যায় এক অপরকে দেখিলেই ঝগড়া বাধাইয়া বইসে। কিন্তু কই? এ তর্কতরঙ্গে সামঞ্জস্যের ত ছায়া মাত্রও দেখিতে পাই না। কি আক্ষেপ এতকাল ধরিয়া এত দার্শনিকের মুণ্ড একত্র হইয়াও, দার্শনিক দলের মধ্যে এ গোলমাল, এ বিরোধ একটুও সাম্য করিতে পারিল না! এতকাল ধরিয়া এত দর্শনের সৃষ্টি হইল, এবং প্রতিবারেই প্রতি-দর্শনের সমকালিকেরা ভাবিল যে, যাহউক এইবারেই জ্ঞান-আবিষ্কারের চূড়ান্ত হইল; কিন্তু তথাপি দেখা যাইতেছে যে, যেমন তাহারা একে একে উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই ক্ষণেক গণ্ডগোল বাধাইয়া, আবার তাহারা কাল পরিবর্ত্তনে একে একে বিচ্যুত, বিদূরিত বা পশ্চাতে পড়িয়া বিস্মৃতি মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেন হইল?—অন্বয়শূন্য যুক্তিবাদের উহাই অনিবার্য্য পরিণাম।

মানব, এই সৃষ্টিমধ্যে তুমি যখন সহায়শূন্য, সঙ্গিশূন্য, আহারসাপেক্ষ, পররোষতোষাপেক্ষ হইয়া প্রেরিত হইয়াছ; তখন মনে করিও না যে তুমি এই সৃষ্টি লইয়া ডিক্রি ডিস্‌মিস্, ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছ। তাহা হইলে এমন দুর্দ্দশায় আসিবে কেন? আসিবার সময় তোমার সঙ্গে নাগরা নিশান আসা সোটা ছুটিত। তুমি একজন ক্ষুদ্রপ্রাণ

কর্ম্মকারক মাত্র ; কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, কর্ম্ম করাইতে আইস নাই। এই সৃষ্টি তোমার ক্রীড়নক, বা ডিক্রি ডিস্‌মিসের পদার্থ নহে ; ইহা তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। ইহাতে নিত্য অসংখ্য অভিনব ব্যাপার, যাহা প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছে, যাহা তোমার অনাকর্ষক দর্শনে অলক্ষিতভাবে চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের কাহাকেই অগ্রাহ্য এবং সামান্য বলিয়া ভাবিও না, উহারা কেহই তোমার তুচ্ছ বা খেলার দ্রব্য নহে। প্রত্যেককে স্থির চক্ষে নিরীক্ষণ কর, নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর ;—কি কর্ম্ম করিতে তুমি এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছ তাহাই তথায় লিখিত আছে, চক্ষু খুলিয়া পড়িয়া লও। সভক্তি চিত্তে পড়িতে চেষ্টা করিও, সহজে পারিবে। খেলাইতে চেষ্টা করিও না, কোথায় পালাইবে; তখন কেবল তাহার অন্তঃ-সারশূন্য ছায়াভিন্ন আর তোমার নিকট কিছুই থাকিবে না, আর তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবে না।

সামান্য যুক্তিবাদী হইতে উচ্চ দার্শনিক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রেই আধুনিক দর্শন ও দার্শনিক শিষ্যের উদ্দেশ্য, আত্ম কর্ত্তব্য বুঝিয়া লওন, বস্তুলাভে তত্ত্বদ্বোধন বা তন্নিরাকৃতিসাধন, বা পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানকে জ্ঞানশৈলের উচ্চশৃঙ্গারোহণ হেতু সোপানশ্রেণীরূপে নিবন্ধন করা নহে। ফাজিলগিরিতে স্বীয় জ্যেষ্ঠত্বের সংস্থাপন, অনন্ত এবং অদৃষ্ট পদার্থের সহসা আয়ত্তীকরণ, এবং অজ্ঞাত জ্ঞানের তড়িদ্বেগে অনুধাবন ; এক কথায় স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি নিচয়ের সম্যক সমর্থন ও পরিপোষণ, ইহাই প্রধানতঃ প্রায় যাবতীয় দর্শন, অন্ততঃ দার্শনিক শিষ্যদের উদ্দেশ্য। এই জন্য ফলও এমন সুন্দর ! পাঁচ টাকা করিয়া বনাতের গজ হইলে, চারিগজ বনাতের মূল্য যদি কষিয়া বিষটাকা বাহির হইতে পারে ; তবে ঈশ্বর থাকিলে, সৃষ্টি মূল থাকিলে, আত্মা থাকিলে, বা যে কোন অদৃষ্ট বা অনন্ত পদার্থ থাকিলে, কেন না তাহা বাহির হইবে ? বিষয় গুরুতর হইলে হইতে পারে, কিন্তু প্রক্রিয়া যখন এক, এবং ত্রৈরাশিকের সাধন প্রণালীও যখন অভ্রান্ত, তখন সেই সঙ্কেতে এ বিষয়ও সাধিত না হইবে কেন ? বাঞ্ছারাম, আমি তাহা জানি, কেবল ত্রৈরাশিক কেন, তুমি অস্থিতপঞ্চক পর্য্যন্ত কষিতে জান ; কিন্তু ইহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, এখানে উপপাদ্য সংখ্যা সর্ব্বতোমুখে অনন্ত ! কই, তোমারও ত গতিশক্তি আছে, ঊর্দ্ধে যাইতে পার, অধোভাগে যাইতে পার, যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে যাইতে

পার ; ভাল, এখন একবার সেই গতি ধরিয়া চন্দ্রমণ্ডলে চল দেখি, তাহাও ত গতির কাজ! পারিবে না—কেন?—বাহ্যে গতিসাদৃশ্য থাকিলেও, অভ্যন্তরে বহুবিধ অদৃষ্ট বাধায় প্রতিবন্ধিত। মূর্খ? এই অদৃষ্টবাধা তবে আর সর্ব্বত্র দেখিতে না পাও কেন? ব্যষ্টিগর্ভে সমষ্টি সমাবেশ, ব্যষ্টি কর্তৃক সমষ্টি আয়ত্ত, ইহাও তোমার যুক্তিবাদে সম্ভব বলিয়া অবলোকিত হয়? তুমিই না ঈশ্বর, ঐশ্বরিক অভিপ্রায়, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি যুক্তিবাদে ফয়সালা করিতে প্রস্তত! তুমি?—ক্ষুদ্রতম হইতেও ক্ষুদ্রব্যষ্টি। আর সেগুলি?—মহৎ হইতেও অনন্ত মহান্ সমষ্টি! অথচ তোমার সেইই চেষ্টা! কেহ কি তোমায় বুঝাইবার ছিল না বা নাই যে, সে অনন্ত মহান্ সমষ্টি আয়ত্ত করিতে, বিশ্বগ্রাসী দর্শন এবং তর্কবুদ্ধির আবশ্যক?—আমাদিগের তাহা নাই! আমরা এক এক বিষয় এক একবারে দেখিতে চাহিলে বোধ করি দেখিতে পাই, এবং তাহা বুঝিতেও সক্ষম হইতে পারি; কিন্তু একেবারে সমগ্র দর্শন, অথবা ব্যষ্টিবিশেষকেই একেবারে সমগ্র ও সগুণ আয়ত্তিকরণ, আমাদিগের ভাগ্যে লেখা নাই। তাবত বিষয়েতেই মানবীয় দৌড়ের একটা সীমা আছে, যাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে, প্রতিঘাতের বিপুল বেগে দূর অধঃপাতে আসিয়া পড়িতে হয়।

তাহার পর তোমার বিজ্ঞান! যাহাকে আনুষ্ঠানিক পর্ব্বে সর্ব্বসাধক বলিয়া নিত্য নিরন্তর ভক্তিভরে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাক, যাহার আভাসে অদৃষ্ট ও গূঢ় বিষয়কেও আলোকিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোহ প্রাপ্ত হও এবং কুবুদ্ধিপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাক, তাহাও তোমাকে এ অনন্ত জ্ঞানক্ষেত্রে অতি অল্পদূর মাত্রই লইয়া গিয়া থাকে। তোমার বিজ্ঞান কি?—স্থূলভূত সংসারে আরও কিছু বেশি পরিমাণে অক্ষর পরিচয় মাত্র; অথবা তোমার খরজনিনাদি বৈজ্ঞানিক ভাষায়, পদার্থ পরম্পরায় মিশ্রণ অমিশ্রণাদি গুণ-পরিবোধন, কে বিধর্ম্মী কে সধর্ম্মী তদুদ্বোধন এবং নামকরণ, ইত্যাদিতে তাহার পরিসমাপ্তি। এবং তত্তৎ বিষয়েরই আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে আনতি, ঐ বিজ্ঞানের দৌড় এবং উন্নতি। অথবা সোজা কথায় এইরূপ একটা কিছু—আমি দেখিতেছি এই বিটপ-শিশু ত্বক্ এবং কাষ্ঠে নির্ম্মিত, এবং উহার শরীরাভ্যন্তরস্থ বৃক্ষরসে উহার পুষ্টি। তুমি দেখাইলে, কেবল তাহা নহে,

এই এই বস্তু সংঘটনে ত্বক্, ইহাতে ইহাতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বা এতৎ সমষ্টিতে কাষ্ঠ; এবং বৃক্ষরসে এই এই বস্তুর অস্তিত্ব হেতু উহা তাহার পরিপোষক; অথবা উহা হইতে আরও কিছুদূর সূক্ষ্মতরে চলিলে; কিন্তু অনন্ত পদার্থ-রূপের মধ্যে তাহা তোমাকে কতদূরই লইয়া যাইবে ভাবিয়াছ? এ ভাবে তোমার বিজ্ঞানের উন্নতি ও গমনপথ আকল্পমান-কালেও ত শেষ হইবে না। তবে তুমি তাহার উন্নতির অনন্ত অংশাংশ মাত্রের উপর এতটা নির্ভর করিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হও, কেমন করিয়াই বা অজ্ঞাত তাবতকে আলোকিত বিবেচনা কর, তাহা সত্য বলিতেছি,আমি বুঝিতে পারি না। পুনশ্চ, তোমার বিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে, পদার্থের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে নাম প্রদান ভিন্ন, প্রকৃত বস্তুভাব কি কখনও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে? পারে নাই! অথচ এই ক্ষুদ্রপ্রাণ বিজ্ঞান অনেক পণ্ডিতের নিকট তাবত বিষয়ের মীমাংসক; লোকাতীত তত্ত্ব পর্য্যন্ত ইহার সাহায্যে তাহার নিকট নিরাকৃত; অনেকে এতদবলম্বনে নাস্তিকতায় পর্য্যন্ত আসিয়া উপনীত হইয়াছে, অন্তত মুখে! কর্ম্মজগতের বিস্তার সহ ভূতজগতকে কিরূপে কর্ম্ম সহায়তায় আনিতে হয়, তদর্থেই তোমাকে বিজ্ঞানানুশীল শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে; তদতীত বিষয়ের জন্য হয় নাই। ভূতজগত হইতে অধ্যাত্মজগতের মধ্যে দূর ব্যবধান। যাহার যথায় অনধিকার, তথায় তাহার অধিকার দিলে, কুফল ফলনই অবশ্যম্ভাবী। তাই আধুনিক বিজ্ঞানবাদে পাষণ্ডপণার এতটা দৃশ্য দর্শিত হয়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভল্লুক একদিন না খাইতে পাইলে মরিয়া যায়, আর উত্তর কেন্দ্রস্থ ভল্লুক বৎসরের তিনভাগ স্বচ্ছন্দে অনাহারে যাপনকরিয়া থাকে; বলিতে পার কি জন্য? তুমি বলিবে এই এই জন্য। আবার জিজ্ঞাসা করি তোমার 'এই এই জন্যের' কারণভূত 'জন্য' পদার্থ কি, অথবা 'জন্য' পদার্থ কাহাকে বলে? ইহাই যখন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন বিশ্বকার্য্য, বা কার্য্যমূল, কেমন করিয়া বুঝিয়া আয়ত্ত করিব?—যখন এই এক পৃথিবীর স্থান ভেদে এত প্রকরণ এবং নিয়মভেদ; তখন ঐ সীমাশূন্য গগন-সাগরে যে অসংখ্য গোলকরাশি নিরন্তর ভাসিয়া বেড়াই-তেছে, তাহাতে আবার কত কি নূতন নিয়ম, কত কি অপরিচিত

পদার্থ অবস্থান করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদিগের কল্পনারও তাহা অগোচর! মন তাহাকে ধারণা করিতে পারে না, বুদ্ধি তাহাকে গ্রহণ করে না এবং সংজ্ঞা সেখানে সংজ্ঞাশূন্য হয়! অথচ বিশ্বতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে হইলে, সে মনোবুদ্ধিসংজ্ঞার অতীত তৎ তৎ লোকস্থ বিষয়ের সঙ্গেও পরিচয় আবশ্যক; নতুবা একদেশদর্শিত্ব দোষ ঘটে, উপপাদ্য অসম্পূর্ণ হয়। তাই বলি বঙ্গারাম, কেবল পৃথিবীস্থ ভূতসংসারের গোটা দুই ভূতগতি দেখিয়া 'এ, ও, তা' এবং নিয়ম 'নিয়ম' করিলে চলিবে কেন? অথবা আমরা যাহাকে নিয়ম বলিয়া থাকি, আমরা যাহাকে যাহা নাম দিয়াছি, তাহাই বা কি, তাহাও আমরা জানি না। আমরা যাহাকে যে নাম দিয়া ভাবিলাম তাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছি, তাহাত কেবল কতকগুলি সংজ্ঞা মাত্র, পার্থক্য বোধক এবং পার্থক্য সাধক। তুমি জান কি? তোমার সেই সংজ্ঞা গুলি থাকুক বা যাউক (তাহা একদিন যাইবেও), বিশ্বকার্য্য তাহাতে বড় একটা অপেক্ষা রাখে না? একবার মনেকর দেখি, যদি কোন ঘটনা ক্রমে সেই সংজ্ঞারাশি সহসা একদিন উড়িয়া অদৃশ্য হয়, তাহা হইলে তোমার পক্ষে কি দুরন্ত বিপদ, তোমার নিকট এই সৃষ্টি মহাপ্রলয়ের আকার ধারণ করিবে কি না? অতএব ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, যে দিকেই দেখিতে যাও, সেই দিকেই অপরিজ্ঞেয় সংসার, সেই দিকেই তুমি সামান্য প্রাণ এবং সামান্য শক্তি; অনন্ত নিবীড়গূঢ় গুহ্য মধ্যে সামান্য খদ্যোতালোক মাত্র! অতএব যে দিকেই তুমি ভ্রাতৃসংমিলন এবং সৌজন্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুত্ব করিতে অগ্রসর হইবে, সেই দিকেই তোমার প্রভুত্বের উদ্দেশ্য পাদার্থ আয়ত্তাতীত বিরাট দেহে, তোমাকে ছায়া-ক্রীড়নক দানে ভুলাইয়া, উপহাস করিতে থাকিবে।

ফলতঃ বিষয় যত উত্তর উত্তর উচ্চ হয়, ততই তাহা আমাদিগের আয়ত্ত, আমাদিগের কর্ত্তৃত্বের অতীত হইয়া থাকে। একজন একখানি ভাল রিপোর্ট লিখিল, তখনই তাহার ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম, এবং পুরস্কার স্বরূপ রিপোর্ট লেখকের আশার অতীত পদোন্নতি বা যে কোন পুরস্কার দিলাম। কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়র যাহা লিখিল, তাহার ভালমন্দ বুঝিয়া পুরস্কার দেওয়া আমার সামর্থ্য হইল না। তাহা বুঝিতে দুইশত বৎসর

গত হইবে, তথাপি বুঝিতে পারিব কি না সন্দেহ! কিন্তু সে গরিব সন্তান?—সে এখনও সেই সং সাজিয়া, নাট্যালয়ে টিকিট বেচিয়া, উদর পোষণ করিতেছে। লোকে বলিতেছে লোকটা নকুলে বটে. নাটকের ছলে গল্পগুলি সাজায় মন্দ নয়! বাঞ্ছারাম, যে কোন সময়ের সমসাময়িক, লোক-গৃহীত সমসাময়িক বড়লোকের ঘটা এবং উন্মাদনের ছটার প্রতি কি কখনও চিন্তানেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছ? সংবাদপত্র লেখক বড় লোক, ঘাট মাঠের বর্ণনা বা সামান্য উপন্যাস লিখিয়া বড় লোক, বক্তৃতা করিয়া বড় লোক, সভা করিয়া বড় লোক, দারগাগিরি করিয়া বড় লোক. টাকা দেখাইয়া বড় লোক, তাহার পর তোমার রঙ্গভূমির অভিনেতৃ (Leading men) বড় লোক, যে দিকে যাইবে সেই দিকেই বড় লোকের ছড়াছড়ি! ইহাঁরা 'দেশের মঙ্গল' সাধন করিয়া থাকেন, খবরদিয়া—বানরকীর্ত্তি দেখাইয়া—কথা শুনাইয়া—পোষাক দেখাইয়া—কুলি ধরিয়া—চাঁদা দিয়া—তাহার পর সাষ্টাঙ্গে সেলাম ঠুকিয়া। কিন্তু প্রকৃত বড় লোক, প্রকৃত মহৎ যে, যাহার কার্য্য যুগান্তস্থায়ী ও অনন্ত ফলপ্রসবী, সেও সেই তাহার সমসাময়িকের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া কার্য্য করিয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু শিশু বনস্পতিবৎ অলক্ষিতে, অপরিচিতে; অথবা লক্ষিত ও পরিচিত যদি, তবে প্রায় সর্ব্বত্রই সে নিন্দা, ঘৃণা, বা উপহাসের পাত্র হইয়া থাকে। তোমার সাময়িক বড় লোক সমক্ষে সে অশ্রুত; বা শ্রুত যদি, তবে তাহার কথা বাতুলের প্রলাপ মধ্যে গণ্য এবং আবশ্যক অনুসারে কখনও বা উপহসিত, কখনও বা উৎপীড়িত। আগাছা এবং বনস্পতি, এই দুয়ের জন্মবৃত্ত ও জন্মখ্যাতি, এ উভয়ের মধ্যে কতই অন্তর! নির্জ্জন কান্তারে মৎস্যজীবী লইয়া যিশুর শিক্ষা প্রচার; এবং বিজন অরণ্য-মধ্যে অশ্বত্থমূলে বুদ্ধের জ্ঞানঘোষণা, ধীর নিস্তব্ধ, নির্জ্জনে নিষ্পাদিত; কিন্তু তথাপি যুগান্ত অতিক্রম করিয়া জীবন্ত মূর্ত্তিতে চলিয়া আসিতেছে। আর তোমার বড় লোকের বড় ঘোষণা গুরুধ্বনি কামান মুখে দিগন্ত ঘোষিত হইয়াও, মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনে জলবুদ্বুদবৎ জলে মিশাইয়া যাইতেছে। আমাদিগের মহত্ত্ব অনুভব-শক্তি কি প্রচুর!

অসারে ধ্বনি প্রতিধ্বনি, সারে নিস্তব্ধতা; একটি কালের, অপরটি কালাতীতের, একটি যুক্তি বা বচনাবলির বিষয়, অপরটী ধ্যেয়। একটি ছায়া,

অপরটি সজীব। যাহা সজীব, তাহাই জীবলোককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ছায়াতে তাহা করে না; অথবা ছায়া দৃষ্টে সজীবতার অনুভূতি কেবল ছায়া-ময়ী ও ভ্রমের কারণ মাত্র হয়।

কপিল, গৌতম এবং কোম্‌তে প্রভৃতি মণিহারীর দোকান সদৃশ অসংখ্য দার্শনিকগণ, এতকাল ধরিয়া অনেক তর্কশাস্ত্র লিখিয়া এবং অনেক তর্ক-শাস্ত্রের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। কেহ ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছেন, কেহবা অনির্ণয় করিয়াছেন; কেহবা বিশ্বমূল, লোক যাত্রা, লোকনীতি, সমাজ-নীতি, ইত্যাদি সমস্ত করতলস্থ করিয়া তুলিয়াছেন; কেহবা তাহাতে অপরি হার্য্য বিঘ্নবাধায় প্রতিবন্ধ হইয়া, সকলই মায়া বা দৃশ্য মাত্র বলিয়া, হাসিয়া উড়াইয়া, আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্থির রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। মূল হইতে তর্ক তারে তারে বাঁধিয়া শেষে মীমাংসায় আসিয়া শেষ হইয়াছে, কোথাও ছিদ্র মাত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ চূড়ান্ত, এরূপ বুদ্ধিবিরোধ নিরশক জ্ঞান এবং জ্ঞানপন্থা আর কি হইতে পারে! কিন্তু তথাপি বলিতে পার, তাহাদিগের অনুগামী শিষ্য সংখ্যা কয়টি? কয়টি লোক জীবন মন বিক্রয় করিয়া তাহাদিগের অনুগামী হইয়াছে এবং কয়টিলোক বা তাহাদের সত্যতা-সাক্ষ্যে জীবন দানে এবং জাগতিক লাঞ্ছন সহনে উদ্যত? কিন্তু এদিকে একজন অতার্কিক নব্যবয়স্ক লোকের প্রতি তাকাইয়া দেখ,—চৈতন্য দেব। বোধ করি এমন অতার্কিক মন আর হইতে নাই; তর্কের সকল সংস্রবশূন্য, কেবল একমাত্র সম্পূর্ণ সভক্তি চিত্ত এবং তদ্ভূত অনুরাগ মাত্র সার। এক হরিধ্বনি, হরিনাম মুখ দিয়া বাহির হইল, আর দেশশুদ্ধ পাগল হইয়া পিছু পিছু হরিনামের মোহে ছুটিল;—জাতিত্ব, জ্ঞাতিত্ব, পুত্রত্ব, সকল বিসর্জ্জন করিল, কেবল একমাত্র হরিনামের মোহে। কি আশ্চর্য্য! বাঞ্ছারাম, কোথায় গোপিনীমোহন ব্যভিচার-পরায়ণ, গোচারণ-বৃত্তি হরি; আর কোথায় তোমার তর্কসার, নিরাকার, উচ্চ নামধারি ঈশ্বর; তবু লোকে ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই হরিতে মাতিয়া গেল।

বলিতে পার কেন? বলিতে পার বা না-পার, এবং বুঝিতেও পার বা না-পার, এই হরিনাম যতই হীন হউক, তথাপি তাহা জীবন্ত। আর তোমার তর্কসার ঈশ্বর যতই উচ্চ হউন, এখানে কেবল নাম মাত্র, জীবন্ত

নহে, বর্ণমালার বর্ণযোজনা, শুষ্ক নীরস ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। একজন ভিক্ষুক আসিয়া তোমার নিকট আপন দুঃখ কত বাক্যকৌশলে বর্ণনা করিল, তুমি ভাবিলে বক্তেশ্বর বেটাকে তাড়াইতে পারিলে রক্ষা পাই; কিন্তু অমনি আর একজন ভিক্ষুক আসিয়া কেবল আপন অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এক ফোটা চখের জল ফেলিল, আর অমনি তুমি দ্রব হইলে, তাহার দুঃখে তোমার দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহার দুঃখ মোচন করিতে তোমার চেষ্টার উদ্রেক হইল; কেন? প্রথমটি এত যুক্তিযুক্ত বাক্য-কৌশল বিস্তার করিল, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলে না; আর এই দ্বিতীয়টির চখের জল মাত্র এক ফোটা দেখিয়া দ্রব হইয়া গেলে? আশ্চর্য্য! "যোগাৎ যোগোন যুজ্যতে," না; া কি গতজীবন শুষ্কদেহ মৈসরীয় 'মমীর' সঙ্গে তোমার সংমিলন হইতে পারে, না তাহা কখনও সম্ভবে? তুমি জীবন্ত, বিশেষ অনন্ত-উৎস-প্রসূত জীবনীতে তুমি জীবন্ত; সুতরাং কৃত্রিমজীবন, বা জীবনের সারশূন্য শুষ্ক ছায়ামাত্র যাহা, তাহাকে উর্দ্ধসংখ্যা পরিচর্য্যার্থে নিয়োজন ভিন্ন, তাহার সঙ্গে তোমার প্রগাঢ় আত্মীয়তা এবং সংমিলন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। জীবন্ত জীবন্তে মিলিত হয়, যেহেতু উহাই স্বাভাবিক। যে কোন জীবন্ত মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলে দেখিতে পাইবে যে, তোমার কিছু অনিচ্ছা থাকিলেও, তথাপি তাহার উপর তোমার আত্মীয়তা ও সহানুভূতি কত দূর! ফলতঃ উহা যতই হীন হউক, তথাপি উহা তোমার স্বজাতীয়,—উহা জীবন্ত; সুতরাং কেমন করিয়া তাহার সংস্রব ছিন্ন করিবে? অনন্তসূত্রে যে সম্বন্ধ বর্দ্ধিত, তাহা তোমার আমার ছিন্ন করিবার শক্তি নাই। জীবন্ত এবং জীবন হীনে কখনও সংমিলন হয় না; এই জন্যই লোকে তর্ক-উপপাদ্য জ্ঞানের সহ সহানুভূতিতে, সর্ব্বস্ব বা যে কোন বিষয় ত্যাগে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। তুমি বলিবে যে, সজীবের দ্বারা জীবলোক আকর্ষিত হওয়া প্রভৃতির কথা যাহা বলিতেছ, তাহাতে যুক্তির কাজ কোথায়? হৃদয়ের প্রভুত্বই যেন সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া বোধ হয়। ঠিক কথা! কিন্তু কে বলিল তোমাকে যে, হৃদয়েরও এ কর্ম্ম-ভূমিতে সার্থকতা নাই?

তর্কদর্শন গ্রথিত যে জ্ঞান তাহা একমাত্র বিচারণা শক্তিকে আশ্রয়,

ং কেবল তাহাকেই যথাশক্তি কথঞ্চিৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। মানবীয় য় এবং অপরাপর বৃত্তি ও শক্তি সমূহের উত্তেজন পক্ষে একেবারে সম্বন্ধ ও আত্মশূন্য, যেন ঐ ঐ বৃত্তি বা শক্তির মানবীয় মনঃক্ষেত্রে অস্তিত্বই ই, এবম্প্রকার আচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং জীবন্তভাব সংঘটন বা ংপাদনের জন্য যতগুলি উপকরণের আবশ্যক, তাহা সমস্তই পরিত্যক্ত বায় একমাত্র বিচারণা শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বারূপে গৃহীত হয়। যদি বিবেচনা য়া যায় যে, একা বিচারণা শক্তিই অপরাপর বৃত্তি এবং শক্তিসমূহের জস্বরূপ; তাহা হইলেই বা ফলের অঙ্কে অধিক কি দাঁড়াইল? রাজপুরুষ পেক্ষতাশূন্য রাজার আশ্রয় যেমন মঙ্গল বা অমঙ্গলকর; একামাত্র বিচারণা কর আশ্রয়ও সুতরাং তদ্রূপ। এই নিমিত্তই; তথাবিধ তর্কগ্রথিত নের সারশূন্যতা; এই নিমিত্তই তাহার নীরস অজীবন্তভাব এত ধিক; এবং এই জন্যই তাহার হৃদয়গ্রাহিতাশক্তি এরূপ শূন্যস্থানীয়।

যুক্তিযোগে বস্তু নিরূপণ আর হৃদয় যোগে তদনুভূতি, এতদুভয়ের মধ্যে নেক অন্তর। কথায় শুনিয়া কাজ আর চক্ষে দেখিয়া কাজ; দূরে বসিয়া জ আর চখোচখিতে কাজ; এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কত দূরন্ত! দূরে সয়া কলিকাতার স্বরূপতা কেমন, তাহার উপর তর্ক বিতর্ক; আর নিকটে সিয়া সচক্ষে কলিকাতা দর্শন, এতদুভয়ের ফলে কতই অন্তর! যুক্তি এবং দয় এ উভয়ে সেইরূপ প্রভেদ। যুক্তিতে উর্দ্ধসংখ্যা শুনায়,কিন্তু হৃদয়ে দেখায়। থবা তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, অসাক্ষাতে লোকের কত সর্ব্বনাশ, কত ৎসা করিয়া থাক; কিন্তু আবার সেই সকল কুৎসা এবং সর্ব্বনাশের পাত্র হারা, তাহারা বারেক সাক্ষাৎকারে আসিলে, তখন সেই কুৎসাদির জন্য মন জড়সড়, অনুতপ্ত, লজ্জিত ও মিষ্টমুখ হও; যেন সেই ব্যক্তিই নহ, এরূপ াব ধরিয়া থাক! যে কোন লোক বা পদার্থের বিষয়, কাণে শুনিয়া একরূপ রণা, আর চখে দেখিয়া আর একরূপ ধারণা, ইহা নিত্যব্যাপার। কাণের নন হইতে চখের দেখা সর্ব্বদাই কত নূতন, কত রূপান্তর ভাব; এবং না হইতে দেখায়, দর্শকের মনে কতই অভিনব এবং পূর্ণভাবের উদ্দীপন রিয়া থাকে। ইহার কারণ কাণে শুনার অবলম্বনীয় বস্তু ছায়া, এবং চখে খার অবলম্বনীয় বস্তু জীবন্ত ভাব। ছায়ার অবলম্বনে, শ্রোতাকে

তদ্বিষয়ীভূত বস্তু তৈয়ার করিয়া লইয়া ধারণা করিতে হয়। তৈয়ারে স্বাধীনতা হেতু, শ্রোতা যতই চতুর হউক, বস্তুটি প্রায় নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী করিয়া তুলে। প্রকৃত আদত বস্তু হইতে, এরূপ কল্পিত বস্তু কাজেই অনেক তফাত হইয়া পড়ে। চখের দেখায় সেরূপ হইতে পারে না; দ্রষ্টা যতই সামান্য শক্তি হউক, তথাপি সে আদত বস্তু দেখিয়া থাকে। আদত বস্তু দেখা আর কৃত্রিম বস্তুর কল্পনা করা, এ উভয়ের ফলে অনেক প্রভেদ; তাই কাণে শুনিয়া কাজ আর চখে দেখিয়া কাজ, এ উভয়ের মধ্যে এত অন্তর। পূর্ব্বে একবার দার্শনিক ও চৈতন্যে তুলনা করিয়াছি; এ স্থানে দার্শনিক সেই শ্রোতা, চৈতন্য সেই দ্রষ্টা! শ্রোতা দেখে নিজেকে;—দার্শনিক উপপাদিত করে নিজ প্রকৃতিকে।

তুমি ইতিহাস পড়িয়া জ্ঞাত আছ যে, সুলতান মামুদ ব্যভিচারী সৈনিককে তরবারি ঘাতে দ্বিখণ্ড করিবার সময় দীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিল। বলিতে পার, এ দীপ নির্ব্বাণের উদ্দেশ্য কি? মামুদের মনে তাহা স্পষ্টতঃ উদয় হউক বা না হউক, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য হত্যাসক্ষম হইবার জন্য, উদ্দেশ্য বস্তুর জীবন্তভাবকে পরিত্যাগ করিয়া সাধ্যায়ত্তে তাহার ছায়াকে অবলম্বন করিবার জন্য,—তর্কদর্শন ক্ষেত্রে প্রবেশ,—হৃদয়ের উপর পরদা ক্ষেপ করিবার জন্য! ছায়ার অবলম্বন মানবকে কি দুরন্ত ভ্রম পথেই না লইয়া যায় এবং তাহাকে দিয়া কি অপকর্ম্মই না করাইয়া থাকে। দেখিও তুমিও যেন ছায়ার অবলম্বনে সেইরূপ কুহক-পতিত হইয়া আত্মবলি দিতে ছুটিও না। তুমি বলিবে, মামুদের যেন ছায়াই অবলম্বন হইল, কিন্তু সেই ছায়া ধরিয়া ফলে কি সে নিতান্ত মন্দ কার্য্য করিতে গিয়াছিল? নির্ব্বোধ! প্রকৃতি যাহার বিরোধি তাহা কি কখনও ভাল হইতে পারে,—সন্তান বধ্য হইলেও পিতৃহস্তে নহে, এ জগতে লোকহিত এবং অপত্যস্নেহ এতদুভয়ের কি সামঞ্জস্য হইতে পারে না? মামুদের সন্দেহ হইয়াছিল, ঐ সৈনিক তাহার পুত্র; পুত্রমুখ দেখিয়া পাছে ক্রূরকর্ম্মে হস্তোত্তোলিত না হইয়া উঠে, এই জন্য দীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিল। কিন্তু সে যাহা হউক, মামুদের তাহাতে বিচার বিষয়ে অপক্ষপাতিত্বের বড় প্রশংসা হইয়াছিল। বাঞ্ছারাম, তোমারই কোন্ সেরূপ প্রশংসা নাই;—সকলেই বলিয়া থাকে তোমার তর্কবুদ্ধি বড় চিকণ, এবং

তোমার হেকৃমতেরও অন্ত নাই; কিন্তু আবার সেই সকলেই বলিয়া থাকে যে, তুমি বড় নাস্তিক, বড় পাষণ্ড, বড় ভণ্ড, তোমার অসাধ্য কাজ নাই।

উপার্জ্জন ক্রিয়ার অনুসরণ এবং তাহাতে যে কৃতকার্য্যতা, তাহা মনুষ্য জীবনের স্ফূর্ত্তিমান্ ও শ্রেষ্ঠ ক্ষমবান্ অংশকেই অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। তখন বাক্যাড়ম্বর বা কুতর্কের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক থাকে না, প্রাণপণে নির্ব্বাক কার্য্যানুসরণই একমাত্র সে সময়ের রীতি। বাক্যাড়ম্বর, তর্কবিতর্ক, দোষগুণবিচার, এ সকল উপার্জ্জন শ্রান্ত এবং উপার্জ্জন ক্ষান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতত্বের সম্পত্তি এবং তাহারা, এতদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত উপার্জ্জন ক্রিয়ার যে আসন্ন সমাপ্তিকাল, তাহার চিহ্ন স্বরূপ। জ্ঞান সংসারেও অবিকল তাহাই; কুতর্কাদি প্রতি পর্ব্বস্থ জ্ঞান উপার্জ্জনের অন্তিমকালের পরিচায়ক স্বরূপ। জ্ঞানবিশেষের যে প্রবল স্রোতধারা এতদিন দুর্দ্দমনীয় গমনে পাহাড় পর্ব্বত অবহেলে লঙ্ঘন করিয়া বেগবতী হইয়া ছুটিতেছিল; এক্ষণে তাহা অন্বয়শূন্য যুক্তিবাদরূপী মরুস্থল সংলগ্নে বিলুপ্ত হইতে বসিল। ফলতঃ যে তর্কদর্শন যে সময়ের এবং যে শ্রেণীর, সেই সাময়িক সেই শ্রেণীর জ্ঞান উপার্জ্জন চেষ্টায় ভগ্ন গতির উহা ধ্বষ্ট নিশান স্বরূপ। অতএব লোকে, যে রুক্ষ যুক্তিবাদকে জ্ঞানের প্রবর্ত্তক স্বরূপ ভাবিয়া, তাহার অবথা অনুসরণে উন্মাদবৎ হইয়াথাকে; এবং অদৃষ্ট জ্ঞানের বৃথা আশায় বসিয়া সময় ক্ষেপণে আত্মধ্বংস করে; এখন দেখ সেই যুক্তিবাদ বস্তুতঃ সেই জ্ঞানের প্রবর্ত্তক নহে। বস্তুতঃ তাহার বিপরীত, নিবর্ত্তকেরই কার্য্য করিয়া থাকে; অথবা নিবর্ত্তন হইতেই উহার উৎপত্তি। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীনেরা, এবং কখন কখন আধুনিকেরাও, যথার্থ উপার্জ্জন ক্রিয়ার অনুসরণ সময়েও, যুক্তিবাদের আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার মধ্যে সৌভাগ্য এই যে, সেই যুক্তিবাদ আনুষ্ঠানিকরূপে কার্য্যে কদাচিৎ পরিণত হইয়া থাকে। অথবা এ সময়ের যুক্তিবাদও একেবারে ততটা সামঞ্জস্য শূন্য হইতে পারে না বা উহার ততটা স্বাধীনতা ও স্বয়ংসর্ব্বস্ব ভাবও থাকে না, যতটা মনবীয় কোন এক অধঃপতন কাল বিশেষে লক্ষিত হয়। যদি ইতিহাস মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, প্রায়ই জাতীয় অধঃপতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই, যে কোন দেশে তর্কদর্শনের ঘটাঘটি আরম্ভ এবং তাহার

ব্যাপ্তি সাধন হইয়া থাকে। মনুষ্যচিত্ত বিশ্বশক্তি প্রতিরূপ, অতএব এমন প্রত্যাশা করিও না যে, তাহাকে যুক্তিবাদের বাঁধা পথে নাকে দড়ি দিয়া যদৃচ্ছা লওনে সমর্থ হইবে। পথ দেখানর অন্য উপায় আছে। সে উপায়ে ভাল পথ দেখাইতে পার দেখাও; দেখাইয়া পথে উঠাইয়া স্বেচ্ছা গমন করিতে দেও; দেখিতে পাইবে তাহার কি সুন্দর, কি মহান, কি চিত্তমুগ্ধকর গতি!

আমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা শুনিয়া তুমি নিঃসন্দেহই মনে ভাবিতেছ যে, আমার ন্যায় যুক্তিবাদের দ্বিতীয় শত্রু এবং নিন্দুক আর নাই, বস্তুতঃ তাহা নহে। সকল বস্তুরই ব্যবহার আছে, যুক্তিবাদেরও ব্যবহার আছে। তুমি তাহাকে অপরাপর চিত্তশক্তি এবং চিত্তবৃত্তি হইতে সামঞ্জস্য চ্যুত করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বারূপে ব্যবহার করিতে চাহ; আমি বলি তাহা নহে, উহা সামঞ্জস্য সংমিলনে ব্যবহৃত হউক। পর প্রস্তাবে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

উত্তর পক্ষ।

যুক্তিবাদের অসদ্ব্যবহার যেমন অপরিসীম কুফল প্রসব করিয়া থাকে, তাহার সদ্ব্যবহার আবার তেমনই সুফল প্রসব করে এবং যাহা প্রসব করে, তাহা এমনই সুন্দর যে, চটকে তাহা যেন আর সমস্ত চিত্তবৃত্তিজ পদার্থের অতিক্রমকারী জ্যোতিষ্মান্‌রূপে প্রতীয়মান হয়।

যুক্তিবাদ মানবীয় মনের একটি বৃত্তিবিশেষ। মন তাবতবৃত্তির সমষ্টি রূপ। ইহলোকে আগত মানবীয় আত্মার সর্ব্বপ্রধান ইন্দ্রিয় মন। অতএব মন এবং মনস্তবৃত্তি সকল কিরূপে সুভাবে কার্য্যকরী হইয়া সুফল প্রসব করিতে পারে, তাহা দেখিবার পূর্ব্বে, ইহলোকে মানবের স্থান, মান, অবস্থা ও ভাব, এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ইহলোকে আগত মানব চতুর্ব্বিধ শাসনে শাসিত। মানবের ভৌতিক ভাগে শাসন দ্বিবিধ এবং আত্মিক ভাগেও শাসন দ্বিবিধ। প্রথমত, মানবের ভৌতিক ভাগ সাধারণ জড়প্রকৃতির অংশ স্বরূপ, সুতরাং উহাও সাধারণ জড়প্রকৃতির নিয়মে শাসিত হয়। যে নিয়মে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া

সাগর হইতেছে, সাগর শুকাইয়া পর্ব্বত উঠিতেছে; স্থানচ্যুত বৃন্তচ্যুত, পত্র উড়িতেছে, ফুল ঝরিতেছে; এক কথায় যাবতীয় নিসর্গ ক্রিয়া যে নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে; মানবীয় ভৌতিক ভাগও, মানবীয় স্বেচ্ছা-শক্তির বিপরীতেই, সেই নিয়মে ওতপ্রোত হইতেছে। জড়জগতের অনাদি কার্য্যকারণ পরম্পরা তাহার কারণ, তোমার আমার সাধ্য নাই যে তাহার ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ হই। মানব এ নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, মানবীয় শরীরে নানাবিধ শুভাশুভাদি দৃষ্ট কতই বৃথা জল্পনা করিয়া থাকে; কখনও ভাগ্যের দোষ দেয়, কখনও ঈশ্বরের দোষ দিয়া ঐশ্বরিক সৃষ্টির সদসৎ বিচার করিতে বইসে। সহসা একটা নৌকাডুবি হইয়া বহুলোক ধ্বংস হইল, অথবা সহসা একটা উৎপাত উঠিয়া নানাজনকে নানাব্যাধিগ্রস্ত ও নিপাত করিল। ইহা আপাতত দেখিতে বড়ই রোম-হর্ষণকর এবং এমনও বোধ হইতে থাকে যে ঈশ্বর কি অবিচারক,—এমন পরিণামে এ হতভাগ্যদের সৃষ্টি না করিলেই ত হইত! কিন্তু মানব ইহা স্বপ্নেও একবার ভাবে না যে, আমার এই শরীর এবং আমি পর্য্যন্ত, কেবল আমার নিজের মতলব ও ভোগবাসনাদি পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট নহে; উহা মহাসৃষ্টির যে উদ্দেশ্য পূরণ, তাহারই সহায়তার জন্য। সুতরাং ঐ শরীর প্রকৃতির প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য; কাজেই উহা, প্রকৃতির যথা অভিপ্সিত ও নিয়োজিত পরিণাম যহা, তাহা অদৃষ্ট স্পষ্টবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রয়োজনীয় উত্তর বস্তুর পরিপাক হেতু, পূর্ব্ব বস্তুর তদ্রূপ পরিণাম আবশ্যক, তাই ওরূপ হইল। ভাল, তোমার প্রকৃত 'তুমি' পদার্থের তাহাতে ক্ষতিই বা কোথায়?

দ্বিতীয়ত, মানব আত্ম-প্রকৃতি বিশিষ্ট আত্মময়, শরীর তাহার অবলম্বিত আবরণ স্বরূপ; এজন্য মানবের ভৌতিক ভাগ যাহা, তাহা মানবের আত্মকৃত-নিয়মের দ্বারাও শাসিত হইয়া থাকে। মানবীয় আত্মময়ত্বের চিহ্ন, তাহার স্বেচ্ছাশক্তির বিকাস। স্বেচ্ছাশক্তির কর্ম্মপ্রবৃত্তি নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে। যখন সেই কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে স্থূলশরীর সহযোগে প্রকটনের আবশ্যক হয়, তখন স্থূলশরীরকে তদ্রূপ শাসনে শাসিত হইবায়, তদ্রূপ গতি প্রাপ্ত হইতে হয়। মানব যে পরিমাণে স্বেচ্ছাশক্তির ক্রিয়া আত্ম শরীরে খাটাইতে সমর্থ

হয়, প্রাকৃতিক ক্রিড়ার উহা সেই পরিমাণে সাম্য ও সংস্কার সাধন করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ দেখ; অরণ্যচর মানবের যে শরীর, সভ্যমানবের শরীর অপেক্ষা তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে অধিক পরিচালিত। পুনশ্চ, আদি মানবের শরীর হইতে সভ্যমানবের শরীর যেরূপ ভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা মানবের স্বেচ্ছাশক্তি পরিচালনের ফল। অরণ্যচর মানবের শরীর প্রাকৃতিক নিয়মের উপর যতটা নির্ভর করিলে রক্ষা হওয়ার সম্ভব, সভ্য মানবের শরীর সম্বন্ধে সেরূপ নির্ভর করিলে চলে না। আবার সেই সভ্যশরীর যাহা প্রকৃতির উপর অযত্নে নিক্ষেপ করিলে, এখনই ধ্বংস হওয়ার সম্ভব; তাহাকেই আবার স্বেচ্ছাশক্তি সম্ভূত ঔষধ কৌশল আদি প্রয়োগে বহুস্থায়ী করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, স্বেচ্ছাশক্তি স্বচ্ছন্দে প্রাকৃতিক নিয়মের কিয়দংশে সমতা ও সংস্কার সাধন করিতে পারে।

তৃতীয়ত, মানব আত্মবান জীব, স্বেচ্ছাশক্তি তাহার পরিচয়। এই স্বেচ্ছাশক্তিদ্বারা মানব স্বকৃত নিয়ম উদ্ভাবনে ও পালনে পটু; এজন্য আত্মিক ভাগে মানবের আত্মকৃত শাসন একটা আছে। স্বেচ্ছাশক্তির সহিত হিতাহিত জ্ঞান সংযোজিত থাকিবায়, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বোধ হেতু, স্বীয় আত্মকৃত নিয়মের সঞ্চার হইয়া থাকে। মানব এই আত্মকৃত নিয়মের দ্বারা আপনি আপনার কার্য্য শাসন করে। এই আত্মকৃত নিয়ম যখন সৎভাবাপন্ন, তখনই তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের সমতা ও সংস্কার সাধনে সমর্থ হয় এবং আত্মা ও প্রকৃতির সন্ধিস্থল যাহা, তাহাকেও কিয়দংশে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়,—যাহাকে অল্পকথায় আধ্যাত্মিক উন্নতি বলে; অসৎভাবাপন্ন হইলে, তন্নিম্নে অবতরণ করিয়া থাকে, ইহাকে অল্পকথায় আধিভৌতিক অধঃপতন বলে। আত্মকৃত নিয়মের সৎভাবাপন্ন ও অসৎভাবাপন্ন রূপে যে ক্রিয়া, তাহাদের ফলও অবশ্য দ্বিবিধ এবং প্রত্যেক ফল আবার দ্বিবিধ প্রকারে অর্শে। সৎভাবাপন্নের ক্রিয়া ফল যাহা, তাহা মানব পক্ষে পুণ্যভাবে ও মহাপ্রকৃতি পক্ষে স্বরূপভাবে সংযোজিত হয়। তদ্রূপ অসৎভাবাপন্নের ক্রিয়া ফল মানব পক্ষে পাপভাবে ও মহাপ্রকৃতি পক্ষে বিরূপভাবে সংযোজিত হয়। মহাপ্রকৃতির গতি বা ক্রিয়া প্রণালী দ্বিবিধ, এক স্বরূপে অপর বিরূপে। একটি বৃক্ষপত্র উৎপন্ন হওয়া ও তাহা নষ্ট হওয়া, উভয়ই প্রকৃতির কার্য্য এবং উভয়েরই পরিণাম ও

পরিপাক আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে উৎপন্নটি স্বরূপ ভাব, নষ্ট হওয়াটি বিরূপ ভাব।

চতুর্থত, মানবের আত্মিক ভাগ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হইলেও, তাহা ভৌতিক শরীরে আবদ্ধ ও ভৌতিক জগতে স্থাপিত হওয়ায়, আত্ম-স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাশক্তির যদৃচ্ছা বিকাশ করিতে পারে না; সে পক্ষে কিয়দংশে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। আত্মা এবং স্বেচ্ছাশক্তির রমনস্থল যখন কেবল একমাত্র জড় প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক বিষয়তেও, যখন এই জড় প্রকৃতি দ্বারা ভিন্ন, আমাদের উপস্থিত হওয়ার উপায় নাই; তখন সেই জড় প্রকৃতির সহ সম্বন্ধচ্যুত হইলে আমাদিগকে অস্তিত্বশূন্যের ন্যায় থাকিতে হয়। আবার সম্বন্ধযুক্ত হইলে, তখন কাজেই তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনে আত্ম চালনা করিতে হয়।

•মানবের আত্মা সহ, তাহার বৃত্তি নিচয়ও আত্মিক পদার্থ বটে; কিন্তু শুদ্ধ ও অনন্বিত আত্মিক ভাবে থাকিলে, ইহলোকে বিকশিত হইবার ও বিকাশিত হইয়া স্বীয় স্বীয় সার্থকতা সম্পাদন করিবার স্থান তাহাদের নাই। শারীর ভাগে ত তাহারা সর্ব্বত্রেই জড় জগতের অধীন, মানসিক ভাগেও তাহাই। মানসিক বৃত্তি সমূহ, যাহার দ্বারা আত্মা কার্য্য করিয়া থাকে এবং যাহারা আত্মার আত্মিক কার্য্যেন্দ্রিয় সদৃশ, তাহাদের ক্রিয়ার্থে উপকরণ একমাত্র এই স্থূল জগতে। স্থূল জগত হইতে সমষ্টিরূপে এবং পদার্থ বিশেষ অনুসারে ব্যষ্টিরূপে যে সকল ভাব রাশি সমুত্থিত হইতেছে, তাহাই প্রতিপ্রসবে উহাদের একমাত্র ক্রিয়া-ধারণার উপকরণ ও অবলম্বন, এবং তাহা হইতেই বৃত্তিসমূহ নিরন্তর ভাবগ্রস্থ ও ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্ত মানবের মনে, ধ্যান ও ধারণা যেরূপেই করিতে যাওয়া যাউক, তাহা কখনই ভৌতিক ভাবাপন্ন এবং রূপবিশিষ্ট ভাবের অন্যতর হইয়া উঠিতে পারে না। যে দিকে ও যত রকমেই মানুষ ধ্যান ও ধারণা করিতে চেষ্টা করুক না কেন, অমনি সে পক্ষে তৎসদৃশ দায়ক কোন না কোন প্রকার ভৌতিক ভাব ও রূপ আসিয়া মনকে আশ্রয় করিবেই করিবে। অভূত ও অরূপ ধ্যান বা ধারণা সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয়ত, অভূতপূর্ব্ব ভৌতিক ধারণাও সাধ্যের অতীত; যাহা পার্শ্ববর্ত্তী বাহ্য জগতে দেখিতেছে, তাহাই কেবল প্রকৃত পক্ষে ধারণীয়

হইতে পারে। মানব ভৌতিক রূপও কল্পনা করিতে গেলে, সে এ কল্পনার ভিতর যতই স্বাধীনতা প্রদর্শন ও নূতনত্ব আনয়নের চেষ্টা করুক না কেন; কখনও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না এবং এই জগত হইতে যে সকল ভাবে ভাবগ্রস্থ হইয়াছে তাহাকেও অতিক্রম করিতে পারে না। কেহ কোন একটা অদ্ভুত পদার্থ, লতা বৃক্ষ বা জীবাদির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হউক এবং যতই সে তাহাকে তাহার বুদ্ধি অনুসারে স্বভাবাতীত আকার প্রকার দিতে চেষ্টা করুক; তথাপি দেখিবে সে কখনই তাহাতে স্বাভাবিকের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। যাহা করিয়াছে, তাহা কেবল এই প্রকৃতি হইতে গৃহিত ভাবরাশির মধ্যে এক বা বহুটার বিকর্ত্তন, বিবর্ত্তণ বা সংযোজন মাত্র। অতএব মানবের আত্মাকে অস্তিত্ব রক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান থাকিয়া, ক্রিয়াপথে স্বীয় আত্মিকইন্দ্রিয় বর্গকে চালনা করিতে হইলে; প্রাকৃতিক ভাবাশ্রয় ভিন্ন তাহার অন্য কোন উপায়ান্তর নাই। একটা কথা, এ হিসাবে উপাসনাপর্ব্বে, যাহারা স্বাকার উপাসক তাহাদের উপাসনাই স্বাভাবিক; নিরাকার উপাসক যাহারা তাহাদের উপাসনা অস্বাভাবিক। নিরাকারের উপাসনা হয় না, জ্ঞানানুভূতি মাত্র হইতে পারে; কিন্তু সে জ্ঞান লাভও সহজ নয়। পূর্ব্বতন হিন্দুযোগীগণ এ কথা বুঝিতেন, সেই জন্য তাহারা ব্রহ্মবাদে উপস্থিত হইয়া, যোগ সাধনে রত হইলেও, স্বাকার মূর্ত্তি লইয়া যোগারম্ভের বিধি দিয়া গিয়াছেন।

পুনশ্চ আত্মার প্রাকৃতিকভাবে ভাবাচ্ছন্নতা ভাব ব্যতিত, প্রাকৃতিক শাসনে শাসিত হওয়ার আরও একটি লক্ষণ এই যে, মানব স্বেচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ হইলেও, প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিকুলে যাইতে তাহার সাধ্য নাই। মানব প্রাকৃতিক শক্তিকে অনুকুল করিতে পারে, অনুকুল কার্য্য দ্বারা বশ ও রূপান্তর করিয়া আপন কাজেও লাগাইতে পারে, কিন্তু সম্মুখীন ভাবে তাহার প্রতিকুলে যাইতে পারে না; যাইলে, তখনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত এবং তখনই তাহাতে বিপদ ঘটনা হইয়া থাকে। এই এই ভাবে চালিলে এবং এই ভাবে কাজ করিলে এ কাজ অসাধ্য হয়, বা মোটেই এই কাজ অসাধ্য; অথবা এই কাজে আমার বা আমাসদৃশ জনের প্রতি-উৎপাত পাতে নানাবিধ বিপদ সম্ভবিতে পারে; সুতরাং মনে ইচ্ছা হইলেও মানব সে সকল কাজে

অগ্রসর হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা তাহার স্বেচ্ছাশক্তিকে বাধ্য হইয়া খর্ব্বাকার ধারণ করিতে হয়। অতএব এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টতই সূচিত হইতেছে যে, মানব স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছাশক্তি চালনা করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহারও সীমা আছে,—তাহা প্রকৃতির অনুকূলগামী হওয়া চাই। এই স্বেচ্ছাশক্তি চালনা যেমন মানুষের স্বাধীনতার লক্ষণ; তেমনি আবার তাহার যে প্রাকৃতিক ভাবে ভাবগ্রস্থ হওয়া ও প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিকূলে যাইতে না পারা, তাহা তাহার পরাধীনতার লক্ষণ।

কথিত চতুর্ব্বিধ শাসনের মধ্যে প্রথমটি তামসিক শাসন; দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাজসিক শাসন এবং তৃতীয়টি সাত্ত্বিক শাসন। মানবকে মানব হইয়া ইহ-লোকে থাকিতে হইলে, উক্ত চতুর্ব্বিধ শাসনেরই সামঞ্জস্য সাধনদ্বারা কার্য্য করা চাই; নতুবা ব্যতিক্রম, ব্যভিচার ও কুফল ফলিয়া থাকে। উক্ত চতুর্ব্বিধ শাসনের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থকে অদৃষ্ট বলা যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে পুরুষকার বলা যায়। পুরুষকার হেতু মানব যেমন স্বাধীন, অদৃষ্ট হেতু আবার তেমনিই পরাধীন। মানবে স্বাধীন পরাধীন ভাবের এরূপে যুগপৎ একত্র সমাবেশ। মানবের অধীনতা ও স্বাধীনতা কোন স্থানে কত খানি, তাহা ভেদ করিয়া দেখাইবার বিষয় নহে। শরীর এবং আত্মা উভয়ের সংমিলিত ভাব যেমন অবিচ্ছিন্ন, তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য দর্শান সহজ নহে; এখানেও তদ্রূপ। ফলত অধীন ভাব ও স্বাধীন ভাব, এ উভয় এরূপ সংমিলিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার মধ্যে ছেদ ও ভেদ করা দুঃসাধ্য। ইহাতে দৃষ্টিভ্রমও অধিকাংশ লোকের ঘটিয়া থাকে;—কাহারও বিশ্বাস, সেচ্ছাহেতু মানব সম্পূর্ণই স্বাধীন; কেহবা সকল বিষয়ের জন্যই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, স্রোতে গা ঢালিয়া আত্ম নষ্ট করে।

শরীর যেমন নানাবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে; আত্মাও তদ্রূপ তাহার আত্মিক ইন্দ্রিয়শূন্য নহে। আত্মার কার্য্যসাধক ইন্দ্রিয় যাহা, তাহাকে বৃত্তি বলে। বৃত্তি বহুতর বা অসংখ্য; কিন্তু তাহা হইলেও মূলবৃত্তি চারিটি যাহার, তাহারা সকলে কেবল শাখা প্রশাখা মাত্র। শাখা প্রশাখা বৃত্তি গুলিকে সহকারী বৃত্তি বলা যায়। যে সকল সহকারী বৃত্তি যে মূলবৃত্তির শাখা তাহারা, সেই মূলবৃত্তির শাসনের দ্বারা, অথবা সমস্ত মূল-

বৃত্তিগুলির যুগপৎ মিলিত শাসনের দ্বারা, শাসিত ও নিয়মিত হয় এবং নিয়মিত হইয়া, আত্মার নানা ভাব, নানা ক্রিয়া, নানা শক্তিরূপ ও মহিমা প্রচার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ শাসনের সহ বাধ্যবাধক সম্বন্ধ ও সমধর্ম্মীতাক্রমে, মানবীয় মূলবৃত্তি চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ চিত্ত, বুদ্ধি, যুক্তি ও শ্রদ্ধা। এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের সংমিলিত সমষ্টি ভাব যাহা, তাহাকেই মন বলে। প্রাচীন হিন্দুতত্বজ্ঞেরাই মনকে যথার্থ বুঝিয়া ছিলেন, তাই তাঁহারা তাহাকে ইন্দ্রিয়রূপে ভেদ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই, মনের সে ভেদভাব আজিও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মনকেই অনেকে আত্মা স্বরূপ ভাবিয়া ভ্রমে আবদ্ধ হইয়া থাকে ;—শরীরের রোগ এবং সুস্থতা, যৌবন এবং জরা ইত্যাদি অবস্থান্তরে মনঃশক্তির ভাবান্তর দৃষ্টে, আত্মাকে ভূতসঙ্ঘ মথিতসার স্বরূপ ভাবিয়া ভৌতিকতায় আসিয়া উপস্থিত হয় ; কেহবা এমন সুবোধও আছে, শরীরাভ্যন্তরে আত্মার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বিশেষ দেখিতে না পাইয়া, নাস্তিকতাকে অবলম্বন করে! ফলত, মন স্বয়ং আত্মা নহে, তবে আত্মিক পদার্থ বটে ; উহা আত্মার সত্বা এবং সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মদ্বার স্বরূপ।

যাহারা ভ্রমক্রমে মনকে আত্মা স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করে, এবং যাহারা শারিরিক সুস্থাসুস্থ, অথবা প্রাবল্য ও ক্ষীণতা হেও ; মনকে অনুরূপ সুস্থা-সুস্থ, অথবা প্রাবল্য ও ক্ষীনতা ভাব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, উক্তরূপে মুগ্ধ হয় ; অথবা যাহারা শরীরাভ্যন্তরে আত্মার বাসস্থান দেখিবার প্রত্যাশা করে, তাহাদের অত্যন্ত সহজ বুদ্ধিতে এই সামান্য কথাটা মাত্র অনুধাবন করিলে যথেষ্ট হইতে পারে, কি না, অর্থাৎ শরীরের অতীত যে, সে অবশ্যই শরীর ও শরীরের ভাবাভাবের অতীত ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ ?

পুনশ্চ, ইহাও আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, শারিরিক ভাবাভাব সহ মানসিক ভাবাভাব সকল সময়েতেই অনুরূপ হয় না, বরণ অনেক সময়ে ঠিক উহার বিপরিত ভাবই লক্ষিত হয়। অনেকের শরীর ক্ষীণ বা রুগ্ন হইলেও, মন রুগ্ন হইতে পায় না। প্রত্যুত, কোন কোন বিষয়ে, শরীর যখন অষাড় হয়, তখনই মনের আভ্যান্তরিক ক্রিয়াধিক্য দেখিতে

পাওয়া গিয়াথাকে। অথবা ইহা একটি বিশেষ লক্ষণীয় যে, মনের আভ্যান্তরিক ক্রিয়াধিক্য করিবার জন্যই যোগীগণ শরীর শোষণ করিয়া থাকেন। আবারও দেখ, অতি সবল শরীরেও ক্ষুদ্র মন, অতি ক্ষীণ শরীরেও সবল মন; অতএব শরীর সম্বন্ধে মনের অবস্থা, ব্যক্তি বিশেষ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হইতেছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, মনকে যখন বহির্জগত সহ সম্বন্ধে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়, তখন কাজেই শরীরস্থ স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত তাহাকে সংমিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; কারণ স্থূলেন্দ্রিয়ের দ্বারাই, স্থূলরূপা যে বহির্জগত, তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পাবা যায়। অতএব মন স্থূলেন্দ্রিয়কে যেমন অবস্থায় পাইবে, মনেরও কার্য্যপটুতা সেই পরিমানে বিকাশ বা অবিকাশ ভাব প্রাপ্ত হইবে। শরীরের শুভাশুভ জনিত যে সুখ দুঃখাদি, তাহাও এই সূত্রক্রমে মনের সাহায্যে আত্মাকে গিয়া সংস্পর্শ করিয়া থাকে। তাহারপর, স্থূল শরীরের ও শরীরজ ইন্দ্রিয়ের ভাবাভাবে, মন যেমন ভাবাভাব প্রাপ্ত হয়; শরীর সহ অচ্ছেদ্য সংমিলিত থাকায় মনের ভাবাভাবেও, অনেক সময়ে শরীরের ভাবাভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয় গণের উপরে মন উপরত মাত্র, এনিমিত্ত শরীরের ভাবের দ্বারা মন যতটা সুস্থ বা অসুস্থ হয়, মনের সুস্থাসুস্থে শরীর ততটা সুস্থাসুস্থ ভাব প্রাপ্ত হয় না। পুনশ্চ যাহাদিগের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বেশী, অদৃষ্ট জনিত শুভাশুভ যেমন তাহাদিগকে অল্পই বিচলিত করিতে পারে; সেইরূপ শরীরের ভাবাভাবও তাহাদের মনকে অতি অল্পই রূপান্তর বা ভাবান্তর করিত সক্ষম হয়।

ফলত আত্মা এবং মন, উভয়ের কেহই ভৌতিক পদার্থ বা ভূতসার নহে। এবং ইহাও ঠিক যে মানব শরীরী হওয়ায়, মন কখনও শুদ্ধ আত্মিকভাবে মগ্ন বা একেবারে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্রব শূন্য হইতে পারে না। এজন্য কি আধিভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক, যে গুণ প্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট মানব হউক না কেন; যখন স্থূলেন্দ্রিয়গণের যেমন সবলতা বা দুর্ব্বলতা, বা সমস্ত শরীর যে ভাব ও যেরূপ উপকরণে গঠিত, আত্মা এবং মনেরও বিকাশ সেই

রকমের হইয়া থাকে। কিন্তু স্থূলেন্দ্রিয় এবং শরীর তদ্রূপ তদ্রূপ হয় কেন? তাহা অদৃষ্ট ও কর্ম্মসূত্রের বিষয়।

এক্ষণে কথিত মূলবৃত্তি চতুষ্টয়ের বিষয় আলোচনা করা যাউক। তাহারা যথাক্রমে, প্রথম, চিত্ত—বিষয়ের অনুভূতি শক্তি।

দ্বিতীয়, বুদ্ধি—বিষয়ের বিষয়ত্ব বোধক শক্তি।

তৃতীয়, যুক্তি—বিষয়ের বিষয়ত্ব নিরূপক শক্তি।

চতুর্থ, শ্রদ্ধা,—বিষয়কে বিষয় ভাবে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ শক্তি।

ভূতজগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহার পরিচয়রূপে আয়ত্তীকরণ পক্ষে প্রথম ক্রম, বস্তুর অনুভূতি বা উপলব্ধি জ্ঞান, ইহা চিত্তের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। মনেকর সম্মুখে একটি বৃক্ষরূপী পদার্থ রহিয়াছে; কিন্তু এইটি যে তদ্রূপ পদার্থরূপে স্থিত, এ জ্ঞান কেবল চিত্তের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। চিত্তের দ্বারা যতক্ষণ এ জ্ঞান উপলব্ধি না হইবে, ততক্ষণ মনের অপরাপর বৃত্তির সাধ্য নাই যে, কোন পদার্থ সম্বন্ধে ক্রিয়াবান হইতে পারে। পুনশ্চ যেমন বাহ্য জগতে, অন্তর্জগত সম্বন্ধেও ঐ কথা বর্ত্তে; সেখানেও যে কোন বিষয়ের জ্ঞান পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে, চিত্তই তাহার প্রথম ক্রম। চিত্তের ক্রিয়া-পরিচয় প্রধানত অনুভূতি, কল্পনা, অনুমান ও চিন্তায়।

বুদ্ধির ধর্ম্ম বোধ জ্ঞান। চিত্তের দ্বারা যে কিছু পদার্থ উপলব্ধি হয়, বুদ্ধির দ্বারা সেই পদার্থটি যে কি, তাহার বোধ জ্ঞান হইয়া থাকে। চিত্ত-দ্বারা যেমন বৃক্ষটির বিষয় জ্ঞান হইয়াছিল, এক্ষণে বুদ্ধি বিষয়ত্বরূপে তাহা যে বৃক্ষ, এই জ্ঞান জন্মাইয়া দিতেছে। চিত্ত নিয়মশূন্য, অভিপ্রায়-শূন্য যদৃচ্ছা অনুভব করিয়া যায়; বুদ্ধি তাহার মধ্যে বিষয়ত্ব, শ্রেণিত্ব ও সঙ্গতত্ব ভাব সংযোজন করিয়া থাকে। একটা উদাহরণ স্বরূপ দেখ, কি জাগ্রত কি নিদ্রিত, চিত্ত সকল সময়তেই স্বীয় কার্য্য করিয়া যাইতেছে। জাগ্রত অবস্থায় বুদ্ধির বিদ্যমানতা সর্ব্বদা থাকার দরুণ, তাহার কার্য্য কথনই অসঙ্গত ও অসংলগ্ন ও অর্থশূন্যরূপে দর্শিত হইতে পারে না; কিন্তু মানবের নিদ্রিতকালে বুদ্ধি যখন সুপ্ত থাকে, তখন চিত্তের ক্রিয়া কি এলো মেলো ও অর্থশূন্যই না দৃষ্ট হয়। এলো মেলো স্বপ্ন সকলেই দেখিয়াছে, যে দেখিয়াছে, সেই এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। সুষুপ্তিকালে

সুপ্তবুদ্ধিতে, অবিরত প্রবাহিত যে সকল চিত্তক্রিয়া জাগ্রতাবস্থা পর্য্যন্ত স্মৃতবাহী হয়, তাহাকেই স্বপ্ন বলা গিয়া থাকে। বুদ্ধির ক্রিয়া-পরিচয় প্রাধানত বোধশক্তি, বিষয়ত্ব ও বিশেষত্ব জ্ঞান, সঙ্গতি এবং অর্থাপত্তি।

যুক্তির ধর্ম্ম নির্ণয় জ্ঞান। চিত্তের দ্বারা যে পদার্থের উপলব্ধি হইয়াছে, বুদ্ধির দ্বারা যাহার স্বরূপ ভাব বোধ হইয়াছে, যুক্তিশক্তি সে পদার্থ বস্তুত তাহাই কি না, তাহা নিরূপণ করিয়া থাকে। চিত্তের দ্বারা বৃক্ষটিকে পদার্থ-রূপে জ্ঞান হইয়াছিল, বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে বৃক্ষ সংজ্ঞক পদার্থরূপে বোধ হইয়াছিল, যুক্তি এক্ষণে তথায় নির্ণয় করিয়া দিতেছে যে হাঁ উহা বৃক্ষই বটে, বৃক্ষ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। যুক্তির কার্য্য প্রধানত সন্দেহ, তর্ক, তত্ত্ব ও অনুসন্ধিৎসা।

মানবীয় সকল বৃত্তি কয়টির মধ্যে, যুক্তি বৃত্তির কিছু চটক বেশী; এজন্য সহসা লোকে ইহার দ্বারা মোহিত হয় এবং মোহিত করিতে পারে। এই চটকহেতুই, বিদ্বান বলিয়া যাহাদের অভিমান অধিক, তাহারা নানা কারণে ইহার অনুগত হয়।

শ্রদ্ধার ধর্ম্ম বিশ্বাস জ্ঞান। প্রথম বৃত্তিত্রয়ের কার্য্যের দ্বারা, কোন বস্তু বিশেষ, সেই বস্তু কিনা তাহা উপলব্ধ, বোধিত ও নির্ণিত হইলে; শ্রদ্ধা তখন সে বস্তু তাহাই বটে, এই জ্ঞানে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপণ এবং তাহাকে সেই বস্তুই বলিয়া সম্যক ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। যে বৃক্ষ প্রথম বৃত্তিত্রয়ের দ্বারা উপলব্ধ, বোধিত ও নির্ণিত হইয়াছিল, শ্রদ্ধা এক্ষণে তাহাকে স্থির নিশ্চয় বৃক্ষ বলিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিয়া লইল। কোন বস্তুকে শ্রদ্ধা কর্ত্তৃক এরূপ স্থিরনিশ্চয় ভাবে গ্রহণের নামই বিশ্বাস। শ্রদ্ধার ক্রিয়া-পরিচয় প্রধানত সঙ্কল্প, বিশ্বাস, ভক্তি এবং শান্তিতে।

মানবীয় শরীরস্থ যন্ত্র সকল যখন স্বাতন্ত্র্য ভাব পরিত্যাগে সর্ব্ব-সংমিলিত হইয়া সামঞ্জস্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিতে থাকে, তখনই মানব শরীরকে প্রকৃত স্বাস্থ্যবান বলা যায়। সেইরূপ উক্ত চতুর্ব্বিধ বৃত্তি যখন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগে সর্ব্বসংমিলিত সামঞ্জস্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিতে থাকে, তখনই মানবীয় মনকে স্বাস্থ্য সম্পন্ন মন বলা যায় এবং

তখনই যথাস্থায় সহজ জ্ঞানের উপস্থিতি হয় এবং অনুষ্ঠিত কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবায়, তাহার সার্থকতা উপস্থিত হয়। যেমন স্বাস্থ্যবান শরীরে কোন্ যন্ত্রের ক্রিয়া কতখানি তাহা নিরূপণ করা সহজ নয়, তদ্রূপ স্বাস্থ্য সম্পন্ন মনের দ্বারা নিষ্পাদিত ক্রিয়ায় কোন বৃত্তির ক্রিয়া কতখানি ও কাহার কার্য্য আগে বা পরে হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে; স্বাভাবিকভাবে স্বভাবক্রিয়াবৎ অজ্ঞাতে, অচেষ্টিতরূপে অথচ সম্পূর্ণভাবে তাহাদের ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইয়া যাইতেছে। পুনশ্চ শরীরের কোন একটি যন্ত্রের ক্রিয়ান্যূনতা বা ক্রিয়াধিক্য হইলে, তাহা যেমন রোগের লক্ষণ; তদ্রূপ একান্তরে যে কোন বৃত্তি প্রবল বা ক্ষীণ হইলে, তাহাও মানসিক রোগের চিহ্ন। তখন আর সহজ জ্ঞানের সহ সম্বন্ধ থাকে না; মন আর তখন কোন বিষয়ে প্রকৃত যোগযুক্ত হইতে পারে না; অসাস্থ্যমন অশান্তির আলয়। সন্দেহ, বৃথান্বেষণ, কুচিন্তা, কুসংস্কার, ইত্যাদি ইহার রোগ চিহ্ন। এই সকল রোগ উপস্থিত হইলে, মানবের নিষ্পাদিত কার্য্য কখনও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয় না; ক্ষুদ্র কার্য্য বা অকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হয় এবং তাহা সর্ব্বথাই কুফল প্রদ হইয়া থাকে।

এই সকল রোগ, ইহাদের মূলস্বরূপ কথিত বৃত্তিগুলির প্রাবল্য বা ন্যূনতা জনিত বিকৃতির ভাব অনুসারে, প্রকৃতিভেদে পৃথক পৃথক। চিত্তের আধিক্য জনিত যে রোগ, তাহার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অর্থশূন্য খেয়াল, কল্পিত জগতে বিচরণ এবং অনাবশ্যক কার্য্যারম্ভ। জাতিগত দৃষ্টান্ত, ভারতে অষ্টাদশ পুরাণের আবির্ভাব এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম গ্রহণ। বুদ্ধির আধিক্য জনিত রোগের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অহঙ্কার, আত্ম সর্ব্বস্ব ভাব, অভিনব বিষয়ে বা উন্নতি পথে দৃষ্টিরোধ ও তৎপ্রতি প্রতিকূলতা; জাতিগত দৃষ্টান্ত চীন দেশের সংসার পথে আবহমান কাল একাবস্থ ভাব এবং পরদেশ, পরদর্শিত বিষয় ও পর জাতীয়ত্ব বিমুখতা। যুক্তির আধিক্য জনিত ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত সন্দেহ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও সারশূন্য অকর্ম্মা জ্যেষ্ঠতাতত্ব; জাতিগত দৃষ্টান্ত ফরাসিরাজ্যের মুহুর্মুহু রাজবিপ্লব। শ্রদ্ধার আধিক্য-জনিত ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্বেচ্ছাপ্রিয়তা, যে কোন বিষয়ে বিশ্বাসপ্রবণতা এবং গোঁড়ামী; জাতিগত দৃষ্টান্ত রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগের প্রবর্ত্তিত

অগ্নিপরিক্ষায় লোকহত্যা, বলপরিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা বিচার নিষ্পাদন এবং মধ্যযুগের পোপীয় অত্যাচার। বোধসুগমের নিমিত্ত এক একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হইলেই যথেষ্ট, তাই আমি এখানে এক একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম। মানবীয় জীবন প্রবাহের স্রোতধারাও যেমন অসংখ্য, দৃষ্টান্তও তেমনি অসংখ্য। আরও কিছু দৃষ্টান্তের আবশ্যক হইলে, যাহার যেরূপ মনের দৌড়, সে সেইরূপ খুজিয়া লইবে।

এ পৃথিবীতে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয় দুইরূপে। এক যথাপ্রাপ্ত স্বাভাবিকী সামঞ্জস্য পূর্ণ বৃত্তিনিচয়ের অনায়াস পরিচালন লব্ধ সহজ জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পাদিত কার্য্য ;—ইহা সামঞ্জস্য পূর্ণ সুকার্য্য বটে, কিন্তু পুরুষকারের অভাব হেতু, উন্নতভাবের ইহাতে নাম গন্ধও নাই। তবে এটা ঠিক বটে যে, এরূপ লোক উন্নত নহে বটে, কিন্তু ইহাদের মন শান্তির আলয়। সঙ্গ রহিত হইলে এসকল লোকের কুপথগামী হইবার ভয় নাই ; কিন্তু সঙ্গ সংযুক্ত হইলেই ইহাদের বিষয়ে বিশেষ আশঙ্কা। ইহারাই এ জগতে ন্যনাতিরেকে "নীত" শ্রেণি মধ্যে গণ্য।

অপর শ্রেণি যাহা, তাহারা পুরুষকার প্রণোদিত হইয়া, উন্নত পথাভি-গমনে অভিলাষ পূর্ব্বক, বৃত্তি নিচয়কে সম্মার্জ্জিত ও সুতীক্ষ্ণ করিয়া, ইচ্ছামত তাহাদের পরিচালন পূর্ব্বক, অভিপ্সিত ফল লাভ করিতে চেষ্টাবান হয় ; অন্তত মনের ইচ্ছাটা তাই। ইহারাই এ জগতে ন্যূনাতি-রেকে "নেতা" শ্রেণি মধ্যে গণ্য। "নীত" শ্রেণির ন্যায় সর্ব্বদা যথাস্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা অটুট থাকিত বটে, কিন্তু তাহাতে চলে কই। মানব ইহলোকে কর্ম্ম করিতে প্রেরিত, সুতরাং কালের সহ সমান পদ রাখিয়া তাহাকে গতি করিতে হইবে; অতএব অবিরাম উন্নতির পথে ছুটিতে হইবে। যখনই মানব সে পথে ছুটিতে ক্রুটিশীল হয়, তখনই ক্রুটির পরিমান অনুসারে অবনতি ও ধ্বংস মুখে পতিত হইয়া থাকে, যেহেতু উদ্দেশ্য ব্যত্যয়ে কোন পদার্থ এজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না বা তিষ্ঠে না। অতএব এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সম্যক্ বৃত্তি-বিচেষ্টিত প্রকৃত কর্ম্মশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক ; প্রকৃত কর্ম্মশীল-তার অপর নাম উন্নতি। এই উন্নতি নেতা শ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পাদিত

হইয়া থাকে; নীতগণ কেবল তাহাদিগকে অনুগমনমাত্র করিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মসার্থকতা করে।

নেতা শ্রেণীস্থগণের মধ্যে বৃত্তি সকলের বহুপরিমাণে পরিস্ফুরণ আবশ্যক। মানবে যে চতুর্ব্বিধ শাসনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদের সহিত বৃত্তি সকলের সম্বন্ধ ও সমন্বয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বৃত্তি চতুষ্টয়ের যখন সামঞ্জস্য সংমিলিত স্ফুর্ত্তি সাধন করা হয়, তাহাকেই প্রকৃত পরিস্ফুরণ ও প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়। তাহা হইতে কখনও কুফলের উৎপত্তি হয় না। তখন যুক্তি বা যে কোন বৃত্তির অযথা প্রাবল্য হেতু কোন অনর্থ ঘটনাও হয় না; যেহেতু তখন কোন বৃত্তিই অযথা প্রাবল্য পাইতে পারে না। বৃত্তি সকলের এরূপ সামঞ্জস্য সংমিলন স্থলে যুক্তি শক্তির যে ক্রিয়া, তাহাকেই যুক্তিবাদের সার্থকতা বলা যায়। স্বাস্থ্যবান শরীরস্থ যন্ত্র বিশেষের ন্যায়, যুক্তিশক্তি তখন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও দেখায় না, অথচ যথোপযুক্ত ভাবে স্বীয় কার্য্য করিয়া যায়। সর্ব্ববৃত্তির সামঞ্জস্য সংমিলিত পরিস্ফুরণ যথায়, তথায় তদুৎপন্ন কার্য্যে কোন্ বৃত্তির ক্রিয়া আগে হইয়াছে, কোন্‌টার ক্রিয়া পরে হইয়াছে, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না;—এতই সুসংমিলনে তাহা সুসম্পন্ন। সর্ব্ব-বৃত্তির উক্তরূপ পরিস্ফুরণ এ পৃথিবীতে কোন লোকে সর্ব্বতোভাবে বিকশিত কখন হইবে কি না জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এ পর্য্যন্ত উহা যে পরিমানে যে ব্যক্তিতে বিকশিত হইয়াছিল, সে সেই পরিমাণে জগদ্‌গুরু ও জগতের উপকারক রূপ মহৎ নামে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছে। অন্য কথায়, জগদ্‌গুরুদিগের ইতিহাস কেবল তদ্রূপ বৃত্তি পরিস্ফুরণের ইতিহাস মাত্র।

বৃত্তি নিচয়ের সামঞ্জস্য সংমিলিত ভাবে পরিস্ফুরণ বা তদন্যতর, মানবের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রণালীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। মনের একটা স্বাভাবিকী আনতি বা স্পৃহা আছে; উহাই, কে কিরূপ কর্ম্মার্থে ইহলোকে প্রেরিত বা কে কিরূপ কর্ম্মে জীবনকে উৎসর্গিত করিবে, তাহার নিদর্শন সূচিকা স্বরূপ। উহাকে লইয়া সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে উহা অতি উত্তমই বা যথান্যায় ফলপ্রসব করে; নতুবা উহার অসদ্ব্যবহারে মানুষকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া গিয়া থাকে। সে স্পৃহা যখন অজ্ঞানগত

নিবং অমার্জ্জিত ভাবে থাকে এবং তাহার সঙ্গে শিক্ষাদোষ আসিয়া যখন সংমিলিত হয়, তখনই তৎহেতু, স্পৃহার মূলিভূত বৃত্তি বিশেষ প্রাবল্য লাভ করিয়া কুফল প্রসব করিতে থাকে। মনে কর, কাহার চিত্তানতি বা স্পৃহা এরূপ যে, সেই স্পৃহাকে সুশিক্ষায় সুমার্জ্জিত করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি একজন গণনীয় আবিষ্কারকের পদে হয়ত অধিরূঢ় হইতে পারিত; কিন্তু শিক্ষার দোষে তাহা হইতে তাহার এরূপ চিত্তবৃত্তির বিকার-প্রাবল্য উপস্থিত হইল যে, একটা সাধারণ ও সহজবুদ্ধি প্রতিপাদ্য বিষয়েতেও, যথায় বুদ্ধি, যুক্তি, শ্রদ্ধা সবাই বলিতেছে এটা ভাল নয়, তথাও মন উপান্যাস ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া প্রকৃত সংসারের প্রতি হাণি ও অনেক সময়ে জানিয়া শুনিয়াই খেয়ালী অকর্ম্মাভাবে স্বায় আত্ম ধংস করিতে উদ্যত হয়। ইহা যেমন শিক্ষাদুষ্ট চিত্তশক্তি প্রাবল্যের ফলমাত্র, সেইরূপ, মানবের অপর কোন ভাবা পারকতা হয়ত যথায় সম্ভব হইত, সেথানে শিক্ষা দোষ হেতু; কোন একটা বিষয়কে চিত্ত যখন স্বতঃই গ্রহণ করিতেছে, যুক্তিতে যখন দেখাইয়া দিতেছে যে উহা গ্রহণীয় এবং শ্রদ্ধাহেতু মনও যখন বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে, তখনও বুদ্ধির প্ররোচনায় মানব তাহা লইতে নারাজ; বলিতেছে, না, যা চলিয়া আসিতেছে তাহাই থাকুক, বাপ-পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছে তাহা হইতে কি সহজে তফাত হওয়া যায়! ইহা শিক্ষাদুষ্ট বুদ্ধিশক্তির অযথা প্রাবল্যের ফল। সেইরূপ যে বিষয়কে চিত্ত গ্রহণ করিতে চায় না, বুদ্ধিতে ভাল বলে না, শ্রদ্ধাও তাহাকে বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত, অথচ যুক্তিতে দেখাইতেছে না এটা এইরূপই বটে; এবং তখনই, অন্যান্য বৃত্তি প্রতিকূল থাকিলেও, তাহাকে লইয়া সর্ব্বে সর্ব্বা করিতেছে এবং অন্যকেও সর্ব্বে সর্ব্বা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে, ইহাই যুক্তিশক্তির অযথা প্রাবল্যের ফল। সেইরূপ চিত্ত,বুদ্ধি ও যুক্তি তিনই যাহাকে গ্রহণ করিতে বলিতেছে, অথচ শ্রদ্ধা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে উহাকে গ্রহণ করিব না; অর্থাৎ চলিত কথায় যাহাকে বুঝিয়াও না বুঝা বলে; তাহাকে শিক্ষাদুষ্ট শ্রদ্ধাশক্তির অযথা প্রাবল্য বলা যায়। শিক্ষা দোষে এরূপ প্রাবল্য এবং তদুৎপন্ন দোষ যাহা কিছু, তাহাও আবার সৎশিক্ষার দ্বারা পরিহার করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ সৎশিক্ষা ও সৎশিক্ষক পাওয়া উভয়ই দুর্লভ।

সে পক্ষে বলিতে গেলে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীকে অবশ্যই দূষিত বলিতে হইবে। শিক্ষা দূষিত এবং শিক্ষার পরিণাম ও পরিপাকের পন্থা যাহা তাহাও সর্ব্বাংশে দূষিত। শিক্ষা দুইরূপ আছে; এক আত্মপ্রকৃতিযোগে অন্তঃশিক্ষা, অপর বহিঃ প্রকৃতিযোগে বাহ্য শিক্ষা। মানবের প্রকৃত প্রকৃতিপরিবর্ত্তন অন্তঃশিক্ষা যোগেই হইয়া থাকে, বাহ্যশিক্ষা তাহার পোষক ও সহায়তা সাধক স্বরূপ। অন্তঃশিক্ষা নিজের নিজের বিষয়, তাহা প্রতি প্রকৃতি অনুসারে পৃথক ও কেহ কাহাকে বলিয়া বুঝাইতে বা করাইতে পারে না। এখানে বাহ্য শিক্ষার বিষয়ই আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদের দেশের বাহ্য শিক্ষার বিষয় দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমেই যে ধর্ম্ম শিক্ষার দ্বারা মানুষ স্বীয় মনুষ্যত্বকে হৃদ্বোধ করিতে পারে; তাহার একেবারে অভাব। তদনন্তর যদ্বারা এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি, ধর্ম্ম তাহার কর্ত্তব্য সূত্র, ধর্ম্মজ্ঞান তাহার প্রবর্ত্তক, এরূপ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়; যদ্দ্বারা সেই তত্ত্বানুরূপ কর্ম্মমার্গে স্বীয় স্বভাব অনুরূপ প্রবৃত্তিমার্গ পরিবর্দ্ধিত ও সন্নিহিত শক্তি সমস্ত স্ফুর্ত্তিযুক্ত হইতে পারে; সেরূপ শিক্ষা দূরে থাকুক, নামও তাহার অনেকের নিকট পরিচিত নাই। অথবা পরাধীনতা হেতু দেশের অবস্থাও এরূপ যে, প্রবৃত্তিমার্গ সেরূপে পরিবর্দ্ধিত এবং শক্তি সকল সেরূপে স্ফর্ত্তিযুক্ত হইলেও, তাহাদের বিকাশ এবং কার্য্যে পরিণতি পক্ষে সময় এবং সুযোগ, উভয়েরই অস্তিত্ব অতি অল্প। তাহার পর যে সেরূপ মতিগতি বৃত্তি প্রবৃত্তির স্ফর্ত্তিসহ শিক্ষিত হইয়া উঠিল, ভাবী জীবনে যে আর তাহার চালনা থাকিবে বা চালনা জনিত উন্নতি হইবে, সে উপায়ও এ দেশে অতি অল্প। কিন্তু তা বলিয়া নিরাশ হইলে চলে কই। মানব উপযুক্তরূপে যদি শিক্ষিত হয় এবং শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার বাসনা যদি তাহার বলবৎ হইয়া উঠে; তাহাহইলে আমার বিশ্বাস এই যে, সময় এবং সুযোগ হাজার প্রতিকূল থাকিলেও, তথাপি সে মানব যথা সম্ভব বা কিয়ৎপরিমাণেও কর্ম্ম আচরণের দ্বারা নিজ জীবনের বহু পরিমাণে সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু কি বলিতেছি। মূলে সুশিক্ষারই যে একেবারে অভাব! শিক্ষা এখন, যে প্রকৃতি যেমনই বিভিন্ন হউক, সকলেরই সেই এক বাঁধা

নিয়মে বাঁধা বিষয়ে; ইচ্ছাশূন্য, উদ্যমশূন্য, কল চালিতের ন্যায়, একই পথে গতি। যাহা আছে তাহাই শিখ, যাহা আছে তাহাই মুখস্থ করিয়া উদরস্থ কর, উহাই শিক্ষা; তদতীতে শিক্ষা নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রার্থীগণের বিশ্বাস, উপাধিগ্রস্থ না হইলে সে বিদ্বানই হইতে পারে না। এরূপ প্রণালীতে তথাস্থিত এবং অনুগমনই মাত্র আদৃষ্ট; সুতরাং বুদ্ধির মধ্যে কেবল অন্ধানুকরণ বৃত্তি মাত্র প্রবল হইয়া উঠে। বিচার শূন্য, বিতর্কশূন্য, পাঠ্য বিষয়ই চূড়ান্ত জ্ঞান, তদতীতে জ্ঞাতব্য নাই এবং সেই জ্ঞাতব্যাতিরিক্ত কর্ম নাই; সেই জ্ঞাতব্য নিহিত কিছু কর্ম যদি আমার সুসাধ্যের মধ্যে আসিল ভালই, নতুবা এ পৃথিবীতে আমার কর্ম্মও নাই;—কর্ম্ম যাহা কিছু তাহা কেবল আহারে ও বিহারে এবং পারিপাট্য তাহাতে যাহা কিছু তাহা কেবল অনুকরণে। ফলে ঘটিয়াছেও তাহাই, কলেজ ছাড়িলেই আর শিখিবার নাই; আহার চলিলেই আর করিবার নাই। সাধারণতই, বাঁধা নিয়মের বাঁধা শিক্ষায় মন তোতা পাখির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ পৃথিবীতে মহত্মনা যাহারা জন্মিয়া ছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা প্রায়ই স্কুল কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে; ভিতরে অতি অল্পই। এ পবিত্র অধুনাতন ভারতেও, খ্যাতনামাগণ যদিও এরও বৃক্ষমাত্র বটে, তথাপি ভারত এরও বৃক্ষই শিক্ষাবিভাগীয় ক্ষেত্র-সীমানার বাহিরে। ইহা কি স্কুল কলেজ আদি প্রথার দোষ, তাহা নহে; ইহা স্কুল কলেজ আদিতে অনুসৃত প্রণালীর দোষ।

যখন স্বাধীন ও শিক্ষালুব্ধ ইউরোপ আদি দেশেই দেখা যায় যে, বাঁধা নিয়মের বাঁধা শিক্ষায় কোন মহৎফল যাহা তাহা কদাচ ফলিয়া থাকে, তখন আর এদেশের সম্বন্ধে কথাই নাই। এদেশ—যথায় শিক্ষায়, অধ্যক্ষেরা ভাবে বেগার দিতেছি; শিক্ষকেরা ভাবে দিনগতে বেতন সই করিতেছি; শিক্ষার্থিরা ভাবে রোজগারের পন্থা ক্রমে খুলিতেছে এবং শিক্ষার্থিদের বাপ মায় ভাবে, ভাবী উচ্চলাভের কারবারে আগে হইতে টাকা ছড়ান যাইতেছে। শিক্ষা বলিয়া কেহ শিখেও না, শিখায়ওনা এবং শিখিতে কেহ দেখেওনা। কতদিন হইল অধুনাতন শিক্ষা প্রণালীর আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার ফলে কোন

নূতন চেষ্টা, নূতন তত্ত্ব বা বস্তু আবিষ্কৃত হইতে কেহ কখনও দেখিয়াছ কি? অতি উচ্চ বিদ্বান্ উর্দ্ধসংখ্যায় পাঠ্য নিহিত তত্ত্বোদ্গীরণ বা আঙ্গুল কাটিয়া অঙ্গুলী করিয়া থাকে মাত্র। সেও বা যে দুই একজন দৃষ্ট হয়, তাহাও শিক্ষা বিভাগের বাহিরে; ভিতরে চথেঠুলি কলুর গরু ভিন্ন অন্য রূপান্তর কিছুই দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপস্থলে বালক, এবং বালক ঘুচিয়া মানুষ, অন্তঃসারশূন্য চিত্তশক্তিশূন্য, একদেশদর্শী বা অপরিণামদর্শী হইয়া যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে; অথবা হৃদয়শূন্য নিরস মানীষাবশে যুক্তিবাদের মোহে ওতপ্রোত হইয়া আত্মধ্বংস করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! অধুনাতন বহুরূপী, বদমেজাজী, সংস্কারভারগ্রস্ত, ভ্রান্ত্য, সংশয়বাদী বা নাস্তিকতার ভান ধারী নব্যদলকে যে কেহ স্থিরনেত্রে অবলোকন করিয়াছে; সেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

আমাদিগের ক্ষুদ্র দার্শনিকের কথা এই পর্য্যন্ত! এক্ষণে বড় দর্শন ও দার্শনিকের কথা বলি। বৃত্তি চতুষ্টয়ের বিষয় যেরূপ আলোচনা করা গেল, তাহাতে দেখা যাথতেছে যে, মনের ক্রিয়াক্ষেত্রে যুক্তিশক্তিরূপ বৃত্তি তৃতীয় স্থান মাত্র অধিকার করিতেছে, সুতরাং উহা গণনাতেও সেই পরিমানে ন্যূন! জীবসৃষ্টির ক্রম পরিক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বনিম্ন জীবে কেবলমাত্র চিত্ত শক্তি নিহিত; তদূর্দ্ধে বুদ্ধির বিকাশ; তাহার উর্দ্ধে যুক্তিশক্তি ও তাহারও উর্দ্ধতরে শ্রদ্ধার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের জাতীয় জীবন এবং প্রতি মানবের ব্যক্তিগত জীবনেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। মানব শিশু আদিতে কেবলমাত্র চিত্ত সম্পন্ন; ক্রমে তাহার বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিত্ত এবং বুদ্ধির দ্বারা যখন তাহার এমন জ্ঞান সমষ্টি সংগৃহীত হয়, যাহা বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিলে আকারে এবং ভারে জ্ঞান পথে গতিরোধক হইয়া দাঁড়ায়, তখনই যুক্তি এবং শ্রদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। যুক্তি শক্তি তখন তাহাকে কষিয়া মাজিয়া সুসজ্জিত করণের দ্বারা আয়ত্ত যোগ্য সঙ্কোচিত করিয়া দেয় এবং শ্রদ্ধা আসিয়া তাহাকে অকপটে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার ভারের লাঘব করিয়া তুলে। এরূপে বিগত ভার হইলে চিত্ত আবার তখন স্বচ্ছন্দে জ্ঞানপথে প্রধাবিত হইতে সক্ষম হয়। এই উদাহরণে যাহা সূচিত হইল, তাহাই বোধহয় যুক্তিবাদের সদ্ব্যবহার পক্ষে

সুন্দর পরিচয়। প্রকৃত পক্ষে চিত্ত এবং বুদ্ধিই জ্ঞান মাত্রের উদ্ভাবক এবং তাহার নিয়ামক। নতুবা যুক্তি-শক্তি স্বয়ং উদ্ভাবক নহে। অতএব কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন জ্ঞানকেই আশ্রয় করা উচিত নহে। অপরাপর বৃত্তিসঙ্গ পরিত্যাগী স্বশক্ত্যনুগামী দর্শনশাস্ত্র সকলের মীমাংসা অতি হেয় পদার্থ বলিয়াই জানিবে। অনন্ত ব্যাপিনী জ্ঞানদেহ দর্শনরূপ বন্ধনীর ভিতর কদাচিৎ আবদ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহাকে কেহ বাঁধিতে পারে না; দর্শকের দৃষ্টিশক্তির পরিমাণ অনুসারে সে তাহাকে দেখিতে পারে বা অনুভব করিতে পারে,—সে দেখা যুক্তিবাদের অধিকারের মধ্যে নয়। হৃদয়ও দর্শন বিক্ষণযন্ত্রের কাচদ্বয় স্বরূপ; কেবল হৃদয়ে সামান্য জ্ঞানাংশ অতি বৃহদাকারে দৃষ্টি রোধ করে; কেবল দর্শন, মহাজ্ঞানকেও নগন্যতায় পরিণত করিয়া থাকে; প্রকৃত জ্ঞান দেহ তখনই দর্শিত হয়, যখন হৃদয়ও দর্শন একতায় আসিয়া সংমিলিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, একদেশগামীরা সহজে অপরের অভাব বা ন্যূনতা অনুভব করিতে পারে না।

দর্শন ও দার্শনিকেরা সাধারণত হৃদয়শূন্য। তাই তাহারা যুক্তি শক্তিকে উদ্ভাবক স্বরূপে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছে। সুতরাং মন যাহাকে গ্রহণ করিতে চায় না, মন যাহাকে ভাল বাসে না, মন যাহাকে বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হয়, দর্শন তাহাকেই প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। এবং নিজের বিশ্বাসের বিপরীতেও তাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছে। যতই হউক, তথাপি মানবকে ঈশ্বর একেবারে হৃদয় শূন্য করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তাই নাস্তিক হইলেও, এক একবার মনে চমক উঠে যে হয়ত ঈশ্বর সত্য, নাস্তিকতায় মহাপাপ সঞ্চয় করিতেছি। তাই ড্যারউইন নিজের বিবর্ত্তবাদে মনুষ্য সৃষ্টি বিষয়নীতত্ত্বে আজীবন ভীত ও সন্দেহ যুক্ত ছিল। তাই দেখা যায়, সাঙ্খ্য দর্শনে একদিকে যুক্তিবাদের দুর্দ্দমনীয় গতি, অপর দিকে শ্রুতির নিকট ভয়বিনত মস্তক, দেখিতে কিছু কৌতুককর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ কৌতুককর প্লেটোর গ্রীকদেববর্গের প্রতি ভক্তি। ফলত দার্শনিকেরা নিজে অনেকে স্বীয় স্বীয় দর্শনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ। তাহারা বিশ্বাস করিত না বলিয়াই, নেহাত দুই একজন মোহাকৃষ্ট ভিন্ন, লোকেও তাহাতে বিশ্বাস কখন করে নাই; ঊর্দ্ধ-

সংখ্যায় তাহারা প্রসংশা মাত্র অর্পণ করিয়াছিল। যাহাতে নিজে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহা জগতে সত্য বলিয়া প্রচার করার ফল? উহাকেও যুক্তিবাদের অন্যতর অসদ্ব্যবহার বলিতে হইবে।

ইংলণ্ডে দুষ্ট দার্শনিক মিল বেন্থাম প্রভৃতি, কেবল কথার পুঁজি। সত্য দার্শনিক নিউটন; যে মনে, যে দর্শনে, মানসিক তাবত বৃত্তি চতুষ্টয় সুসংমিলিত হইয়াছে, বিজ্ঞান এবং বাইবল, সমাজ এবং স্বয়ং, সর্ব্বত্রেই সমান দৃষ্টি, সমান সত্যে রতি, সমান চত্বর। এসংসারে নিউটনের কার্য্য ফলটাও, আশু এবং গৌন, উভয়ত কি মহান্ দেখ দেখি। সত্য দার্শনিক সঙ্করাচার্য্য, বেদ এবং বেদান্তে সমান দৃষ্টি; তাবত বিষয়েতেই সমান দৃষ্টি, এরূপ মহাপুরুষ আর কখনও কোথাও জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। সত্য দার্শনিকের কথা যেমন বলিতেছি, সত্যদর্শনের উদয়ও এ সংসারে অনেক হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে চূড়া স্বরূপ টীকা টিপ্পনি প্রভৃতি রহিত বেদান্ত।

কেবল যুক্তিশক্তি মাত্রের উপর নির্ভর যে দর্শন শাস্ত্রের, তাহা সহকারী শাস্ত্র মাত্র। এ পর্য্যন্ত যেরূপভাবে অনুশীলিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ ভাবে উহাকে স্বয়ংসিদ্ধ মলশাস্ত্র পদে সংস্থাপন করা উচিত নহে। চিত্ত বৃদ্ধি ও শ্রদ্ধা এ বৃত্তিত্রয়, উহার দৌড়ে যতদূর পৌছিতে উহার প্রতিবন্ধকতা করে, সে পর্য্যন্ত উহাকে প্রধাবিত হইতে দিতে নাই। যতদূর উক্ত বৃত্তিত্রয় অনুমোদন করে, ততদূরই উহাকে প্রধাবিত হইতে দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য মনে আপনা হইতেই উহা সীমা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু রুগ্নমনে উহা প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে এবং তেমন স্থলে উহাকে আটক করিয়া রাখাও দুষ্কর। তদ্রূপস্থলে আটক করাও সৎপরামর্শসিদ্ধ নয়, যেহেতু তাহাতে মন আরও অশান্তির আলয় হইয়া উঠে। যেখানে এরূপ ঘটে, সেখানে অন্য যে কোন উপায়ে মনকে সুসংস্কৃত ও সুশিক্ষিত করা বিধি। মনকে স্ববশে আনিতে হইলে, তাহার প্রতি চিন্তায় তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নহে; তাহাতে মনের মধ্যে অশান্তি ও চিন্তনীয় বিষয়ের প্রতি আরও অধিক আশক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। মনকে স্ববশে ও সুপথে আনিবার প্রধান উপায় এই যে, মন যখন আগ্রহ সহকারে প্রতিকূল বিষয়ের উপর চিন্তা করিতে থাকে, তখন অপরাপর ইন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয়

মনকে যদৃচ্ছা প্রতিকূল বিষয়ে চিন্তা করিতে দিতে হয়। ক্ষণপরে আপনা হইতেই সে চিন্তায় তৃপ্ত ও ক্লান্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে থাকে; তখনই তাহাকে অনুকূল পথে লইয়া যাইবার সময় এবং সে সময়ে যে চেষ্টা করে, সে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হয়। নতুবা যে বলে যে, প্রতিকূল চিন্তার পূর্ণতরঙ্গ হইতে মনকে সহসা প্রতিনিবৃত্ত করিয়া স্বদেশে ও সুপথে আনিতে পারে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাহার চিত্ত কখনই প্রকৃতপক্ষে শান্তির আলয় হয় না।

দর্শনের সীমা যেরূপে নিরূপণ করা গেল, তাহাতে দর্শন বা এককথায় যুক্তিবাদের ব্যবহার দুইরূপে সিদ্ধ হয়। এক উপলব্ধ জ্ঞানের সংস্থাপন; অপর উপার্জ্জিত জ্ঞানকে সহজে আয়ত্ত হেও, তাহাকে দর্শনাকারে অনুবন্ধন।

• প্রথমত। চিত্ত যে জ্ঞানকে গ্রহণ করিবে, বুদ্ধি যাহাকে ভাল বলিবে, এবং মন যাহাকে বিশ্বাস করিতে চাহিবে, সেই জ্ঞানকে যুক্তির দ্বারা দেখিয়া লওয়া যে উহা ঠিক কি না। যুক্তি তৃতীয় বৃত্তি এবং শ্রদ্ধা চতুর্থ বৃত্তি। যুক্তিক্রিয়া হইবার পূর্ব্বেই যে ওখানে শ্রদ্ধাক্রিয়ার আগে সূচনা করিলাম, তাহার একটু কারণ আছে; চিত্ত বুদ্ধি শ্রদ্ধা ইহারা স্বাভাবিক ভাবে থাকিলে, যাহা সৎ, তাহা স্বতই গ্রহণ করিয়া থাকে; এবং যুক্তিও স্বাভাবিক ভাব সম্পন্ন হইলে কখনই তাহার বিপরীতে যায় না। এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে যে, যে কার্য্য সৎ, তাহাতে বড় ভাবাচিন্তা যুক্তি প্রভৃতির আবশ্যক হয় না। অসৎ কাজ মাত্রই অস্বাভাবিক, চিত্ত বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা সহজে তাহাতে আনত হইতে চাহে না; এজন্য যুক্তিশক্তিরও তথায় অনেক প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই জন্যই দেখা যায় কুকর্ম্মে যুক্তিশক্তির সর্ব্বদাই অনেক প্রয়োজন; অথচ এরূপ যুক্তিফল প্রায়ই পরিণাম দুষ্ট হয়, তাহার কারণ অনন্বিত যুক্তিশক্তি কখনই সম্পূর্ণ ফল প্রসব করিতে পারে না। কুকর্ম্মশীলেরা জানত ও দৃশ্যত অনেক যুক্তি করিয়াই কুকর্ম্ম করিতে যায়, অথচ ধরা পড়ে। আর সুকর্ম্মশীলেরা জানত ও দৃশ্যত কোন যুক্তি না করিয়াই সুকর্ম্ম করে, অথচ সর্ব্বদাই সফলতা লাভে কৃতার্থ হয়। অনেকের বিশ্বাস, বিজ্ঞানশাস্ত্র কেবল যুক্তিবাদের উপরে উদ্ভাবিত; সেটা মিথ্যা

কথা। চিত্ত ও বুদ্ধিই তাহার মূল, তবে বিষয়ধর্ম্মে তদুভয় উদ্ভূত বিষয় কষিয়া লইতে অনেক যুক্তির প্রয়োজন হয় বলিয়াই লোকের তদ্রূপ ভ্রম। বৃত্তি সমূহের অনুকূলতায় স্বাভাবিক ভাবে উপলব্ধ জ্ঞানেতেও যে, পরবর্ত্তী ভাবে যুক্তিশক্তির বিশেষ চালনার আবশ্যক হয়, সে কেবল অনুকূল-প্রতিকূল সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ নিরসনার্থে এবং বিশেষ বিশ্বাস ও বিশেষ দৃঢ়তা স্থাপন জন্য।

দ্বিতীয়ত। ভাষা পর্ব্বে ব্যাকরণ যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, জ্ঞানানুশীলন পর্ব্বে দার্শনিকতাও সেইরূপ কার্য্য করে। আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ; তদ্রূপ আগে জ্ঞান, পরে দর্শন। ভাষা বিষয়ের অর্জ্জিত জ্ঞানকে আয়ত্তীকরণ দ্বারা ভাষাপথে উত্তর গমন জন্য, যেমন অর্জ্জিত ভাষাবিষয়ক জ্ঞানকে ব্যাকরণের নিয়ম ও সূত্রের দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা হয় ও তাহার অভ্যাসের প্রয়োজন হইয়া থাকে; জ্ঞানানুশীলন পর্ব্বেও উত্তর গমনের উপায় স্বরূপ, পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞানাদিকে দর্শনের দ্বারা নিয়মিত ও সূত্রিত করিয়া লইতে হয়। প্রাচীন আর্য্যদিগের দর্শনাদি প্রধানত এই পথাবলম্বী, যেমন পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি; এজন্য ইহারা এদেশীয় এবং বিদেশীয় অপরাপর দর্শনাদির ন্যায় কালবশে হতমানতায় কখনও পড়িয়া বিলুপ্ত হয় নাই, বরণ শাস্ত্রপদে পর্য্যন্ত বরিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

যুক্তিবাদের সদ্ব্যবহার, অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। বলিতে যে ঠিক পারিয়াছি তাহাও আমার বিশ্বাস নাই, শুনিবে যে কেহ আমার কথা, তাহাতেও আমার বিশ্বাস নাই। কথা বলা এবং শুনা, এ দুয়েতে, কথারও মূল্য থাকা চাই; শ্রোতারও মনের গতিক ভাল থাকা চাই। মনের গতিকে এক সময়ে যে কথা অসার, অযৌক্তিক এবং পুনরুক্ত বলিয়া ঘৃণিত হয়; আর এক সময়ে তাহাই অতি মহাপদার্থ বলিয়া গৃহিত হইয়া থাকে। এক সময়ে হয়ত সহস্র ভাল কথাও কাণে প্রবেশ করে না, আর এক সময়ে হয়ত মন্দ কথার ভিতরেও ভালর আভাস গ্রহণে তদ্বারা লোকের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। মদুক্ত বাক্য কি পরিণামে উপস্থিত হইবে, তাহা অনন্ত পুরুষই জানেন; আমার জানিবার অধিকার নাই, জানিতেও চাহি না। তথাপি এক্ষণে মোটের উপর সারকথা এই, যুক্তিবাদের মিথ্যা-

ঘোরে ঘুরিয়া এটা, ওটা, সেটা করিয়া পাষণ্ডপণায় মাতিয়া বেড়াইও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, স্বীয় জীবনের উপর বিশ্বাস কর, কর্ম্মভূমিতে বিশ্বাস কর এবং কর্ম্মে বিশ্বাস কর।

সুকর্ম্মবান হইতে হইলে স্বধর্ম্ম অবলম্বন ও স্বজাতীয়ত্বের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সেই স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয়ত্ব, অনুকরণ মিশ্রিত যুক্তিবাদের মোহে, এখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিকৃত ও ছন্ন ছাড়া হইয়া যাইতেছে। বিশ্বাসে পাষণ্ডপণা ও ব্যবহারে ছন্ন বিজাতীয়ত্ব আসিয়া জুটিতেছে। তাই, ভাল হউক, মন্দ হউক, এতগুলি কথা বলিলাম। দেখ, যদি স্বদেশীয় রাজনীতি সহস্র দোষে দূষিত এবং বিদেশীয় রাজনীতি সহস্র গুণে ভূষিত হয়; তথাপি কি কেহ স্বজাতীয় রাজাকে তাড়াইয়া ও স্বীয় জাতীয় স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় হারাইয়া বিদেশীয় রাজাকে ডাকিয়া আনে? সেখানে কর্ত্তব্য কি, না স্বদেশীয় রাজনীতিকেই যথাস্থিত রাখিয়া তাহার সংশোধন করিয়া লওয়া। স্বজাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয়ত্ব ও সামাজিকতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অথবা বঙ্গসন্তান, এ দৃষ্টান্তের উল্লেখ তোমার নিকটেই বা কি ভাবে কি সাহসে করি;—জগতের ইতিহাসে যাহা কখন ঘটে নাই, যাহা কখনও ঘটিবার নহে; যাহা লজ্জাস্কর, অযশস্কর, অপ্রতিষ্ঠা প্রতিপাদক;—সেই বিজাতীয় রাজাকেও না তুমি একদিন স্বীয় পদে চিরনিগড় পরাইবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলে? অতঃপর তবে তোমার আর অকর্ত্তব্যই বা কি আছে, বক্তব্যই বা তোমার কাছে আর কি থাকিতে পারে? মহাভারত!

ইতি যুক্তিবাদ।

মানবীয় ধর্ম্ম।

১২৯৩।

১

ইউরোপীয় তত্ত্বানুসন্ধায়ী ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আদি মানবের ক্রমোন্নতি পরম্পরায়, স্বপ্ন দৃষ্টে লোকান্তর কল্পনা, লোকান্তর কল্পনা হইতে স্রষ্টা বা লোকাতীত শাসক চৈতন্যের কল্পনা এবং শাসক চৈতন্যের কল্পনা হইতে ধর্ম্ম কল্পনার গঠন ও প্রচলন মানবসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেহ বা বলিয়া থাকে, বহিঃপ্রকৃতির রোমহর্ষণকর বিরাটমূর্ত্তি দৃষ্টে মানবীয় মনে ভয়ের সঞ্চার এবং ভয় হইতে ধর্ম্মের এবং তাহার গঠন ও প্রবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু সকলের কথারই মূল তাৎপর্য্য এই যে, মানবীয় মনের উপর বহিঃ প্রকৃতির ক্রিয়াজনিত যে উত্তেজন, তাহাই রূপান্তর পরিগ্রহে ইহসংসারে ধর্ম্ম আকারে প্রকটিত হইয়াছে। শুদ্ধ আধিভৌতিক দৃষ্টি দ্বারা বহিঃ-প্রকৃতিকে পরীক্ষা করিলে, এইরূপ কতকটা অনুমিত হওয়ারই কথা বটে; কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও যাহারা বহিঃ প্রকৃতিকে আলোচনা করিয়াছে, তাহারা জানে যে মানবীয় অন্তঃপ্রকৃতির কোন অংশ বা অন্তঃপ্রকৃতির যন্ত্র স্বরূপ কোন বৃত্তি বিশেষ বা বৃত্তি সকলের কোন ক্রিয়াশক্তি বিশেষ, ইহাদের কাহাকেই বহিঃপ্রকৃতির নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা নাই; কেবল যথা সম্ভব আহারীয় দানে তাহাদিগকে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত মাত্র করিতে সক্ষম হয়। অতএব বহিঃপ্রকৃতি যে কোন আকারে বা প্রকারেই হউক না কেন, ধর্ম্মপদার্থের মূল কারণ স্বরূপ হইতে পারে না, বা নিমিত্ত কারণও নহে, ঊর্দ্ধমাত্রায় কেবল মাত্র সমবায়ী কারণরূপে গণিত হইতে পারে।

অনেক পর্য্যটক দেশ দেশান্তর পরিভ্রমনান্তে সংবাদ আনিয়া দিয়াছে যে, এমন অসভ্যজাতিও জগতে অনেক আছে, যাহাদের ধর্ম্মধারণা একেবারে নাই। একথার অর্থ বড় একটা বুঝিয়া উঠা যায় না। কারণ, যে ধর্ম্ম পদার্থ মনুষ্য প্রকৃতির সহিত জড়িত, অথবা মনুষ্য প্রকৃতিই যাহা; মনুষ্য আছে, তাহা নাই, একথা কেমন যেন অসম্ভব ও অসংলগ্ন বলিয়া বোধ

হয়। এই পর্য্যটকদিগের কথার অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইলে, তাহারা ধর্ম্ম অর্থে কি পদার্থ বুঝে আগে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এক্ষণে এই পর্য্যটকদিগের নিজের ধর্ম্মধারণা কি, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত লোকাতীত কোন চৈতন্যে বিশ্বাসের নামই ইহাদের মতে ধর্ম্ম। কোন পর্য্যটক এমনও আছে যে খৃষ্টানী মতের দ্বারা চিত্রিত রূপ ঈশ্বরের নামাদির পরিচয় যথায় আছে, তাহাই ধর্ম্ম নতুবা ধর্ম্মশূন্যতা। পর্য্যটকদিগের এই বিভিন্ন বিশ্বাস হেতু দেখা যায় যে, কোন পর্য্যটক বা প্রথমোক্ত প্রকারের স্থূল বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়া, কোন গরিব অসভ্যজাতির বিশ্বাস বিশেষ দৃষ্টে, তাহাদিগে ধর্ম্মধারণার খ্যাতি প্রদান করিয়াছে। কেহ বা আবার সে বিশ্বাসে দ্বিতীয়বিধ স্বজাতীয় বিশ্বাসের সাদৃশ্য না দেখিতে পাইয়া, সে সামান্য খ্যাতি টুকুও একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে। যেস্যুট পাদ্রি দব্রিজফার ইহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। উক্ত পাদ্রি বলিতেছে যে, আবিপোণ নামক অসভ্য আমেরিকদিগের মধ্যে কোন ধর্ম্ম নাই এবং ঈশ্বর বিষয়ক কোনরূপ ধারণারই অস্তিত্ব নাই। অথচ কিন্তু আবিপোণেরা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের একজন আদি পিতা আছেন; ঐ আদি পিতাকে তাহারা সাধারণত পিতামহ নামে আখ্যাত করে। পিতামহ এখন সপ্ত নক্ষত্রে (অর্থাৎ কৃত্তিকা মণ্ডলে) বাস পূর্ব্বক, সন্তানগণের অর্থাৎ আবিপোণ-দিগের শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। যে যে ঋতুতে উক্ত নক্ষত্র মণ্ডল অস্তমিত থাকে, তখন পিতামহ পিড়ীত হইয়াছে বলিয়া আবিপোণেরা অনেক শোক প্রকাশ করে; আবার ইংরেজী মে মাসে যখন নক্ষত্র মণ্ডলের পুনরুদয় হয়, তখন পিতামহ দর্শনে মহাহর্ষে হর্ষান্বিত হয়। দব্রিজফারের খৃষ্টীয় ঈশ্বর আর আবিপোণদিগের পিতামহ, এ দুয়ে বস্তুত প্রভেদ কি? প্রভেদের মধ্যে ঈশ্বরটি ইউরোপীয় সভ্য, আর পিতামহটি আমেরিক অসভ্য। অথচ, এই দব্রিজফারের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, আবিপোণদিগের কোন ধর্ম্মধারণাই নাই; তাহারা একেবারে ধর্ম্মশূন্য মানব!

ফলত, ইহা একটি অখণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, মানব ক্রমোন্নতি পথে যত হীন-অবস্থারই হউক না কেন, ধর্ম্ম ছাড়া মানুষ হইতে পারে না এবং ধর্ম্ম পদার্থ যাহা তাহাও বহিঃ প্রকৃতির কোন ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সৃষ্ট বা

উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে ধর্ম্ম বস্তুত পদার্থটা কি?—অগ্র উত্তর দিবার পূর্ব্বে, পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব সকলে কি শিক্ষা দেয়, অগ্রে তাহার কিছু আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমেই পার্শিদিগের ধর্ম্মের আলোচনা করা যাউক। অহুরমজ্‌দ পবিত্রাত্মা এবং অঙ্গ্রমৈনু অসদাত্মা। উভয়ে নিত্য সংগ্রাম; যেথানে অহুরমজ্‌দ স্বর্গরচনা করিতেছেন, সেই থানেই অঙ্গ্রমৈনু নরক রচনা করিয়া থাকে, ইত্যাদি। ফলত, জেন্দ-অবস্তার দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব এই যে, অহুরমজ্‌দ ও তাহার দলবল সহ, অঙ্গ মৈনু ও তাহার দলবলের নিত্য সংগ্রাম এবং মাঝে পড়িয়া, তাহার মধ্যে মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি। এজন্য অহুরমজ্‌দের আদেশে, মানব এ সংসার ক্ষেত্রে অবিরত যজ্ঞাদি করিবে, যদ্দারা অসদাত্মাসহ সংগ্রামে সদাত্মাগণ বলিয়ান হইতে পারে এবং মানবও তদ্দারা সদাত্মাগণের প্রীতি সাধনে শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সক্ষম হয়; অপিচ, পবিত্রতা সাধন দ্বারা এবং কুকুরের সাহায্যেও, অসদত্মাগণ হইতে মানব আপনাকে রক্ষা করিবে। পার্শি-ধর্ম্মে কুকুর, হিন্দুর গরু অপেক্ষা, সহস্র গুণে পূজনীয়। বেন্দিদাদের ত্রয়োদশ ফার্গর্দ, কেবল এই এক কুকুর মাহাত্মেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কুকুরকে কেহ হত্যা করিলে, তাহার আর নরক হইতে নিস্তার নাই? কুকুরকে মন্দ খাদ্য দিলে, প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত গৃহপতিকে মন্দ খাদ্য দান করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের পাপী হইতে হইবে। যাউক, এক্ষণে পার্শি-ধর্ম্মের চূড়ান্ত শিক্ষা ও ফল কি, তাহা দেখা যাউক। এ সম্বন্ধে অষ্টম ফার্গর্দে, জরথুস্ত্রের প্রশ্নোত্তরে অহুরমজ্‌দ বলিতেছেন,—যে কেহ মজ্‌দের শাসন প্রতিপালন করিয়া পবিত্রতা সাধন পূর্ব্বক, অঙ্গ্রমৈনু হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, সেই তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইয়া, মজ্‌দ লোক অর্থাৎ স্বর্গ লোকে গমন করিতে সক্ষম হইবে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মূল তত্ত্বে উহা, পার্শি-ধর্ম্মস্থ সদাত্মা সহ অসদাত্মা সংগ্রাম বিষয়ের রূপান্তর মাত্র। তদুভয় সংগ্রামের মাঝে পড়িয়া মানুষের প্রাণ লইয়া তেমনই টানাটানি; ঈশ্বরেরও তথাবিধ আদেশ, যে কেহ শয়তান বিমুখ ও ঈশ্বর প্রমুখ হইবে, সেই স্বর্গ রাজ্য অধিকারে সক্ষম হইতে

পারিবে। পার্শি ধর্ম্মে আত্মপবিত্রতা ও শৌচ সাধন একান্ত আবশ্যক; কিন্তু এধর্ম্মে তদপেক্ষা আরও একটু বেশী সুবিধা দেখা যায়, অর্থাৎ বরাতে মুক্তি! অপবিত্র হউক, পাপী হউক, খৃষ্টের উপর নির্ভর ও তাহার উপর বরাত দিতে পারিলেই মানুষ মুক্ত হইতে পারে। ফলত বরাতে মুক্তিই এ ধর্ম্মের এক মাত্র পন্থা; যেহেতু এমনও শাসন দেখা যায় যে, মানব যতই জ্ঞানী, যতই পবিত্র ও যতই নীতিশীল হউক, খৃষ্টের উপর বরাত ব্যতীত কথনই তাহার উদ্ধার হইবে না; নরকে তাহার যাইতে হইবে, নরকও আবার অনন্ত নরক! মোটের উপরে এ ধর্ম্মের সার কথা এই যে, খৃষ্টের উপাসনা ও আনুগত্য করিলেই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করা হইল। খৃষ্টের কথিত নীতিগুলি পালন না করিলে খৃষ্টশিষ্যেরও তাহাতে প্রত্যবায় না ঘটে এমন নহে, কিন্তু নরকে ফেলিয়া বার কয়েক মারপিট সাজা শাস্তি করিলেই সেজন্য, যে কিছু পাপ তাহা কাটিয়া যাইবে ও পাপী এরূপে পুণ্যবান হইয়া স্বর্গে যাইতে পারিবে। কিন্তু নীতিব্যতিক্রম জন্য এ সাজা টুকুও হইবে, কি তাহাও খৃষ্টের বরাতে বিনা শাস্তিতে কাটিয়া যাইবে, তাহা লইয়াও আবার মতভেদ আছে। খৃষ্টান মহাপাপী হইলেও সে উদ্ধার হইবে, অনন্ত স্বর্গে স্থান পাইবে; আর অখৃষ্টান মহাসাধু হইলেও সে উদ্ধার হইবে না, অনন্ত নরকে তাহাকে যাইতে হইবে! এক খৃষ্ট নামের উপর বরাত দেওয়া না দেওয়ার এতই তারতম্য। কি উদারতাপূর্ণ মধুর ধর্ম্ম, কি মধুর তত্ত্ব! অন্তত খৃষ্ট শিষ্যেরা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ফলত, অখৃষ্টান সাধুর অপেক্ষা খৃষ্টান পাপীর ভাগ্য যে অপরিমিত গুণে ভাল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না।

মহম্মদীয় ধর্ম্ম আবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মের রূপান্তর। এখানেও বরাতে মুক্তির ব্যবস্থা, কিন্তু তত নহে; এখানেও যে কেহ মহম্মদকে স্বীকার করিবে, সেই স্বর্গে যাইতে পারিবে; যে কেহ করিবে না, সে যাইতে পাইবে না; তদর্থে সাধু অসাধু ভেদ নাই। প্রভেদ এই, খৃষ্টানের পাপ, খৃষ্টের উপর বরাত দিলেই ক্ষমিত হওয়ার সম্ভাবনা, আর শাস্তিভোগ করিতে হইবে না; মুসলমানের পাপ কিন্তু সেরূপে ক্ষমাযোগ্য হইবে না। পাপের জন্য মারপিট প্রভৃতি নানা প্রকার শাস্তি নরকে হইয়া যাইবার পর পাপ কাটিয়া গেলে, তখন

মুসলমান স্বর্গে গিয়া মদের পুকুরে, সোণার ঘরে, পরির মহলে আমোদ আহ্লাদ করিতে পাইবে। যতই সাধু হউক, যে কেহ মুসলমান নহে, সে নরকে যাইবে; আর যতই অসাধু হউক, যে কেহ মুসলমান, সে সাজা শাস্তিভোগের শেষে অবশ্যই স্বর্গে যাইতে পাইবে। খৃষ্টীয় অপেক্ষা, মহম্মদীয় নীতিমার্গ পৃথিবীতে যদৃচ্ছা সুখ ভোগ বিষয়ে কিছু বেশী উদার।

আর নূতন হইয়াছে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। উহার মূলতত্ত্ব এবং অনুষ্ঠান কি, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কৈশবীদলে একা কেশব, সাধারণ দলে সবাই কেশব। স্থাড়ার আলখেল্লা গোচ, সাত জায়গার সাত টুকরা তালি সংগ্রহের দ্বারা গ্রথিত নীতি মাত্র বিধায়ক কতকগুলি বচন গ্রন্থি ইহার শাস্ত্র। যে সূত্রে পরিধেয়তে কোমরে বাঙ্গালির কাপড় তদুপরী ইংরেজী প্যাণ্টালুন, গায়ে পার্শিকোট, মাথায় মুসলমানের পাগড়ি, ইত্যাদির একত্র সমাবেশ; সেই সূত্রেই এ অপূর্ব্ব শাস্ত্রের উৎপত্তি। প্রকৃত সভ্য হইলেই প্রকৃত গুণ গ্রাহি হয়, প্রকৃত গুণ গ্রাহি যে সে মধুকরের ধর্ম্ম না পাইবে কেন? সেই অপূর্ব্ব মধুকর চরিতে, ফলে যাহা এখন দেখা যায়, তাহা এই যে, যে কেহ স্বজাতীয় রীতিনীতিকে দূষিত ভাবিয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা পূর্ব্বক বিজাতীয়ের অনুকরণ করিতে পারিবে; যে কেহ পৌত্তলিকতা, বিশেষ হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষে অকপট বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে; এবং যে কেহ খুব চোখবুজিয়া উপাসনা করিতে পারিবে, সেই ঈশ্বরের বিশেষ প্রীতিভাজন হইবে। উপাসনা ও অনুষ্ঠান প্রণালীতে প্রায়ই খৃষ্টীয় প্রণালী ও রীতি ও নীতি এবং মতি গতি অনুকৃত হইয়া থাকে!—মধুকর চরিতের নিয়মই এই! কিন্তু ইহাও প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্য্য। বাঁধা ঘোড়া ছাড়া পাইলে, যথাস্থির হইবার পূর্ব্বে, আগে এক নিশ্বাসে এক লাফে মাঠ পার হইয়া থাকে; কেহই তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। বহুদিনের উপধর্ম্ম দলিত হিন্দুসন্তানের উহা সেই একলাফে মাঠ পারের পরিচয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম এ সকল গুলি হইতেই স্বতন্ত্র। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর বা আদি-কর্ত্তা মানে না। অনন্তকাল হইতে এই বিশ্বের স্থিতি এবং অনন্তকাল

হইতে ইহাতে মানবের গতাগতি। এই মানবের মধ্যে যাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা চরম উৎকর্ষ ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই উৎকর্ষের পর্য্যায় ভেদে বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ। বুদ্ধ জন্ম মরণের অতীত; বোধিসত্ত্বকে এখনও জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ-অবস্থা লাভ করিতে হইবে। বুদ্ধগণ জীবনান্তে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চেষ্ট রূপে নিত্যানন্দে অনন্তকাল নিমগ্ন হইয়া থাকেন। বোধিসত্ত্বগণ যুগে যুগে পৃথিবীতে বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সুপথ প্রদর্শনের দ্বারা মানবকুলকে উদ্ধার করেন। বৌদ্ধশিক্ষা এরূপ,—এ জগতের আধিভৌতিক তাবত পদার্থই ক্ষণিক এবং তাহারাই যাবতীয় ক্লেশের কারণ ও তাহার উপাদান স্বরূপ; অতএব তাহাতে আশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যে সকল সুনীতি, সৎক্রিয়া ও জ্ঞানের দ্বারা আত্মার পুষ্ঠতা সাধন হইতে পারে, তাহারই অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মানবের এই আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম ভাব যতদিন পর্য্যন্ত সাধিত না হইবে, ততদিন তাহাকে নিশ্চয় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং প্রতি জন্মে জন্মান্তরীণ কর্ম্মসূত্র সকল তাহাকে পরিচালনা করিতে থাকিবে। অপ-কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ যাহার যেরূপ আধিভৌতিক প্রকৃতি প্রবল হইয়া উঠে, সে সেইরূপ অধমজন্ম পরিগ্রহ করিয়া, অধোমুখে গতি করিতে থাকে।

উপরে যে কয়টি ধর্ম্মের প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করা গেল, সেই প্রকৃতির অভিপ্রায় মনুষ্যের জীবন কার্য্য সম্বন্ধে কিরূপ বর্ত্তে এবং তদ্বারা মনুষ্য-আত্মার ভাবী পরিণাম কতদূর অনুমিত হইতে পারে, তাহা একটি উদাহরণের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব। চোর আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইল কিন্তু, চীন দেশে যেমন আছে, পিতার হইয়া পুত্রে দণ্ড গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ আর একজন আসিয়া চোরের পক্ষে দণ্ড গ্রহণ করায় চোর সাধু হইয়া ঘরে গেল; ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। খৃষ্টশিষ্যের চরিত্রও তদনুরূপ, অন্ততঃ আমরা যতটা দেখিতে পাই বা শুনিতে পাই। চোর চোর বলিয়া সাব্যস্ত হইল, মহম্মদ ওকালতি করিলেন, কিছু শাস্তি হইল, চোর তখন সাধু হইয়া ঘরে গেল; আর কোন দোষ নাই, উকিলের সঙ্গে একাসনে বসিতে পাইবে; ইহাই মহম্মদীয় ধর্ম্ম। চোর চোর বলিয়া সাব্যস্ত হই-তেছে না, চোরও কাঁদে আদালতও কাঁদে; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। চোর শাস্তির

ভয়ে চুরি করিল না, ইহা পার্শিধর্ম্ম। চোর উপদেশ ও শিক্ষাগুণে এমন জ্ঞানমার্গে উঠিল, যেখান হইতে চুরিতে রত হওয়া তাহার প্রকৃতির বিপরীত, ইহাই বুদ্ধধর্ম্ম। ইহার উপরেও উচ্চ ধর্ম্মতত্ব প্রকটিত হইয়াছিল, কিন্তু অনুস্থত হইবার জন্ত তাহা এপর্য্যন্ত কেবলমাত্র কাল প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে। সে উচ্চধর্ম্ম—যথায় চোর জ্ঞানমার্গবশে কেবল চুরিতে প্রবৃত্তি শূন্ত হইয়াই ক্ষান্ত হয় না; অধিকন্তু চুরীর বিপরীতে, নিজের যথাসর্ব্বস্ব দানে জগতের হিত সাধনার্থে ব্যাকুল হয়। কিন্তু সে ধর্ম্ম কোথায়? টীকি তিলকধারী অধুনাতন হিন্দুসন্তান যেন তা বলিয়া ভাবিও না যে, সে উচ্চ ধর্ম্মতত্ব তোমার দ্বারা আচরিত বা উপরোক্ত অপরাপর ধর্ম্মধারী অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। উপরোক্ত ধর্ম্মধারীরা যদি একগুণ দোষ দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তুমি দোষদুষ্ট শতগুণ, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তাহাদের তবু একটা যেমন হউক ধর্ম্ম আছে; কিন্তু তোমার? তুমি নামে হিন্দু বটে কিন্তু তোমার না ধর্ম্ম না কর্ম্ম, তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম উদর পূরণে ও প্রবঞ্চনে।

ভাল কথা, এখনও আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা হয় নাই। সমগ্র হিন্দুর আচরিত ধর্ম্ম এবং অবলম্বিত শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, অবশ্যই বলিতে হয় এবং মুক্ত কণ্ঠেও বলা যায় যে, এ জগতে ধর্ম্ম নামের ছায়ায় যথায় যথায় যাহা কিছু বিভৎস, অসংলগ্ন, ঘৃণিত, অসম্পূর্ণ হাস্তাস্পদ, ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, তাহা সমস্তই একাধারে, এক সহস্র গুণে এই এক হিন্দু নামধারী বিশাল ধর্ম্মবিস্তারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সে পর্ব্বে দেখিবার জন্য কোন খেদই থাকে না। কিন্তু এক পর্ব্বে যেমন এই অসৎ দৃশ্য দেখিবার পক্ষে কোন খেদই থাকে না; সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের আর একপর্ব্ব, আর একদিক আছে, যে দিকে আবার তদন্ততর দৃশ্যগুলি তদ্রূপ সহস্র গুণে দেখিবার পক্ষেও কোন প্রকার খেদ থাকিবার সম্ভাবনা নাই সেই দিক, সেই পর্ব্ব, যথায় চোর জ্ঞানমার্গবশে কেবল চুরিতে প্রবৃত্তি শূন্য হইয়াই ক্ষান্ত হয় না; চুরীর বিপরীতে, নিজের যথাসর্ব্বস্ব দানে জগতের হিত সাধনার্থে ব্যাকুল হয়। কিন্তু কোথায় সে ধর্ম্মতত্ব, কোথায় সে ধর্ম্ম শাস্ত্র,—বেদবিদ্যা বা বেদবিদ্যামথিত সারস্বরূপ ভগবদগীতা।

এখানে বরাতে মুক্তির ব্যবস্থা নাই, অথবা শাসন ভয়ে কুকর্ম্মবিরত

হইলেও মুক্তি নাই, অথবা কেবল কান্নাকাটি উপাসনা প্রভৃতি করিলেও মুক্তি হয় না। চামারকে ধুইয়া পুছিয়া উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া রাজাসনে বসাইতে পারিলেই সে রাজা হয় না। দেদো খেঁদো কালু ঘেসুড়েকে যদি মহম্মদীয় স্বর্গস্থ সোনার ঘরে পরির মহলে বসাইয়া দেওয়া যায়; তাহা হইলে কালুসেথ বা কি করে, পরিই বা কি করে,—না জানি কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই বা অভিনীত হয়! অধুনাতন খৃষ্টশিষ্যগণ যদি যিশুর বরাতে স্বর্গে যায়, তবে না জানি স্বর্গ কি অদ্ভুত স্থান! ফলতঃ প্রকৃত রাজা হইতে হইলে, আগে রাজোচিত গুণজ্ঞান লাভের আবশ্যক। অতএব মুক্তি কিরূপে হইতে পারে?—গীতা বলিতেছেন, জ্ঞানে—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

কেন?

"অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥"

যেহেতু তুমি যেমন পাপিই হওনা কেন, জ্ঞানের এমন ক্ষমতা আছে যে, সে কটাক্ষে তোমাকে তাহা হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারে।

এ সংসারে মানবে পাপস্পর্শ হয় দুই প্রকারে, এক আধিভৌতিক অপর আধ্যাত্মিক। কৃত অপকর্ম্ম আধিভৌতিক পাপ, ইহা ইহ জগতেই আধিভৌতিক প্রায়শ্চিত্ত সহ আধিভৌতিক সংসারে হরণ পূরণ হইয়া যায়; অতএব উহা এই সংসারের বিষয়, সুতরাং উহাতে তত আসে যায় না, আসে যায় যত আধ্যাত্মিক পাপে। আধ্যাত্মিক পাপ লোকান্তর, সংসারান্তর, সর্ব্বত্রই অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব বাঞ্ছারাম, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রকৃত পক্ষে অপকর্ম্মকে পাপ বলে না; পাপ বলিতে হয় অপকর্ম্ম প্রবর্ত্তক স্বভাব বা অজ্ঞানকে। জ্ঞানের উদয় হইলে, সেই স্বভাব এরূপ উন্নীত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যাহাতে আর অপকর্ম্ম প্রবর্ত্তনার সম্ভাবনা হইতে পারে না। সুতরাং যেমন আলোকের উদয়ে অন্ধকার নষ্ট হইয়া থাকে, যেমন সংলগ্ন মল জল দ্বারা ধৌত হইলেই মলশূন্যতা উপস্থিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানরূপ পাপের ক্ষণমাত্রে সম্পূর্ণত ধ্বংস হয় এবং এই জন্যই, সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপী হইলেও জ্ঞান, প্লবরূপে

তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। জ্ঞানোদয়ে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্যও আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, যেহেতু ঐ জ্ঞানোদয়ই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই কি মুক্তি হয়? তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্মকেও সম্পূর্ণ বলিলাম না কেন? ফলতঃ তাহা হয় না; জ্ঞানেতে পাপ নষ্ট হয় বটে, পাপ নষ্ট হইলেই যে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল এবং মুক্তি হইবে, তাহা হয় না। মলযুক্ত হওয়ায় কর্ম্মযন্ত্রের বিকৃতি হেতু যে বিকৃত কর্ম্মোৎপত্তির সম্ভব ছিল, জ্ঞান দ্বারা মানবরূপী কর্ম্মযন্ত্র সেই মল মুক্ত হইয়া, তাহা নির্ম্মলতা মাত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে তবে আবার কি করিতে হয়?—

"তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥"

জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানকে বিনাশ করিয়া সংশয় নিরসন পূর্ব্বক, কেবল কর্ম্ম করিবে, কেবল কর্ম্ম করিবে। উহাই উদ্দেশ্য, উহাতেই সার্থকতা। কিন্তু কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে,—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিযম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

ইহারই নাম, কেবল চোর হওয়া হইতে বিরত হইলে চলিবে না; নিজের যে সর্ব্বস্ব আছে, তাহাও জগতহিতে বিতরণ করিতে হইবে এবং করিতে হইবে স্বীয় প্রকৃতি ও নীতির বশবর্ত্তী হইয়া; যেহেতু তদ্বিপরীতে যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা বিরূপ হইয়া থাকে। এ নিমিত্তই পুনশ্চ এবম্ভূত উক্ত,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

এক্ষণে এই কর্ম্মের সমাহার এবং ফল?—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিংবিন্দতি মানবঃ॥"

যিনি সর্ব্বময়, যাহা হইতে ভূত সকলের মতিগতি শক্ত্যাদি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, মানব স্বীয় স্বীয় মতিগতি শক্ত্যানুরূপ কর্ম্মাচরণের দ্বারা, সেই কর্ম্মরূপ

পাসনা ও উপকরণে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, সিদ্ধি লাভে পরমপদ প্রাপ্ত য়।—ইহাই মুক্তি এবং এরূপেই মুক্তি পদার্থ সাধ্য; নতুবা তাহা বরাতে দ্ধি হয় না, শাস্তিতে হয় না, ভয়বিরত-ভাবে হয় না, কান্নাকাটিতে হয় না, কেবল জ্ঞানেও হয় না!

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে যেন আগে জ্ঞান পরে কর্ম্ম; স্তুতঃ ঠিক তাহা নহে। জ্ঞান হইতে কর্ম্মোৎকর্ষ, কর্ম্মোৎকর্ষ হইতে জ্ঞানের উত্তর বিকাশ; এইরূপে বীজবৃক্ষবৎ পরস্পর পরস্পরের কার্য্যকারণত্ব ভাবসম্পন্নরূপে, অনন্তোৎকর্ষ পথে উভয়ে প্রধাবিত হয়। শৌচ পবিত্রতা াদি সে পথের নিয়ম মাত্র; অনম্বিত ভাবে তাহাদের কোন মূল্য নাই বং স্বর্গ অপবর্গ উভয় সাধনেই তাহারা অপটু। অধুনাতন হিন্দুধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর নিকট এই অনম্বিত শৌচ পবিত্রতাদি ধর্ম্মবিষয়ে ..ায় একমাত্র ম্বল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

অতঃপর ধর্ম্ম কাহাকে বলে?—প্রতি মানবে জ্ঞান, প্রকৃতি, নীতি, এ তনের সমষ্টিরূপ, যাহা সেই মানবের আচরিত কর্ম্মের 'আদি' এবং 'নিমিত্ত' ভয় কারণ স্বরূপ হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। এতদ্বিষয় পরপরিচ্ছেদে বিস্তারে আলোচনা করা যাইতেছে।

২

আত্মবোধ বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু যাহারা তাহাদের, আত্মবোধ সম্বন্ধে তকিছু প্রশ্ন আছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম, অর্থাৎ ানব কি জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছে? যদি বলা যায় যে, মানব আপনা ইতে আইসে নাই, স্রষ্টা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তবে আবার জ্ঞাস্য, কি জন্য স্রষ্টা মানবকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন? কর্ম্ম-র্তার অবশ্যই কোন প্রয়োজনসিদ্ধিরূপ উদ্দেশ্য না থাকিলে কর্ম্ম হয় না; নব স্বয়ং এবং তাহার ইহলোকে প্রেরিত হওন, এ উভয়ই স্রষ্টার কর্ম্ম রূপ। অতএব আবার জিজ্ঞাস্য, স্রষ্টার কর্ম্ম স্বরূপ মানব, কি হইয়া বা করিয়া, স্রষ্টার কোন্ প্রয়োজন বিশেষ সে পূরণ করিতেছে? কি বলিবে, হারাম? আহার, বিহার! যতদূর বুঝিতে পারি, অন্ততঃ সাক্ষাৎভাবে,

ইহাত মানবের নিজের প্রয়োজন পূরণ; স্রষ্টার প্রয়োজন পূরণ ইহাতে হইল কোথায়? আহার, বিহার, শয়ন, সুখে হউক দুঃখে হউক, উহাত নিজের শরীর, নিজের জীবন রক্ষা ও পোষণার্থে; সুতরাং উহারা শরীর এবং জীবনের মাত্র প্রয়োজন পূরক বলিতে হইবে। কিন্তু শরীর এবং জীবন যাঁহার সৃষ্ট ও যাঁহার প্রয়োজন পূরণার্থে, তাঁহার প্রয়োজন পূরণ হইল কোথায়?

লোকোমোটিব এঞ্জিনের ছাই ফেলিয়া, ময়লা ধুইয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সর্ব্বরূপে করিয়া, তৈলাদি দিয়া, যে কিছু তদ্বির করা যায়, তাহা এঞ্জিনকে যথাবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য; সুতরাং সেই সেই কার্য্যকে এঞ্জিনের নিজ প্রয়োজন পূরণ বলা যায়। কিন্তু এঞ্জিন যাহার ও যে প্রয়োজনের জন্য, তাহার সে প্রয়োজন পূরণ বলা যাইবে তখন, যখন চালক এঞ্জিনে ষ্টিমের উৎপত্তি করিয়া, গন্তব্য পথে যথাকার্য্য তাহাকে পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইবে। মানবের দেহও তথাবিধ যন্ত্রস্বরূপ, আহার বিহারাদি তৈল কয়লাদির ন্যায় উহাকে যথাবস্থায় রক্ষা করিবার বিষয়; সুতরাং সে সকলকে দেহ বা জীবনের নিজ প্রয়োজন পূরণ মাত্র বলা যায়। এঞ্জিনকে যথাকার্য্যে পরিচালন দ্বারা প্রয়োজন পূরণ স্বরূপে, দেহ বা দেহরূপী মনুষ্য জীবনের পক্ষেও, অবশ্য এমন একটি বিশেষ প্রয়োজন পূরণ আছে, যাহা আহার বিহারাদির অতীত ভাবে অবস্থান করে। এঞ্জিনের চালকের ন্যায়, দেহ যন্ত্রের চালক মনুষ্য-আত্মা স্বয়ং। মনুষ্যজীবনের দ্বারা যখন স্রষ্টার যথানিয়োজিত প্রয়োজন সকল পরিপূরণ হয়, তখন তাহাকেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা বলা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কিরূপে হইতে পারে। তাহা দেখিতে হইলে, স্রষ্টার অভিপ্রায় এবং প্রয়োজন কি, তাহা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু স্রষ্টাকে না কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, না কখন তিনি তোমাকে বা আমাকে এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎরূপে দাঁড়াইয়া কোন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিলেও ত বসিয়া থাকিবার যো নাই; কালের কঠোর তাড়নায় অস্থির হইতে হয়। একটা কিছু করিতেই হইবে;—যে কোন রকমে সে অভিপ্রায়, সে প্রয়োজন জানিতেই হইবে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে তিনি সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কিছু

না বলিলেও, এরূপ ভাবে আমাদিগকে তাঁহার অনুজ্ঞা জ্ঞাত হইতে দিয়াছেন যে, তাহা সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া বলারই সমান। তাঁহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কি এবং তিনি আমাদিগকে লইয়া বা আমাদিগকে দিয়া কি করাইতে চাহেন, তাহা জানিবার জন্য আমাদের বক্ষ্যমাণ দুইটি উপায় আছে, এক যুক্তি প্রমাণিত অনুভূতি, অপর আপ্তবাক্য।

আপ্তবাক্য দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের জীবনের সার্থকতা কর্ম্মে। দেহে যতদিন মানসিক শক্তি সহ সমতায় দৈহিক শক্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন সেই মিলিত শক্তি সাধ্য কর্ম্মের দ্বারা জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে এবং যখন আবার সে শক্তির লোপ হইবে, তখন যতিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। অর্থাৎ বয়সে. সাংসারিক ও সামাজিকতাকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে; বয়স গতে পারলৌকিক সমাজে প্রবেশ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে এ উভয়ই কর্ম্ম পন্থা; তবে কি না কোন্ পন্থা, পাত্রভেদে, কখন এবং কিরূপ সঙ্গত বা অসঙ্গত, তাহা বিবেচনা স্থল। সে কথার অবতারণায় এখানে তত আবশ্যক নাই।

এক্ষণে যুক্তি প্রমাণিত অনুভূতির বিষয় দেখা যাউক। এতদালোচনে, মূলস্থানেই আমরা এই একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, এ সংসারে যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেহই অসার্থকের নহে; সকলেরই স্ব স্ব স্বভাব অনুসারে অনুরূপ সার্থকতা আছে এবং সুতরাং বলিতে হয়, সকলেই স্ব স্ব সীমাস্থ মধ্যে স্রষ্টার অনুরূপ প্রয়োজন সকল পরিপূরণ করিতেছে। সকলেরই ব্যবহার আছে, সকলেই মহাপ্রকৃতির মহাগতি ও পরিণতি পক্ষে সহায়তা করিতেছে;—ইহাপেক্ষা স্রষ্টার প্রয়োজন পূরণের আর কি উৎকৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষ নিদর্শন হইতে পারে। অতএব যখন কোন পদার্থকেই অসার্থক ও নিরর্থক সৃষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন এই দেহ যন্ত্রে তিনি যে সকল শক্তিরাশি ও তন্নিয়ামক বুদ্ধিরাশি নিহিত করিয়াছেন, তাহাও সুতরাং অসার্থক ও নিরর্থকরূপে যে সৃষ্ট একথা কখন বলা যাইতে পারে না। প্রত্যুত যখন দেখা যাইতেছে যে, সে সকল শক্তির ব্যবহার না হইলে, তাহারা নানা অনর্থ উপস্থিত

করে; এমন কি অব্যবহারের অতিরেক অবস্থায় যন্ত্রকে পর্য্যন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয়; তখন কাজেই বলিতে হইবে যে, সে সকল শক্তির অবশ্যই ব্যবহার এবং ব্যবহার হেতু সার্থকতা আছে এবং অন্যান্য তাবত সৃষ্ট পদার্থের ন্যায়, তাহারাও স্রষ্টার প্রয়োজন পূরণার্থে নিয়োজিত ও নিয়মিত;

দেহযন্ত্রে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। সে দ্বিবিধ শক্তির প্রত্যেককে একক বা উভয় সম্মিলনে চালনা করিলে, যে চালন ফল উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকে; তাহাই কর্ম্ম।

শক্তি সঞ্চালিত হওয়ার নাম কার্য্য, সেই কার্য্যফল যাহা তাহা কর্ম্ম। সর্ব্বত্রেই মহাশক্তির ক্রিড়া!—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা." এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মহাশক্তির কর্ম্মস্বরূপ;—

"হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত
মব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।"

মহাকর্ম্ম স্বরূপ এই মহা ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের বিরাট দেহ এবং তিনিই উহার কর্ত্তা। কর্ম্মরূপী ব্রহ্মাণ্ড, সমষ্টি কর্ম্ম স্বরূপ; তদন্তর্গত অংশ, অংশাংশ, ইত্যাদি সূক্ষ্ম স্থূল যাবত শক্তিসাধ্য ভূতপরিণাম, তৎসমস্ত ব্যষ্টিকর্ম্ম স্বরূপ—ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির পরিণতি। ঐ যে নদীর মৃদু জলতরঙ্গে এক একটি বালুকাকণা আসিতেছে বা যাইতেছে; যুগান্ত পারে, এখানে বা সেখানে যে পর্ব্বত, পাথর বা যে কোন অপরূপ সৃষ্টি হইবে, উহা তাহারই এবৈক প্রাথমিক পর্ব্বশ আয়োজন বিশেষ সাধন করিতেছে। এসংসারে ব্যষ্টি ও সমষ্টিই নিয়ম এবং উভয়েরই যুগপৎ একত্র সমাবেশ,—এমন কোন সূক্ষ্ম পদার্থই দেখিলাম না, যাহা ফলে সমষ্টিরূপ নহে; আবার এমন কোন সমষ্টিই দেখিলাম না যাহার অনন্তগর্ভে ব্যষ্টিরূপের বিদ্যমানতা নাই। প্রতি কর্ম্মে অনন্ত কর্ম্ম নিহিত এবং প্রতি কর্ম্ম আবার অনন্ত কর্ম্মের অনন্ত অংশ স্বরূপ। সামান্য বৈজ্ঞানিকেও না বলিয়া থাকে, প্রতি পরমাণুকে অনন্ত খণ্ডে খণ্ডিত করিতে পারা যায়? অনন্ত পুরুষের কি অনন্ত

লীলা বৈচিত্র্য!—যে ব্যষ্টি সহজেই অন্ত বোধক, তাহারও অনন্ত মুখে গতি ; সমষ্টিরও অনন্তমুখে গতি ;—

"ত্বংবৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্যবীজংপরমাসি মায়া।"

পাতা নড়িতেছে, পোকা হাঁটিতেছে, তুমি আমি যাহা করিতেছি এ সকলই কর্ম্ম ;—ব্যষ্টি কর্ম্ম, মহাসমষ্টিতে মিশিয়া তাহার পরিণতি সাধন করিতেছে। জড় অজড় সকলেই সমষ্টি উদ্দেশে সেই ব্যষ্টি সাধনে ব্যাপৃত, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়। কাহারও তাহাতে হেলা করিয়া বসিয়া থাকিবার সাধ্য নাই। সবাই কর্ম্মবান্। কর্ম্ম, কর্ম্ম,—মহাপ্রকৃতি তাঁহার গহনগম্ভীর অনন্ত কুহর হইতে অনন্ত বিশ্রুত স্বরে সেই একই মাত্র চিৎকার, সেই একই মাত্র আদেশ করিতেছেন,—কর্ম্ম। কর্ম্মেই উৎপত্তি, কর্ম্মেই স্থিতি, কর্ম্মেই গতি ও পরিণতি। তাবতোৎপত্তির একমাত্র প্রয়োজনই কর্ম্ম ;—

"সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্ ॥"

সমষ্টিরূপ কর্ম্মের কর্ত্তা ঈশ্বর, ব্যষ্টিরূপ কর্ম্মের কর্ত্তা জড় অজড় তাবত ব্যষ্টি পদার্থ। স্ব স্ব নিহিত শক্তি অনুরূপ কৃত কর্ম্মের দ্বারা, প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপীজীব জড়াদি স্বীয় স্বীয় উৎপত্তির সার্থকতা ও তদ্দ্বারা স্রষ্টার প্রয়োজন সকল পরিপুরিত করিতেছে।

অতএব যুক্তি, অনুভূতি, সর্ব্ব প্রকারেই প্রমাণিত হইতেছে যে, কর্ম্মই যখন শক্তি মাত্রের এক মাত্র পরিণাম এবং শক্ত্যহিতে আর কিছুই যখন মানবে নিহিত হয় নাই ; তখন স্রষ্টাকর্ত্তৃক মানবকে ইহলোকে প্রেরণের উদ্দেশ্য, মানবের দ্বারা কর্ম্মের উৎপাদন করা এবং সেই কর্ম্মের দ্বারা স্রষ্টার প্রয়োজন পূরণ হওয়া। এখন ইহা বলিতে পার যে, যখন শক্তি চালন ফলই কর্ম্ম এবং কর্ম্মই যখন মানবজীবনের উদ্দেশ্য, তখন কেবল আহার বিহারাদির দ্বারা জীবনের সার্থকতা না হয় কেন?—তাহাওত কর্ম্ম। কেবল আহার বিহারাদি বা আরও সামান্য শক্তি সঞ্চালিত ব্যাপারাদিরূপ কর্ম্মকেই পর্য্যাপ্ত বলিয়া ধরিতাম, যদি তোমার শক্তি সকলও কেবল তদ্রূপ কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত। যখন দেখা যাইতেছে তাহা হয় না, নিহিত

শক্তির অতি অল্পাংশ মাত্রই তদ্দ্বারা চালিত হয়, তখন ইহাও নিশ্চয় যে, আহার বিহারাদির অতীতরূপী কর্ম্ম ব্যতীত কখন জীবনের সার্থকতা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ইহাও দ্রষ্টব্য, আহার বিহারাদির দ্বারাত কেবল যন্ত্র রক্ষা মাত্র হইল, কিন্তু যন্ত্র যে জন্য সে প্রয়োজন পূরণ হইল কোথায়? ফলতঃ কর্ম্ম যাহাই হউক, কর্ম্মের রাশি পরিমাণের দ্বারা মনুষ্য জীবনের সার্থকতা ধরিতে হইবে না; মনুষ্যে যে সকল কর্ম্মশক্তি নিহিত হইয়াছে, তাহার নিয়োগ হইল কতখানি, সেই পরিমাণের দ্বারাই মনুষ্য-জীবণের সার্থকতার পরিমাণ করিতে হইবে। অর্থাৎ মনুষ্য যথাশক্তি সম্পূর্ণত কর্ম্মপথের পথিক হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকুক, ইহাই ব্যবস্থা।

এক্ষণে কি আপ্তবাক্য কি অনুভূতি, উভয়তই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মনুষ্য ইহাগত হইয়াছে কেবল কর্ম্ম করিবার জন্য এবং সেই কর্ম্মের দ্বারাই তাহার জীবনের সার্থকতা। কিন্তু এখানেও একটি কথা উঠিতেছে যে, কর্ম্ম যেন আমরা করিব, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্‌টার দ্বারা স্রষ্টার প্রয়োজন পূরণে আমার শক্তি চালনার সার্থকতা, কোন্‌টার দ্বারা বা অসার্থকতা, তাহা বুঝিব কি রূপে?—যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কর্ম্ম বিশেষে অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ আমরা সুকর্ম্ম, অপকর্ম্ম, বৃথাকর্ম্ম, নানারূপ কর্ম্ম উৎপাদনেই পটু; কিন্তু এখন কথা এই, সে পটুতাকে নিয়মিত করিয়া সুকর্ম্মসাধক সুপথে লইয়া যাইবার উপায় কি? সত্যবটে একটা অপকর্ম্ম করিলেও তাহা কিছু প্রকৃতি অঙ্কে বৃথা যায় না, সুতরাং আমার অপকর্ম্মও একেবারে বৃথা যাইবে না; কিন্তু তাহা হইলেও আমার নিকট যতদূর প্রত্যাশিত ছিল, তাহার সফলতা ত তদ্দ্বারা কখনই হইতে পারে না;—তাহার পরিচয়, মানসিক শক্তি তদ্দ্বারা আপনাকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিতে সক্ষম হইয়া উঠে না। কৃতকৃতার্থ বোধে মানসিক শক্তির যে প্রসন্নতা ও শান্তিলাভ, তাহা কর্ম্মসফলতা পক্ষে একটা বিশেষ পরিচয় স্বরূপ। অতএব যেরূপেই হউক, কোন্ কর্ম্মে সার্থকতা, কিসে অসার্থকতা, সে বিষয়ে একটা নিদর্শন ও নিয়মের অতিশয় আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে।

এই নিয়ম ও নিদর্শন এবং তাহাদের অধিষ্ঠান ভূমিস্বরূপ মানবীয়

প্রকৃতি, এতৎ ত্রয়ের সমষ্টিকেও অন্যতর দর্শনে ধর্ম্ম বলে। নিদর্শনের মূল জ্ঞান; নিয়মের মূল নীতি, প্রকৃতির মূল অদৃষ্ট। জ্ঞান আত্মাজন্য; নীতি দেবতাত্মাজন্য এবং অদৃষ্ট কর্ম্মসূত্রজন্য। এতত্রয়ের সাম্যাবস্থোৎপন্ন যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরমাত্মপদ অভিমুখে তদীয় প্রতি প্রবাহিত হইতেছে; জীব তাহাই কর্ম্মরূপে সম্পাদন করিতে বাধ্য। জ্ঞান হইতে তত্ত্ববোধের উদয় হয়, নীতি হইতে সদসদ্ জ্ঞান জন্মে এবং অদৃষ্ট হইতে কর্ম্ম নির্ব্বাচিত ও কৃত হয়। অতএব ধর্ম্ম যেন মানসিক অঙ্কণ, কর্ম্ম তাহার বহির্বিকাশপ্রাপ্ত চিত্র বা মূর্ত্তিপ্রতিমা স্বরূপ। ধর্ম্ম কূটস্থরূপে কর্ম্মের মূল এবং কারণ উভয়তঃই; তাহার বিকাশ যাহা তাহা কর্ম্মের আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্ব এবং কর্ম্ম যাহা তাহা তদ্বিকাশের আধিভৌতিক প্রতিবিম্ব স্বরূপ, অথবা তদুভয়ে একই পদার্থের উভয় দিক। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বস্তুতঃ দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, একই পদার্থের উহা দুই বিভিন্ন দিক মাত্র। যতটুকু মন হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাকে আধিভৌতিক এবং যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের অতীত, তাহাকেই আধ্যাত্মিক বলা যায়। এখন বোধহয় ইহাও আর বলিবার আবশ্যক অতি অল্পই রহিয়াছে যে, মানবের সমস্ত কর্ম্মজীবনের আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্ব যাহা, অথবা যে মানবের যে আধ্যাত্মিক অংশ কর্ম্মজীবন রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই সেই মানবের ধর্ম্মজীবন রূপে বলা গিয়া থাকে। কর্ম্মজীবনই মানবীয় অস্তিত্বের অপরোক্ষ প্রয়োজন; ধর্ম্মজীবন পরোক্ষ প্রয়োজন। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, মানবের উভয় জীবনের পরস্পর সম্বন্ধে,এ সংসারে যেমন তাহার ভৌতিক জীবনেরই সাক্ষ্যাৎ প্রয়োজন ও উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়া থাকে; তেমনি ইহ সংসারে আগত মানবের পক্ষে ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন, এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে, কর্ম্মজীবনেরই সাক্ষাৎ প্রয়োজন ও উপযোগিতা উপলব্ধ হয়। মানবীয় ভৌতিক জীবন প্রবাহে আত্মা যেরূপ মূল, কারণ এবং অবলম্বন, সকলই; কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে ধর্ম্মজীবনও তদ্রূপ। আত্মার পরিপোষণেই যেরূপ ভৌতিক জীবনের স্বচ্ছন্দতা; সেইরূপ ধর্ম্মের পরিপোষণেই কর্ম্মজীবনের স্বচ্ছন্দতা সাধিত হয়। এরূপেই কেবল ধর্ম্মের খাতিরে ধর্ম্মাচরণ হইতে পারে, ইহাকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিতে পারা যায়

নতুবা আর যত কিছু ধর্ম্মাচরণ সে সকল স্বার্থের খাতিরে, তাহা তস্করবৃত্তি বা ভাঁড়াম!

এক্ষণে আবার একবার প্রতিপন্ন করা যাইতেছে যে, ঈশ্বর আছেন বা না আছেন বলা, খৃষ্টের উপর বরাত দেওয়া বা মহম্মদের দোহাই দেওয়া, উপাসনা করা বা কেবল জ্ঞানানুশীলন করা, অথবা যে কোন দেবতত্বতে আকৃষ্ট হওয়া, ইহারা স্বয়ং প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম নহে; ধর্ম্মের পরোক্ষ অঙ্গস্বরূপ মাত্র। জ্ঞান নীতি ও প্রকৃতি, ইহাদের যে সমষ্টি, যাহা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম; তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করণের নামই ধর্ম্মাচরণ। কেবল ধর্ম্মাচরণে পুরুষার্থ লাভ হয় না; ধর্ম্মাচরণ প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম সফলতা দ্বারাই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। যাহার যেমন ধর্ম্ম; তাহার চলন, বলন, করণ এবং চিন্তন পর্য্যন্ত যে কোন কর্ম্ম, অবিকল তদনুরূপ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাহার যেরূপ কর্ম্ম এবং কর্ম্মজীবন, তাহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনও তদনুসারে পরিচিত হয়। একই উৎস হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, সে সমস্তে প্রকৃতিসাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক নিয়ম স্বরূপ জানিবে।

উপরে যেরূপ ধর্ম্মপদার্থের স্বরূপ আলোচনা করা গেল, তাহাতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক মানব ভেদে যেন ধর্ম্ম ভেদ। ভাল, তাহা যদি হইল, তবে আবার খৃষ্টীয়, মহম্মদীয়, হিন্দু, ইত্যাদি যে সকল জাতীয় ধর্ম্ম দেখা যাইতেছে, তাহারা তবে কি?—কোথা হইতে বা তাহারা আইসে, প্রয়োজনই বা তাহাদের কি? পুনশ্চ, জাতীয় ধর্ম্ম মধ্যে আবার প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধর্ম্মই বা উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও কর্ম্মশালী হয় কেমন করিয়া? দেখা যাউক।

এ সংসারে কোন দুই পদার্থ এক নহে; ঘাসের পাতা ও ক্ষুদ্র কীট হইতে, বৃহৎ জ্যোতিষ্ক পিণ্ড ও শ্রেষ্ঠতম জীব পর্য্যন্ত, কোন দুই ব্যক্তি এক নহে, কোন দুই শ্রেণী এক নহে, কোন দুই জাতি এক নহে, ইত্যাদি। সকলেই পৃথক পৃথক। এই পৃথকত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে, ইহাই অনুভূত হয় যে, প্রত্যেকের দ্বারা প্রতি নূতনত্ব প্রকটন এবং প্রতি নূতনত্বের দ্বারা প্রতি সত্যসাধন বা স্রষ্টার অনন্ত প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রতি পৃথক্ প্রয়োজন পূরণ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন পৃথকত্বের অপর কোন সুব্যাখ্যা

বা সদনুভূতি পাওয়া যায় না। যে অভিপ্রায়ে সর্ব্বজগতে উক্তরূপ পৃথকত্ব সাধক পদার্থের সঞ্চার; সেই অভিপ্রায়েই, প্রতি মানবত্ব পৃথক্ হইয়া থাকে। প্রতিজনে প্রতি নূতন কার্য্য সাধন করিবে বলিয়াই, সকলে এক প্রকারের দেহ, এক মন, এক মতি গতি যুক্ত না হইয়া, প্রতি জনে সর্ব্ব বিষয়ে পৃথক প্রকারের হইয়া জন্মিতেছে। বিশ্বেশ্বরের এবিশ্বকর্ম্ম ক্ষেত্র অনন্ত; অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অনন্ত কর্ম্ম এবং অনন্ত কর্ম্মের অনন্ত পৃথক দিক্ বা ব্যষ্টি। প্রতি পৃথক ব্যষ্টিকে সমষ্টিমুখে সাধন করিয়া লইবার নিমিত্ত, প্রতি পৃথক কর্ম্ম পদার্থ ও কর্ম্মকারক, উভয়েরই প্রয়োজন। কর্ম্ম সাধন জড় ও অজড় সকলেরই দ্বারা হইতেছে; পৃথক এই, জড় যে সে মহাপ্রকৃতির নিয়মে চালিত, অজড় যে সে তদতিরিক্ত আত্মনিয়মে চালিত।

প্রতি মানব যে পৃথক কার্য্য করিবার জন্য সৃষ্ট তাহা, প্রতি মানবে পৃথক কার্য্য সাধক মতি গতি, তন্নিহিত শক্তি ও তৎসমুদয়ের আধার স্বরূপ পৃথক প্রকারের গঠিত শরীর, এ সকলেরও দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে অনুমিত হয়।

প্রতি মানবের দ্বারা যখন পৃথক পৃথক কর্ম্ম সম্পাদন হয়, তখন সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে যে প্রতি মানবের কর্ম্মমূল স্বরূপ ধর্ম্মও পৃথক। কিন্তু তাহা হইলেও, সে মানব সামাজিক ধর্ম্ম, জাতীয় ধর্ম্ম এবং শ্রেণিধর্ম্ম, ইহাদের বহির্ভূত হইতে পারে না। এক সমাজে প্রতি মানব পৃথক প্রকৃতির হইলেও, সমস্ত সামাজিক বর্গের মধ্যে এমন একটা বিষয়-সাধারণ আছে, যদ্দারা তাবত পৃথক প্রকৃতির মানুষ এক সমাজস্থ হইয়া এক প্রকৃতির স্থায় দৃষ্ট হইতে থাকে; যথা দক্ষিণ বঙ্গীয় লোক, পূর্ব্ববঙ্গীয় লোক; বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; উন্নতিশীল, স্থিতিশীল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন বিষয়-সাধারণ রূপ কোন একটি একার্থ বশে এক প্রকৃতির স্থায় দৃষ্ট হইয়া সমাজ; জাতিবিভাগও তদ্রূপ; যথা রুষ, ফরাশি, ভারতীয়, চীন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। তদ্রূপ বিষয়-সাধারণ হেতুই সমস্ত মানব প্রকৃতি আবার অপর-জীব প্রকৃতি হইতে পৃথক ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানবের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় ধর্ম্মাদি সম্বন্ধেও উক্ত কথা বর্ত্তে। কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মগত একার্থ বিশেষ বিশেষের শ্রেণী, পর্য্যায়,

জাতি আদি ভেদে; সামাজিক ও জাতীয় ধর্ম্মাদি ভেদ হইয়া থাকে। সামাজিক ধর্ম্ম, যথা;—প্রোটেষ্টাণ্ট, কাথলিক; শাক্ত, শৈব; ইত্যাদি। জাতীয় ধর্ম্ম, যথা হিন্দুয়ানী, খৃষ্টীয়ানী। খৃষ্টান জাতির মধ্যে কোন একজনকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার প্রথম উত্তর সে খৃষ্টীয়ান; দ্বিতীয় প্রশ্নে হয়ত সে প্রটেষ্টাণ্ট; তৃতীয় প্রশ্নে হয়ত সে মেথডিষ্ট; চতুর্থে মেথডিষ্টের মধ্যেও, তাহার নিজের ভাল হউক মন্দ হউক, এমন একটা মত দেখিতে পাইবে যাহা আর কোন ব্যক্তিতেই দৃষ্ট হয় না। উহাই সে মানুষের স্বীয় বা স্বধর্ম্ম। তাবত ধর্ম্মে ও তাবত মানবেই, এমন কি নাস্তিকতার মধ্যেও, ঐরূপ জাতি গত, সমাজ গত, এবং ব্যক্তি গত ধর্ম্ম বিভাগ ও স্বধর্ম্ম দেখিতে পাইবে।

মানবের ব্যক্তিগত স্বধর্ম্ম যাহা, তাহাই তাহার পক্ষে প্রকৃত প্রকৃতি অনুসারিণী কার্য্য মূল ও কার্য্য প্রবর্ত্তক। সেই অনুসারে কার্য্য করিলেই, সেই কর্ম্ম যথার্থত তাহার শক্তি ও প্রকৃতি অনুরূপ হইয়া, মানব কর্ম্ম সার্থকতা লাভ করিতে পারে; অন্যরূপে পারে না, যেহেতু তাহা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হয় এবং যাহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ তাহা বাহ্য দৃশ্যে যতই ভাল এবং সঙ্গত বলিয়া দৃষ্ট হউক, তাহাতে কখনও হৃদয়ের পূর্ণ আশক্তি ও সাত্তিকতা সংযোজিত হইতে পারে না। যাহাতে হৃদয়তা ও সাত্তিকতা উভয়ের অভাব, দৃশ্যত যতই ভাল দেখাক তথাপি তাহা ভাক্ত এবং অশুদ্ধ;—এই জন্যই এরূপ প্রবাদ, নকল কখনও আসলের সমান হয় না। যেখানে দেখিতেছ অনুকরণ ভিন্ন কোনই উৎকর্ষ বিশেষে তোমার হাত বাড়াইবার সুযোগ ও সাধ্য নাই; সেখানেও অনুকরণ না করিয়া, পার যদি নিজ প্রকৃতিকে এমন উন্নত কর যাহাতে সেপ্রকৃতি সেই বা তাহার সমকক্ষ উৎকর্ষকে প্রাপ্ত হয়; অথবা ভদসম্ভাবে, একেবারেই সে উৎকর্ষ বিশেষকে পরিহার করিয়া, অন্য কোন সাধ্য দিকে স্বশক্তি নিয়োজনে চেষ্টা কর। প্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, অনুকরণ দ্বারা উৎকর্ষ লাভ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; যেমন বিলাত গত বাঙ্গালি সাহেব। এরূপ স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম যাহা, মহা প্রকৃতি অঙ্কে তাহা বিরূপতায় বিনিয়োজিত হয়। সেই জন্যই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥"

মানব স্বধর্ম্মবশে যথাভাবে কর্ম্ম করিলে, তাহা আপনা হইতেই সমাজ ও জাতিতে প্রযুক্ত হইয়া যায় এবং আপনা হইতেই তাহা সামাজিক ও জাতীয় কর্ম্মের সহ সমতা লাভ করে। অতঃপর বোধ হয়, ইহা বলা অতি অল্পই আবশ্যক যে, যখন যে ধর্ম্মেরই ভাল বলিয়া অভ্যুত্থান হউক না কেন এবং সে ভাল ধর্ম্ম যতই চেষ্টা করুক না কেন; তথাপি কথনও তাহা, মানব ভেদে পৃথক স্বধর্ম্ম এবং সমাজ ও জাতি আদি ভেদে পৃথক পৃথক সামাজিক ও জাতীয় ধর্ম্ম, ইত্যাদি পৃথকত্ব ভাব, রদ করিতে পারিবে না এবং নিজেও তদ্রূপ পৃথকৃত্ব ভাববিশিষ্ট হওয়া হইতে অব্যাহতি পাইবে না। 'ভাল' ভেকধারী কোন নূতন ধর্ম্মই যদি মনে কর কোন জাতির মধ্যে সহসা আসিয়া সর্ব্বাঙ্গিন্ প্রচলিত হয়; তাহাহইলেও পরমুহূর্ত্তে দেখিতে পাইবে যে, সেই ভাল ধর্ম্মের মধ্যে ব্যক্তি ভেদে পৃথক স্বধর্ম্ম, সমাজাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ সামাজিকাদি ধর্ম্ম, তথনই আসিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, আশ্চর্য্য কেবল ইহ সংসারে এমন মূর্খদলেরও অস্তিত্ব, যাহারা মনে করে যে তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই যথাবস্থরূপে জগতের গ্রহণীয়! কথিত পৃথকত্ব কেহ ইচ্ছা করিয়া অবলম্বন করে না, উহা মানবের স্বভাবে আসিয়া প্রবর্ত্তিত করে এবং সে স্বভাবও যদৃচ্ছা সংঘটিত হয় নাই। এক্ষণে আরও একবার বলিতেছি, বিশ্বকার্য্যের অনন্ত পৃথক ব্যষ্টি ও সমষ্টি সমূহের পর্ব্ব, পর্য্যায়, শ্রেণী আদি ভেদে; তৎসম্পাদকদিগের মধ্যে ব্যক্তি, দল, সমাজ, জাতি ইত্যাদি ভেদ হয় এবং সেই ভেদ অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের উপযোগী কর্ম্ম প্রবর্ত্তকতা হেতু, ব্যক্তি গত স্বধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, জাতীয় ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা বিভাগে ধর্ম্ম বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

স্বধর্ম্মরত সর্ব্বতোভাবে হইলেই যে কর্ম্ম প্রবর্ত্তকতা ভাল এবং কর্ম্মও ভাল হইবে, এমন কোন কথা নাই। অনেকে স্বধর্ম্মবশে কেবল অপকর্ম্মই করিয়া থাকে; অনেক অসভ্য জাতিকে স্বধর্ম্মবশে কেবলই নৃশংস আচরণ করিতে দেখা যায়। ফলতঃ অপকর্ম্ম, নৃশংস কর্ম্ম, ইত্যাদি রূপ যে যেমন

কর্ম্মের দ্বারা স্রষ্টার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, ফল সে সেই রকমেই প্রাপ্ত হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

প্রবৃত্তি মার্গ স্বরূপ মানবের প্রত্যেক কর্ম্মে ঈশ্বর ফলের যোজনা করিয়াছেন। সেই ফল দ্বিবিধ, আশু ও গৌণ। প্রতি কর্ম্মে এখনি একটা ফলের উৎপত্তি, আর একটা ফল দূর ভবিষ্যতে সংলগ্ন। ফল দুই প্রকারের, এক সুখকর আর এক অসুখকর। সুখকর যাহা, তাহা সুকার্য্যে প্রবর্ত্তক স্বরূপে, আর অসুখকর যাহা তাহা কুকার্য্যে নিবর্ত্তক স্বরূপে নিয়োজিত। পুনশ্চ আশুফল যাহা, তাহা ইন্দ্রিয়গণের পুরস্কার স্বরূপ; আর গৌণ ফল যাহা তাহা কর্ত্তার পুরস্কার স্বরূপ। কিন্তু অজ্ঞান মূঢ় ব্যক্তিরা অনেক সময়ে বা সর্ব্বদাই, সুখকরকে অসুখকর ও অসুখকরকে সুখকর এবং আশুফলকেই মুখ্য ফল জ্ঞান করিয়া, তাহার অযথা উপার্জ্জনে কুকর্ম্ম বিজড়িত হইয়া আত্ম ধ্বংস করিয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারাই স্রষ্টার অর্চ্চনা, অর্চ্চনা করিলেই ফল স্বরূপ পুরস্কার আছে। সে পুরস্কার কর্ম্মের ভাল মন্দ অনুসারে অবশ্যই সু বা কু আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম যে যেমন সাধন করিয়া থাকে, সে সেই রূপেই তাহাতে সুফল বা কুফল পুরস্কার পায়। ঈশ্বরের মহাপ্রকৃতিরূপ শক্তিচক্রে, যেখানে যেরূপ সমধর্ম্মী কর্ম্মশক্তির ঘাত প্রতিঘাত করিবে, সেখানে সেই রূপই ফলের উৎপত্তি হইবে। সে অখণ্ডনীয় নিয়ম সহস্র কান্নাকাটি বা পূজা প্রার্থনা ও উপাসনাতেও বিতথ হইবার নহে। উহাই কর্ম্মফল। জ্ঞানীগণ জ্ঞানের দ্বারা কুকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক, সুকর্ম্মমাত্র সাধন করিয়া, আপনাকে পবিত্র এবং পৃথিবীকেও পবিত্র করিয়া থাকেন।

৩

সর্ব্বতোমুখে উত্তরগামিনী মহাপ্রকৃতি অঙ্কে উত্তর গমন বা উন্নতিই সর্ব্বপদার্থ পক্ষে একমাত্র নিয়ম। বালুকাকণা হইতে জ্যোতিষ্কপিণ্ড, ক্ষুদ্র জীব হইতে মহৎ জীব, আধিভৌতিক সংসার হইতে আধ্যাত্মিক সংসার, সকলেই সেই এক নিয়মের অধীন। সবাই বলিতেছে চল চল; যে দিকে যাও, যে দিকে তাকাও, চল ভিন্ন কথা নাই। যে না চলে সেই মরে, যে

চলে সেই বাঁচে। মানবের ধর্ম্মপদার্থও বলিতেছে চল চল, মানবের কর্ম্ম পদার্থও বলিতেছে চল চল। চলিবই বা কত! গতি যথায় উর্দ্ধমুখে, পথ যথায় অনন্ত, সেখানে আসিয়াছিই বা কতদূর, চলিবই বা কতদূর?

কোথায় হইতেছিল কথা স্বধর্ম্মেও, অপকর্ম্ম, অসম্পূর্ণ কর্ম্ম প্রভৃতির সঞ্চার হয় কেন; না কোথায় আসিল কথা অনন্ত পথে উন্নতির গতি। তাই বলি, বাঙ্গারাম, একি ঘোর উন্মাদনের ঘটা? হউক তাহাই হউক; ভবগহনগত মানবের পক্ষে উন্মাদলীলা কোন্ খানেই বা নয়?

সবাই বলিতেছে ত চল চল, এখন সে 'চল-চলর' পরিচয় কি; কেমনে বুঝিব কিসে 'চল-চল' হয়,—কিসে না হয়? ইংরাজীনবিশ বাঙ্গারাম বলে রেলের গাড়ি, কলের জাহাজে; ইংবঙ্গ বাঙ্গারাম বলে সাহেব সাজায়; ব্রাহ্ম বাঙ্গারাম বলে, সমাজ সংস্কারে; রাজনীতিজ্ঞ বাঙ্গারাম বলে সভা সমিতি ও ইংরাজী বক্তৃতায়; পণ্ডিত বাঙ্গারাম বলে, উদর পূরিয়া ফলার এবং বিদায় প্রাপ্তে, ইত্যাদি। ইংরেজ বলে আমার ইংরেজগিরিতে; চীন বলে আমার আপাদ বিলম্বিত টীকিতে, ইত্যাদি। দারুণ পাগলের হাট বাজার!—কেনা বেচা লাভালাভ সকলই পাগলামী, দারুণ পাগলামী।

'চল-চল,' কোথায় এবং কে বলে? কালের সঙ্গে এবং বলিতেছে কাল। কালের সঙ্গে গতি, তাহারই নাম উন্নতি। কিন্তু কালের সঙ্গে ছুটিয়া চলা, সোজা চলন-শক্তির কর্ম্ম ত নয়; তোমার আমার ন্যায় ক্ষীণ প্রাণিকে সহসা মারা যাইতে হয়। তবে কি না উপযুক্ত মূল্য দিতে পারিলে, এ পথে যান বাহনও মিলে। কালই এ বিশ্বে প্রয়োজনরাশির ভাণ্ডারী। প্রতি পদক্ষেপে প্রয়োজনবিনির্ম্মিত ভিক্ষার ঝুলি খুলিতেছে; যে তাহাতে উপযুক্ত ভিক্ষাদানে ঝুলি পূরণ করিতে পারে, কাল তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যায়; সে পথিকের নিকট পথের কোন কষ্টই নাই। কিন্তু মুস্কিল এই, নিত্য নূতন রকমের ভিক্ষা; যে ঝুলি একবার পূরে আর তাহা বাহির করে না ও যে দ্রব্য একবার পায়, আর তাহা চায় না।

তবে আর তুমি আমি, বনের বুনো, এ দুয়েতে তফাত কি? সেও চলে, তুমিও চল, তাহারও পথের অন্ত নাই, তোমারও পথের অন্ত নাই! হইলে না হয় তুমি তাহা অপেক্ষা অগ্রগামী, হইল না হয় তোমার জ্ঞানকর্ম্ম

তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এ অনন্তপথে অনন্ত মাত্রা সহ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানকর্ম্মও যেমন অসম্পূর্ণ, তোমার জ্ঞানকর্ম্মও তেমনি অসম্পূর্ণ। অতএব তুমি বা নিজেকে রাজগুণ সম্পন্ন ভাবিয়া রাজপাটে বসিতে চাও কি হিসাবে, আর বুনোই বা মুচি বলিয়া তফাতে পড়িয়া থাকে কেন? জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্পূর্ণতা ব্যতীত যদি মোক্ষ না হয়, তবে তুমি আমি বুনো, সকলেই সমভাবে মোক্ষ হইতে এখনও অনেক দূরে! জ্ঞানকর্ম্মের সম্পূর্ণতা এক অনন্তপতি জ্ঞানেশ্বর ভিন্ন কে সাধিতে পারে? তোমার আমার সাধ্য, প্রাপ্ত জ্ঞানের নির্ম্মলতা সাধন পর্য্যন্ত।

কিন্তু মোক্ষ কি?—নিশ্চল, নিষ্কর্ম্ম, নিত্য আনন্দাতিশয্যে অনন্ত গৃহে শয়িত হওয়ার নাম মোক্ষ?—নির্ব্বাণ মুক্তি? বলিতে ভাল; শুনিতে ভাল। কিন্তু নির্ব্বোধ, কোথায় তোমার জন্য তেমন কর্ম্মশূন্য আলস্যের আয়েস্‌খানা সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে; কোথায় জগদ্বিধাতা তোমার জন্য তাহা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন? মনেও করিও না। যেখানে জগদ্বিধাতা স্বয়ং ক্রিয়াবান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রিয়াবান, ক্ষুদ্র মহৎ তাবত জড়াজড় ক্রিয়াবান এবং পরমাণুটি পর্য্যন্ত ক্রিয়াবান; সবাই ক্রিয়াবান; সেখানে এ ঘোর ক্রিয়া ও কর্ম্ম সমুদ্র মধ্যে, কে তোমাকে সেরূপ আলস্যদ্বীপের মায়া মরিচীকা সৃজন করিয়া দিয়াছে! এ ঘোর ক্রিয়া সংসারে, স্বয়ং সংসারাংশ হইয়াও, কেমন করিয়া তুমি নিষ্ক্রিয় থাকিবে; তোমার যুক্তিশক্তিতেই কি ইহা অসম্ভব প্রমাণিত করিয়া দেয় না? কে এ মিছা ভ্রমে তোমার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে? তুমিই বা তাহাতে ভুলিলে কি বলিয়া? নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কর্ম্মে নিত্য নিরতিশয় আনন্দলাভই মোক্ষ, ইহাই তোমার ধারণা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—আনন্দ তুমি অনেক ভোগ করিয়াছ, আনন্দ তুমি অনেক জানিয়াছ, নতুবা আনন্দকে তুমি তোমার চরম পুরুষার্থ স্বরূপ ভাবিবে কেন,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিনা কর্ম্মানুষ্ঠানে, বিনা শক্তিসঞ্চালনে, কি শারিরীক কি মানসিক, কখনও কোন আনন্দ ভোগ করিতে পাইয়াছ কি? সত্য বল দেখি, তোমার আনন্দ বিষয়ে প্রথম বা যে কিছু জ্ঞানোৎপত্তি, তাহা কর্ম্মজনিত কি না? ভাবিতেছ, পরিজনাদি দর্শনে যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহাত কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল নহে। —তাহাও কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত ফল, কর্ম্মবিশেষের আশুফল স্বরূপ না হউক,

গৌণ ফল নিশ্চয়। আনন্দ বিশেষকে কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত ফল স্বরূপে অনুভূত না হইবার পক্ষে আরও একটি ভ্রমের কারণ এই যে, মানব স্বীয় নিগূঢ় প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত কর্ম্মবিশেষকে, কর্ম্মানুষ্ঠানরূপে উপলব্ধ করে না।

কর্ম্মশূন্য, ক্রিয়াশূন্য আনন্দ আর আধার শূন্য আধেয়, অগ্নি শূন্য শিখা, চন্দ্র শূন্য জ্যোৎস্না, এ সকল একই কথা। শ্রমজনিত পুরস্কার, কর্ম্মজনিত পুরস্কার, তদুভয় জনিত পুরস্কার বা তদেক সমষ্টি, এই সকলকেই আনন্দ বলিয়া থাকে; তদতিরিক্তে আনন্দ সম্ভব হইতে পারে না। দুঃখও তদ্বিপরীত, তদন্যতর তদ্রূপ; শ্রম, কর্ম্ম, ইত্যাদির অসদ্ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের সদ্ভাবে আনন্দ, অসদ্ভাবে দুঃখ। যেমন নিরতিশয় আনন্দানুভবের সম্ভবতা আছে, তেমনি নিরতিশয় দুঃখানুভবেরও সম্ভবতা আছে। কর্ম্মরূপ বীজ বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে, ফলরূপ অঙ্কুর শীঘ্র বা বিলম্বে অঙ্কুরিত হয়। তন্মধ্যে যাহা যাহা বিলম্ব বা কালক্রীড়া হেতু লোকান্তরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহাই লোকান্তরে ভোগ্য এবং তাহাই সদসদ্ ভেদে, ইহলোকে সাধারণত স্বর্গ নরকাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অথবা যদ্গতি যৎজ্ঞানাপকর্ষে,—

"মনঃপ্রতিকর স্বর্গঃ নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গ সংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

কর্ম্মাপকর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে স্বর্গনরকেরও উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মসূত্র বা কর্ম্মবেগবশে পুনঃ পুনঃ, কর্ম্মানুরূপ জন্মান্তর অর্থাৎ লোকান্তর, জীব সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেমন জ্ঞানসম্পন্ন, যাহার মতিগতি যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে চাহে এবং যে যেমন কর্ম্মক্ষম. তাহাকে স্বভাবতই সেইরূপ লোক, সেইরূপ জন্ম ও সেইরূপ দেহাদি প্রাপ্ত হইতে হয়। তাহাই যথার্থ কথা, যেহেতু যে শক্তি একবার উচ্ছসিত হয়, নির্দ্দিষ্ট সমাহারসীমার মধ্যে কে তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতে পারে। গতি যথাশক্তি হইবেই, প্রতিকূলতায় কেবল এই মাত্র করিতে সক্ষম যে সেই গতিকে অপথবাহ করিয়া দেয়। অপথবাহিতায় কেবল ক্লিষ্ট বিলম্বতা রূপ পরিণাম উপস্থিত করিয়া থাকে মাত্র; নতুবা তাহাতে উচ্ছসিত শক্তি নষ্ট

হইয়া যায় না, এক সময়ে তাহা সমাহারসীমায় যাইবেই যাইবে। উচ্ছ্বসিত শক্তির এরূপ অবিনাশী বেগ থাকা হেতুই, মানব দারুণ অধঃপাতে পড়িয়াও, সৎস্বৈরেকবশে আবার উর্দ্ধমুখে উত্থান করিতে সমর্থ হয়।

ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, যে কর্ম্ম যেরূপ পবিত্র ও মহান্ হয়, তাহার আনন্দাধিক্য তদ্রূপ বেশী। মানব যে পরিমাণে মহান্ কর্ম্ম সাধন করে, সে সেইরূপ মহা আনন্দ উপভোগ করিতে পারে ও অনুরূপ উচ্চ লোকান্তর সকল প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উত্তরোত্তর কর্ম্মমহত্বে আনন্দসহ মহত্তর লোক সকলে উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমে এমন শ্রেষ্ঠ আনন্দসহ এমন লোকে উন্নত হইতে হইতে অনন্ত মুখে চলিয়া যায়, যেখান হইতে আর পতন নাই এবং যেখানকার ক্রমবর্দ্ধিত আনন্দের ধারণা আমাদের কি—দেবলোকেরও হইতে পারে না। উহাই পরিণাম, উহাই স্বর্গ, উহাই মুক্তি; নতুবা অঘোর আলস্যে কর্ম্মশূন্য নির্ব্বাণ মুক্তি, না যুক্তি না বুদ্ধি, না কিছুতেই স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কর্ম্মভ্রমপথে সসীমতা দায়ক নির্ব্বাণমুক্তির ধারণা, আমাদের অন্তবদ্ধ আধিভৌতিক প্রকৃতি উত্তেজনের ফলে কল্পিত এবং তাহারই সান্ত্বনা হেতু পাত্র বিশেষে আদেশিত। যে সূত্রে মানব অসীম আকাশকে সসীম করিয়া ভাবে, অসীম কালকে সসীম করিয়া গুণে, সেই সূত্রেই অনন্ত কর্ম্ম ও আনন্দ পথকে সসীমতা সহ নির্ব্বাণমুক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। নতুবা প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মেরও অন্ত নাই, আনন্দোৎকর্ষ ও উচ্চ লোকসকলেরও অন্ত নাই। এরূপ না হইলে, লোকে এ অনন্ত জীবনের উপরেও বিরক্তিপূর্ণ হইয়া তাহার ধ্বংস কামনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। কর্ম্মশূন্য আলস্যবানের জীবন কিরূপ ভারভূত, তাহা কর্ম্মশূন্যেরাই ভালরূপে জানে। তাস দাবায় সে ভারের কতকটা লাঘব করিতে যায়; কিন্তু যখন সে উপায়ও শূন্য হয়, তখন তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে প্রকৃতই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যেমন উত্তরোত্তর মহৎকর্ম্ম হেতু মহদানন্দ ও মহৎলোক সকল উপার্জ্জিত হয়; তদ্রূপ ক্রমাধ অপকর্ম্মের দ্বারা আবার বিপরীত দিকে উত্তরোত্তর দুঃখাতিশয্য ও অধমলোক সকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে, এমন অনেক কর্ম্ম আছে যাহাকে, আমরা অপকর্ম্ম বলিয়া

জানি, কিন্তু বুনো যে সে জানে না; তেমন স্থলে কি ব্যবস্থা? সেই জন্য এই মাত্র বলিতেছি যে, প্রতি মানব স্ব সময়ে ও স্বীয় চতুঃপার্শ্বে যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয় তাহা, তাহার উপযোগী ইহলোক পক্ষে ত প্রচুরই বটে, পরন্তু লোকান্তর স্থলেও অল্প বিস্তর অগ্রসর করাইবার পক্ষে তাহা উপযুক্ত। অতএব প্রত্যেক মানবের যে যেমন জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যদি সে প্রচুর পরিমাণে সদ্ব্যবহার করে; তাহা হইলে সে সম্ভবমত লোকান্তরে নিজাবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থা বা উচ্চ লোকে গমন করিতে পারে। কিন্তু সে জ্ঞানালোকের প্রতিকূলগামী হইলে অধমলোক এবং যথাবস্থায় থাকিলে নিজ অবস্থাকেই তাহার পুনঃ প্রাপ্তি হওয়ার কথা। কেবল সভ্যলোকের প্রতি যে এই ব্যবস্থা তাহা নহে, বর্ব্বর বুনোর পক্ষেও সেই একই ব্যবস্থা; সর্ব্বজীবের প্রতিই সেই এক ব্যবস্থা,—নিকৃষ্ট বুনো, নিকৃষ্ট জীবও উচ্চে যাইতে পারে, অধোতে যাইতে পারে, বা যথাবস্থায়ও থাকিতে পারে। তথাপি তুমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ জ্ঞানশীল; সে জ্ঞানশীলতার ফলে তোমার সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, তাহার পক্ষে যাহা উচ্চলোক স্বরূপে আনন্দ-দায়ক হইবে, তোমার নিকটে এখন তাহা অধমলোক স্বরূপ। এ জ্ঞান-কর্ম্মাত্মক 'চল—চল' পথে, তোমাতে আর বুনোতে এই প্রভেদ, এই তফাৎ। এ প্রভেদ ও তফাতের আরও পরিচয়, বুনো তোমার অবস্থা দৃষ্টে স্পৃহাযুক্ত হয় ও স্পৃহাহেতু ক্লেশ পায়; তোমার তাহার অবস্থাদৃষ্টে স্পৃহা হয় না, অধিকন্তু উভয় অবস্থা তুলনে স্বীয় উৎকর্ষতা দৃষ্টে আনন্দানুভব করিয়া থাক। জ্ঞানকর্ম্ম পথে অগ্রগমনের যে লাভ, উহাও তাহার অন্যতর (যদিও সামান্যমাত্রায়) পরিচয়।

স্বচ্ছন্দ অন্ধকারময়ী রজনীর ন্যায়, মানবজীবনও নিবিড় দুঃখময়ী। আনন্দ তাহাতে আলোক রেখা সদৃশ। উৎকর্ষতা হেতু সেই আলোক রেখার বৃদ্ধি এবং তৎপরিমাণ অনুরূপ অন্ধকাররাশির ক্ষয় হয়। ক্রমে আলোক রেখা বর্দ্ধিত হইয়া এমন অবস্থায়ও উপনীত হইতে পারে, যথায় ব্রহ্মলোকের আভাস প্রাপ্তে তাহা নিত্যস্থায়ী হইবার আর পতনাশঙ্কা থাকে না; জীব তখন ক্রমে অবশিষ্ট দুঃখের ক্ষয় করিতে করিতে আনন্দাতিশয্য লাভে অনন্ত সুখে চলিয়া যায়। জ্ঞান ও কর্ম্মোৎকর্ষসহ অগ্রগমন বা উন্নতি পক্ষে, উহা অন্যতর বাঞ্ছিত আবশ্যকতা।

উৎকৃষ্ট আনন্দ ও লোকাত্তর দায়ক যে সকল কর্ম্ম, তাহা কেবল উৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রবর্ত্তনাতেই সম্ভব হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ জ্ঞান ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ কর্ম্মের কখনও সম্ভব হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্ম, এ দুয়ের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, এ উভয় দিকে যদিও অন্ত নাই; সুতরাং অনম্বিতভাবে তাহাদের উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতার পরিমাণ নির্ণয় করা যদিও দুঃসাধ্য; তথাপি আপেক্ষিক ভাবে দেখিতে গেলে, কাহা অপেক্ষা কাহার জ্ঞান ও কর্ম্ম উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করিতে বিশেষ জটিলতার মধ্যে পড়িতে হয় না। ফলতঃ কোন এক আপেক্ষিক ভাব অবলম্বন ব্যতীত; কোন অনন্ত পদার্থকেই আমরা মন মধ্যে অনম্বিত ভাবে ধারণা ও তাহার উপর কার্য্য করিতে পারি না; এই জন্য যে কোন পদার্থ বল, সর্ব্বত্রে এবং সর্ব্বদাই আপেক্ষিকতা বিরাজিত এবং যেখানে যেখানে বস্তুতঃ আপেক্ষিকতা অস্তিত্ব-শূন্য, সেখানে সেখানে আমাদের বোধ ও কার্য্যের জন্য, আপেক্ষিকতা কোন এক মানদণ্ডের দ্বারা কল্পনা করিয়া লই।

জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই অনন্ত। যেমন অল্পজ্ঞানী ও অল্পকর্ম্মা উভয়েই জানে, 'আমার জ্ঞাতব্যের অতিরিক্তে অনেক আছে, আমার কর্ত্তব্যের অতিরিক্তে অনেক আছে'; মহাজ্ঞানী ও মহাকর্ম্মা যে সেও তদ্রূপ জানে। অল্পজ্ঞানীই হউক আর অধিকজ্ঞানীই হউক, যে কেহ ভাবুক বা জ্ঞানী এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত, সেই অনুভব করিয়া থাকে যে, 'আমি কেবল বেলা ভূমিতে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু জ্ঞান মহার্ণব যাহা তাহা পুরোভাগে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।' আমরা সাধারণতঃ অবস্থা এবং ফল, এতদুভয় পরিমাণের দ্বারা আপেক্ষিক ভাবে ঠিক করিয়া লই—এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর, এই কর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর। এ ঠিক করা কিয়দংশে ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু একেবারেই যে ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

সর্ব্বাবস্থা এবং সর্ব্বত্রেই মানবে নিহিত জ্ঞানপদার্থের চতুর্ব্বিধ রূপ। প্রথমতঃ প্রকৃত জ্ঞান, যাহা মানবের উন্নতি পথে আদর্শ স্বরূপ; যাহাকে শিক্ষাদি নানা উপায়ে জানিতে হয় এবং যদনুসারে কর্ম্মাচরণ করিলে উচ্চ পরিণাম সকল প্রাপ্তি হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ স্থিতজ্ঞান, যাহা মানবে

স্বতঃ-উৎপন্নবৎ ও চেষ্টাশূন্যতা সত্ত্বেও স্বভাবত স্থিতস্বরূপ ; যাহার অবলম্বনে মানব, উদ্যমশূন্য, উৎসাহশূন্য ; যখন যে কর্ম্ম যথাবস্থভাবে স্বতঃ উপস্থিত, তখন তাহাকে তথাবস্থভাবে নিষ্পাদন করিয়াই দিন কাটাইয়া দেয়। এতদ্বারা মানব, না উন্নত না অবনত, প্রায় অবিকল স্বীয় অবস্থা বা স্বীয় লোককেই পুনঃ প্রাপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ বিকৃত জ্ঞান ; এতদ্বারা মানব অপকর্ম্ম সকল করিয়া, যে নীচ অবস্থায় আত্ম অবস্থাকে পরিণত করে ; তদ্রূপ নীচ লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, অজ্ঞান, যাহার ফল মানবের উপর স্থূলঅদৃষ্ট-ক্রিয়া ; প্রকৃত এবং স্থিত জ্ঞানের সুপ্তাবস্থাকেই অজ্ঞান বলা যায়। উহা প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা, চর্চ্চার পরিমাণ অনুসারে তিরোহিত হইতে থাকে এবং যত তিরোহিত হয়, ততই অদৃষ্টক্রিড়ার স্থূলতা হ্রাস হইবায়, মানব দেবত্বপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যথায় তাহা হইতে পায় না, তথায় অদৃষ্ট ক্রমাগতই মানবকে ক্রিড়নক স্বরূপে পরিণত করিয়া দুঃখ দেয় এবং স্থিতজ্ঞান ও বিকৃতজ্ঞান এতদুভয়ের স্থায়িত্ব ও পরিবর্দ্ধন পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। অথবা বিকৃত জ্ঞান এবং অংশত স্থিতজ্ঞানও অজ্ঞানেরই রূপান্তর বিশেষ মাত্র এবং তদঙ্গগত ভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অজ্ঞান যাহা তাহা অদৃষ্ট জনিত, বিকৃতজ্ঞান ও স্থিতজ্ঞান যাহা তাহা অজ্ঞান আশ্রয়ে মানবের আত্মদোষ জনিত এবং প্রকৃত জ্ঞান যাহা তাহা জীবের পুরুষকার হেতু জীবপ্রতি ঈশ্বরের করুণাজনিত। প্রকৃত জ্ঞানের অনুশরণ দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং অজ্ঞান নষ্ট হইলে, আশ্রয় অভাবে বিকৃতজ্ঞান ও যথাস্থিত জ্ঞান সহজেই আপনা হইতে নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আবার এমন হতভাগ্যও অনেক আছে, যাহাদের তাহা হয় না ; তত্ত্বজ্ঞানাদি লাভ হইলেও, বিকৃতজ্ঞান ও স্থিতজ্ঞানের মোহ তাহারা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, অপকর্ম্মের দ্বারা আত্ম অবনতি সাধন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে প্রকৃতজ্ঞান বিষয়ে চিনিরবলদ বলিলেও চলে।

প্রচারিত প্রকৃতজ্ঞানের চূড়ান্ত অংশকে সাধারণতঃ ঈশ্বরবাক্য বা আপ্তবাক্য বলা যায়। দেশ কাল পাত্র অনুসারে সর্ব্বত্রেই অনুরূপ আপ্ত-বাক্যের প্রচার আছে। মনুষ্য সঙ্ঘের মধ্যে চিরন্তিমুখী মনিষীগণ যোগযুক্ত চিত্ত হইয়া যে জ্ঞানকে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই সাধারণত দূরদর্শন,

নানাবিদ্যাবিষয়িনী তত্ত্বাবিষ্করণ, তত্ত্ববিদ্যা এবং তাহা যখন তৎকালোচিত চূড়ান্ত সীমায় পৌছে, তাহাই ধর্ম্মতত্ত্ব, আপ্তবাক্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। মানব যে অবস্থাপর্য্যায়ে, যতদূর উন্নত তত্ত্বগ্রহণে পটু, এবং যে পরিমাণে যোগাবলম্বনে সক্ষম, তাহারা তদনুরূপ জ্ঞানকেই দৃষ্ট করিয়া থাকে। এই জ্ঞান সর্ব্বদাই উত্তরদর্শিনী; এ নিমিত্ত, উত্তরদৃষ্টির সীমান্ত মধ্যস্থিত কি আগত কি অনাগত, তাবত মানবের পক্ষেই, উহা সর্ব্বদা অর্চ্চনীয়, সর্ব্বদাই আদর্শস্থলীয়। তাহাকে আদর্শ করিয়া, সেই জ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া, স্বীয় জ্ঞানকে তদ্দ্বারা আলোকিত ও স্বীয় আত্মিক শক্তিকে তদ্বারা উত্তেজিত পূর্ব্বক কর্ম্মরত হইলেই, মানব যথোপযুক্ত শ্রেয় ও পুরুষার্থলাভে সমর্থ হইতে পারে।

মনুষ্যমণ্ডলে আপ্তবাক্যের প্রচার প্রকৃতই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত, প্রকৃতই তিনি বৈষ্ণবীমায়া যোগে অবতারবৎ প্রতীয়মান হইয়া, ইহসংসারে সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে আপ্তবাক্য প্রচার করিয়া থাকেন। যখন যখন পৃথিবীতে বিকৃতজ্ঞানের সঞ্চার, যখন যখন সাধুগণ তদ্দ্বারা উৎপীড়িত, যখন যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য সারশূন্য হওয়ায় নূতন বাক্য প্রচারের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়; তখনই তিনি নানা উপায়ে পুনর্ব্বার জগতে সত্যধর্ম্ম প্রচারের উপায় পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন;—

> "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, চৈতন্য, ইহারা সকলেই তাঁহার অবতার; অথবা অবতার বলিয়াই বা বলি কেন,—তিনিই সর্ব্বময় ও সর্ব্ব, সুতরাং তিনি স্বয়ং।

যে জাতি যেরূপ, যাহার মানসিক ধারণাশক্তি যেরূপ, যে যেরূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম; যাহার কর্ম্মভূমি যেরূপ ও যাহার কর্ম্ম যেরূপ; তাহার জন্য তেমনি শিক্ষক, তেমনি শিক্ষা ও তদুপযোগী আপ্তবাক্যই প্রচার হইয়া থাকে। যুক্তিযোগেও উহা সিদ্ধ এবং ঐরূপই হওয়া উচিত। বেদসূক্তকে বৈদিকযণ্ডা মক্ষমূলর ও এদেশীয় অনেক যণ্ডবিজ্ঞতেও, কাব্য, কৃষকের গীত, ইত্যাদিরূপে বুঝিয়া থাকে; সেই ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করে এবং না বুঝিলে

বাবার ছলে কাওয়ার স্তায় ঝগড়াও করে! অথচ বেদপুরুষ, বেদ কি, সম্বন্ধে স্বয়ং বলিতেছেন ;—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥”

ঋঃ সং ১। ১৬৪।

ঋষিগণ তাঁত বুনিতে বুনিতে, গরু চরাইতে চরাইতে, ঋকৃসূক্তরূপ মেটো গান বাঁধিয়া, তাস দাবা বা ব্যাডমিণ্টনের অভাব পূরণ করেন নাই। এক এক জন ঋষি প্রকৃত যোগস্থ হইয়াই এক এক সূক্ত দর্শন করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহাদিগের নিকট এবং আমাদিগের নিকট পর্য্যন্তেও, অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গের আধার স্বরূপ। তাই এত যত্নে রক্ষিত যে, এ দূর কালেও, লুপ্ত না হইয়া, বিকৃত না হইয়া, অক্ষুণ্ণবৎ আগত হইয়া আসিয়াছে; কালে ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। সত্য অর্থাৎ জ্ঞান একবার প্রচারিত হইলে, আর তাহার ধ্বংস নাই; কালের তথায় ক্ষমতা নাই। সত্যতা পক্ষে কালপরাজয় তুল্য অখণ্ডনীয় প্রমাণ আর কিছুই নাই। এটা নিশ্চয় জানিও, কোন দেশের কোন আপ্তবাক্যরূপ মাননীয় পদার্থই, গরু চরাইতে চরাইতে তাঁত বুনিতে বুনিতে বাহির হয় নাই। নিবিড় ভক্তিসমন্বিত নিগূঢ় যোগাবেশ হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এ কথার অর্থ যোগ ভক্তি উভয়শূন্য যে, সে বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আপ্তবাক্যের দ্রষ্টৃত্ব সম্বন্ধে সে হয় ত বড় জোর এই পর্য্যন্ত বলিবে যে, আপ্তবাক্যের দ্রষ্টা যাহারা তাহারা না হয় একটু বেশী ভাবুক এবং আপ্তবাক্য তাহা হইলে বিষটা কি?—এক একজন ভাবুকের সামান্য ভাবনা কণ মাত্র! কিন্তু তাহা হইলেও, সেই একটু বেশী ভাবুকতার তফাতেও ত অনেক যায় আসে।

যে যাহা নিজে কখনও প্রত্যক্ষ বা অনুভব করে নাই, সে তাহা বুঝিতে পারে না। যে নাস্তিক, সে দেবভক্তিতে কত সুখ কত শান্তি তাহা অনুভব করিতে পারে না। যে সামান্য ভক্ত, সে নিগূঢ় ভক্তের অবস্থা ও বিভূতি অনুভব অথবা অনুমানও করিতে পারে না। পুনশ্চ নিগূঢ় ভক্ত যে, সে ভগবানের অবস্থা ও বিভূতি অনুভব ও অনুমান করিতে পারে না।

অতঃপর তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যে ঈশ্বরসত্ত্বা সহজ সাধ্যভাবে সাক্ষাৎরূপে নিত্য অনুভব করিয়া থাকে, সামান্য ভক্তের নিকটে তাহা উপন্যাসের এবং নাস্তিকের নিকট তাহা উপহাসের বিষয়। যে মানব যে পরিমাণে আত্ম সমর্পণে অপটু, সে সেই পরিমাণে, কি অন্তঃ কি বহিঃ, তাবত সম্বন্ধেই, কেবল মাত্র আত্মপ্রকৃতিকে উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং সে কেমন করিয়া অপর অবস্থা ও বিভূতি অনুভব করিবে। অনুমানও তাহার তদ্রূপ সসীমতাযুক্ত। যাহার কেবল মুড়ী মুড়কী যাচিতে দিন যায়, রাজ-বিভূতি সম্বন্ধে তাহার ঊর্দ্ধ সংখ্যায় এই ধারণা যে, রাজা হইলে রাজ হওয়ার প্রধান সুখ অপরিমিত মুড়ী মুড়কী খাইতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে এ যুগের যুগধর্ম্মে, বেদাদি সেই সূত্রেই কৃষকের গীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! মহাযোগে প্রত্যক্ষবৎ যে ঈশ্বর সাযুজ্য প্রাপ্তি এবং ঈশ্বরাদেশ শ্রুত হওয়া যায়; অযোগী যে এবং আরও নিম্নে যোগের উপহাসকারী যে, সে কেমন করিয়া তাহা অনুভব করিয়া উঠিবে—তাহার ইন্দ্রিয় যাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, বুদ্ধি যাহাকে অনুমানের সীমায় আনিতে পারে না এবং মন যেখানে অনুধাবনে অক্ষম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়? সাধারণ বিদ্যাবিষয়িনী তত্ত্ব ও আপ্তবাক্য, উভয়ই ভাবুকের দ্বারা প্রকাশিত হয় ইহা, কথা এবং দৃষ্য, উভয়ত সত্য বটে; তথাপি সাধারণ বিদ্যাবিষয়িনী তত্ত্বাবিষ্কারকের খ্যাতি দুই দিনের জন্য ও সম্মানও তাহার সম্পূর্ণ:ই মান-বীয়রূপে। কিন্তু আপ্তবাক্যের আবিষ্কারক যে, তাহার খ্যাতি দিব্যরূপে ও যাবচ্চন্দ্র দিবাকর পরিমিত কালের জন্য। দুই দিন ও যাবচ্চন্দ্র দিবাকর পরিমিত কালে যে তফাত, বিদ্যাতত্ত্ব আবিষ্কারক ও আপ্তবাক্যের আবি-ষ্কারক এ উভয়েরও সেই তফাত। পুষ্করিণীও জলাশয়, সমুদ্রও জলাশয়। অথবা বৃহত্তম নদীস্রোত আর বাঁশবনে প্রবাহিত জলের ধারা, বিষয়ত উভয়েই এক!

এই আপ্তবাক্য সমষ্টিই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতিতে ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে গণিত হইয়া থাকে। প্রতি বিভিন্ন জাতির প্রকৃতি ভেদে উহা পৃথক পৃথক যথায় যথায় বহুজাতি একত্র করিয়া এক ধর্ম্মশাস্ত্র, সেখানেও অন্তত প্রতি-জাতিভেদে পৃথকরূপ অর্থগ্রহণ, প্রয়োগ আদির প্রভেদ, ইত্যাদি নানারূপ

র্থক্য সৃষ্টি হইবে এবং সে সকল পার্থক্য আবার এতই স্পষ্ট যে, দেশভেদে ন পৃথক ধর্ম্মশাস্ত্র ভেদরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। এ সকল র্থক্য ও তাহার কারণাদি বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেই একবার যথাসম্ভব না হইয়াছে!

অন্যান্য শাস্ত্র সকল হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র কতই প্রভেদ। অন্য কোন কার শাস্ত্রকেই, বিনা পরিবর্ত্তনে, বিনা উন্নতি গ্রহণে, একাদিক্রমে কখনও ইশত বর্ষ কালও স্বভাবে স্থায়ী হইতে দেখা যায় না; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ম্বন্ধে এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র এমন কি, ঐতিহাসিক মাণ অনুরূপ, চারিহাজার বর্ষ পর্য্যন্ত, একাদিক্রমে একভাবে লোক কলকে ধর্ম্মশাসনে শাসিত ও মনুষ্যত্ব পথে সুশিক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। হা দ্বারাও স্পষ্টত প্রমাণ হয়, কি অধিক পরিমাণেই অনাগত সত্য ও ানরাশি আপ্তবাক্য মধ্যে নিহিত থাকে যে, মানব চারি হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত নুগমন করিয়াও, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই! এটা নিশ্চয় ানিও, অপদার্থ বা বিগত পদার্থকে কেহ কখন অনুগমন করে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রও সময়ে বাতিল ও অর্থশূন্য হইয়া যাওয়ার কথা বা যায়। ব ধর্ম্মে যে পরিমাণে সত্য ও জ্ঞান নিহিত থাকে, তাহার স্থিতি কাল সেই পর্য্যন্ত। অথবা অসীমকালবাহী উন্নতিগ্রাহী মানব বংশের চালক রূপ যে অসীম জ্ঞানদেহ, তাহা কখনই এককালে একশাস্ত্র মধ্যে, চিরকালের তরে ও সম্পূর্ণত কেহ কখন আবদ্ধ করিয়া দিতে পারে না। ানব মহাযোগী হইলেও, মানবীয় ক্ষুদ্রতা তাহাকে এলোকে একেবারে রিত্যাগ করে না এবং ভাষা বহু সংস্কৃত হইলেও, তথাপি দিব্য গুহ্য বিষয় প্রকটিত করণ সম্বন্ধে তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় না। তাহার পর উৎসোত্থিত ধারা পরিষ্কার হইলেও, পথের গুণে পঙ্কিলতা পায় এবং াঙ্কিলতায় ক্রম সঙ্কীর্ণতা পাইয়া কিছুদূর আসিয়া হয় ত লোপ প্রাপ্তই হয়। সেইরূপ মানবীয় ক্ষুদ্রতা ও ভাষার অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া যত পরিমাণে ও যে পর্য্যন্ত জ্ঞানদেহ প্রদর্শক আপ্তবাক্য প্রচার হইতে পারে, তাহাই মাত্র প্রচারিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে যে কিছু মানবীয়ত্ব ও অনতি দীর্ঘস্থায়িত্ব ষ্ট হয় তাহা, স্রোতধারার পথগুণ স্বরূপ, প্রকটকারী মানবীয়রূপ দ্বারের

গুণ হইতে সংঘটিত হয়। সুতরাং আপ্তবাক্য মধ্যে যাহা কিছু স্বর্গীয় তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরবাক্য ও জ্ঞান এবং যাহা কিছু মানবীয়, তাহা মানবীয় দোষে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। মানববংশ উন্নতিপথে উত্তর গমন করিতে করিতে, ক্রমে যখন আসিয়া আপ্তবাক্য নিহিত জ্ঞানসীমাকে অতিক্রম করে এবং নূতন জ্ঞানের অভাব যখন নানারূপে অনুভব করিতে থাকে; তখন আবার নূতন আপ্তবাক্য প্রচারের আবশ্যকতা উপস্থিত হয় এবং এ নিমিত্তই,

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

নারায়ণ এরূপ উক্তি করিয়াছেন। এরূপ ঘটনা এ পৃথিবীতে সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। ইতিহাসের দ্বারাতেও জানা যায় যে, এরূপে এ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রের উদয় ও বিলয় হইয়া গিয়াছে। যে পর্য্যন্ত মানবীয় দ্বার ভিন্ন আপ্তবাক্য প্রকাশের অন্য উপায় না হইবে, সে পর্য্যন্ত এমন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র, যাহা চিরকালবাহী, তাহার উদ্ভব হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া জানিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল যখন পুরাতন হইয়া অর্থশূন্য হয়, তখন তাহা বীতশ্রদ্ধায় পড়িয়া আপনাপনিই বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ হইতে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাহা, তাহাই সাধারণ বর্ণিত জাতীয় ধর্ম্ম এবং তাহার আবার বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থাপত্তি হইতে প্রবর্ত্তিত যে সকল ধর্ম্ম, তাহাদিগকেই সমাজ, শ্রেণী ইত্যাদির অবলম্বনীয় ধর্ম্ম বলিয়া থাকে যেমন শিয়া, সুন্নি; শাক্ত, বৈষ্ণব; আবার বৈষ্ণবের মধ্যে বিবিধ সম্প্রদায় ইত্যাদি।

শ্রেণী, সমাজ, জাতি প্রভৃতির অবলম্বিত ধর্ম্ম, প্রতি মানব কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত কর্ম্মের কেবল শ্রেণী পর্য্যায় জাতিত্ব আদি রক্ষা করে মাত্র; নতুবা প্রকৃত কর্ম্ম বিশেষের নিষ্পাদন যাহা, তাহা মানবের স্বীয় স্বধর্ম্ম হইতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব মানবের প্রথম দৃষ্টিথাকা চাই স্বধর্ম্মের প্রতি। এক্ষণে সেই স্বধর্ম্মের বিষয় আগে আলোচনা করা যাউক।

৪

স্বধর্ম্ম যতক্ষণ অজ্ঞান জড়িত থাকে, ততক্ষণ তাহাহইতে অপকর্ম্ম, অস-
[illegible] আদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। অজ্ঞান দ্বিবিধরূপে মানবকে আচ্ছন্ন করিয়া
[illegible]কে, এক মানবীয় বংশবাহী, অপর প্রতি মানবীয় জীবনবাহী। বংশবাহী
[illegible], তাহা জাতীয় ধর্ম্মদ্বারা বিদূরিত হওয়ার নিয়ম এবং প্রতিজীবনবাহী
[illegible] তাহা স্বধর্ম্ম সংস্কারেরদ্বারা বিদূরিত হওয়ার কথা। এখানে, এই স্বধর্ম্ম
[illegible]লোচনাস্থলে, অবশ্যই প্রতিজীবনবাহী স্বধর্ম্ম মোহক অজ্ঞানের কথাই
[illegible] যাইতেছে।

সুকর্ম্ম, সম্পূর্ণ কর্ম্ম প্রভৃতি স্বধর্ম্মদ্বারা প্রবর্ত্তিত করাইতে হইলে, স্বধর্ম্মকে
[illegible]নেরদ্বারা সুমার্জ্জিত করা আবশ্যক। সুতরাং ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে,
[illegible]বকে আপনাপনি উচ্চলোকের জন্য সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইতে হয় এবং
[illegible]পনার মুক্তির পথ আপনাকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সে কাজ
[illegible]নও বরাতে হয় না, যা চোরকে ঘা কয়েক বিনামা প্রহার করিলেই সে
[illegible] হয় না, বা চামারকে পরিষ্কার করিয়া রাজাসনে বসাইলেও সে রাজা হয়
[illegible]। মানব ইহলোকে থাকিয়া হউক বা লোকান্তরে থাকিয়াই হউক, যতদিন
[illegible]নেরদ্বারা আত্মোন্নতি ও কর্ম্মেরদ্বারা আত্মসার্থকতা সাধন করিতে সক্ষম না
[illegible]বে, ততদিন সে কখনই উচ্চলোক সকল, এবং এমন উচ্চলোক সকল,
[illegible]ধিকার করিতে সক্ষম হইবে না, যেখানে গমন করিলে কৃতার্থ হওয়া যায় এবং
[illegible]খান হইতে আর অধঃপতনের আশঙ্কা কখনও থাকে না।

জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, যাহার সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি,
[illegible]তীয় ধর্ম্মও যেরূপ তৎসমষ্টি, স্বধর্ম্মও তদ্রূপ তৎসমষ্টি। মানবে সেই তিনের
[illegible]মিলিত ভাব যাহা, তাহাকে বাক্‌সুগমের নিমিত্ত এখানে মনুষ্যের 'স্বভাব'
[illegible]লিয়া অভিহিত করা যাউক। ফলতঃ উহাকেই সাধারণ বর্ণিত মানবীয়
[illegible]ভাবও' বলা যায়। স্বভাবশূন্য মানব হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মশূন্যও
[illegible]নব হইতে পারে না। জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতির প্রত্যেককে বিশ্লেষণ করিলে
[illegible] সমস্ত বৃত্তি সকলের দেখা পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বমানবেই যথাবশ্যকরূপে
[illegible]হিত আছে এবং কেবল নিহিত নহে, যতদূর উন্নতিগ্রহণে মানব পটু, সে
[illegible]তি গ্রহণশক্তিও তাহাদের মধ্যে সন্নিবেশিত করা রহিয়াছে। বালুকাবৎ

বীজকণায় বৃহৎ অশ্বথ নিহিতবৎ, তাবৎ ভবিষ্যৎ ও ভাবী বৃত্তিপরিণাম মানবীয় মনে নিহিত; এক বংশবাহীরূপে যুগযুগান্তে, অপর ব্যক্তিবাহীরূপে জন্মজন্মান্তরে প্রকটিত ও পরিণত হইতে থাকে। যে যেমন উন্নতি পর্য্যায়ে আসিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহাতে বা বৃত্তি সমস্ত বা বৃত্তি বিশেষ সুপ্ত বা জাগরিত রূপে দৃষ্ট হয়। বৃত্তি সমস্ত বা তাহাদের যে কোন সমষ্টি, যখন যেমন সমবায়ী কারণ যোগে যেমন জাগরিত ও স্ফুরিত হইতে থাকে, তখন তদনুসারে মানবের সেই পরিমণে উন্নতি বলা যায়। বৃত্তি সকলের স্ফুরণ জনিত বা স্বভাবজ উন্নতি, দ্বিবিধরূপে বর্ত্তে এবং লক্ষ্যস্থলীয় হয়। এক জাতি বা মানবীয় বংশ প্রতি, অপর ব্যক্তি বা আত্ম প্রতি। সমষ্টি ব্যষ্টি নিয়ম সর্ব্বত্রেই সমান সুরক্ষিত! ব্যক্তিগত উন্নতি জাতিতে সংমিলিত হইয়া জাতির পুষ্টতা সাধন করে, আবার জাতিগত উন্নতি পর পর বিশ্বে সংমিলিত হইয়া বিশ্বের পুষ্টতা সাধন করে।

ব্যক্তিগত উন্নতি লোকান্তরবাহী, এজন্য তাহার অত্যুন্নত ভাব যাহা তাহা সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বংশবাহী উন্নতি যাহা তাহা সর্ব্বদাই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তদ্দ্বারাই আমরা দেখিতে পাই যে, স্বভাবজ উন্নতি কি সামান্য আরম্ভ হইতে কি বিশালতাই ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি ক্রিয়া দৃষ্টান্তে তাহা দেখান যাউক। দেখ, যে ইষ্টিম এঞ্জিন আজিকে এমন অদ্ভুত ক্রিয়া সকল সাধন করিতেছে, উহার প্রাথমিক বীজ নিশ্চয়ই সেই আদি মানবের মনে নিহিত ছিল এবং যে মানব সর্ব্ব প্রথমে স্বহস্তে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সেই এষ্টিম ইঞ্জিন নির্ম্মাণের মুখ্যত প্রথম সূত্রপাত করিয়া যায়; তথা হইতে ক্রম পরম্পরা সমবায়ী কারণ যোগে স্ফুরিত হইয়া, আজিকে এষ্টিম ইঞ্জিনে পরিণত হইয়া এরূপ অদ্ভুত কার্য্য সকল সাধন করিতেছে। যে যে বিদ্যার বলে আকাশ মাপিতেছে, পৃথিবী তোলপাড় করিতেছে, তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা বর্ত্তে। এক কথায় মনুষ্য স্বীয় সাধ্যে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিতে পারিয়াছে এবং তাহার মনের প্রশস্ততা, বুদ্ধির বিকাশ এবং অভিজ্ঞতা আদি সম্বন্ধেও, অবিকল উক্ত কথা বর্ত্তে; ফলত যে কোন পদার্থ মনের দ্বার দিয়া প্রকটিত হয়, তাহারই সম্বন্ধে উক্ত কথা বর্ত্তে। এ সমস্তই বিবর্ত্ত নিয়মের ফল। এ সংসারই

বিবর্ত্ত নিয়মের অধীন, বিবর্ত্ত নিয়মে প্রসূত ও বর্দ্ধিত; সুতরাং মানবের অন্তঃ বহিঃ ক্রিয়াক্ষেত্রও এতন্নিয়মের বহির্ভূত নহে। মানবীয় ধর্ম্মও বিবর্ত্ত নিয়মাধীন; উহাও তদ্বশে আদি মানবের অস্ফুট ধর্ম্মধারণা হইতে, বর্ত্তমান মানবের অত্যুন্নত ধর্ম্ম ধারণায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, সে কথা পরে হইবে।

মানব ব্যষ্টিরূপে বিবর্ত্ত নিয়মাধীনে লোকান্তরবাহী আত্মোন্নতি করিয়া থাকে এবং সমষ্টিরূপে তদধীনে কালান্তরবাহী বংশোন্নতি সাধন করে। এই বংশোন্নতি সহজ কথায় সামাজিক উন্নতি বা জাগতিক উন্নতি। উহাকে সংক্ষেপে সামাজিক উন্নতিই বলা যাউক। ইহলোকে আগত মানবের পক্ষে সমাজই একমাত্র আশ্রয়স্থল; তাহারই অঙ্কে, তদাশ্রয়ে ও তদীয় যত্নে মানব জীবিত থাকিতে ও বর্দ্ধিত হইতে সমর্থ হয় এবং তাহাকে যেমন উন্নত দেখে, নিজেও উন্নতি গ্রহণের নিমিত্ত সেইরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। যে যেমন সমাজে জন্মে, সে সেই রকমের মানুষ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা ও নিত্য প্রত্যক্ষ স্থলীয়। যে যেমন কর্ম্মফল ভোগার্থে যেরূপ হইয়া জন্মিবে, সে সেইরূপ শরীর, সেইরূপ পিতা মাতা, সেইরূপ সমাজ আদি প্রাপ্ত হয়, ইহা হিন্দুশাস্ত্রসমূহের নিত্য ঘোষণা। অতএব সামাজিক অবস্থার উপর যখন দেখাইতেছে যে, ব্যক্তিগত অবস্থা নির্ম্মাণ-বিষয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তখন সামাজিক উন্নতিই আগে মানবের লক্ষ্যস্থলীয় হওয়া উচিত; আত্মোন্নতি পরে।

বাঞ্ছারাম, এখানে বলিতে পার যে, হইল যেন ব্যক্তিগত অবস্থা নির্ম্মাণ পক্ষে সমাজ লীলাভূমি সদৃশ; কিন্তু তাহাতে আমার পক্ষে কি? আমিত যাহা জন্মিবার তাহা জন্মিয়া বসিয়াছি, যাহা হইবার তাহা হইয়া বসিয়াছি; এখন হইতে সমাজ ভাল হইতে থাকুক বা মন্দ হইতে থাকুক, তাহাতে আমার আসে যায় কি? এখন হইতে সমাজে যাহা কিছু ভাল মন্দ ঘটিতে থাকিবে, তাহা উত্তর পুরুষের উপর বর্ত্তিবে এ কথা মানি, কিন্তু উত্তর পুরুষের সহ আমার সম্বন্ধ?

সত্য বটে, কিন্তু সকল পূর্ব্বপুরুষেই যদি ঐরূপ ভাবিত তাহাহইলে আজি তুমি আর বাঞ্ছারাম হইয়া, এ নানা ঐশ্বর্য্য লইয়া, এজগতে জন্মাইতে

পারিতে না। আজিও তোমাকে সেই আদিম গাছতলা সার করিয়া, পশুবৎ বেড়াইতে হইত। বিশেষত যাহার অবলম্বনে, যত্নে, আশ্রয়ে ও ব্যয়ে বহ্বারাম হইতে পারিয়াছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বলিয়াওত একটা পদার্থ আছে। তাহার পর তোমার জীবিত কালেই সমাজ ভাল বা মন্দ দাঁড়াইলে, তাহাতে বা তোমার এড়ান কোথায়? অথবা সমাজের জন্য খাটিব ও তাহার উন্নতিকল্পে যত্ন করিব, এ ভাব এ বৃত্তি তোমাকেত নূতন স্বজন করিয়া লইতে হইতেছে না। তোমাতেই তাহা আছে, ঈশ্বর তোমাতে তাহা নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তোমাকে কেবল তাহা স্ফুরিত ও বৰ্দ্ধিত করিয়া লইতে হইবে মাত্র; তাহাহইলে তোমার, সামাজিক উন্নতিকল্পে চেষ্টা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তোমার সেই বৃত্তি আছে বলিয়াই তোমার পরিবার, তোমার পুত্র, ইহাদের জন্ম ভাবিয়া থাক; না খাইয়াও ইহাদের ভবিষ্যত উপায় করিয়া থাক। সেই বিধাতৃ সূত্রে ত তাহা কর বটে, কিন্তু কর তাহা তোমার বোকামি বুদ্ধিতে কি ভাবিয়া ও কি বলিয়া?—আপনার জন বলিয়া? আপনার পদার্থটা কি? তোমার পুত্র হইতে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র পর, কিন্তু পাড়ার লোকের তুলনে?—আপনার! তেমনি পাড়ার লোক অপর পাড়ায় তুলনে?—আপনার! তেমনি নিজের গ্রাম অপর গ্রামের তুলনে?—আপনার! তেমনি নিজের দেশ অপর দেশের তুলনে?—আপনার! নিজের পৃথিবী অপর পৃথিবীর তুলনে?—আপনার! অতএব 'আপনার' এবং 'পর' এ দুই শব্দ কেবল মায়া ও মোহের খেলা মাত্র। তুমি পুত্রাদিকে আপনার ভাবিয়া খুন হও, কিন্তু দেখিয়াছ কি, এমনও অনেক লোক আছে যে যাহার আপনার বিষয়িনী বুদ্ধি তোমারই ন্যায় সমান সঙ্কীর্ণ; অথচ স্ত্রী-পুত্রের জন্ম না ভাবিয়া অপরের উপায় জন্ম ভাবিয়া খুন হয়; সুতরাং কেমন করিয়া 'আপনার' বুদ্ধিকে মায়া ও মোহখেলা না বলিব। তোমার এ অনন্ত গম্যপথে, কি অধঃপাতে কি ঊৰ্দ্ধমুখে, কেহই যখন গমনসঙ্গী বা সহকারী নয়, তখন কেমন করিয়া কাহাকে আপনার বলিব। বরং জগত আপনার, কারণ যাই সে আমার জন্ম এরূপ স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, তাই এরূপ হইতে পারিয়াছি; নতুবা আমার দশা কি হইত? ভাল, যদি কেবল আপনার জন মাত্রই বুঝিয়া থাক ও আর কিছু না বুঝ, তাহা

হইলে সেই আপনার জনের খাতিরেও জগতের প্রতি কর্ত্তব্যাবলম্বন করা উচিত; যেহেতু জগতের কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন, সে আপনার জন কথনই মনোমত বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

তাই বলিয়া নিজ পরিজনের জন্য নিগূঢ় ভাবনা ভাবিতে ও তাহাদের উপায় চিন্তা করিতে তোমাকে মানা করি না। সংসার শুদ্ধই 'আপনার,' আবার সংসার শুদ্ধই 'পর।' 'আপনার' আপেক্ষিক বিষয়। যাহারা তোমার সন্নিকটে স্থাপিত, তাহারা নিকট 'আপনার;' তদ্ভিন্ন আর সমস্ত দূর 'আপনার।' দূর 'আপনার' আছে বলিয়াই, নিকট 'আপনার' সম্ভব হয়। সকল বিষয়েতেই বিশেষ এবং সাধারণ আছে এবং তদুভয়, উভয় সাপেক্ষ। বিশেষ কেবল সাধারণের ঘনিকৃত কেন্দ্রিভূত মূর্ত্তিমাত্র। বিশেষে বিশেষ কর্ত্তব্য, সাধারণে সাধারণ কর্ত্তব্য। কিন্তু নিকট 'আপনার' রূপ বিশেষ বিষয়ে, বিশেষ কর্ত্তব্য উঠে কোথা হইতে?—যেহেতু, সাধারণ কর্ত্তব্যের অতিরিক্তে, সাধারণ অংশরূপ বিশেষকে সাধারণার্থে সংরক্ষণ, সংবর্দ্ধন ও প্রস্তুত করনার্থে, তুমি বিশেষরূপে নিয়োজিত এবং তদর্থে সে বিশেষরূপে তোমার হাতে ন্যস্ত। অতঃপর নিজ পরিজনের জন্য খুব ভাবিবে এবং সে ভাল কথাই, কিন্তু তুমি তাহাদের জন্য, আর তাহারা তোমার বা ভবিষ্যতের জন্য,এ ভাবে তাহাদের জন্য না ভাবিয়া; তুমি জগতের জন্য এবং তাহারাও জগতের জন্য, যাহাতে তাহারা জগতের উপযুক্ত হইতে পারে, এ ভাবে ভাবিয়া যদি তাহাদের জন্য ভাবনা কর, তাহাহইলে সকল দিকই রক্ষা হয়। তোমাকেও এই পর্য্যন্ত করিতে বলি, তদধিক সংসারত্যাগী হইতে বলি না। ফলত, এরূপ হইলেই, পূর্ণ সংসারী হইয়াও প্রকৃত নিষ্কাম-কামী হইতে পারা যায়। যে স্বার্থত্যাগের প্রথম সূত্রপাত স্ত্রীগ্রহণে, তাহাই বিস্তার প্রাপ্ত হইলে জাগতিক স্বার্থত্যাগ হয়; যে ভবিষ্যত ভাবনার সূত্রপাত পুত্রাদিতে, তাহাই বিস্তার প্রাপ্ত হইলে জগতের জন্য ভাবনা হয়। যাহার সেরূপ বিস্তারপ্রাপ্ত কিছুমাত্র দর্শনীয় পরিমাণে হয় না, সে কর্ম্মপশু। তাহার জীবনে বসুন্ধরা ভারগ্রস্থ হইয়া থাকেন।

তুমি কর্ম্ম করিবে সমাজের জন্য, সমাজ করিবে জগতের জন্য, জগত করিবে বিশ্বের জন্য এবং বিশ্ব করিবে বিশ্বপতির জন্য। এরূপ হইলেই,

তোমার কৃতকর্ম্ম মহাকর্ম্মে সংমিলিত হয়, তাহাকেই বিষ্ণুপ্রীতিকামেকৃত বলা যায়, সুতরাং তোমারও কর্ম্মসার্থকতা উপস্থিত হইতে পারে। কেবল স্বার্থবুদ্ধিতে তাহা হয় না; কেবল স্বার্থবুদ্ধিতে কর্ম্ম বিকলাঙ্গ হয়, কার্য্যে অনেক শক্ত রহিয়া যায় এবং স্বনিহিত শক্তি সমস্তেরও যথাসম্ভব স্ফুরণ হয় না। কেবল বনে গিয়া তপস্যা করিলেও, শক্তি সকলের সম্যক সার্থকতা হয় না; তাহাতে আরও অধিক ক্ষুন্নতা রহিয়া যায় এবং যথেপ্সিত শ্রেয়ঃ লাভ ও হয় না। এতদর্থে গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

"নকর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোশ্নুতে।
নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥"

শক্তি সকলের সার্থকতা কেবল কর্ম্মসার্থকতায়; সে সার্থকতা যথাসম্ভব একমাত্র সামাজিক বা জাগতিক স্বার্থবুদ্ধিতেই সাধিত হইতে পারে। কেবল স্বীয় গৃহস্থলী মাত্র অতি সঙ্কীর্ণ কর্ম্মস্থান! আত্মহিত জগতহিতে মিলাইতে হয়; জাগতিক হিতে কর্ম্মকৃত হইলে, তাহাতে আত্মহিতও অন্যতর পন্থাপেক্ষা অনেক সুন্দর ভাবে সুসম্পাদিত হয়। নেহাত স্বার্থভাবে দেখিতে গেলেও, সবাই যদি পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনদিক টানে, তাহা হইলে সবারই সর্ব্বনাশ কাজেই সংঘটন হয়। সেইরূপ সবাই যদি অন্যের ভাল করিতে চায়, তাহাহইলে কাজেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভালও অপরিমিত সংঘটন হয়। যদিও এ পৃথিবীতে একেবারে তেমন সর্ব্বৈব মন্দ বা সর্ব্বৈব ভাল আচরণ কখনও ঘটিবেনা, তথাপি যাহাদের জ্ঞানোদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের প্রবুদ্ধ হইয়া যথা পথ অবলম্বন করা অতি কর্ত্তব্য।

পুনশ্চ উপরে কোনস্থানে বলিয়াছি যে, যে শক্তি একবার উচ্ছসিত হয়, যে কোনরূপে তাহা সমাহারসীমায় না পৌছিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। স্বার্থে কৃত কর্ম্মের ক্ষুন্নতা হেতু, শক্তি-উচ্ছাস পর্য্যবসিত না হওয়ায়, কাজেই মানবকে আবার সেই কর্ম্মভূমিতে পুনরাগমন করিতে হয়; কিন্তু শক্তির পর্য্যবসান হইলে আর সেরূপ পুনরাগমন করিতে হয় না এবং সে পর্য্যবসান কেবল জগতহিতে কৃত কর্ম্মদ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। এই

নিমিত্তই গীতা শাস্ত্রে ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত যে, অহং-বুদ্ধিতে কৃতকর্ম্ম যাহা, তাহাদ্বারাই কর্ম্মবন্ধন হয় এবং তাহা কর্ম্মসূত্ররূপে সংযোজিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরূপ জন্মের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি অহং-বুদ্ধি পরিত্যাগে কর্ম্মাচরণ করে, তাহার কর্ম্মের দ্বারা আর কখনও কর্ম্মবন্ধন সংঘটন হয় না;—

"যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়াং স্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥"

আত্মহিতে কৃতকার্য্যকে সকাম কর্ম্ম এবং জগতহিতে কৃতকর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে;—সেইরূপ নিষ্কামকর্ম্মই যথার্থপক্ষে ব্রহ্মে অর্পিত হয়। তাই আবার বলি, তুমি কর্ম্ম করিবে জগতের জন্য, জগত করিবে বিশ্বের জন্য এবং বিশ্ব করিবে বিশ্বপতির জন্য; এরূপেই কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পিত হইয়া থাকে। এইরূপেই সমাজ উত্তর-উন্নতিশীল আত্মার ভাবী আগমযোগ্য হয়।

যতদূর দেখা গেল, তাহাতে সমাজই কর্ম্মস্থলী রূপে নিরূপিত হইতেছে। কিন্তু যে সে সমাজ হইলেই কর্ম্মস্থলী হয় না। যে জাতীয় স্বধর্ম্ম, সেই জাতীয় সমাজ হইলেই, প্রকৃত কর্ম্মস্থলী ও প্রকৃত কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে। নতুবা ভ্রষ্টাচার উপস্থিত হইবায় কর্ম্মক্ষুণ্নতা ও তাহাতে জীবনের অসার্থকতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

উপরে সকাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা করিয়া আসা হইল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বধর্ম্মকে অজ্ঞানমোহ হইতে মুক্ত করিয়া সুকর্ম্ম সম্পূর্ণাদি কর্ম্মে কর্ম্মবান করাইতে হইলে, অহং-বুদ্ধি বা স্বার্থত্যাগ তাহার প্রথম সোপাণ। জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, যাহার সমষ্টি-রূপ ধর্ম্ম, তাহাদের সংস্কার সাধনের দ্বারাই অজ্ঞান বিদূরিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ সাত্মাপদার্থ সংস্কারের পন্থা ও উপায় পৃথক পৃথক্। আগে প্রকৃতি সংস্কারের কথা বলা যাউক।

প্রকৃতি সংস্কার ত্রিবিধ উপায়ে হয়, প্রথম স্বার্থত্যাগ, দ্বিতীয় পবিত্রতা, তৃতীয় শৌচ। স্বার্থত্যাগের বিষয় উপরে বলিয়াছি। পবিত্রতা অর্থে

মানসিক পবিত্রতাকে বুঝাইতেছে। শম, দম, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি গুণ; সত্যে রতি; কাম, ক্রোধ, দ্বেষাদি রিপুগণের সদ্ব্যবহার; দুরভিসন্ধি সকলের সংযমন ও সদভিসন্ধি সকলের সংবর্দ্ধন; সর্ব্বতো সদাচরণ ও সদভিপ্রায় হেতু চিত্তের প্রসন্নতা; ইত্যাদিকে মানসিক পবিত্রতা বলে। অনেকের বিশ্বাস আছে ক্ষমা গুণ হইলে, সকলকেই ক্ষমা করিতে হইবে; কিন্তু সেটি বিষম ভুল। যে অসৎকে ক্ষমা করিলে অসৎ প্রশ্রয় পাইয়া সমাজের আরও অধিক অপকারী হয়, সেখানে ক্ষমাকরা পবিত্রতার কার্য্য না হইয়া তাহা অবিত্রতার কারণ স্বরূপ হয়। ঐরূপ দয়া দাক্ষিণ্যাদি তাবত সদ্গুণ সম্বন্ধেই, বিষয় অনুসারে, বিশেষ বিশেষ সীমা দেওয়া আছে; জ্ঞানী ব্যক্তি যে তাহাকে সে সীমা বলিয়া বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দিতে হয় না, আপনা হইতেই দেখিতে পায়। পুনশ্চ কাম ক্রোধাদি রিপুগণ যদি একেবারেই পরিত্যজনীয় হইত; তাহা হইলে আর সংসার চলিত না এবং তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে মনুষ্যবংশও লোপ প্রাপ্ত হইত। অতএব উহারাও একেবারে পরিত্যজনীয় নহে। কিন্তু কথা এই, তুমি রিপুগণের বশ হইবে না, রিপুগণ তোমার বশ হইবে; তাহারা তোমাকে চালনা করিতে না পারে, তুমি তাহাদিগকে চালনা করিবে; তদ্দ্বারাই তাহাদের সদ্ব্যবহার রক্ষিত হয়। দয়া দাক্ষিণ্যাদি সুগুণ হউক, আর কাম ক্রোধাদি রিপুগণই হউক, সদসদ্ তাবত বিষয়ই, আবশ্যক অনুসারে যথাযোগ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে, উভয়েই সুফল প্রসব করিয়া থাকে; আবার অসৎ ব্যবহারে উভয়েই, কুফল প্রসব করে। সকল বিষয়ই পরিমিতের অপেক্ষা আধিক্য যুক্ত হইলে, কুফল প্রসবী হয়। সৎ অসৎ তাবতগুণকেই সবশে আনিবে এবং কেবল অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সুসমাপ্তি হেতু যে টুকু যথায় প্রয়োজন তাহাই মাত্র প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইবে। গুণ সকলের অবলম্বন অথচ তাহাদের অতীতরূপে নির্লেপ ভাব, ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। নীতি ও জ্ঞান এ উভয়ে যে ব্যক্তি অধিকারী, সেই এ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে; নতুবা মন্দবুদ্ধি যে সে হয়ত এতদ্বারা মন্দপক্ষে অনেক উদার অর্থ করিবে, অথবা একদেশদর্শী যে, সে এ বাক্যের প্রতি অপরিমিত উপহাস বর্ষন করিতে থাকিবে।

শৌচ লইয়া হিন্দুর ঘরে একালে মহা গণ্ডগোল। হিন্দুর ধর্ম্মবিষয়ে এক্ষণে প্রায় আর তাবত বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল শৌচ মাত্র ধর্ম্মস্থানীয় বলিয়া গণিত হইতেছে। হিন্দুর শৌচ কি, তাহা বলিতে গেলে রঘুনন্দন সংগৃহিত সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ খুলিতে হয়। ঠিক তদনুসারে শৌচাচার করিতে হইলে, প্রায়ই ঘরে দুয়ার দিয়া বসিয়া না থাকিতে পারিলে সিদ্ধ হয় না। কর্ম্মপথে ও ধর্ম্মপথে হিন্দুর দশাও তাই আজি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায় লইয়া মারামারি করিলে, এইরূপ দশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। খৃষ্ট ও মহম্মদ শিষ্যেরা বড় একটা শৌচাচার পদার্থটাকে গুণে না। সে যাহা হৌক, অনুধাবন করিয়া দেখিলে সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতি সংস্কার করিতে হইলে শৌচাচার তাহার একটি প্রধান উপায়।

এখন প্রকৃতপক্ষে শৌচ কাহাকে বলে?—যদ্দ্বারা শরীরের স্বচ্ছন্দতা, মনের প্রসন্নতা এবং সৎ বিষয়ে চিত্তানতি হয়, তাহাকেই শৌচ বলা যায়। কিন্তু লোক বিশেষে সংস্কার বিশেষ হেতু শৌচাচারের পৃথক্‌ত্ব হওয়ার কথা। অপরিষ্কার স্থান দিয়া গমনে কাহারও স্নান না করিলে চলে না; কেহ বা পদ মাত্র প্রক্ষালনে শুচি বোধ করিয়া থাকে; এরূপ স্থলে কাজেই শৌচাচারের পৃথক্‌ত্ব দৃষ্ট হইতেছে। আমার এই কথায়, এক মাত্র মনঃ-প্রত্যয়ই যেন শৌচ বিষয়ে মুখ্য পরিচয় স্বরূপে দৃষ্ট হইতেছে। তাহা বটে, কিন্তু ইহাতেও সীমা আছে। কেহ ক্ষণিক মল সংস্পর্শ হেতু স্নান করিল; কেহ বা তৎ তৎসংস্পর্শিত স্থান ধৌতাদি দ্বারা শুদ্ধ হইল; এতদুভয় মনঃ-প্রত্যয়ের সীমার ভিতর। কিন্তু কেহ বা আবার নিরন্তর মলদিগ্ধ হইয়া থাকিতেও কিছুমাত্র বিরূপমনা নহে; ইহা মনঃ-প্রত্যয় সীমার অতীত: এখানে সহস্র মনঃ-প্রত্যয় থাকিলেও ইহা দূষ্য। যে যে আচারগুলি মনঃ-প্রত্যয় সীমার অতীতে দূষ্য, তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষে সংস্কার বিশেষ অনুসারে বিধানের পৃথক্‌ত্ব হইতে পারে না। যে গুলি মনঃ-প্রত্যয় সীমার ভিতরে, তাহাদেরই সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষ ও সংস্কার বিশেষ অনুসারে, শৌচাচার বিধানের পৃথক্‌ত্ব হইতে পারে। উক্ত সীমার মধ্যে যাহার যেমন সংস্কার, যে যেরূপে আত্মশুদ্ধি অনুভব করে, সে সেইরূপেই শৌচাচার করিবে। কিন্তু এ বিষয়ে, অতি স্থূল সংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ

লোকদিগকে, স্বাধীনতা পূর্ব্বক আচার বিষয়ে আত্মনির্ভরতা করিতে দেওয়া কোন মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের মধ্যে সমধর্ম্মীতা অনুসারে দল, সমাজ বা জাতী বিশেষের জন্য, সাধারণ শৌচবিধি বিধানিত করিয়া দেওয়া, এবং যে পর্য্যন্ত যে কেহ জ্ঞানবলে তাহাকে অতিক্রম করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহাকে তদধীন করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে উচিত; নতুবা হীণ যথেচ্ছাচারে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা; আবার বেশী বাঁধাবাঁধিতেও অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। বরণ হীণ যথেচ্ছাচার ভাল, তবু বেশী বাঁধাবাঁধি ভাল নহে; কারণ হীণ যথেচ্ছাচারে পতন হইলেও উদ্ধার হওয়া তত কঠিন নহে, যত কঠিন বেশী বাঁধাবাঁধি হইতে পতন হইলে। এতদ্বিষয়ে বাঁধাবাঁধির যে নিয়ম তাহা অবিকল উপদেষ্টা গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে, পুলিশ বা কারাধ্যক্ষের ন্যায় আচরণ করিবে না।

জাতিভেদে সংস্রব শূন্যতা ও আহারীয় গ্রহণ, ইহাও শৌচ বিষয়ের অন্তর্ভূত। এখানেও সংস্কার ভেদে ব্যবহারের তারতম্য; এখানেও পূর্ব্বোক্তরূপ মনঃ-প্রত্যয় সীমার অতীত বিষয় এমন অনেক আছে, যাহাতে মনঃ-প্রত্যয় হইলেও তাহা যেমন দূষ্য, না হইলেও তাহা তেমনি দূষ্য; এমন হীণ সংস্রব এ সংসারে অনেক আছে, যাহাতে সংস্রবীর সত্য সত্যই হীণতা প্রাপ্তি হয় এবং এমন আহারীয়ও এ সংসারে অনেক আছে, যাহাতে শরীর বা মনের অপ্রসন্নতা অথবা সুমতির ক্ষয়, কুমতির প্রবলতা, ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। বলাবাহুল্য যে সে সকল সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা উচিত। কিন্তু আবার যে সকল সংস্রব, যে সকল আহারীয়, যাহাদের দোষাদোষ কেবল কল্পনা বা 'বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মব্যাখ্যা' যোগেই সিদ্ধ; তদ্ভিন্ন সে দোষা-দোষের অন্য কোন প্রকার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না, তাহাদের গ্রহণ বা অগ্রহণ অবশ্যই সংস্কার বিশেষ বশে দূষ্য বা সংস্কার বিশেষ বশে অদূষ্য হয়। এত-দ্ভিন্ন, নিত্য বা সর্ব্বজনীনরূপে দূষ্য বলিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। এরূপ সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত চিত্তসংস্কার আত্মিক উন্নতির সহিত দূরীভূত হইতে থাকে এবং হওয়াও উচিত। অতঃপর স্থূলত এইমাত্র বলি যে, কোন সংস্রব, কোন আহারীয়তে একেবারে দোষ নাই বলাও যেমন দোষের; এতে দোষ ওতে দোষ বলিয়া একেবারে

আহারীয় ও সংস্রব সঙ্কীর্ণতা করাও তেমনি দোষের। হিন্দুর ঘরের বর্ত্তমান জাতীয় সঙ্কীর্ণতা যত শীঘ্র বিদূরিত হয় ততই ভাল।* বিভিন্ন জাতি পরস্পরায় আহার ও বিবাহাদি বিষয়ে, মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে যেরূপ উদারতা আছে, তাহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রকৃতি সংস্কারের বিষয় বলিলাম, অতঃপর জ্ঞান সংস্কারের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এতদ্বিষয় 'গ্রীক এবং হিন্দুতে' একবার আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে কেবল মাত্র সঙ্ক্ষেপত কিছু বলিব। জ্ঞান সংস্কারের প্রধান উপায়, কর্ম্মাচরণ, শিক্ষা ও ধ্যান বা চিন্তা। যে জ্ঞানাদির দ্বারা কর্ম্মাচরণের উদার সুসম্পাদন হয়; সে জ্ঞান সংস্কৃত না হইলেই কর্ম্ম, আবার কর্ম্মাচরণের দ্বারা জ্ঞানের সংস্কার হইবে কিরূপে? ব্যাকরণ যোগে ভাষা শিক্ষা সুসম্পাদিত হয়; অথচ ভাষা শিক্ষা না হইলে ব্যাকরণ জ্ঞান পুষ্ট ও সংস্কৃত হয় না। মাতৃ উদরেই স্বভাবের সূত্রপাত এবং মাতৃ উদরে কর্ম্মেরও সূত্রপাত। সে স্বভাব বা ধর্ম্মসংস্কারের দ্বারা এইমাত্র হয় যে, কর্ম্ম-সংস্কৃত, উন্নত ও হীনকর্ম্ম স্থানে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নিয়োজিত হয়। দগ্ধ স্থান ও কর্ম্ম স্থান, ইহা কখনই মানবে শূন্য স্থায়ী থাকে না; তবে কিনা মন্দের বিদূরণে ভাল দ্বারা তৎস্থান অধিকৃত হওয়াই অভিপ্রেত। কর্ম্মাচরণের দ্বারা শক্তির বিকাশ ও বহুদর্শিত্ব লাভ হইবায়, জ্ঞানের পুষ্টতা পক্ষে তাহা সহায়তা করিয়া থাকে।

অজ্ঞানের নাশ এবং জ্ঞানের বিকাশ ও সে জ্ঞানের সংস্কার, শিক্ষার বিষয়ীভূত। সে শিক্ষা উপদেশ গ্রহণ, অধ্যয়ন, দৃশ্য দর্শন, ইত্যাদি নানা উপায়ে সুসাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সমস্তই ততক্ষণ সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রদ

---

* আজি কালি রাঁধুনি বামনের উত্তরোত্তর যেরূপ দৌরাত্ম্য ও দুষ্প্রাপ্যতা বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে এক রাঁধুনি বামনের কল্যাণেই আহার বিষয়ক জাতীয় সংস্রবশূন্যতা অতি সত্বরেই দূর হইবে। এখনই অনেক নীচ জাতি সুতার কল্যানে বামন বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। অতএব, অন্ততঃ এ বিষয়ে, লেখকের উক্তি ফলবতী হইবার দিন অনেক নিকট বলিয়া বোধ হইতেছে। ইতি।——বাঞ্ছারাম।

ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না, যতক্ষণ তাহাতে আত্মচিন্তা ও অনুধ্যান আসিয়া সংমিলিত না হয়। প্রতি মানবে যে মৌলিকতা নিহিত আছে, তাহা প্রকটিত করিবার পক্ষে চিন্তা ও অনুধ্যানই মুখ্য উপায়। আমেরিক ইমারসন কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত যে, শিক্ষাকালে যতক্ষণ আত্মজীবন মূল পুস্তক এবং শিক্ষণীয় বিষয় সকল তাহার টীকা টিপ্পনি, এরূপ বুদ্ধিতে শিক্ষা চালনা না হয়; ততক্ষণ প্রকৃত শিক্ষা কখনই হইতে পারে না। উহা যথার্থ কথা, উহাই প্রকৃত শিক্ষা।

অনেকের বিশ্বাস যে প্রকৃত, পরমার্থিক ও উচ্চ জ্ঞানের বিকাশ ও লাভ কেবল এক ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ ও তদ্বিষয়িনী চিন্তায় সুসাধিত হয়, অন্য রূপে হয় না। অন্য যাহা কিছু জ্ঞান তাহা বৈষয়িক বা সাংসারিক প্রয়োজন সাধক জ্ঞান, সুতরাং অকিঞ্চিৎকর, পরমার্থিক লাভে তাহা সহায়তা না করিয়া বরণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহা অতি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। যাহারা ইহলোক ও পরলোককে সম্বন্ধ শূন্য পৃথক দেখিয়া থাকে, যাহারা ধর্ম্ম হইতে কর্ম্মকে সংস্রব শূন্য আলাহিদা করিয়া থাকে; যাহারা গরু মারিয়া জুতা দান করিয়া ভাবে জুতা দানের পুণ্যে গোহত্যা পাপ হরণ পূরণ হইয়া যাইবে; যাহারা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক সদুপায়ে ব্যায় করিয়া ভাবে উচ্চ লোক অধিকার করিতেছে; যাহারা ভাবে উপাসনা আদি দৈবকার্য্যের দ্বারা সাংসারিক পাপ কাটিয়া যাইবে; তাহারাই ওরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে ও ওরূপ কথা বলে। কিন্তু যাহারা এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে এক দেবতার একার্থপূর্ণ বিভূতি রূপে দৃষ্ট করে; যাহারা স্বীয় অস্তিত্ব ও তৎসম্বন্ধীয় কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, তাবৎ বিষয়কে একার্থ সমষ্টিরূপে অনুভব করে; যাহারা তাবত বিষয়কেই ব্রহ্মচক্র ও আত্মচক্রের অন্তর্গতরূপে অবলোকন করে; তাহারা ওরূপ কথা বলে না। যে ব্যক্তি তাবত বিষয়কেই চক্রগত, তাবত বিষয়কেই একার্থ সমষ্টিভূত, দর্শন করে; তাহার জ্ঞানশিক্ষা কেবল ধর্ম্মপুস্তকে আবদ্ধ থাকিবে কেন? তাবত বিষয়ই তাহার নিকট ধর্ম্মপুস্তক, তাবত বিষয়েতেই তাহার শিক্ষণীয় পদার্থ আছে এবং তাবত বিষয় হইতেই সে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যে কোন এক বিশেষ বিষয়িনী জ্ঞান, সমীমত

সেই বিশেষ বিষয়ে কখনও আবদ্ধ থাকে না; তাহা সর্ব্বদাই বিশেষত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমষ্টি জ্ঞানের পরিণতি ও পুষ্টতা সাধন করিয়া থাকে, কেহ ইচ্ছা করিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। অতএব সংক্ষেপত এখন এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, যে কোন বিষয়, যাহাই চিত্তক্ষেত্রে যথাপরিমাণে নূতন বলিয়া আনীত হইবে, তাহাই তথাপরিমাণে জ্ঞান উপার্জ্জনের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। অসৎ তত্ত্বপরিজ্ঞানও জ্ঞান-উপার্জ্জনের স্বরূপ। সদসৎ তত্ত্বপরিজ্ঞান ভিন্ন, তত্ত্ববিষয়ে কি গ্রহণ কি পরিহার, উভয়ের কোনটাই সুসাধিত হয় না। অতঃপর পর পরিচ্ছেদে নীতি সংস্কারের বিষয় আলোচনা করা যাউক। নীতির উপরে অনেক নির্ভর করিয়া থাকে।

৫

নীতি আপ্তবাক্য জনিত। আপ্তবাক্য বা শ্রুতি তাহাকেই বলা যায় যদ্দ্বারা মনুষ্যের উপস্থিত জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। শ্রুতিপ্রতিপাদিত বিষয়কে সাধারণত দেবতত্ত্ব নামে অভিহিত করা যাউক। এই দেবতত্ত্বই সাধারণত সর্ব্বত্রে ধর্ম্মতত্ত্ব নামে আখ্যাত হয় এবং ইহারই প্রভেদ অনুসারে, বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় নামে নামিত হইয়া থাকে। বস্তুত, সেরূপ নামিত হওয়ায় দোষও বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও দেবতত্ত্ব বস্তুত ধর্ম্মের কেবল একটা প্রত্যঙ্গ স্বরূপ বটে, তথাপি ইহাকে সমস্ত অঙ্গের মধ্যে উত্তমাঙ্গ এবং আর তাবত অঙ্গকে ইহারই দ্বারা পরিচালিত বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে অগ্রে অতিশয় গুরুতর দেবতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিব। মানব দেবতত্ত্ব আত্মসাদৃশ্যে কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে দোষ নাই, অথবা তাহা ভিন্ন উপায়ও নাই। ইহার মধ্যে আরও একটি অতি আশ্চর্য্য ও লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, কোন না কোনরূপ দেবতত্ত্ব কল্পনা না করিয়া মানব ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এ সংসারে প্রতি পৃথক ব্যষ্টি, সমষ্টির সম্বন্ধে পূর্ণ দৃশ্য; পূর্ণ পূর্ণ সমাবেশে মহাপূর্ণ। যে কিছু গুণপদার্থ সমষ্টিতে বিদ্যমান; সে সমস্তই অনুরূপ সূক্ষ্মভাবে, অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, ব্যষ্টিমধ্যে নিহিত।

যে বৃহৎ অভিনয় একটা বৃহৎ আকাশপিণ্ড করিয়া যাইতেছে, একটা পরমাণুও তাহার ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে অবিকল সেইরূপ অভিনয় করিয়া যাইতেছে। প্রত্যেকে গুণপদার্থের পৃথক সমাবেশ হেতু, অবশ্যই প্রকৃতি বৈচিত্র—সৃষ্টিবৈচিত্র; কিন্তু সমাবেশের পার্থক্য হইলেও, আছে সমস্তই গুণপদার্থ প্রত্যেক। এই সমস্ত পৃথিবীতে যে কিছু গুণপদার্থ, এই এক সামান্য ব্যষ্টিরূপী মানবীয় শরীরে সমস্তই তাহারা অনুরূপ সূক্ষ্ম-পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ঔষধশাস্ত্র দ্বারাও আমরা দেখিতে পাই যে, এমন কোন গুণ ও পদার্থই এ সংসারে নাই, যাহা উপযুক্ত পরিমাণে মানবীয় শরীরে প্রযুক্ত এবং তদ্দারা সমধর্ম্মীতায় তাহা গৃহিত না হইতে পারে। সমধর্ম্মীতা ও স্বজাতীয়ত্ব বিদ্যমান না থাকিলে কখনই তাহা গৃহিত হইতে পারিত না। যেমন আধিভৌতিক ভাগে, আধ্যাত্মিক-ভাগেও প্রতি আত্মচৈতন্য পরমাত্ম মহাচৈতন্যের সংক্ষেপরূপ। বৃহৎ চক্রের সংক্ষেপরূপ ক্ষুদ্রচক্র যেমন, তদ্রূপ সংক্ষেপরূপ। মহাচৈতন্যের যে কিছু স্বভাব, তাহা ক্ষুদ্রচৈতন্যে সমস্তই অনুরূপ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। ক্ষুদ্র বৃহতের সংক্ষেপরূপ বলিয়াই, আমরা আত্মসাদৃশ্যে যে কোন মহত্তত্বের প্রতি অনুধাবন ও তৎপ্রকৃতি ও তদীয়তত্ব ধারণা করিতে উদ্যম করিলে, আমাদের উদ্যমফল একেবারে ভ্রমাত্মক ও বিফলতাযুক্ত না হইয়া, আত্মবোধের পরিমাণ অনুরূপ যথাপরিমাণে তাহাকে কামপ্রদ হইতে দেখা যায়। তাহার পর বৃহৎ সমধর্ম্মী, ক্ষুদ্রকে নিয়ত স্বীয় কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তদুভয় কারণেই এবং কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, উভয়ত সমষ্টিধর্ম্ম ব্যষ্টিতে সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়াই, একদিকে আধিভৌতিক ভাগে ভূতজগতের সহ আমাদের সম্বন্ধ; ভূতজগতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হই এবং আত্মদেহের স্বভাবক্রিয়াদি সাদৃশ্যে ভূতজগতকে বুঝিতে সক্ষম হইয়াথাকি। আত্মসাদৃশ্যে নাম ও ধারণার উদয় হইয়াছে এবং সেই নাম ও ধারণার সাহায্যেই আমরা ভূতজগতকে বুদ্ধির অধীনে আনিতে পারিতেছি। পুনশ্চ কালে সেই নাম ও ধারণা আধার যত উদারতা প্রাপ্ত হইতেছে, ভূতজগৎও ততই বোধের সূক্ষ্ম আয়তনের মধ্যে আসিতেছে। ঐরূপ

আর একদিকে আধ্যাত্মিক ভাগেও, মহাচৈতন্য সহ আমাদের সম্বন্ধ; মহাচৈতন্যে অনিচ্ছা সত্বেও আকৃষ্ট হই, নাস্তিক হইতে চাহিলেও সে আকর্ষণ একেবারে ঘুচে না; এবং আত্মচৈতন্যের স্বভাবক্রিয়াদি সাদৃশ্যে মহাচৈতন্যকে বুঝিতে সক্ষম হই। পশু সৃষ্টিতেও, উচ্চাত্মা সন্নিকটে অধমাত্মার তদ্রূপ আকর্ষিত হওন বিষয়ে ব্যত্যয় নাই। শ্রেষ্ঠ আত্মা সকাশে আকৃষ্ট হওয়ার একটা বিশেষ নিদর্শন, পালকের নিকট ইতর প্রাণীর বশ্যতা ভাব; এ বশ্যতা বা পোষমানা সর্ব্বজীবেই লক্ষিত হয়। অতএব মানব আদি জ্ঞান-উদ্ভিন্নের সময় হইতেই, উদ্ভিন্নরূপ দেবতত্বে কেন যে আপনা হইতে অপরিজ্ঞাত ভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহা উপরোক্ত তত্বের দ্বারাই স্পষ্টত অনুমিত হইতেছে এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, আত্ম সাদৃশ্যে দেবতত্ব কল্পনা করায় মানবের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, বরণ উহাই স্বাভাবিক ও উহাই পন্থা।

যেমন নাম ও ধারণার ক্রম উদারতা সহ ভূতগত, বোধের সূক্ষ্ম আয়তন মধ্যে আসিয়া থাকে; সেইরূপ আত্মতত্বের ক্রমোৎকর্ষ সহ, দেবতত্বও ক্রমশ সূক্ষ্মরূপে বোধবিষয়ীভূত হয়। উভয়ই বিবর্ত্ত নিয়মের অধীন এবং উভয়েতেই বীজকণা ক্রমে মহা অশ্বত্থবৃক্ষে পরিণত হইতে থাকে। অথবা ইংরেজ ডারবিন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত সামান্য জীব হইতে উচ্চ-জীবে পরিণতির ন্যায়, পরিণত হইতে থাকে। যাহা আগে অতি স্থূলরূপে বোধিত ও অনুভূত হইত, তাহা ক্রমত সূক্ষ্মতায় আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। যেমন গর্ভশয়ে, গর্ভাশয়ের শক্ত্যনুরূপ পরিণতির ক্রমানুসারে জরায়ু আগে বুদ্বুদাকার, পরে স্ফুটচিহ্ন বিশিষ্ট অঙ্গুষ্ঠ মূর্ত্তি, পরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভেদ চিহ্ন সহ লম্বমান মাংশপিণ্ড, ক্রমে নরাকার সাদৃশ্য, ক্রমে নর, ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া আসিতে থাকে; তদ্রূপ পরমাত্ম-তত্বরূপী দেবতত্বও; আদি মানব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোত্তরে, বোধরূপগর্ভা-শয়ের আয়তন ও শক্ত্যনুসারে এবং পরিণতির ক্রমানুসারে, অস্ফুট লোকান্তর শক্ত্যাভাস, পরে ভূতপ্রেতাদি, পরে রক্তদন্তা ভয়াবহ দেবতাদি, ক্রমে শোভন দেবগণ, ক্রমে একেশ্বর জ্ঞান, ইত্যাদি নানা প্রকার ও নানা শ্রেনির ক্রম পরিণতিতে পরিণত হইয়া আসিতে থাকে। উহা

স্বাভাবিক, উহাই হইয়াছে, হইতেছে এবং হইতে থাকিবে। যেমন ইহ-সাংসারিক বিষয় সমস্ত, তেমনি লোকান্তরস্থ সাংসারিক বিষয় সমস্তও, তাহাদের ধারণা সম্বন্ধিনী উৎকর্ষ বিষয়ে, মানবীয় চিত্তপরিণতি ও চিত্তোৎকর্ষ ক্রমের উপর সম্পূর্ণত নির্ভর করিয়া থাকে। তাবতজাতির তাবত দেবতত্ত্বই চিত্তোৎকর্ষের বা অপকর্ষের ক্রম ও শ্রেণি পর্য্যায়াদি অনুসারে তথাবিধ পরিবর্ত্তন সকল প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যখন যেমন মানুষ, তখন সেই রকম দেবতত্ত্বই কল্পিত ও প্রকটিত হইয়া থাকে। স্বভাবত দেবতত্ত্বে আকৃষ্ট হওয়াও যেমন অনিবার্য্য; উদ্ভিন্ন দেবতত্ত্বের উক্ত রূপ ক্রমোত্তর পরিবর্ত্তনও তেমনি অনিবার্য্য বলিয়া জানিবে।

কিন্তু দেবতত্ত্ব লইয়া কত জনে কত কথাই বলিয়া থাকে। কাহারও বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন বহুদেব কল্পনা বড়ই দোষের, তাহাতে মহাপাপের সঞ্চার হয়। তা বটে, কিন্তু আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?—কোন একটা বৃহদায়তন বিষয়কে বয়স্থ ব্যক্তি যেমন একটি অখণ্ড দৃশ্যে দেখিয়া আয়ত্ত করে, বালকে তাহা পারে না; বালক স্বভাবত তাহাকে বহুতর খণ্ড দৃশ্যে দেখে এবং সেইরূপ প্রতি খণ্ডকে পৃথক পৃথক বস্তু বোধে নানা নামে নামিত করে। কেন?—অখণ্ড দৃষ্টিতে পারদর্শী হওয়া প্রসস্ত মনের কাজ, বালকের মন সেরূপ প্রসস্ত নহে। একা বৃক্ষের নাম তরু, পাদপ, বৃক্ষ ইত্যাদি নানা সংখ্যক হইয়াছে কেন বলিতে পার?—বিভিন্ন গুণ ও বিভূতি অনুসারে পৃথক পৃথক দর্শন হেতু। যে সূত্রে বৃক্ষের এই নানা নাম, বহুদেবকল্পনাও সেই সূত্রে। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ পদার্থ, তাই বহু নাম হইলেও অতি অল্প সময়েতেই তাহারা একার্থবোধকতায় আসিয়াছিল; কিন্তু দেবতা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ; তাই বহুদেবকল্পনা একার্থবোধকতায় তত শীঘ্র পরিণত হয় নাই। ফলে বৃক্ষের বহু নামে যদি দোষ না থাকে, বহুদেব জ্ঞানেও দোষ নাই! পুনশ্চ, খণ্ড দৃষ্টি ও অখণ্ড দৃষ্টি, ইহা সায়তন দৃশ্য সমন্ধেই খাটে; কিন্তু যেখানে অনন্ত-আয়তন ঈশ্বর পদার্থ লইয়া কথা, সেখানে তোমার আমার বা যাহারই হউক, অখণ্ড দৃষ্টি কোথা হইতে আসিবে? সেখানে খণ্ডদৃষ্টি ও বিবিধ বিভূতি হেতু বিবিধ নামকরণ, তাহাই স্বাভাবিক; তদন্তর আর সমস্ত বরণ, ধারক বিশেষ বিবেচনায়, অস্বাভাবিক। অনন্বিত

পরমাত্মতত্ত্ব ধারণা আমাদের সাধ্যের অতীত; বিভূতি অবয়েই ধারণীয় হয়। অসংখ্য বিভূতি হেতু বহুদেবকল্পনা কার্য্যত করিয়া থাকে সকলেই, তবে কিনা কাহারও উপকরণের সূক্ষ্মতা হেতু প্রচ্ছন্ন থাকে; কাহারও বা উপকরণের স্থূলতা হেতু অরুচিকর হয়। কিন্তু তাহা হইলেও, মূল তত্ত্বে একে অপরের কাছে নিন্দনীয় হইবার বিষয় কিছুই নাই।

কাহারও বিশ্বাস, প্রতিমা তৈয়ার করিয়া পূজা করিলে ঈশ্বর বড় চটিয়া থাকেন। কেন?—তাঁহাকে সঙ্কীর্ণতা দেওয়া হয়। ভাল,তবে গীর্জা মস্জিদ, ইহারা পবিত্র ও উপাসনার বিশেষ স্থান হয় কেন?—অথবা তথায় কি ঈশ্বর বিশেষ আবির্ভাব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তবে প্রতিমায় আবির্ভাব হইতে বাধা কি? অথবা বলিবে সৃষ্ট বস্তু লইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ দেখান ভাল নয়; কেন?—সৃষ্টিকর্ত্তা কি সৃষ্টবস্তু ছাড়া? অথবা এমন কি অসৃষ্টবস্তু আছে যদ্দারা, সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ বুঝিতে ও বুঝাইতে আমরা সক্ষম হইতে পারি? বাক্য কি সৃষ্ট পদার্থ নহে? ঈশ্বরের প্রতিমা রচনা কে না করে;—সবাই করে; না করিলে চলিবার উপায় নাই। তবে কিনা, উপকরণ ভেদে কেহ কথায়, কেহ মাটি পাথরে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মূল তত্ত্বে কথা ও মাটি পাথরে প্রভেদ কি? খৃষ্টানের খৃষ্ট এবং ঈশ্বর প্রভৃতি মনুষ্য প্রতিমা নয় কি?

কেহবা মূর্ত্তি কল্পনায় অতি মানুষিকী হেতু, সেটা ভূত প্রেতাদির হেয় পদার্থ; আর অন্যত্রে সুন্দর মানুষিকী মূর্ত্তি হেতু তাহাকে প্রকৃত দেববৎমূর্ত্তিরূপে ভাবিয়া থাকে। এটা বড় ভ্রান্তি ও বড় অবিবেচনার কাজ। যাহার যেমন ধারণা, সে সেইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাতে কোনটা ভূত প্রেত এবং কোনটা বা দেবতা হইবে কেন? এখান সেখান স্থান ভেদ, বা এটা সেটা বিষয় ভেদ হইলেও, প্রকাশ করিবার চেষ্টা সেই এক পদার্থকেইত। বরণ আমি বলি যে, যে অতি মানুষী মূর্ত্তি কল্পনা করে, বিরাট বিভূতি নিশ্চয়ই তাহার মনে অপেক্ষাকৃত কিয়ৎ পরিমাণে অধিক উদ্ভাসিত হইয়াছে; আর যে কেবল মানুষীমূর্ত্তি কল্পনা করে, তাহার মনে সেরূপ উদ্ভাসিত হয় নাই। ঈশ্বর প্রতিরূপ দেবতাকে যে মানুষের ন্যায় সামান্য ভাবে, সেই মানুষীমূর্ত্তি কল্পনা করে; কিন্তু অতি মানুষী কল্পনা করিয়া

থাকে সে, যে দেবতাকে সর্ব্বদা মানুষের অতীতরূপে দেখিয়া থাকে ; এখানে তবে ভাবনার শ্রেষ্ঠতা কাহার ? অনেক মূর্খ ইউরোপীয় গ্রীকদেবতা সহ তুলনা করিয়া, হিন্দুদেববর্গকে উপহাস ও অশ্রদ্ধা করিতে চায়, কিন্তু ফলে বুঝে না যে হিন্দুর ধারণা কি বিশালতা পূর্ণ, আর গ্রীকের ধারণা তাহার তুলনায় কতদূর বালকবৎ সঙ্কীর্ণ। আসিয়াটিক সোসাইটিতে ঈশ্বরের বিশ্বরূপের একখানি ছবি রক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয় আদর্শ ছবি বলিয়াই রক্ষিত ! ছবিটির গুটি ১৫।১৬ মস্তক, খান ৩০।৩৫ হাত, দুইখানি পা, পেটের উপর গোটা দুই কি দাগ, ইত্যাদি। বোধ হয় "অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং" শ্লোকার্থ হইতে ওরূপ অনেক মাথা অনেক হাতের বুদ্ধি উঠিয়া থাকিবে। "অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য, মনন্তবাহু শশিসূর্য্য নেত্রং" এবম্ভূত পুরুষের এই ছবি ! যে চিত্র করিয়াছে তাহার ধারণাও অপূর্ব্ব, যে পছন্দ করিয়াছে তাহার ধারণা ও রুচিও অপূর্ব্ব, সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটীও অপূর্ব্ব !! ছবিটি লেখা একজন মূর্খের, পছন্দ একজন খৃষ্ট শিষ্যের। হিন্দুদেববিভূতি বুঝার ইহাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নিদর্শন কি হইতে পারে। আর কি বলিব, এই পর্য্যন্ত বলি যে, নর-উপাসক খৃষ্টশিষ্যের নিকট হিন্দুদেবতত্ত্বের বিশালতা বুঝিবার দিন এখনও অনেক দূরে। যাহাহউক, এসকল ভ্রান্ত বিশ্বাস লইয়া বিতর্ক করিবার আর অধিক প্রয়োজন নাই।

উন্নতি পর্ব্বে মানব যে যেমন পর্য্যয়ের হউক এবং স্বীয় স্বীয় ধারণা অনুরূপ যে যেমন দেবতত্ত্ব কল্পনা করুক, কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না যে তদ্দ্বারা দেবশের তুষ্টি সাধন ও তাঁহার উপাসনার কিছু ক্রটী হয় ; অথবা তাহাতে উপহাস করিবার, নিন্দা করিবার, ঘৃণা করিবার বা বিদ্বেষ করিবার বিষয় কিছু আছে। ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা, অনন্ত বিভূতি ও অনন্ত রূপ ; মানবীয় দেবকল্পনা বিশেষ, সেই অনন্ত মহিমাদির একাংশমাত্র বুঝিবার হেতু আগ্রহ-নিদর্শন স্বরূপ। অন্ধ বালকগণ হাতি দেখিতে গিয়া, প্রত্যেকে হস্তির অঙ্গবিশেষ স্পর্শে হস্তিকে কেহ স্তম্ভাকার, কেহ সূর্পাকার, ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছিল। তাহাদের সকলেরই বর্ণনা পৃথক্ পৃথক্ অথচ সকলেরই কথা সত্য ; অথচ সম্পূর্ণ সত্য নহে। আত্মিকনেত্রে অন্ধ মানবের বিবিধ দেবকল্পনাও তদ্রূপ। যে যেমন থাকের মানুষ,

তাহার দেবকল্পনাও তেমনি, দেবতার ভূষণ বা ‌নও তেমনি, দেবতার ইষ্ট দায়িকাশক্তিও তেমনি এবং সাধকের ইষ্ট প্রার্থনাও তেমনি; কিন্তু কথা সে সকল লইয়া নহে, কথা এই—সাধক সে দেবকে উপাসনা করিয়া তাহার সেই অভিপ্সিত ইষ্ট পূর্ণরূপে পায় কিনা? পায়। অথবা চন্দ্রের কলঙ্ক এক সময়ে মৃগাঙ্ক, আর এক সময়ে গুহা গহ্বরাদিতে আখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু চন্দ্রের যে জ্যোৎস্না বিতরণ তাহা মৃগাঙ্ক কালেও যেমন উদার, গুহাগহ্বর কালেও তেমনি উদার, কিছুমাত্র তাহাতে ইতর বিশেষ হয় নাই; প্রভেদ কেবল পাত্রভেদে জ্যোৎস্না লইয়া ভোগের ও ভোগপ্রকরণের। দেবকল্পনারও সেইরূপ পাত্রভেদে, মনের উৎকর্ষাপকর্ষ ভেদে, রূপান্তর পরিগ্রহ হইয়া থাকে; কিন্তু তদ্দরুণ ঈশ্বরের করুণা বিতরণ পক্ষে কিছুই ইতর বিশেষ নাই; ইতরবিশেষ যাহা কিছু, তাহা সেই করুণার অনুভূতিতে ও ব্যবহারে। যে যেরূপে অনুভব ও ব্যবহার করে, সে সেইরূপে ফল পায়।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং॥"

বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ী মানবের উপাস্য একমাত্র আত্মা। কিন্তু এ কথা যে কেবল জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেই খাটে, এমন নহে; কর্ম্মকাণ্ড ও দেবতত্ত্বেও মানব, অজ্ঞাত ভাবে হউক, সেই আত্মাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। মানব যখন স্বপ্রকৃতিবশে স্বীয় অর্জ্জিত জ্ঞানযোগে মহাপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, তখন মহা প্রকৃতি প্রতিক্রিয়ায় আত্মসত্ত্বার উপর যে প্রতিভাস নিক্ষেপ করে; সেই প্রতিভাসিত আত্মসত্ত্বাই দেবতা ও দেবতত্ত্বরূপে কল্পিত ও প্রকটিকৃত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে, মানবের স্বীয় আত্মাই প্রকৃতপক্ষে দেবতারূপে মানবের নিকট প্রকাশিত ও মানবের দ্বারা উপাসিত হয়। কিন্তু ইহাতে দোষের কিছুই নাই, যেহেতু আত্মারই সমষ্টিরূপ ঈশ্বর, পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম। একথায় হয়ত অনেক ধর্ম্মধারীই চমকিয়া উঠিবেন, সে কি? ফিরিয়া ঘুরিয়া তবে কি আবার সেই অদ্বৈতবাদ! দোষ কি? অদ্বৈতবাদ কি যুক্তি কি অনুভূতি উভয় পেই সিদ্ধ, অদ্বৈতবাদ ভিন্ন বিশ্ব নিরাকরণের অন্য কোন পন্থা নাই। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেও সর্ব্বত্র ব্যষ্টি সমষ্টির বিদ্যমানতা এবং কোথাও তাহার

অনন্তাব দেখিয়াও কি এ কথা বুঝিবে না? অদ্বৈতবাদ হইলেই যে তোমার তুমিত্বলোপ হইবে এমন কথা নাই; জলাশয়ের সমস্ত জল এক জল হইলেও, তাহার ব্যষ্টি জলকণায় বষ্টীরূপের বিলোপ হয় নাই। তুমিও তোমার তুমিত্বসহ, পরমপিতা পরমেশ্বরের অনন্ত সত্বামধ্যে ব্যষ্টি সত্তারূপে অথচ অদ্বৈতভাবে, উপযুক্ত হইলে স্বকীয় ব্রহ্মানন্দ লাভে বঞ্চিত হইবে না।

সর্ব্বময় ঈশ্বর হইতে পৃথকত্বের সম্ভাবনা কোথায়, কে তাঁহার ব্যষ্টি-স্বরূপাত্মক না হইয়া সম্ভাবিতে পারে? তিনিই সর্ব্বময় এবং সর্ব্ব, আর সমস্ত তদংশ এবং তদন্তর্ভূত। তিনিই জীবদেহে জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন, অথচ তিনি জীবাত্মারও অতীত পুরুষ কর্ত্তা;

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে,
সর্ব্বাং স্তথা ভূত বিশেষ সংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষিংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥"

কল্পিত দেবমূর্ত্তিরূপী আত্মসত্বাই যথার্থত বেদের অগ্নিদেবতা, দেবপুরোহিত—

"অগ্নিমিলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং,
হোতারং রত্নধাতমং।"

দেবভক্তিতে যাহা কিছু অর্চ্চিত এবং অর্পিত হয়, তিনিই তাহা দেবদেব বিষ্ণু সকাশে বহন করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদই উজ্জ্বল তত্ব; লোকে তাহার নিগূঢ়তত্ব বুঝিতে না পারিয়াই নানারূপ গোল করিয়া থাকে এবং পরমেশ্বর হইতে আত্মস্বাতন্ত্র্য দেখিতে না পাইয়া আতঙ্কিত হয়।

মানবের যত দুঃখ, যত আশঙ্কা, যত ভয়, সে সমস্তই দ্বৈতবুদ্ধি ভেদ জ্ঞান হইতে। পৃথক হইতে বিসদৃশ, বিসদৃশ হইতে পর, পর হইতে শত্রু ভাবের সমুদ্ভব হয়। ভয় হইতে স্বভাবের বিকার, বিকার হইতে দুঃখ পরিণাম অপরিহার্য্য। মৃত্যু হইতে ভয় পাই, মেঘ ডাকিলে ভয় পাই, পাতাটি নড়িলে ভয় পাই, প্রতিহিংসায় প্রকৃতি জর্জ্জরিত; সবারই আমি শত্রু, সবাই আমার শত্রু। কিন্তু শত্রুভাবুদ্ধিশূন্য জীবের শত্রু নাই; ভয় থাকিলেই হিংসা থাকে,—হিংসাশূন্য জীবের ভয় নাই; যোগীগণ স্বচ্ছন্দে হিংস্রক জীবের অঙ্কগত থাকিয়াও হিংসিত হয়েন না। বিশ্বদেহে মদীয় দেহ এবং

বিশ্ব আত্মায় মদীয় আত্মা যদি একীকরণ করিতে পারিতাম, তবে আর আমার দুঃখ কোথায়, ভয় কিসের? সকলই আমি, সর্ব্বত্রেই আমি; যে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এখন দুঃখের কারণ, তাহা সুখের নিমিত্ত স্বরূপে অনুভূত হইত,—নিজ দেহের ভোগার্থে যেমন তদীয় শ্রম ঘটনাদি হইয়া থাকে। কোন্‌টা এবং কখন দুঃখের, কোন্‌টা এবং কখন সুখের, তাহার নির্ব্বাচন, অবস্থা বিশেষে মানস-ভাবান্তরের ফল মাত্র; বস্তুত সত্যতা তাহাতে কিছুই নাই; ভেদ বিকারে এখন যাহা দুঃখের, অভেদ সুলয়ে তাহাই পরম সুখের স্বরূপে দৃষ্ট হইত। মৃত্যু কি সৎ অবস্থান্তরে পরিণতির পথ নহে?—অথচ সেই মৃত্যুই আমার নিকট ভয় বিষয়ের চরম। প্রভু জগদীশ, কেন আমি এ বিদ্যাসেতু সম্মুখে দেখিয়াও অবিদ্যাতরঙ্গে হাবুডুবু খাই; কেন আমি ঐ কুলস্থানে অনন্ত জ্যোতিস্বরূপে আমার এই আত্মা মিশাইতে সক্ষম না হই; কেন আমি ঐ বিরাটদেহ হইতে এই আত্মদেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘটনাভিঘাতে মুহ্যমান হই। যে ঘটনারাশি আমার অনন্ত লীলাবৈচিত্র, তাই কি না আজি আমার নিকট অনন্ত ভয়স্বরূপ! এ দুঃখ, এ কথা, বলি কারে; আর কত কাল এরূপে যাইবে প্রভু? এ অন্ধনেত্র কি কখনও উন্মিলিত হইবে না? বল বল প্রভু, কখনও কি উন্মিলিত হইবে না?

"বিদ্যাসীতাবিয়োগক্ষুভিতনিজসুখঃশোকমোহাভিপন্নঃ,
চেতঃ সৌমিত্রিমিত্রোভবগহনগতঃ শাস্ত্রসুগ্রীবসখ্যঃ
হত্বান্তে দৈন্তবালিং মদনজলনিধৌ ধৈর্য্যসেতুং প্রবধ্য,
বিধ্বস্তাবোধরক্ষঃপতিরধিগতচিজ্জ্ঞানকীস্ত্বাত্মরামঃ।"

অপথ স্থানে যখন পথ পড়ে, তখন এই বিশেষ স্থান বাহিয়া চলিতে হইবে এমন যুক্তি করিয়া কিছু লোক সকলে চলে না। সকলেই যদৃচ্ছা স্বাধীন ভাবে চলে, অথচ তাহাদের চলা একস্থান বাহিয়াই কার্য্যত দাঁড়ায় এবং যেখানে কখনও পথ ছিল না সেইখানে সুন্দর পথ পড়িয়া যায়। এরূপ হয় কেন এবং স্বেচ্ছাগামিতা সত্বেও এরূপ একস্থানবাহিকা বুদ্ধি কোথা হইতে উদ্ভব হয়? বিশেষ সঙ্কল্পাত্মক ও স্বেচ্ছাশক্তির প্রতিঘাত শূন্য মানবীয় স্বভাব যখন স্থিরভাবে স্থিত, তখন উহা উক্ত একস্থানবাহিকা বুদ্ধি আপনিই আনিয়া উপস্থিত করিয়া থাকে। কেবল এবিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই এরূপ

স্বভাব হইতে প্রবর্ত্তিত ফলাফল যাহা কিছু তাহা, দেশ কালপাত্রজনিত দৃশ্য-পার্থক্য পরিত্যাগ করিলে, সকল দেশে সকল সময়ে সকল সম উন্নত পর্য্যায়স্থ মানুষেই একরূপের দেখিতে পাওয়া যায়। এ হিসাবে, চিত্তোৎকর্ষ পর্য্যায়ের সমতা প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, সকল দেশের সকল জাতির দেবতত্ত্বের মধ্যেই সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইবার কথা এবং কার্য্যত হইয়া থাকেও তাহা। বস্তুত সকল দেশের সকল জাতিরই আদিম দেবতত্ত্ব আলোচনা করিলে, তাহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য এবং একতা অতি সুন্দর ভাবেই লক্ষিত হইতে থাকে। যদিও তাহারা পরস্পরে অতি দূরান্তরে ও স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি তাহাদের সৌসাদৃশ্য ও একতাপক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। যে যে জাতির মধ্যে সেই সৌসাদৃশ্য অধিক ঘনিষ্টতা-যুক্ত, আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে সেই সমস্ত জাতিই পূর্ব্বে একবংশীয় ছিল। ভাষাবিষয়ক সৌসাদৃশ্যও তাহাদিগের নিকট একবংশীয় পক্ষে আর একটি অকাট্য প্রমান। বলা বাহুল্য যে, দেবতত্ত্ব এবং ভাষা বিষয়ক একতা থাকিলেই যে একবংশত্ব হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, যেরূপ দেখা গেল, তদ্রূপ একতা এবং সৌসাদৃশ্য স্বভাবে আনিয়াও প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

অন্তঃ প্রকৃতি বহিঃ প্রকৃতিতে সম্মিলিত হইলেই রূপের বোধ হয়; রূপের পৃথকত্ব মানবের আত্মপটে যেরূপ রেখা পাতিত করে, তাহা হইতে তদ্রূপ (তদ্রূপ ভাব বিধায়ক ও বটে) নামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানব এই নাম ও রূপের অধিকারী হইলে তখন উহার সাহায্যে দৃশ্যাদৃশ্য যাবত পদার্থ আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হয় ও তাহাতে সক্ষম হইয়া থাকে। যাহা যাহা আধিভৌতিক আয়ত্তের ভিতরে তৎকালে আইসে, তাহা ইহ সাংসারিক বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; যাহা তদতীতে থাকে, তাহাই লোকান্তরের বিষয়াংশরূপে দেবতত্ত্ব মধ্যে প্রবেশ করে। আদিতে আয়ত্তীকরণ শক্তির অপ্রশস্ততা হেতু, অবিশ্লেষিত ও জড়জগতের ঘন আবরণের দ্বারা অধিক পরিমাণে আবরিত থাকায়, তাৎকালিকী দেবতত্ত্ব এরূপ স্থূলাকার প্রাপ্ত হয়। ক্রমে সেই আবরণ যতই চিত্তাধিকারে আসিয়া অপসারিত হইতে থাকে, দেবতত্ত্বও ততই স্থূলতা পরিত্যাগে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ

করে। আদিম কালীয় প্রাকৃতিক শক্তি ও বিষয়াদির রূপে ও রূপকে গঠিত দেবতত্ত্বসহ, সভ্য সাময়িক দেবতত্ত্বের তুলনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। দেবতত্ত্ব কিরূপে কল্পিত হয়, তাহা উপরে একস্থানে বলিয়াছি। সে কল্পনাযোগে যতদিন দেবতত্ত্ব পরিস্ফুট এবং পরবল যতদিন স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত না হয়, ততদিনই মানব আত্মবলদৃপ্ত পশুভাবে থাকে। কিন্তু দেবতত্ত্ব পরিস্ফুট হওয়ার সঙ্গে পরবলের অস্তিত্ব স্পষ্টত হৃদ্বোধ হইবায়, মানব যেদিন পরবলের নিকট বিনত মস্তক হইতে শিখে; সেই দিন হইতেই সে পশু ঘুচিয়া মানুষ হইতে আরম্ভ করে। পরবলের প্রতি নির্ভর ও তাহার প্রতি ভক্তির উদয়, এই উভয়ই মানুষ হওয়ার ও মনুষ্যত্ব পথে যাওয়ার একমাত্র নিদানভূত কারণ। তদুভয়ের অভাবে পশুত্ব, তদুভয়ের অস্তিত্বে মনুষ্যত্ব, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

শিশুর গঠিত পুত্তল আর নিপুণ বৃদ্ধের গঠিত পুত্তল, বিষয় এবং উদ্দেশ্য যদিও এক, তথাপি তাহাদের মধ্যে দৃশ্যত এবং করণ ও উপকরণে কতই অন্তর! আদি মানবের দেবতত্ত্ব ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত মানবের দেবতত্ত্ব, এতদুভয় সম্বন্ধেও সেইরূপ। চিত্তোৎকর্ষ ও ধারণা ভেদ হেতু কেবল আকার ও প্রকার ভেদ, নতুবা বিষয় এবং উদ্দেশ্য যাহা তাহা এক। অন্ধ বালকগণের স্পর্শিত স্তম্ভাকার, সূর্পাকার, ইত্যাদি হস্তিরূপের ন্যায়; আদি মানব এই মহাপ্রাকৃতিক ক্রিড়া দৃষ্টে বিশ্বপতির ধারণা করিতে গিয়া, কেহ তাঁহাকে অগ্নিরূপ, কেহ তাঁহাকে বায়ুরূপ, ইত্যাদিরূপে কল্পনা করিয়াছে। ক্রমে দৃশ্যমান অগ্নি বায়ু যে দেবতা নহে ইহা যখন হৃদ্বোধ হইয়াছে, তখন আবার তাহাদের পশ্চাতে অধিষ্ঠাতৃদেবস্বরূপ যে একজন আছেন এই বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এবং যে পদার্থবিষয়ে অধিষ্ঠিত, তদীয় স্বভাব ও আকার প্রকারাদি চিত্তক্ষেত্রে যেরূপ আকৃতি উৎপাদন করে, সেই আকৃতি অনুসারে; সেই 'এক জনের' মূর্ত্তিকল্পনা ও ধারণা করিতে যাওয়ায়, ক্রমে পৌত্তলিকতার উৎপত্তি হইয়াছে। এ পৌত্তলিকতায় নিন্দনীয় বিষয় কিছুই নাই। বরণ বিশেশ্বরের অন্বেষণ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উহা নিদর্শন স্বরূপ। সকল দেশের সকল জাতিতেই, যতদিন তাহাদিগে পূর্ব্বকথিত স্থিরস্থিত স্বভাবের ক্রিয়াছিল, ততদিন প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় দেবতাজ্ঞান এবং তাহা হইতে পৌত্তলিকতার উৎপত্তি, সমান ভাবেই

হইয়াছিল এবং সে বিষয়ে প্রায় সকল আদিম জাতির মধ্যেই সুন্দর সৌসাদৃশ্য ও একতা দৃষ্ট হয়। বাইবলে যদ্রূপ দৃষ্ট হয়, ঈশ্বর সর্ব্বদা পিছনে লাগিয়াও, য়িহুদি জাতিকে পৌত্তলিকতা হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই; কেমন করিয়া করিবেন,—পরদেব এবং পরলোক সম্বন্ধীয় ধারণা যাহা জীবনের একমাত্র অবলম্বন, কে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে রাজি হয়? বলা বাহুল্য যে য়িহুদিদিগের মধ্যে সে আদিম পৌত্তলিকতাও উক্তরূপে উৎপন্ন।

ক্রমে মানবীয় মনের উৎকর্ষ সহ স্বাভবের উপর স্বেচ্ছাশক্তির যখন বিশেষ সঙ্কল্পিত ঘাত প্রতিঘাত হইতে থাকে, তখন স্বভাবজ বিষয় মাত্রেই এবং স্বভাবজ দেবতত্বও, রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। দেশ কাল ও পাত্রভেদে বিশেষ সঙ্কল্পাত্মক স্বেচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বিভিন্নতা হেতু সে রূপান্তরে, স্বভাবজ বিষয়ের ন্যায়, আর নানা জাতির মধ্যে সৌসাদৃশ্য ও একতা রক্ষিত হয় না। সেই রূপান্তরের সূত্রপাত হইতে, বিভিন্ন জাতীয় দেবতত্ব সকল ক্রমে পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে সম্পূর্ণতই পৃথক আকার ধারণ করিতে থাকে। হিন্দুজাতির আদিম দেবতত্বের সহ, বহু বিভিন্ন জাতীয় দেবতত্বেরই একতা ও সৌসাদৃশ্য অতি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়; কিন্তু পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতত্ব সহ আর সেরূপ একতা প্রভৃতি দৃষ্ট হয় না। আদিম দেবতত্ত্ব হৃদয়যোগে উদ্ভূত আর কথিত পরবর্ত্তী দেবতত্ব বুদ্ধিযোগে উদ্ভূত; বুদ্ধি সকলের সমান নহে, কিন্তু হৃদয় প্রায়ই এক।

স্বভাবজ সরল দেবতত্বের উপর বিশেষ সঙ্কল্পাত্মক স্বেচ্ছাশক্তির ক্রিয়া দ্বিবিধরূপে বর্ত্তে, এক আদিম সরল পৌত্তলিকতা প্রভৃতিকে কুটিলতা ও জটিলতা প্রাপ্ত করাইতে থাকে, যেমন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতত্বাদি; অপর সে সরল পৌত্তলিকতাদিকে ক্রম সূক্ষ্মতায় আনিয়া, অবশেষে মানবকে তদতীতে আত্মভাবে লইয়া উপস্থিত করে। সে আত্মারামতায় উপস্থিত হইলে, তখন আর পৌত্তলিকতার আবশ্যক থাকে না। কিন্তু সে আত্মারাম অবস্থায় না উঠিতে উঠিতে যাহারা পৌত্তলিকতা পরিশূন্য হইতে চেষ্টা করে; তাহারা দেবতত্ব পথে অবলম্বন শূন্য হইয়া পড়ে। মানবের

অবলম্বন দুই হইতে পারে, এক ভূত বা পুত্তল, অপর আত্মা। যাহারা আত্মভাবে উপস্থিত হয় নাই, তাহারা কেমন করিয়া পুত্তলাতীত নিরাকারকে অবলম্বনরূপে সম্মুখে স্থাপিতে সমর্থ হয়? অথচ অবলম্বন শূন্য হইয়া থাকিবারও সাধ্য নাই, সুতরাং শেষে দাঁড়ায় এই যে দেব প্রতিরূপ পুত্তলের পরিবর্ত্তে, আত্মারাম প্রাপ্ত নরবিশেষের উপাসনা আসিয়া প্রবর্ত্তিত হয়; যেমন খৃষ্ট এবং বুদ্ধের উপাসনা। ইহাও প্রকারান্তরে আর এক পৌত্তলিকতা; যদিও বহিরূপকরণে গঠিত হয় না বটে, কিন্তু মানস উপকরণে সর্ব্বদাই গঠিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এখানেও অবলম্বন আছে এবং উপাসনা চলিতে পারে,—"যথাভিমত ধ্যানাদ্বা"; কিন্তু দুর্দ্দশা তাহাদের যাহারা পৌত্তলিকতা পরিশূন্য হইয়াছে, অথচ চিত্তের কোন উন্নতি হয় নাই এবং যাহাদের পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে আত্মারাম প্রাপ্ত কোন লোকও উপাস্যরূপে স্থাপিত হয় নাই। তাহারা সর্ব্বদাই অস্থির ঘূর্ণায় ঘূর্ণিত, নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষায় বিতাড়িত, অথচ কোনদিকেই কূল বা স্থির নিদর্শন কিছুই পায় না, যেমন অধুনাতন ব্রাহ্মগণ। ইহাদের প্রকৃতি ও উদ্যম এ উভয়ই অতি প্রসংসার এবং অনুকরণীয়; কিন্তু নিদর্শন এবং অবলম্বন, এ উভয়ই শোচনীয় এবং পরিতাপকর। তাহাদিগের কৃত কোন অনুষ্ঠানই যে জাতীয়ভিত্তির উপর দাঁড়াইতেছে না, উহাই তাহার একমাত্র কারণ। যাহা কিছু করিতে যায়, তাহাই জাতীয় প্রকৃতির অরুচিকর ভাবে। কেবল ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে; অনেক স্থলে অনেক সময়েতেই এরূপ ঘটিয়াছে। সামান্য চিত্তোৎকর্ষ প্রাপ্ত মানবের পক্ষে, ভাবী পরিণামের স্থির নিদর্শনদায়ক আপ্তবাক্যপ্রসূত সাকার উপাসনা অপরিত্যজনীয়; তদভাবে কর্ম্মপথ ও নীতিপথ উভয়েতেই প্রতিভ্রম ও বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে, যেহেতু পরিণাম ও উপাস্যের স্পষ্টত ধারণা ভিন্ন ভক্তি এবং উপাসনা ও উপাসনা-পরিণাম উভয়ই অন্ধের মৃগয়া সদৃশ হয়।

মানবীয় মনের যথেষ্ট উন্নতি অপেক্ষা না করিয়া পৌত্তলিকতা দূর করিতে গেলে, পরিশেষে আত্মারাম প্রাপ্ত নর-উপাসনায় আসিয়া পরিণত হয়। দেবপ্রতিরূপের উপাসনা ভাল, না তথাবিধ নর-উপাসনা ভাল? ফলের অংকে তারতম্য অতি সামান্যই, যেহেতু সে নর-উপাসনাও যখন

দেবপ্রতিরূপ বুদ্ধি হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহার মধ্যে প্রশংসনীয় এবং সৌভাগ্যবান বলি সেই কতকাংশ হিন্দুগণকে যাহারা এতাদৃক জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে, দূরদৃষ্টি হেতু আত্মারাম-প্রাপ্ত নরদিগেতে উপাস্যভাব কিছু না দিয়া, তাহাদিগকে কেবল শিক্ষকতা পদে মাত্র বরণ করিয়াছিলেন। ইহারা সে নর-উপাসক অবস্থা অপেক্ষাও যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই উহা দ্বারা সূচিত হইতেছে; যে আত্মভাবতা অন্যত্রে দেবত্ব স্বরূপে দৃষ্ট হয়, সহজ ভাবেই সে আত্ম-ভাবতার সঙ্গে সে হিন্দুরা সুপরিচিতরূপে দৃষ্ট হইতেছেন। যাহা হউক, সর্ব্বসাধারণের জন্যে, এই আত্মারাম প্রাপ্ত বা যে যেমন যুগ তদনুরূপ অভ্যুন্নত চিদাভিমুখি ব্যক্তিগণই, দেবতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্ব একটিত করিয়া থাকেন। উপাস্য বলিয়া হউক, শিক্ষক বলিয়া হউক, বা যে কোন দৃষ্টিতেই হউক, তাঁহারা এজগতের যে সর্ব্বপ্রকারেই পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ বা দ্বিরুক্তি মাত্র নাই। আত্মারামতা যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সংসারে জ্ঞানলাভের যত কিছু পন্থা আছে, তন্মধ্যে যোগমার্গই শ্রেষ্ঠ-তম; তদ্দ্বারা কর্ম্মশক্তি সকলেরও অপরিমিত পরিস্ফুরণ হয়। যোগা-লোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

অতঃপর কোন জাতিকে, 'তোমার দেবতত্ত্ব ভাল নহে, আমার দেবতত্ত্ব ভাল, অতএব উহা গ্রহণ কর' এরূপ বলিবার বিষয় কিছুই নাই। যে যেমন জ্ঞানোৎকর্ষ পর্য্যায়ে অবস্থিত, তাহার পক্ষে তদনুষ্ঠিত দেবতত্ত্বই উপকারী ও কার্য্যকর; অন্য তাবত অংশত অপকারী হয়। কোন হীনপর্য্যায়ের লোককে উচ্চ পর্য্যায়ের দেবতত্ত্ব দিলেও, সে তাহা অবিকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; তাহাকে তখনই বিকৃত করিয়া স্বীয় সমতায় আনিয়া থাকে, যেমন সাঁওতাল আদি ইতরবুদ্ধি জাতি কর্ত্তৃক গৃহিত খৃষ্টি-য়ানী; কর্ম্মজ্ঞানশূন্য হিন্দুকর্ত্তৃক গৃহিত হিন্দুয়ানীর জ্ঞানকাণ্ড। 'এ দেবতত্ত্ব ভাল নয়, এটা ভাল,' এই বলিয়া একটার পরিবর্ত্তে আর একটা এক-জনের ঘাড়ে চাপানর অপেক্ষা; তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে বরণ মার্জ্জিত এবং উন্নত করিবার চেষ্টা করা বিধি। কারণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, মানুষ আপনা হইতেই যাহা ভাল এবং যাহা তাহার প্রকৃতিসহ সমধর্ম্মী, তাহা

গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেরূপ গ্রহণস্থলে, কোনরূপ বহিরাকর্ষণের ঘাত প্রতিঘাত না থাকিলে, সে স্বীয় স্বজাতীয় দেবতত্ত্বকেই, যে কোন প্রকারে হউক, স্বীয় সমতায় সংস্কৃত করিয়া লয়। কিন্তু নষ্টবুদ্ধিকল্পিত দেবতত্ত্বাদি যাহা, যাহা সর্ব্বদৃশ্যতই মানুষকে উন্নত না করিয়া বরণ অবনতি প্রাপ্ত করাইয়া থাকে, তাহাকে যে কোনরূপে পরিহার করানতে মঙ্গল আছে; যেমন তান্ত্রিক বামাচার প্রভৃতি।

দেবতত্ত্ব মনুষ্যমন হইতে উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং বিলয়ে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াই যে তাহা কল্পিত এবং মিথ্যা, সুতরাং অভক্তির জিনিস, তাহা নহে। মনুষ্য মন-প্রসূত বিষয় ত এ সংসারে অসংখ্য অথবা মানবীয় সংসারের সমস্তই; তাহারা যদি সত্য এবং শ্রদ্ধার পদার্থ হয়; তবে দেবতত্ত্বও না হইবে কেন? অন্যান্য তত্ত্বও যাঁহার অংশত বিভূতি প্রকাশ, দেবতত্ত্বও অংশত তাঁহারই বিভূতি প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর সর্ব্বদাই নিমিত্ত এবং কারণযোগে আত্মবিভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে প্রতিভাবলে অন্যান্য তত্ত্ব দর্শিত হয়, সেই প্রতিভাবলেই, তাহা ঘনিভূত হইলে, দেবতত্ত্ব দর্শিত হইয়া থাকে। তাবত তত্ত্বাপেক্ষা দেবতত্ত্বই গরিয়সী।

"অধো ন উর্দ্ধং ন শিবো ন শক্তিঃ,
পুমান্ন নারী নচ লিঙ্গমূর্ত্তিঃ।
ন ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্নচ দেবরুদ্রো
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায়॥"

৬

মহাপ্রকৃতি কর্ত্তৃক নিক্ষেপিত প্রতিভাসে প্রতিভাসিত আত্মসত্ত্বা যেমন দেবতত্ত্বরূপে প্রকটিকৃত হয়; তদ্রূপ প্রতিভাসে প্রতিভাসিত জ্ঞানসত্ত্বা যাহা, তাহাই নীতিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মানবীয় মনের শ্রেষ্ঠ শাসন-ধারণা যাহা,তাহা দেবতায় আরোপিত হওয়ায়,দেবতা বিশ্বশাসক হয়েন এবং মানবীয় শ্রেষ্ঠজ্ঞানজনিত সদসদ্বুদ্ধি যাহা তাহা সেই দেববিভূতিতে সংযোজিত হওয়ায়, দেবতাদীষ্ট নীতিরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। এখানে যে শ্রেষ্ঠশব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে,তাহার অর্থ অনাগতদূরদর্শী চিরভিমুখী প্রতিভাশালী চিত্তপ্রসূত বিষয়, যাহা স্বীয় সময়ের তুলনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

যাহা হউক, মনুষ্যচিত্ত স্বয়ং যদিও নীতির মূল-উৎপাদক, তথাপি ঐ চিত্ত সর্ব্বদা নানা বিক্ষেপে বিক্ষেপিত হওয়ায় উহা ভ্রান্তিশীল এবং এক বিষয় অতি সহজেই ভুলিয়া আর এক বিষয়ে মাতিয়া উঠে ; সুতরাং ঐ নীতি অতি শীঘ্রই বিলুপ্ত হইতে পারে এবং মানবত্ত সদসদ্বোধের অভাবে অনেক কুকর্ম্ম করিয়া ফেলে। রাজকীয় আইনও মনুষ্যপ্রসূত বটে, কিন্তু তাহা লোকের মনে থাকে তখন, স্থায়ী হয় তখন এবং কার্য্যকরী হয় তখন, যখন তাহা রাজশক্তিতে আরোপিত হয়। নীতিও স্থায়ী হয় তখন এবং কার্য্যকরী হয় তখন, যখন তাহা দেবশক্তিতে আরোপিত হয়। নীতি দেবশক্তিতে আরোপিত এবং দেবাদেশরূপে গৃহীত হইলেও, মানুষের মন এমনই অনবহিত ও ভোলা যে, সর্ব্বদা তাহার চর্চ্চা ভিন্ন নীতিমার্গে হয়ত একেবারেই বিস্মৃতিযুক্ত হইয়া যায়। নীতি বিস্মৃত হইলে মানুষ সদসদ্ বোধের বিকারে অধঃপাতে যাইবার পথে দাঁড়ায়। নীতিকে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার জন্য যতগুলি উপায় আছে, তাহার মধ্যে উপাসনা ও অর্চ্চনাদি ক্রিয়া সর্ব্বপ্রধান।

মানব আপ্তভাবে উপস্থিত হইলে, তখন তাহার উপাসনা করা বা না করা উভয়ই সমান হইয়া দাঁড়ায় এবং তদবস্থার যে উপাসনা তাহাকেই এক-মাত্র নিষ্কাম উপাসনা, ধর্ম্মের খাতিরে ধর্ম্মালোচনা, দেবত্বর খাতিরে দেবোপাসনা, বিষ্ণুপ্রীতিকামানুসরণ, বলিতে পারা যায়। তন্নিম্নস্থ যে কোন পর্য্যায়ের লোক, তাহারা যে যেরূপে ও যেভাবে এবং যে যে খানে উপাসনা করুক না কেন, তাহাদের কোন উপাসনাই নিষ্কাম নহে। দেবতার নীতি মনে থাকিবে, দেবতার প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিত হইবে এবং তজ্জন্য কর্ম্মসদসদ্ বিচারে সক্ষম হইয়া সুকর্ম্মরত হইতে পারিব, ইহা ভাবিয়া অতি অল্প লোকেই উপাসনা করিয়া থাকে। সকলেই কোন না কোনরূপ ফল কামনায় উপাসনা করে; কেহবা রোগাদি যে কোন দেবদৌরাত্ম্য পরিহৃত হইবার জন্য, কেহ সাংসারিক ঐশ্বর্য্যাদি লাভের জন্য, কেহ বা পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভের জন্য, ইত্যাদি নানা প্রকার কামনা কল্পনায় করিয়া থাকে ফলের অঙ্কে যদিও নীতি সকল পালিত এবং দেবতার প্রতি ভক্তিও বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু উপাসনাপ্রবর্ত্তক মনের সঙ্কল্প অন্যরূপ; এই এই রূপ না

করিলে দেবতা অভিপ্সিত ফল দান করিবেন না বা এইরূপ অমঙ্গলের উৎপাদন করিবেন, এই জন্য। আমার বোধ হয় যে, কেবল সুকর্ম্মিতা বুদ্ধিমা অবলম্বন স্বরূপ হইলে, কেহই সেরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত ও নীতিবান হইতে চাহিত না।

মানবকে যাহা করিতে হইবে, যাহা হইতে হইবে, মানবের সরল স্বভাব তাহা আপন হইতেই প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; অথচ প্রকাণ্ড চিত্ত বিক্ষেপ হেতু সর্ব্বদাই তাহা বিস্মৃতির আবরণে আবরিত হইতে চায়। সে বিস্মৃতি মোহকে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত মানবকে কতই না স্বীয়কৃত কৃত্রিম কৌশল, কামনা ও প্রয়োজন সকলের অবলম্বন করিতে হয়। কেহ কেহ সে সকল কৃত্রিম উপায় যোগে অভিপ্সিত লাভ করে বটে; কিন্তু অধিকাংশই আবার তৎসমস্তের তন্তুজালে আবদ্ধ হইয়া মোহাচ্ছন্ন, তাহাদিগকে অদৃষ্টকৃতবৎ দৃষ্টি করে এবং তাহা ভেদ করিতে না পারিয়া হস্তপদসঙ্কোচে আত্মধ্বংস করিয়া ফেলে। মানবীয় মনীষার অনেক গুণ, কিন্তু বুঝিয়া চলিতে না পারিলে তাহাতে দোষও অনেক। যে মনীষা সঙ্কট উদ্ধারের একমাত্র উপায়, তাহাই আবার ব্যবহার বিশেষে সঙ্কট জড়াইয়া আনে। স্বভাবানুযায়ী সরল ভাব সর্ব্বদাই সুপথের পথদর্শক স্বরূপ হয়, আড়ম্বর এবং কূটভাব তদ্বিপরীতে সর্ব্বদাই কাঁটাবনে পাতিত করিয়া থাকে। মনীষাসংসারকে যে সকল কূট কৃত্রিমতা আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একবার তাহা কাটিয়া বাহির হইতে পারিলে, তাদৃশরূপ অক্লিষ্ট হৃদয়ে উন্নত অনন্তমার্গে উড্ডীন হইতে পারি, কিন্তু তথাপি কর্ম্মদোষ ও কর্ম্মসূত্রে তাহা যেন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে! মনে জানিতেছি, বুদ্ধিতে বুঝিতেছি, তথাপি সে অসৎভাবকে বিদূরিত করিতে পারি না! কি আক্ষেপ, কি পরিতাপ, বিড়ম্বনা আমাতে, বিড়ম্বনা আমার স্থজিত সংসারেতে! সেই মানুষই যথার্থ সৌভাগ্যবান, যে কেবলমাত্র স্বীয় সরল স্বভাবের উপর দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম; তাহাকেই যথার্থত মনুষ্য নামের অধিকারী বলা যায়। চিত্তবিক্ষেপ ও তজ্জনিত এবং তন্নিমিত্তক উত্তর ফলাদি মানবের জড় প্রকৃতিবশে সমুৎপন্ন হয়। উপাসনার ক্রম পরিচ্ছিন্নতায় সে জড়প্রকৃতির খেলা ক্রমশিথিলতা প্রাপ্ত হয়; মানবীয় আত্মিক প্রকৃতি যাহা, তাহাও

তখন ক্রমে সরল স্বভাবাভিমুখে উত্থিত হইবার নিমিত্ত স্বাধীনতা অনুভব করিতে থাকে। আদিতে অজ্ঞান জড়িত সরল স্বভাব হইতে উত্থিত হইয়া, মধ্যকালে মোহপান্থিতে ভ্রান্তভ্রমণ করিয়া, আবার যখন সজ্ঞান জড়িত ভাবে সেই সরল স্বভাবে উপনীত হইতে পারিবে, তখনই মানবের যথার্থত পরমার্থ লাভ। বালক বালক ঘুচিয়া মানুষ হয়; আবার মানুষ ঘুচিয়া যখন বালক হইবে, তখনই সে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবে, দুই বালকত্বে প্রভেদ এই যে, এক অজ্ঞান বালক, অপর সজ্ঞান বালক।

মানব নিজেই নিজের দেবতা কল্পনা করে, নিজেই নিজের উদ্ভাবিত নীতি সেই দেবতায় আরোপ করে; অথচ নিজেকেই সেই দেবতার উপাসক এবং নিজেকেই সেই নীতির অনুগমনাকাঙ্ক্ষীরূপে দৃষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু স্বোদ্ভাবিত বিষয় এবং স্বয়ং, এ উভয়ে উপাস্য উপাসক ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় কোথা হইতে? উপাস্য দেবতা এবং নীতি মানবের আত্মিক প্রকৃতি হইতে এবং উপাসক ভাব মানবের জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়;—জড় নিয়তই আত্মার অধীন। কেবল আত্মিক প্রকৃতি হইলে, আত্মভাবে ঈশ্বর সাযুজ্য থাকিত এবং নীতি সকলও নিয়ত যথাস্বভাবে অনুবর্ত্তিনী হইত; কিন্তু জড় প্রকৃতি জড়িত হওয়ায় তাহা হইতে পায় না। প্রথমত, জড় প্রকৃতির সংস্রব হেতু, আদি হইতেই, দেবতা এবং নীতি, এ উভয়ের কেহই স্বীয় শোভন দ্যুতিতে প্রকটিত হইতে পারে না; অপরিচ্ছিন্নরূপে প্রকটিত হয়। দ্বিতীয়ত, জড় প্রকৃতিই মানবীয় প্রয়োজন জালের উৎস, সুতরাং উপাসনা ও উপাসকভাব উভয়ই সকামরূপে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানোন্নতি সহ দেবতত্ত্ব, নীতি ও উপাসনা, এ সকল যখন পরিচ্ছিন্ন হইয়া আইসে; তখন জড় প্রকৃতির খেলাও ক্রমে শিথিল হইতে থাকে এবং তখন, তাহার যে প্রয়োজনজাল আগে মনুষ্য চিত্তের উপর রাজত্ব করিত, তাহা মনুষ্যচিত্তের অধীন হয় এবং মনুষ্যচিত্তও তখন তাহাদিগের উপর রাজত্ব করে ও সে প্রয়োজনকে যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে খাটাইয়া থাকে। যে প্রয়োজন আগে কেবলমাত্র পাশববৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার উৎস স্বরূপ ছিল; এখন তাহা জ্ঞানমার্জ্জিত নীতির প্রতিভাসে প্রতিভাসিত হইয়া, দিব্য কর্ত্তব্যরূপে প্রতীয়মান হইতে

থাকে। যে প্রয়োজন সকল আগে নরকের দ্বারস্বরূপ ছিল; এখন তাহা বস্তুত স্বর্গের দ্বারে পরিণত হয়। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয়, মানবের পাশব বা নারকী দিক এবং দেব বা স্বর্গীয় দিক, এতদুভয়ের সন্ধিস্থল। মানবের আদিম বর্ব্বরতা হইতে কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদয়ের অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত পাশব বা নারকী দিক; এদিকের উন্নতিতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, কারণ পরমুহূর্ত্তেই কিছুমাত্র প্রলোভনের উদয় হইলে, তাহার ব্যতীক্রমে অধঃপাতে যাইতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হইতে কর্ম্ম সকল নিষ্কাম ভাব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে; তখন মানবের দিব্য বা দেবদিকে গতি হইতে থাকে এবং এখন হইতে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হওয়ারই কথা, অধঃপতন সংঘটন কদাচ সম্ভব হইয়া থাকে।

প্রকৃত উপাসনা যখন, তাহা হৃদয়শূন্য শুষ্ক ইচ্ছা ও মতলবের উপর আইসে না; অথবা আসিলেও কখনও তাহা স্থায়ী হয় না এবং চিত্তের পূর্ণ আবেশও তাহাতে আসিয়া পৌঁছে না; সুতরাং উপাসনার উদ্দেশ্য এবং ফল যাহা তাহাও অতি সামান্য বা নগণ্য পরিমাণেই লাভ হইয়া থাকে, হয়ত একেবারে লাভ হয়ও না। সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা সমন্বিত প্রকৃত উপাসনার প্রবর্ত্তক একমাত্র ভক্তি। ভক্তি পদার্থটা কি? পদার্থদ্বয়ে সমধর্ম্মী অংশ পরস্পরার মধ্যে স্বভাবজাত নিত্য আকর্ষণ যাহা, তাহা স্থান বিশেষে নানা নাম ধারণ করিয়া থাকে এবং স্থান বিশেষে তাহা ভক্তি নামেও নামিত হয়। জড় জগতে জড় পদার্থ দ্বয়ের মধ্যে তাহা যৌগিকাকর্ষণ; জীবজগতে নীচের প্রতি তাহা অনুগ্রহ এবং দয়া; পুত্রাদির প্রতি তাহা স্নেহ; স্ত্রীর প্রতি তাহা ভালবাসা; সমযোগ্যের প্রতি তাহা বন্ধুত্ব; গুরুজনের প্রতি তাহা সম্মান এবং দেবতার প্রতি তাহাই ভক্তি। এ জগতে সমধর্ম্মী পদার্থদ্বয়ের অস্তিত্বমাত্র থাকিলেই যে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ কার্য্যকরী রূপে দৃষ্ট হইবে, এমন কোন কথা নাই। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু নিকট হইলেই লোকনয়নে সে আকর্ষণকে কার্য্যকরী রূপে দৃষ্ট হয়; দূর হইলে, অদৃশ্য এবং অকার্য্যকরীবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জড়জগতে যেমন দেশব্যবধানে আকর্ষণ কার্য্যকরী বা অকার্য্যকরী রূপে দৃষ্ট হয়; চৈতন্য জগতেও সেই রূপ বোধব্যবধানের তারতম্যে

আকর্ষণ কার্য্যকরী বা অকার্য্যকরী রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের মর্ম্ম অবগত হইলে, উভয় উভয়ের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়, মর্ম্ম অনবগতে তাহা হয় না। আত্মচৈতন্য সহ পরচৈতন্যের সম্বন্ধ মানবের যতই অনুভূত হইতে থাকে, ততই দেবতা প্রতি মানবের ভক্তি প্রগাঢ় হইতে থাকে। সেই প্রগাঢ় ভক্তি হইতেই সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা সমন্বিত উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। ভক্তি, পরচৈতন্য সহ সাযুজ্য প্রাপ্তি পক্ষে, একমাত্র শক্তিমান প্রবৃত্তিমার্গ স্বরূপ; ইহাই ভক্তির অধিকার এবং তদর্থেই ভক্তির আবশ্যকতা ও সার্থকতা; তদতীতে ভক্তির আর কোন আবশ্যকতা বা ফল নাই। সাযুজ্য প্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মভাবে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা; আত্মভাবে উপনীত হইলে আর ভক্তির আবশ্যকতা বা ভক্তির পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। ভালবাসার পৃথক অস্তিত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ একাত্মপ্রাণাভিমুখে গতি, কিন্তু একাত্মপ্রাণতা উপস্থিত হইলে, আর ভালবাসার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। যে জনের সঙ্গে একাত্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে 'ভালবাসি' বলিলে তাহার অবমাননা করা হয়।

আত্মবোধ বিরহিত বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় না। পরচৈতন্য সহ কোন ব্যষ্টিচৈতন্য যদিচ একেবারে সংস্রব শূন্য হইতে পারে না সত্য, কিন্তু সে সংস্রব ও আকর্ষণ, দূরস্থিত লৌহ চুম্বকের আকর্ষণবৎ অদৃশ্য ও অকার্য্যকরী এবং দৃশ্যত শূন্যস্থলীয়। ভক্তিশূন্য বহির্ম্মুখ ব্যক্তি ঊর্দ্ধলোক সহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন এবং ঊর্দ্ধলোক প্রতি মোহান্ধ হওয়ায়; সমুদ্র তুফানে পতিত কর্ণধার শূন্য নৌকাবৎ, প্রয়োজন সমুদ্রে অবস্থা ও অভাবের তুফানে ওতপ্রোত হইয়া, অবশেষে জলমগ্নে আত্মধ্বংস করিয়া থাকে। কোথাও তাহার জন্য অবলম্বন নাই, কোথাও তাহার জন্য বিরাম স্থান নাই;—চিত্ত নিত্য অশান্তির আলয়। ভোগ, বিলাস, বৃথা কৌতুক, জল্পনাদিতে সে অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, নিরন্তর ছুটাছুটি করিতে থাকে;—তবু শান্তি মিলে না! অবশেষে কুকুর শিয়ালের জীবন অতিবাহিত করিয়া, কুকুর শিয়ালের মৃত্যুতে আপাতত দুঃখের অবসান হয়। স্বগৃহচ্যুত তুফানে পতিত যে, তাহার বিরাম সম্ভাবনা কোথায়? যেমন

আধিভৌতিক, তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবেও, আশ্রয়চ্যুত হইলে মানবের পক্ষে অশান্তি এবং ক্লেশের অবধি থাকে না।

দেবতায় পরাভক্তি, শান্তি এবং সদ্গতি লাভের একমাত্র পন্থা। যতক্ষণ মানব পরচৈতন্য ও পরাপ্রকৃতি হইতে নিজেকে পৃথক্ ভাবে দৃষ্টি করে, ততক্ষণই মানবের অশান্তি এবং দুঃখ। পুনশ্চ যত পরিমাণে একসম্বন্ধ ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়, ততই শান্তি এবং সুখের ভাগী হইতে থাকে। উপরেই আভাসিত হইয়াছে যে, পরাভক্তি হইতে পরম উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়।

উপাসনা দুই রকমের এবং দুইরকমে মানুষ উপাসনার ফল পায়। এক সাধ্য উপাসনা, অপর সিদ্ধ উপাসনা। সাধ্য উপাসনা তাহাকে বলা যায়, যাহাতে নিত্য এবং নিয়মিত নিয়মবদ্ধ অর্চ্চনা ও স্তুতি পাঠাদি এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা আহ্নিক আদি অনুষ্ঠিত হয়। সমাজবদ্ধ ভাবে উপাসনাও এতদন্তর্গত। কিন্তু ভণ্ড অভণ্ড তাবত লোক লইয়া সমাজবদ্ধ ভাবে, জনেকের উপাসনা বক্তৃতা শ্রবণে উপাসনা সহি করণ, কেমন কেমন যেন একটা তামসিক দৃশ্যের ন্যায় বোধ হইতে থাকে; দ্বীপান্তরে অর্দ্ধ স্বাধীনতা প্রাপ্ত কয়েদীরা যেমন সাতদিন অন্তরে এক একবার উপস্থিত হইয়া হাজিরা সহি করিয়া যায়, এ সামাজিক উপাসনাও প্রকৃত উপাসনাস্বরূপ বোধ না হইয়া যেন ঈশ্বরের কাছে বদমাইস্ কয়েদিদিগের সেইরূপ হাজিরা সহি বলিয়া বোধ হয়। সমাজবদ্ধভাবে, উপদেশাদি শ্রবণ পর্য্যন্তই সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু উপাসনা পর্য্যন্ত তেমন সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উপাসনা প্রতি মানবের সম্পূর্ণতই গুহ্য ও আত্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়, তাহাতে অংশ চলে না, বরাত চলে না; অথবা তাহাতে লোকের প্রশংসা আকর্ষণেও কোন লাভ নাই, নিন্দা আকর্ষণেও কোন লোকসান নাই। এ গুরুতর বিষয়ে প্রতি মানবকে নিজে খাটিয়া নিজের ফল নিজেকে লাভ করিতে হইবে, অন্যের তাহাতে কোন সংস্রবই থাকিতে পারে না। উপাসনা নিজের বিষয়, নিজে নির্জ্জনে ও একাকী সাধন ভিন্ন সর্ব্বদা সুসম্পাদিত হইবার কথা নহে। বোধগত ভাবায় সমাজ গৃহে সকল সমবেতে উপাসনা-বক্তৃতা শুনা অপেক্ষা, একাকী বসিয়া অবোধগত ভাবায়

উপাসনা করাও সহস্র গুণে অধিক ফলপ্রদ। সমাজমন্দিরে নানা রকমের লোক সমাবেশহেতু নানারূপ বিকৃতসত্তার আবর্ত্ততরঙ্গে, ব্যক্তিবিশেষের ভক্তি ও তদ্ভূত উপাসনা-প্রবাহ কখনই অবিকৃতে সুসম্পাদিত হওয়ার কথা নহে। ফলতঃ যে বিষয়সহ মানুষের সর্ব্বতোভাবে একা সম্বন্ধ, তাহা একক অনুসরণ করাই বিধি।

সিদ্ধ নামে আখ্যাত উপাসনা সকল, যখন পূর্ণ আন্তরিকতার মাত্রায় যে কোন কারণে না উঠিতে পারে, তখন তাহাও সাধ্য উপাসনার মধ্যে আসিয়া পড়ে। সাধ্য উপাসনার ফল দেবাদৌষ্ট নীতি সকল হৃদয়ে জাগরিত রাখা এবং দেবচরিতের আদর্শে প্রবুদ্ধ হইয়া অনুরূপ আত্মচরিত সংস্করণ পূর্ব্বক, শ্রেষ্ঠকর্ম্মে নৈতিক অংশীয় পারকতা লাভ করা; অথবা অন্য কথায় তথা পরিমাণে অন্ত্যোৎকর্ষ বা আত্মবোধে প্রবুদ্ধ হওয়া; তদন্তাতে নহে। অথবা এই ফলমাত্র পূর্ণমাত্রায় লাভ করিলে, লাভ করিতে বাঁকিই বা রহিল কি? এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফলই বা আকাঙ্ক্ষণীয় আর কি আছে? মানবের বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নত ও কর্ম্মক্ষম অবস্থায়, উক্তফলই অতিশ্রেষ্ঠ ও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত ও গৃহিত হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। অন্য ফল যাহা, তাহা অন্যরূপ সাধনা ও উপাসনায় প্রাপ্য, সে বিষয় পরে বিবেচিত হইবে।

সভক্তিচিত্তে সরল অন্তকরণে ও পূর্ণবিশ্বাসে তীর্থভ্রমণ ও শাস্ত্রাদি শ্রবণেও অবিকল সাধ্য উপাসনার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যাহারা ভণ্ড এবং নষ্ট; যাহারা ব্যবহারে কুকর্ম্মরত হইয়া, উপাসনা বা তীর্থভ্রমণাদিতে ভাবে যে তাহাদের কুকর্ম্মজনিত পাপের ক্ষয় হইবে; তাহাদের উপাসনা ও তীর্থ ভ্রমণাদি ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় ফলোপধায়ক। যে উপাসনা ও তীর্থভ্রমণাদির সহ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইতে থাকে, তাহা উপাসনাদি নহে। তদ্রূপ লোকের আচরিত ধর্ম্মকার্য্যাদিকে ধর্ম্মকার্য্য বলে না; তাহা দারুণ অধর্ম্ম ক্রিয়া।

সিদ্ধ উপাসনা, মানবের উপস্থিত অবস্থার তুলনে অতি কঠিন জিনিস। জানত কদাচিত কেহ তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়; হয়ত যোগীগণ জানত কিছু কিছু তাহা লাভ করিয়া থাকেন। অজ্ঞানতও, কোন কোন কারণপ্রবাহে, কখন কখন কেহ ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু যব যখন সেরূপ সিদ্ধিহেতু ফললাভ করে, তাহা যেন দৈব অনুগ্রহে প্রাপ্ত-

বৎ অনুভব করিয়া থাকে। সিদ্ধ উপাসনার বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা দৃষ্টিস্থলীয় হওয়া উচিত।

১। ইহা বোধ হয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন প্রকার বিশেষ রোগগ্রস্থ হইয়া চিন্তায় একান্ত ম্রিয়মাণ হয় বা দেবতা বিশেষের দোহাই দিতে থাকে, তখন হয় স্বপ্নে কাহার দ্বারা ঔষধ বিশেষের উপদেশ পাইয়া থাকে; অথবা স্বপ্নে এমনও আদেশিত হয় যে, "অমুক স্থানে অমুক ঔষধ পাইবে" এবং জাগ্রতবস্থায় সেখানে গিয়া সেই ঔষধই পাইয়া থাকে। কেহ বা স্বপ্নের পরিবর্ত্তে জাগ্রত অবস্থাতেই দৃষ্টত কোন মহাপুরুষ বিশেষ হইতে ঔষধ লাভ করিয়া থাকে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এরূপে প্রাপ্ত ঔষধে নিশ্চয়ই উপকার লাভ হইয়া থাকে। সে ঔষধে সে উপকার কেবল তাহার নহে, অপরেরও হইতে দেখা যায়; সুতরাং সে ঔষধ ও ফলকে কেবল মনের খেয়াল ও বিশ্বাস এবং তদ্ভূত র ফল বলা যায় না।

২। অনেকে অনেক বিষয়ের জন্য দেবদ্বারে হত্যাদিয়া লব্ধকাম হয়।

৩। কেহ কেহ পূজা অর্চ্চনা শান্তি সস্ত্যয়ন বা সাধনা বিশেষের দ্বারা অভিপ্সিত ফল লাভে সমর্থ হয়।

৪। কোন কোন যোগী বা মহাপুরুষ আদেশমাত্রে রোগাদির নিবৃ করিয়া থাকেন বা অপর কোন অভিপ্সিত ফল বিশেষও প্রদান করিয়া থাকেন।

৫। কেবল মন্ত্র শক্তির দ্বারা, আধিভৌতিক ক্রিয়া বা ফল বিশেষের উৎপাদন হইয়া থাকে। মন্ত্রশক্তির দ্বারা যে ফল বিশেষের উৎপাদন হইতে পারে, ইহা সকল দেশেই লোকে অল্প বিস্তর বিশ্বাস করিয়া থাকে। বেদমন্ত্রের প্রয়োগে যে ফলের উৎপত্তি হয় ইহা পূর্ব্বতন কি সাধারণ মানববর্গ, কি জ্ঞানী ও ঋষিগণ, সকলেই বিশ্বাস করিতেন। সেই ফলোৎপাদিকা শক্তির উপর বিশ্বাসহেতুই, অবিরত বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি হইত; এবং এখনও সেই বিশ্বাসে কিন্তু প্রযোক্তার পক্ষে অক্ষম ভাবে, বেদ মন্ত্রের কোথাও কোথাও প্রয়োগ হইয়া থাকে। সামবিধান ব্রাহ্মণে, কোন্ কোন্ সাম প্রয়োগে কিরূপ কিরূপ ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা সবিস্তারে আদেশিত হইয়াছে।

৬। খৃষ্টীয় ধর্ম্মেতিহাসে কথিত আছে যে, অনেক খৃষ্টীয় ধর্ম্মগুরু কেবল মাত্র উপসানা প্রভাবে অনেক অদ্ভুত কার্য্য সকল প্রদর্শন করায় 'সেণ্ট' খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৭। পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্রাভিমুখীন দেশের আবিস্কারক ইংরাজ রস, একবার ঘোর তুফান সঙ্কটে পতিত হইয়া, ঘোর নিরাশাস্থলে, কেবলমাত্র এক প্রগাঢ় উপাসনা প্রভাবে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল।

৮। প্রেত-তত্ত্বজ্ঞদিগের দ্বারা প্রেতাবির্ভাব করা হইয়া থাকে এবং ঐ সকল প্রেতের দ্বারা অভাবনীয় কার্য্য সকল কৃত হয়। ইত্যাদি। আর অধিক উদাহরণের উল্লেখ আবশ্যক নাই।

উপরে যে কয়টি ঘটনা-উদাহরণ প্রদর্শিত হইল, তাহা দেখিয়া হয়ত, অথবা হয়ত বলি কেন, নিঃসন্দেহই অনেকে হাসিয়া আকুল হইবে এবং ভাবিবে যে লেখকের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন বিশ্বাসবাতুল অতি অল্পই আছে। যাহাহউক সে হাসি বা টিটীকারিতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। যখন সর্ব্বত্রেই কখন না কখন অল্প বিস্তর ওরূপ ঘটনা ঘটার কথা শুনা যায় এবং যখন অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দেয় এবং লেখক নিজেও যখন দুই একটি ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে; তখন কেবল হাসি বিদ্রূপের ভয়ে পিছপাও হইলে, মূল বিষয়ের পূর্ণত আলোচনায় ব্যাঘাত পড়িয়া যাইবে।

যে কয়টি ঘটনা-উদাহরণ উল্লেখিত হইয়াছে, আরও যাহা কিছু তৎ-সম্বন্ধীয় অনুল্লেখিত আছে, কার্য্য এবং পরীক্ষা উভয়ত দেখা গিয়াছে যে তাহার কোনটিই, সাধনাকালীন সাধকচিত্তের নির্ব্বিকল্প সমাবেশ ভিন্ন, কখনও ফলোন্মুখ হয়না; অন্যথা সাধনা পণ্ডশ্রমে মাত্র পরিণত হয়। সবিকল্প চিত্ত সমাবেশে, কখনই তদ্রূপ তদ্রূপ ফল লাভে কেহ সমর্থ হয় নাই। ইহাও দেখা গিয়াছে যে একজন দেবদ্বারে হত্যাদিয়া নির্ব্বিকল্প চিত্ত সমাবেশ করে তখনই ফল লাভ করিয়াছে; আর একজন তদভাবে আজন্ম দেবতার কাছে মাথা খুঁড়িয়াও কোন ফল পায় নাই। উপহাসকেরা প্রায় সর্ব্বদাই নির্ব্বিকল্পচিত্ত সমাবেশে কাতর বা অক্ষম, সুতরাং তাহাদের দ্বারা তদুপায়ে কোনরূপ ফল লাভ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। সেরূপ উপহাসক প্রকৃতি

বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি কৌতূহল পরবশ হইয়া ওবিষয়ে চেষ্টাবান্ হইলেও, উক্ত কারণ জনিত নিষ্ফলতা লাভে, তৎ তৎবিষয়ের সত্যতা বিপক্ষে তাহাদের পূর্ব্ব সংস্কার আরও দৃঢ়মূল হইবার কথা। কৌতূহল বশ্যতায় কখনও নির্ব্বিকল্প চিত্ত সমাবেশ আইসে না; কেবল পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি হইতেই তাহা উদ্ভূত হইয়া থাকে।

প্রাচীন একটা সর্ব্বজন পরিচিত শ্লোক আছে,—

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

এ শ্লোক যে নিতান্ত অর্থশূন্য তাহা নহে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে ভাবনা প্রভাবে অনেক বিষয়েতেই অনেকে ফল লাভ করিয়াছে। ইহা বোধ-হয় অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রোগীর ভক্তি আকর্ষণের নিমিত্ত অনেক স্থলে ঔষধের নাম চিকিৎসক গোপন করিয়া থাকে; ভক্তি এবং বিশ্বাসের অতীতে সর্ব্বদা ফল ফলিলে, ওরূপ করিবার আবশ্যক হইত না। ফলতঃ উপযুক্ত ভাবনা থাকিলে, ফলও প্রায় সর্ব্বদা সম্ভব হয়; কিন্তু তেমন ভাব-নাও দুর্লভ, সুতরাং ফলও তেমন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্ত্র সম্বন্ধেও, ঐকান্তিকী বা নির্ব্বিকল্প চিত্ত সমবেশ যদিও প্রায়ই আবশ্যক; তথাপি এমনও ঘটনা দেখা গিয়াছে যে, প্রযোক্তা এবং প্রযুক্ত এ উভয়ের কাহাতে সেরূপ চিত্ত সমাবেশ না থাকিলেও, মন্ত্রের উদ্দেশ্যভূত ফলের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতেও আশ্চর্য্য কিছু নাই এবং কেন যে তদ্রূপ হইতে পারে, তাহা যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

উপরে যে কয়টি ঘটনা-উদাহরণ বিবৃত হইয়াছে, তৎ সমস্তের বিষয় বিশেষে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, বিষয় বিশেষ অনুসারে দ্বিবিধ মাত্র উপায় লক্ষিত হইতেছে;—এক ফলের গ্রহীতা বা দাতা ইহাদের যে কোন পক্ষে চিত্তের ঐকান্তিকী বা নির্ব্বিকল্প সমাবেশ, অপর মন্ত্র প্রয়োগ। একণে যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, এই দুইই সিদ্ধ উপাসনার অঙ্গ। চিত্তের নির্ব্বিকল্প সমাবেশের অপর নাম যোগ বলিতে পারা যায়।

যেমন বিক্ষিপ্ত সূর্য্যতেজ আতসী পাথরে কেন্দ্রীভূত হইলে, তাহার সম্মুখ স্থিত পদার্থকে অগ্নিজ্বালিত করিয়া থাকে; সেইরূপ বিক্ষিপ্ত চিত্ত কেন্দ্রীভূত

হইলে, তাহা যে কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহারই নিরাকরণ করিয়া থাকে। মনঃ যখনই কোন এক বিষয়ে ঐকান্তিকী ভাবে নিবিষ্ট হয়, তখনই তদ্বিষয়ে ফললাভ করিয়া থাকে, ইহাত নিত্য ঘটনা। মানুষ কার্য্য বিশেষের জন্ত যখন বিশেষরূপে ভাবিয়া থাকে এবং সে সময়ে ভাবনা যত গাঢ় হয়, তখন ফলও তত ভাল হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভাবনা বিশেষে ভাবনা ফল অনেক সময়ে আশাতীত লাভ হয় না; তাহার কারণ, কেবল ঐকান্তিকী নিবেশ হইলেই সব সময়ে উপায় পূর্ণ হয় না। বিষয় বিশেষে সমাবিষ্ট চিত্ত প্রয়োগেরও আবার প্রকরণ ভেদ আছে। প্রকরণ যদি ঠিক না হয়, কেবল চিত্ত সমাবিষ্ট হইলেই ফল লাভ হয় না। কিন্তু কোন্ ফল লাভের প্রকরণ কি, তাহা সাধারণে এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র পরিজ্ঞাত হয় নাই। তাহার পর চেষ্টা দ্বারা নির্ব্বিকল্প ভাবে চিত্তসমাবেশ করিতেও সাধারণতঃ সাধারণ লোকে অক্ষম। সুতরাং নির্ব্বিকল্প চিত্ত সমাবেশ রূপ সিদ্ধ-উপাসনায় ইচ্ছামত পারকতা এবং তদ্দ্বারা নিয়মিত ও অবশ্যম্ভাবীরূপে ফললাভে সক্ষমতা, এতদুভয়ে মানব অদ্যাপিও সামর্থ্য লাভ করে নাই। যোগীরা লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা বলিতে পারি না। তাই বলিতেছিলাম যে, সাধ্য-উপাসনাই আমাদের প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত; যেহেতু অজ্ঞাত বিষয়রূপ হাওয়ায় দড়ি দিয়া সর্ব্বদা সময় নষ্ট করিলে কর্ম্মক্ষতি হয়। তবে যে দুই একজন সিদ্ধ-উপাসনার ফল লাভ করিয়া থাকে, সে কেবল কোন দায়গ্রস্থে বিশেষ ভাবনাগ্রস্থতার হইতে হঠাৎ ও যদৃচ্ছাভাবে নির্ব্বিকল্প চিত্ত সমাবেশে উপস্থিত এবং প্রকরণ পথে পতিত হইবার লাভ করিয়া থাকে; লাভকারক স্বয়ংই বুঝিতে পারে না যে তাহা কি করিয়া ঘটিয়া উঠিল, সুতরাং সে ফললাভ দৈবানুগ্রহেরই উপর আরোপ করিয়া থাকে। অবশ্য, মানব যখন সিদ্ধ উপাসনায় নিয়মিতরূপে ফল লাভে সক্ষম হইবে, তখন নিশ্চয়ই এই পৃথিবী স্বর্গের আকার ধারণ করিবে; কিন্তু সে দিন এখনও অনেক দূরে। অতঃপর সে নিয়ম আবিষ্কারে যাঁহারা নিজেকে সক্ষম বিবেচনা করেন, তাঁহারাই সে পথের পথিক হউন। কিন্তু বাছারাম, তোমায় বলি; তোমার সে হাওয়ায় দড়ি দিয়া সময় নষ্ট করার কোন আবশ্যক নাই।

কিন্তু সেই ঐকান্তিকী চিত্ত সমাবেশ হইলেই বা ফল লাভ হয় কোথা হইতে এবং কারণই বা তাহার কি ? মানবীয় আত্মা আত্মস্বরূপে পরমাত্মার অংশ, সুতরাং সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বক্ষমবানতা আদি বিভূতি সম্পন্ন; কিন্তু এই স্থূল দেহে তিনি বদ্ধ হইলেই, তাহার তৎসমস্ত অভিধান সীমাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখন কাজেই তিনি অদূরগামী, অল্পজ্ঞতা ও ক্ষুদ্র ক্ষমতাদি যুক্ত হয়েন। দেহবদ্ধ আত্মার অবস্থান আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় জগৎ ব্যাপিয়া এবং মনরূপ ইন্দ্রিয় এতদুভয় জগতের মধ্যে সন্ধিসূত্র স্বরূপ। সেই মনঃ যখন আধিভৌতিক জগতের বিক্ষেপ ভাব হইতে বিমুখ হইয়া তৎসহ সম্বন্ধ শিথিলতায়, আধ্যাত্মিক জগৎ গত হয়; তখন আত্মা দেহাতীত স্বীয় ক্ষমতা ও শক্ত্যাদি তৎক্ষণের নিমিত্ত পুনর্লাভ করিয়া থাকেন এবং যে অভাববিশেষ জনিত চিত্ত-উত্তেজনা হেতুক চিত্তাবেশ হইতে তাঁহার তদ্রূপ লাভ, সেই অভাবকে তিনি তখন ভাবরূপের দ্বারা পরিপূরণ করিয়া দেন। সেই ভাবরূপ, জগতে ফল রূপে গৃহিত হয়। যেহেতু সে ফল সর্ব্বদাই চিত্তাবেশ জনিত আত্মার শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞতা অবস্থায় প্রদত্ত, এজন্য তাহা কখনও ব্যর্থ হইতে দেখা যায় না। যেরূপ অভাব, আত্মাকে তদনুরূপ স্বস্বভাবে জাগরিত করার প্রকরণকেই চিত্তপ্রয়োগ প্রকরণ বলে। চিত্ত সমাবেশ বা যোগের দ্বারা সে আধ্যাত্মিকতা যতক্ষণের নিমিত্ত স্থায়ী, ততক্ষণের জন্য আত্মা দেহাতীত স্বস্বভাবকে পুনর্ব্বার অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু সে চিত্ত সমাবেশ বা যোগে, কিঞ্চিন্মাত্র সবিকল্পতা থাকিলে, আর তাহা হইতে পায় না। লোকে যে দেবদ্বারে বা দেবপ্রতিমা সম্মুখে হত্যাদি দিয়া থাকে, সে দেবপ্রতিমা বা দেবদ্বার চিত্ত সমাবেশ আনয়নের নিমিত্ত কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। যাহারা আত্মাকে আত্মভাবে উপাসনা করিতে পারে না, তাহারাই আত্মাকে আত্ম হইতে পৃথক্ দেব রূপে স্থাপন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে; যেমন অগণক ব্যক্তি খুঁটি বা কড়ির সাহায্যে গণনা করিয়া থাকে। উপাসনা যে প্রকারেরই হউক না কেন, তদ্বারা কেবল আত্মোৎকর্ষ বা আত্মবোধে, উপাসনার পরিমাণ অনুসারে, প্রবুদ্ধ হওয়া মাত্র ফল।

মন্ত্র প্রয়োগে যে ফলের উৎপত্তি হয়, ইহা আমি নিজেও প্রত্যক্ষ

করিয়াছি; কিন্তু কথাটা এমনি যে, প্রতিজনে স্বয়ং উহা প্রত্যক্ষ না করিলে লোকের মনঃ উহা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু কাহার ভাগ্যে সেরূপ প্রত্যক্ষ ঘটিবে বা না ঘটিবে, সে ভাবনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, মন্ত্রের দ্বারা যে ফলের উৎপত্তি হয়, ইহা শুনিতে কি বড়ই অসম্ভব কথা? অসম্ভব বৈ কি,—আমিও ত সহজে উহা বহুকাল বিশ্বাস করিতে চাহি নাই। যাহা হউক, বস্তুতঃ বিষয়টা অসম্ভব নহে; এবং জড়বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে যে উহার ফলোপধায়ীতা একেবারে স্থাপিত হইতে পারে না, এমনটাও বোধ হয় না। দেখা যাউক।

এ সংসারে স্থূল সূক্ষ্ম যে কিছু পদার্থ, তৎসমস্তই শক্তিরূপ—শক্তির ক্রিয়া দৃশ্য; অথবা এ সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা স্বয়ং শক্তি শূন্য বা যাহাতে শক্তি নিহিত নাই। যে কোন পদার্থের দ্বার দিয়া হউক না কেন, প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ পজিটিব ও নিগেটিব গুণভেদে, সমধর্ম্মী * শ ক্ত্বয়ের ঘাত প্রতিঘাত হইলে, ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে;—স্ত্রীপুরুষে জীবের উৎপত্তি হয়, তাড়িতদ্বয়ে বজ্রের উৎপত্তি হয়, ইত্যাদি। উদাহরণোক্ত ফলগুলি সমজাতীয় ফল; কিন্তু শক্তিদ্বয়ের মিলন ও ঘাত প্রতিঘাতের প্রকরণ অনুসারে, নানাপ্রকার বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় ফলেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। শুদ্ধ প্রকৃতিকে নিগেটিব বা স্ত্রীগুণ, পৌরুষাভাসে ভাসিত কূট প্রকৃ-

ক পজিটিব বা পুরুষগুণ বলিয়া থাকে। পদার্থ নিহিত শক্তি যে কেবল অপর এক সমধর্ম্মী শক্তি সহ মিলনেই ফলের উৎপত্তি করিয়া থাকে, তাহা নহে; একক ভাবেও ফলের উৎপত্তি করে, কিন্তু তাহা হইলেও এ শেষোক্ত ফল সাধারণত প্রথমোক্ত ফল হেতু আয়োজন স্বরূপে দৃষ্ট হয়। মিলিত শক্তির ক্রিয়াও দুই রকমে হয়, এক শক্তিনিহিত পদার্থদ্বয়ের ঘাত প্রতিঘাতে উৎপন্ন ফল; অপরটি পদার্থ নিহিত শক্তি সহ বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির ঘাত প্রতিঘাতে উৎপন্ন ফল। প্রথমোক্ত শক্তিক্রিয়া ও ফল যাহা তাহাই আমরা আধিভৌতিক জগতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, এবং তাহাকেই সাধারণত প্রাকৃতিক নিয়ম নামে অভিহিত করিয়া থাকি। দ্বিতীয়োক্ত শক্তি ক্রিয়া আমাদের প্রত্যক্ষভূত নহে, কেবল তদুৎপন্ন যে ফল তাহাই প্রত্যক্ষভূত হয় ও তাহাকে সাধারণত দৈব ফল আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। দ্বিতীয়োক্ত

শক্তি ক্রিয়াকেই বোধ করি থিওসফিষ্টগণ 'ওকল্ট' নিয়ম বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়া থাকে।

বাক্য বা শব্দের একক শক্তি ক্রিয়া এবং শক্তি নিহিত বাক্যদ্বয়ের মিলিত শক্তিক্রিয়া ও তদুভয়ের ফল, আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে অথবা প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তগোচর হইতেছে ;—বলিতে কি, বাক্যশক্তিতেই মনুষ্য জগৎ চলিতেছে। কিন্তু বাক্যনিহিত শক্তি সহ মহাশক্তির ঘাত প্রতিঘাত ক্রিয়া যাহা, তাহা আমরা সেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। যেরূপ বাক্যনিহিত শক্তিসহ মহাশক্তির প্রয়োজনীয় ঘাত প্রতিঘাত হইতে পারে, সেইরূপ বাক্যকে মন্ত্র এবং ঘাত প্রতিঘাত জনিত ফলকে মন্ত্রফল বলা যায়। কিরূপ ফল জন্য কিরূপ শব্দশক্তি প্রযুক্ত হইবে, তাহা আমরা হয়ত না জানি, কিন্তু তা বলিয়া অন্য উপযুক্ত জনের তাহা জানিতে বাধা কি? উপযুক্ত শব্দ- বিন্যাসিত হইলে, সুতরাং উপযুক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ হইলে, উপযুক্ত ফলের যে উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাতে অযৌক্তিকতা কিছুই নাই। হয় ত পূর্ব্বতন ঋষিরা সেরূপ শব্দ প্রয়োগের নিয়ম যথাসম্ভব বা যথাকথঞ্চিত রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই বেদমন্ত্রাদির ফলোৎপাদিকা খ্যাতি ;—

"শব্দাত্মিকা সুবিমলার্গ্যজুষাং নিধান
মুদ্গীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তাচ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তি হন্ত্রী॥"

হয় ত অধুনাতন সামান্য লোকে, শব্দশক্তি প্রয়োগ নিয়মে অজ্ঞ হইলেও, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, কেহ দৈবাৎ কোন মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে; তাই তাহাকে মন্ত্রাত্মক ক্রিয়াও সাধন করিতে কখনও কখনও দেখা যায়। যাহা হউক, এক্ষণে সাধারণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলি যে, যে পর্য্যন্ত মন্ত্র নিয়ম পরিজ্ঞাত না হয়, সে পর্য্যন্ত মন্ত্রমোহে কাল ব্যয় করা অনুচিত এবং মন্ত্রশক্তি প্রতি উপহাস করাও উপযুক্ত হয় না। ফলতঃ মন্ত্রশক্তি একেবারে মিথ্যা কল্পনা নহে এবং যে কেহ মন্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হয় তাহার পক্ষে, যে সে ইতর মন্ত্রমোহে না ঘুরিয়া, মন্ত্রাত্মক শাস্ত্রাদিষ্ট দেব-উপাসনাদি করাই বিধেয়; তাহাতে ফল আছে।

আত্মশক্তি পরমাত্মশক্তির সঙ্কেতস্বরূপ, এতদভিধানদ্বয়যুক্ত শক্তিই অন্য তাবত ব্যষ্টিশক্তি সম্বন্ধে মহাশক্তি পদবাচ্য। শব্দশক্তির দ্বারা আত্ম-শক্তি উত্তেজিত হইলেই ফলের উৎপত্তি হয়, এবং আত্মাই সেই ফলের কর্ত্তারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। বেদমন্ত্র সকলের গূঢ় অর্থাভিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি, হস্তপদধারী মূর্ত্তিবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ কোন দেবতা নাই; বিশ্বব্যাপিনী আত্ম, সুতরাং পরমাত্ম শক্তিরই অবস্থা বা ভাব বিশেষ, সেই সেই দেব নামে অভিহিত হইয়া থাকে; অথবা তৎ তৎ শক্তিভাবাভিমানী চৈতন্য অংশকে তৎ তৎ দেবতা বলিয়া বলা যায়। ইন্দ্র, বায়ু আদি নাম কেবল ভাববিশেষের নাম মাত্র, নতুবা বিষয় যাহা তাহা এক। ফলতঃ তাহাই বোধ হয়; বেদান্ততত্ত্বে সারত্ব থাকিলে, তাহা না হইয়া অন্যরূপ হইতে পারে না; বেদ স্বয়ংও সেই কথা বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহু॥"

প্রতি মানবের আত্মিক অভ্যন্তরে, আত্মশক্তিভাবরূপী উক্ত দেবদেবী সমস্ত নিরন্ত অধিষ্ঠান করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে প্রতি পৃথক্ শক্তিভাবের পরিণাম প্রতি পৃথক্ ক্রিয়াফলে। বিশেষ বিশেষ দেবতাত্মক বেদমন্ত্র সকল প্রয়োগ করিলে. আভ্যন্তরীণ তৎ তৎ দেবশক্তি, উত্তেজিত হইবায়, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ ফল সকল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব যে যেমন ফলের কামনা করে, তাহাকে সেইরূপ বৈদিক ক্রিয়াদি বা বেদমন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। বেদমন্ত্র সকল এরূপ ক্রিয়াফলদায়িকা বলিয়াই, বেদের মন্ত্রভাগকে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া থাকে।

যাহারা আত্মবোধে বোধিত বা আত্মসংস্থ, তাহাদের পক্ষে মন্ত্রতত্ত্ব অবগত হওয়া কিছুই কঠিন নহে; ফলতঃ আত্মসংস্থ হইলেই তাহা অবগত হইতে পারা যায়, নতুবা তাহা হওয়ার বিষয় নহে। হিন্দুসংসারে ঋষিদিগকেই আত্মসংস্থ বলিয়া থাকে; হিন্দুশাস্ত্রানুসারে রাজা হউন্, দেবতা হউন, বা ব্রাহ্মণ মুনি হউন, যাঁহারই মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বশক্তি আছে, কেবল তিনিই মাত্র ঋষি পদ বাচ্য হইতে পারেন, নতুবা অন্য কেহ প্রকৃত ঋষিপদের বাচ্য নহেন।

এস্থলে অবতার সম্বন্ধেও একটা কথা কহা উচিত। আত্মসংস্থ হইয়া

যাঁহারা ঈশ্বরের সাযুজ্য ও সারূপ্য লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহাদের আত্মা ভৌতিক প্রকৃতি জয় করিয়া আত্মশক্তির বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং যাঁহারা সেই বিকশিত আত্মশক্তিকে জগৎ হিতে নিয়োজিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অবতার বলা যাইতে পারে। মুনি, ঋষি ও অবতার ইঁহারা সকলেই সমশ্রেণির, সকলেই যথাপরিমাণে আত্মসংস্থ ; কিন্তু প্রভেদ কেবল এই যে, মুনি যিনি তিনি স্বীয় আত্মশ্রেয়তার বহির্ভূতে যান না ; ঋষি যিনি তিনি মুনিত্বের উপর অধিকন্তু মন্ত্র দৃষ্টি করিয়া থাকেন ; কিন্তু অবতার কেবল তাঁহাকেই বলা যায়, যিনি আত্মশ্রেয়তা পরমাত্মশ্রেয়তায় মিশাইয়া চরাচরহিতে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। উহাই অবতার ভাবের বাহ্য লক্ষণ ; অন্তর্লক্ষণ,যাহা তাহা আমাদের বোধ বিষয়ীভূত নহে।

বাঞ্ছারাম ভাবিতেছে যে, করে কি,কেবল আত্মা,কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত ! ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, দেব বল, ঈশ্বর বল, মন্ত্র বল, যা কিছু বল, সবই আত্মা ; একি অন্যায় কথা ;—এতটা আত্ম-সর্ব্বস্ব হওয়া ভাল নহে, উহাতে পাপ আছে ! বাঞ্ছারামের কথার উত্তর নাই। যে আত্মা পরমাত্মার ব্যষ্টিরূপ ; ভৌতিকতা ক্ষয়ে যিনি ভূতাতীত শক্তি লাভে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন ; জ্ঞানাদিযোগে যে আত্মার আত্মিকভাবের উন্নতি ; আত্মবোধে ঈশ্বর সাযুজ্য আদি পরমাগতি প্রাপ্তি যাঁহার বিষয়,সে আত্মা সম্বন্ধে কি আর বক্তব্য হইতে পারে বা না পারে। পুনশ্চ এ সমস্তই, আত্মা পরমাত্মার ব্যষ্টি-রূপ বলিয়াই সম্ভব হয় ;—সমষ্টিধর্ম্ম ব্যষ্টিতে বিরাজ করে এবং ব্যষ্টি সমষ্টিতে গিয়া সংমিলিত হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা আর কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর নীতি সংস্কার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। সিদ্ধ-উপাসনার উপাসক ভাগ্যক্রমে যাঁহারা হইতে পারিয়াছেন,তাঁহাদের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই ; তাঁহাদের সম্বন্ধে নীতিসংস্কার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম ও উপদেশেরও প্রয়োজন দেখা যায় না। তাঁহারা আপনারাই আপনার উপ-দেষ্টা ও আপনা আপনিই অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া থাকেন। সাধ্য উপাসকদিগের পক্ষে অনেক উপদেশ ও অনেক চেষ্টার প্রয়োজন। গুরুর নিকট বিনতভাব, দেবতায় পরাভক্তি, বেদাদর্শে স্বীয় চরিত্র গঠন এবং দেবসকাশে উপাসনা রত হইতে হয়। উহাই নীতিবান্ হওয়া এবং নীতি বিষয়ে সংস্কার

সাধন করার পক্ষে মুখ্য উপায়। নীতি প্রভাবে, সুকর্ম্ম সাধনে চরিতার্থ হওয়া যায়। নীতিবশে দৈহিক ও মানসিক শক্তি সকল সুনিয়মিত হয় এবং সুনিয়মিত শক্তি হইতেই সুকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। সত্য বটে সিদ্ধ উপাসক কেবলমাত্র এক উপাসনা প্রভাবেই সুকর্ম্মসাধন করিয়া থাকে; কিন্তু সিদ্ধ উপাসকও নীতিবান্ না হইলে সে সুকর্ম্মসাধনে সক্ষম হয় না, অথবা সিদ্ধ-উপাসক যে, সে নীতিবান না হইয়াই থাকিতে পারে না। উপাসনাও শক্তিবিশেষ, সে শক্তিও বিনা নীতিতে সুনিয়মিত হয় না। উপাসনা নানাজনে প্রবৃত্তি ও রুচিভেদে নানারূপে করিয়া থাকে। "শ্রবণং বন্দনং দাস্য সখ্যামাত্ম নিবেদনম্" ইত্যাদি প্রাচীনোক্ত বিধানমত, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপে করিতে পারে। মর্ম্মোস্থান হইতে উত্থিত উপাসনা যাহা, তাহা সমাজসহবাসে কখনই সম্ভব নহে; একাকভাবেই কেবল তাহা সম্ভব হইতে পারে। দেবোপাসনা বিষয়েও, সাময়িক উল্লাস ও উৎসবের প্রয়োজনীয়তা আছে; সেই সকলই কেবল,সমাজ ও পর্ব্বাহ প্রভৃতি যোগে সুসম্পাদিত হইতে পারে। মানবীয় তাবৎ বিষয়েতেই, পুরাতনকে নূতনত্ব প্রদান করিবার নিমিত্ত,সাময়িক উল্লাস ও উৎসবের প্রয়োজন ও অনুষ্ঠান হওয়া উচিত।

নীতির নিজ উন্নতি যাহা, অর্থাৎ নীতি বিষয়ে ধারণার উৎকর্ষ যাহা,তাহা দেবতত্ত্বের ক্রমোৎকর্ষ সহ সাধিত হইয়া থাকে। প্রতি মানবে নীতি যখন যে বিশেষ মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন, তদুৎকর্ষ যাহা, তাহা তাৎকালিক উপাসিত দেবতার আদর্শ অনুসরণে সাধিত হয়। যে জাতি, যে সমাজ, যে মানব, যে ভাবে ও যেমন দেবতার উপাসনা করে ও তৎপ্রতি তাহার ভক্তি যে প্রকারের, তাহার অনুষ্ঠিত নীতিও অবিকল তদ্রূপ হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই; উহাই স্বাভাবিক।

"যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥"

৭

জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, এতৎ ত্রয়ের যথা সম্ভব সুসংস্কৃত অবস্থা সকলের সামঞ্জস্য সমাবেশ যাহা; তৎসমন্বিত যে মনুষ্যজীবন, তাঁহাকেই যথার্থত ধার্ম্মিক জীবন বলা যায়। এই ধার্ম্মিকতা মনুষ্য জীবনের প্রস্তুতি অংশ; উহার ফলবান্ অংশ যাহা,তাহা সেই ধর্ম্মজীবনানুরূপ কর্ম্ম জীবনে। যদর্থে ও যে অবলম্বনে মনুষ্যজীবন ইহ জগতে স্থিত, ধর্ম্ম তাহার প্রথম অর্দ্ধ, কর্ম্ম তাহার শেষার্দ্ধ। কেবল ধর্ম্মাচরণে জীবন অসম্পূর্ণ ও অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট থাকে, সুতরাং তাহার শেষ পরিণামও তদনুরূপ ক্ষুণ্ণ হয়। ধর্ম্মানুরূপ সম্পূর্ণত কর্ম্ম সাধন হইলেই, জীবনের পূর্ণতা ও সফলতা উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং তাহার শেষ পরিণামও সর্ব্বতোভাবে অনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিবে, বিনা কর্ম্মে সমস্ত ধর্ম্মই নিষ্ফলতাকে প্রাপ্ত হয়।

অনেক লোকেরই বিশ্বাস, গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে, প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ ঘটিয়া উঠে না; প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে, সংসার পরিত্যাগে নিরাশ্রমী সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। যাহারা কর্ম্মকে জীবনের প্রয়োজনরূপে গণে না; ধর্ম্মধারণা যাহাদের বিকৃত; দেবতার উপাসনাই সাধারণতঃ যাহাদের নিকট ধর্ম্ম বলিয়া গণিত, তাহারাই ওরূপ কথা বলিয়া থাকে। পুনশ্চ, অনেকের বিশ্বাসে স্ত্রীপরিবার রাক্ষসীর স্বরূপ, ধর্ম্মপথের মহাবিঘ্নকারিণী। অনেকে এমনও ভণ্ড মূর্খ আছে যে, গৃহে থাকিয়াও স্ত্রী পরিবার হইতে স্বতন্ত্র থাকে;—তাহার আত্মপবিত্রতা বোধ এতই তীক্ষ্ণ যে, পরিবারাদির স্পর্শিত অন্নাদি পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। এরূপে, দ্বিতীয় স্বর্গস্বরূপ মহাসুখের স্থানে থাকিয়াও, আত্মদোষে তাহাকে বিজন নরকস্থান করিয়া তুলে। এ সৃষ্টিতে তাহারা নিতান্তই দুর্ভাগ্যবান্ জীব।

সংসার এবং সম জই এ পৃথিবীতে মানবের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান, নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মস্থান এবং নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থান। তবে এ পৃথিবীতে নিরাশ্রমী সন্ন্যাসীরও আবশ্যকতা না আছে এমন নহে। নিরাশ্রমী বুদ্ধ, নিরাশ্রমী খৃষ্ট, নিরাশ্রমী শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি, ইহারা যদি না জন্মিত এবং ইহারা যদি নিরাশ্রমী না হইত, তবে না জানি আজি পৃথিবীর কি দুর্দ্দশাই ঘটিত। এরূপ নিরাশ্রমী যদি হইতে পার, তবে আপত্তি নাই; তেমন স্থলে বরণ বলিব যে, তুমি নিরাশ্রমী

না হইয়া গৃহস্থ আশ্রমে থাকায় পাপগ্রস্থ হইতেছ এবং গৃহস্থ আশ্রমে থাকায় ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ।—এখনই ঘরের বাহির হও, বিলম্ব করিও না।

যাহারা এ সংসারে এমন কর্ম্মভার লইয়া আইসে যে, যে কর্ম্মের ক্রিয়াস্থলী এই সমস্ত জগৎ এবং যে কর্ম্মে সমস্ত জীবন উৎসর্গ ভিন্ন কর্ম্ম সমাধা হওয়ার কথা নহে; পুনশ্চ যাহাদিগকে সেরূপ কর্ম্মার্থে আর শিক্ষানবিশী করিবার প্রয়োজন নাই, জন্মান্তরে বা অনন্ত পুরুষ কর্ত্তৃক যাহারা সে কর্ম্মপথে শিক্ষিত হইয়াছে; তাহাদের পক্ষে আর গৃহস্থ আশ্রমের প্রয়োজনও নাই এবং গৃহস্থ আশ্রমে থাকিলেও আর তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবার কথা নহে। তেমন লোকের পক্ষেই গৃহস্থাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাস অবস্থা উপযোগী এবং অবলম্বনীয়। কিন্তু যাহার কর্ম্মভার সামান্য, নিষ্কামতা ও প্রকৃত কর্ম্মপন্থা যাহার এখনও শিক্ষা হয় নাই; সে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবে কি করিয়া ও কি জন্য? সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে গৃহস্থাশ্রম শিক্ষা স্থলী এবং কর্ম্মস্থলী উভয়ই। তেমন লোক, যাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে গীতায় এরূপ উক্ত,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

কর্ম্মবাসনা ও কর্ম্মের হাত যখন ছাড়াইতে পারিতেছ না,

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"

সেখানে সেই কর্ম্ম যাহাতে আরব্ধ ও সমাধা হইতে পারে, তাহাই করা প্রার্থনীয়। আমি যাহাকে নিরাশ্রমী সন্ন্যাস বলি ও যে সন্ন্যাস ভাবকে শ্রেয় বলি, তাহাও উপরে বলিলাম। কিন্তু তুমি যে সন্ন্যাসের গোঁড়া, সে সন্ন্যাসে কেবল উপযুক্ত কর্ম্মের ব্যাঘাত হইয়া অপকর্ম্মের সঞ্চার হয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে ভাল না হইয়া কেবল অধঃপতনের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতে থাকে।

তুমি বোধ করি গৃহস্থলীগত কর্ম্মে বিরক্ত হইয়াই, আপাত অলসবৎ দৃষ্ট সন্ন্যাস অবস্থার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া থাক। কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে, প্রকৃত সন্ন্যাসী যে, তাহার কর্ম্মভার গৃহীর কর্ম্মভার অপেক্ষা অসংখ্যগুণ কঠিন ও অসংখ্যগুণ বেশী। আধিভৌতিক প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত সন্তান-উৎপাদন

ও পরিবার পালন আদি হইতে, তাহার কর্ম্ম অনন্তগুণে গুরুতর হেতুই; আধিভৌতিক প্রকৃতিজ কর্ম্ম পরিত্যাগে তাহার পক্ষে দোষ হয় না। কিন্তু তোমার পক্ষে সেরূপ আধিভৌতিক ঋণ পরিশোধ না করায় সম্পূর্ণ প্রত্যবায় আছে। সন্ন্যাসীর নিকট, আধিভৌতিক ঋণে আর বাধকতা করিতে পারে না; ন্যাস্ত অপর গুরুকর্ম্মভারই তাহার নিকট, ঈশ্বর আদেশে, একমাত্র অনু- সরণীয় হয়। ভাবিয়া দেখ দেখি, শঙ্করাচার্য্য এ সংসারে কি গুরুতম হইতেও গুরুতর কর্ম্ম সাধন করিয়া গিয়াছে; কি দুষ্কর কর্ম্মভার! তুমি সামান্য প্রাণ, সংসার ত্যাগ করিলেই কি তাহাতে সক্ষম হইতে পার? যাহার চিত্তে নিষ্কা- মতা উপস্থিত হইয়াছে, যাহার শক্তি সকলের সম্যক্ স্ফুরণ হইয়াছে, জগতের নিমিত্ত কোন মহাকর্ম্ম বিশেষ সাধনের জন্য যাহাকে যাহার চিত্ত নিরন্তর উত্তেজনা করিতেছে; সেইই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত, অন্যে নহে। চিত্তের নিষ্কামতা, শক্তির স্ফুরণ, ইত্যাদি মানবের সন্ন্যাস গ্রহণে উপযুক্ততা পক্ষে নিদর্শনসূচি স্বরূপ।

অনেকে বিবেচনা করে নিষ্কামতা প্রভৃতি সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত গুণ যাহা, তাহা সংসার পরিত্যাগ করিলেই ভাল উপার্জ্জিত হইতে পারে; সংসারে থাকিয়া তাহা উপার্জ্জিত হয় না। ইহা মহা ভ্রম! তোমার গায়ে মলা রহি- য়াছে দেখিয়া লোকে নিন্দা করে; সে স্থলে মলা হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা ভাল, না যেখানে নিন্দা করিবার লোক নাই সেখানে পলাইয়া যাওয়া ভাল। বরণ যেখানে নিন্দা করিবার লোক আছে সেখানে থাকাই ভাল, কারণ নিন্দাযোগে জানিতে পারিব যে গায় মলা আছে; যেখানে নিন্দার সুযোগ নাই, সেখানে আমিও জানিতে পারিব না অথচ অতর্কিতে গায়ে মলা রহিয়া যাইবে; সুতরাং কেবল পরিচ্ছিন্নতা সাধন যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সে উদ্দেশ্য সাধন বরং দূরের কথা হইয়া পড়িবে। বাঞ্ছারাম, তোমার সংসার সেই নিন্দার স্থান; আর তোমার পক্ষে সংসারত্যাগীতা সেই নিন্দাশূন্যতার স্থান। লোভের পদার্থ সম্মুখে রাখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেই নির্লোভী হইতে পারা যায়; নতুবা লোভের পদার্থ হইতে দূরে পলায়ন করিলে নির্লো- ভীতা সাধিত হয় না। এখন দেখ, সংসারই প্রকৃত অবলম্বন এবং শিক্ষার স্থল কি না এবং সংসারের বাহির কতটা পরিমাণে অশিক্ষার আকরভূমি স্বরূপ।

প্রকৃত সন্ন্যাসী সংসার হইতেই প্রস্তুত হয়; সাংসারিক জীবনের পূর্ণ পরিণতি ও শেষ ফল সন্ন্যাসাবলম্বনে। পরিণতির অসম্পূর্ণতায় সন্ন্যাসাবলম্বন করিলে, উভয় দিক নষ্ট হয়। পরিণতির অসম্পূর্ণ অবস্থায় যে কেহ সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া, এখন দেবোপাসনা ও যোগচিন্তা প্রভৃতিকে মুখ্যজ্ঞানে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া আছে; নিশ্চয় জানিও, জীবনের অসম্পূর্ণ অংশ সকলকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য, অবশ্যই তাহাকে এক সময়ে না এক সময়ে, ইহ জন্মেই বা জন্মান্তরে, সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। সংসারের বহিঃস্থান শুদ্ধ কর্ম্মণস্থলী, কিন্তু সংসার শিক্ষা কর্ম্মণ উভয়স্থলী।

সংসারস্থলীতে সকল বিষয়েই আত্মসংস্কার সাধন করা কঠিনত নয়ই; অধিকন্তু তাবৎ পন্থা অপেক্ষা উহা সে পক্ষে সহজ পন্থা স্বরূপ। প্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থ সম্মুখে না থাকিলে ও তাহার প্রকৃতি অবগত না হইলে, তাহাদের প্রতি পক্ষে উপায় অবলম্বন ও আত্মরক্ষা নিশ্চয়ই অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরন্তর সম্মুখে দেখিলে, তাহাদের দ্বন্দ্ব নিবারণ করা আর সেরূপ কঠিন হয় না; সংসারস্থলীতে সেই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থকেই সম্মুখীন ভাবে পাওয়া যায়। সংসারস্থলীতে থাকিয়া এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয় সকল তদ্দীয় স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিবেই, কিন্তু তুমি সেই কার্য্যে ক্রিড়নক স্বরূপে পরিণত না হইয়া, তাহাদিগকে স্ববশে আনিয়া, তাহাদের উপর ক্রিড়াকারক স্বরূপ হইবে। তাহাদেরও স্বভাব বদ্ধ না হওয়ায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিবে না, অথচ তোমারও তাহাতে অভীষ্ট লাভ হইবে। নতুবা যদি তুমি তাহাদের ক্রিড়নক স্বরূপ হও, অথবা উদ্ধতভাবে যদি তাহাদের স্বভাব সহসা নিবারণ করিতে যাও, উভয়েতেই অনর্থ ঘটিয়া উঠার সম্ভাবনা। বিবেচনা ও অধ্যবসায়ের উপর চলিলে, উক্ত প্রকারে সফলতা লাভের ন্যায় সহজ বিষয় আর কিছুই নাই; তেমনি আবার অবিবেচনা ও ত্রুটি হইলে, ইহার অপেক্ষা শক্ত বিষয়ও আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

তাহার পর, স্ত্রীপরিবার আদিও তোমার পথে অনর্থোৎপাদক স্বরূপ নহে; বরং এ গহন পথে তোমার পরম সহায় এবং স্ত্রী তোমার সহধর্ম্মিণী। এ সংসারে মানবের আত্মোন্নতি পক্ষে, এক স্ত্রী হইতে যতদূর সাহায্য ও সহকারিতা হইতে পারে, ততটা কি শিক্ষা কি দীক্ষাগুরু বা কাহারই দ্বারা

হয় না। বাঞ্ছারাম, কথাটা কিছু নূতন বোধ হইতেছে এবং ভাবিতেছ যে ইহাতে হাঁসিবার জিনিস অনেক আছে! কিন্তু হাঁসিবার জিনিস ইহাতে কিছুই নাই, বরং কাঁদিবার জিনিস ইহাতে অনেক আছে; কাঁদিবার জিনিস এই যে, স্ত্রীসম্বন্ধিনী এই কথা অনেক দিন হইতে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

এই সংসার গৃহে মানব যতদিন একক থাকে, ততদিন সে স্বীয় পাশব ভাবদৃপ্ত স্বার্থ পূর্ণ খণ্ড স্বরূপ; স্বীয় কাঠিন্য যুক্ত পুরুষ গুণে বিঘট্টিত ও দ্বন্দ্ব-ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। স্ত্রীগ্রহণে সে ঘোরঘূর্ণার নিবৃত্তি ও কাঠিন্যে কোমলতার উপস্থিতিতে, সাম্যভাব এবং স্বার্থত্যাগেরও প্রথম সূত্রপাত হয়। আত্মসর্ব্বস্বতা স্ত্রীর উপস্থিতিতে দ্বিধা বিখণ্ডিত হয়; স্বার্থত্যাগে স্ত্রীগ্রহণ প্রথম সোপাণ, এবং স্বার্থত্যাগের এই প্রথম সূত্র হইতে তাবৎ উত্তর ক্রিয়াস্থলীতে স্ত্রীই একমাত্র অভিন্ন সহকারিণী। স্ত্রী মৃত্যুবশে কদাচ বিচ্ছিন্ন হইলেও, স্ত্রীর সহকারিতা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় না। অবিবাহিত বোমূবেটে বিবাহ যোগে নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে কি না এবং কিরূপ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার কি উদাহরণ প্রদর্শনের আর আবশ্যক হইবে?—তাহার উদাহরণ তুমি আমি সকলেই! অতঃপর স্ত্রীকে যে, যে ভাবে রাখিয়া, যে ভাবে দেখিয়া ও যে ভাবে তাহার সহকারিতা যাচিয়া থাকে; স্ত্রী তাহাকে সেই ভাবে সহকারিতা প্রদান করিয়া, সেই ভাবেই সংসারস্থলীতে প্রতীয়মানা হইয়া থাকে;—

যা শ্রীস্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ॥
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥"

স্ত্রীপ্রকৃতি কি প্রকার প্রস্ফুটিত হইবে ও কি প্রকার জীবন সঙ্গিনীর আকার ধারণ করিবে, মূল নির্ব্বাচন ঠিক থাকিলে, তাহার নিরূপণ ও নির্ম্মাণ প্রায়ই সম্পূর্ণত স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যে স্ত্রীকে ভোগবিলাসের উপাদান স্বরূপ মনে করে, যে সন্তান পালনার্থে ধাত্রী স্বরূপ মনে করে, যে গৃহকর্ম্মে রক্ষিকা স্বরূপ মনে করে, যে বাঁদীদাসী স্বরূপ মনে করে, যে ব্যবহারে

বাবুয়ানী স্বরূপ মনে করে, অবিশ্বাসিনী স্বরূপ বা রাক্ষসী স্বরূপ মনে করে, অথবা যে জ্ঞানসঙ্গিনী বা কর্ম্মসঙ্গিনী স্বরূপ মনে করে; এক কথায় যে যেরূপ ভাবে মনে করে, তাহার স্ত্রী প্রায় সেইরূপই হইয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজনা স্বরূপ। যে উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজনা বিকৃত হইলে, যাহার বলে লোকে মা বুন ও বাপ ভাইকে পর্য্যাপ্ত বিনা কারণে কর্কশ-পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; সেই উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজনা সুমার্জ্জিত ও সৎ হইলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জ্ঞান পক্ষে তোমার দৌড় ও দৌড় ফল কতদূর মহত্তর হওয়ার সম্ভাবনা বল দেখি। সে উদ্যম, উৎসাহ ও উত্তেজনের শক্তি অদম্য ; তাহাকে সুমার্জ্জিত বা কুমার্জ্জিত যেমন করিতে পারিবে, সেই দিকেই অসাধারণ ফললাভে সমর্থ হইবে। অতএব তোমার যে সুপথে ও সুবিষয়ে চিত্তানতি, সেই ভাবে তোমার স্ত্রীকেও সুমার্জ্জিত ও সুশিক্ষিত কর ; তাহা হইলে উপযুক্ত সঙ্গিনী লাভে এমন কৃতার্থ হইবে, যাহা অন্য কোন উপায়ে সিদ্ধ হওয়ার কথা নহে। স্ত্রীজনের উদ্যম, উৎসাহও উত্তেজনা ব্যতীত, কি স্বীয় কি সামাজিক, কোন বিষয়েতেই উন্নতির অভিলষিত সীমায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে। তোমার ষষ্ঠীদাসী বা কার্পেট লক্ষ্মী বা সে কালের নির্ব্বাক পাকা গৃহিণী হইলে, সে উন্নতির আশা করিও না। সে উন্নতি চাও, স্ত্রীজনকে এখনও উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করাইতে হইবে।

উপরে বলিয়াছি যে, মূল নির্ব্বাচন ঠিক থাকিলে, স্ত্রীচরিত্র নির্ম্মাণ প্রায়ই স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সে মূল নির্ব্বাচন অর্থে বিবাহ। স্ত্রী পূর্ণ বয়স্থা হইলে, তখন তাহার চরিত্র যাহা হইবার তাহা একরূপ গঠিত হইয়া আইসে ; সুতরাং তখন যে আর সে স্বামীর শিক্ষার অধীন হইয়া থাকিবে এবং স্বামীপ্রদত্ত শিক্ষাদ্বারা আত্মচরিত্র স্বামীর অভিমতানুরূপ রূপান্তর করিয়া লইবে, সে সম্ভব অতি অল্পই। সেরূপ স্ত্রী প্রায়ই স্বামীর সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে ; তবে যে কখন কখন কিছু বিনত থাকিতে দেখা যায়, সে স্বার্থ এবং ভাত কাপড়ের জন্যে। স্ত্রীর তদ্রূপ সমকক্ষ ভাবে কিছু মাত্র আপত্তি ছিল না, যদি একপক্ষের ভাবত গুরুতর কর্ম নিষ্পাদনে স্ত্রী সমান অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত।

কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন কাজেই লোকত ধর্ম্মত স্ত্রী পুরুষের সহকারিণী স্বরূপ মাত্র। যাহা হউক, যখন দেখা যাইতেছে যে গঠিত চরিত্রা স্ত্রী স্বামী-দত্ত শিক্ষার অপেক্ষা অতি অল্পই রাখিয়া থাকে, তখন প্রকৃত সহধর্ম্মিণী প্রাপ্ত হইতে হইলে, বিপুল স্ত্রীসংঘ মধ্যে সমধর্ম্ম বিশিষ্টা দেখিয়া স্ত্রী খুজিয়া লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সেটা কি সহজ ব্যাপার। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুকাল ধরিয়া অবনি পর্য্যটনে অন্বেষণ ভিন্ন, তাহাতে সিদ্ধকাম হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। বলিতে পার, তোমার এ দীর্ঘজীবনে কয়জন প্রাণের প্রাণ সমধর্ম্মী ও সহানুভূতিশীল লোক খুজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছ? স্ত্রীকোর্টসিপেই যেন বর্ত্তমান সমাজে তোমার অধিকার নাই; কিন্তু বন্ধু আহরণেত সে অধিকার আছে এবং বন্ধুওত নিতান্ত ফেলিবার সম্বল নয়! আবার জিজ্ঞাসা করি, কয়জন সমধর্ম্মী যথার্থ বন্ধু এ দীর্ঘ জীবন কালে লাভ করিতে পারিয়াছ? বোধ করি একজনও নয়? বাপুহে, একজন সামান্য বন্ধু লাভই যখন এমন কঠিন, তখন জীবনের জীবন একজন সহধর্ম্মিণী লাভ আরও কত কঠিন। লোক সহ আজীবনের এত মেশামিশিতে একজন প্রকৃত বন্ধু লাভ হইয়া উঠে না, কিন্তু কেবল কয়েক-দিনের কোর্টসীপে একটি সহধর্ম্মিণী সহজে লাভ হইবে; একথা বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল, অথবা বলিতে বা শুনিতে কি বাধ বাধ লাগে না? একেবারেই যে, সে উপায়ে লাভ হয় না একথা কখনও বলি না; একেবারে 'হাঁ' বা একেবারে 'না' কোথাও কোন বিষয়ে নাই, তবে 'না'র ভাগ অত্যন্ত বেশী বলিয়াই এখানে 'না' বলিতেছি। ফলত বিলাতি নির্ব্বাচন প্রথা এদেশে চলিলে, বয়সের তাড়নে, অবস্থার তাড়নে, ধনের তাড়নে, বিবাহ অবশ্যই অনেক এবং সত্বরেই ঘটিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, যেমন অপরাপর দেশ সর্ব্বত্রে ঘটিতেছে; কিন্তু তাহাতে যে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী লাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেহ ঘটিয়া উঠিবে এটা স্থির নিশ্চয়। বস্তুত এরূপ বিবাহ চলিত কথায় "দিল্লিকা লাড্ডু" হইয়া উঠিবে। বয়স্থা বিবাহে সুবিধা অবশ্য অনেক আছে; কিন্তু অসুবিধা আরও অনেক।

বাল্য বিবাহেতেও অসুবিধা অনেক, কিন্তু সুবিধা আরও অনেক। চরিত্র গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে, সে স্ত্রী প্রায়ই যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপে

স্বামীর দ্বারা গঠিত হইতে পারে। যদি তেমন গঠিত না হয়, তবে সে স্বামীর দোষ, স্বামীর অভিভাবকের দোষ এবং সে দোষের জন্য সমাজকে দোষী করা যাইতে পারে না। শৈশবকাল হইতে ১৩ বা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকাকে যদৃচ্ছা গঠিত করা যাইতে পারে। অতএব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, উক্ত কাল পর্য্যন্তই ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কন্যা কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং এইরূপ স্থলে. কন্যা পছন্দ করণের ভার, স্বামী স্বয়ং বা তাহার পিতা ভ্রাতা বা যে কোন আত্মীয় বর্গের উপর ন্যস্ত হউক, তাহাতে আসে যায় না ; কিন্তু তথাপি বলি যে, সে ভার স্বামীর উপর অর্পিলে, অন্তত অংশত অর্পিলেও ভাল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার দেখাশুনা হইলে, তাহাতে ভাল ভিন্ন মন্দ নাই ; উভয়েরই তখন দৃষ্টত পছন্দশক্তি জন্মে এবং প্রথম বয়সের প্রথম দৃষ্টির যে পছন্দ অপছন্দ ভাব, তাহা বাস্তবিকই আজী-বনের উপর বহুপরিমাণে প্রভুত্ব করিয়া থাকে। অতি শিশুবয়সের কন্যাকেও বর পছন্দ কি অপছন্দ তাহা বলিতে শুনা গিয়াছে এবং সেই বয়সে যাহাকে পছন্দ বলিতে শুনা গিয়াছে, আজীবনে ও উত্তর জীবনেও সে পছন্দকে আর পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় নাই।

এখানে আর একটি কথা ;—বয়স্থা বিবাহপ্রথা সমন্বিত স্ত্রীস্বাধীনতা এবং বহুপরিবার প্রথা, এই দুই একত্রে কখনও তিষ্টেনা ; অথবা বাল্যবিবাহ এবং বহুপরিবার প্রথায় বিরোধিতা, এ দুইও কখনও একত্রে সামঞ্জস্য মিলিত হইতে পারে না। ফলত বহুপরিবার প্রথা থাকিলে, বাল্যবিবাহ এবং স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা পথে সঙ্কীর্ণতা এ দুই অবশ্যম্ভাবী। আবার বহুপরিবার প্রথা না থাকিলে, বয়স্থা বিবাহসহ স্ত্রীস্বাধীনতাএবং বিধবা বিবাহ এ দুইও অবশ্যম্ভাবী। বহুপরিবার প্রথা যদি না থাকে এবং স্বামীকে যদি অবস্থাগুণে, সময়গুণে, সামাজিক প্রয়োজনে বা যে কোন কারণে, অধ্যবসায়শীল হইয়া নানাদিকে নানাদেশ ও নানা ভাবগামী হইতে হয় (এবং হইতেও হয় প্রায় পোনের আনাকে) ; তাহা হইলে কে বা তখন তাহার বালিকা স্ত্রীর ভার লইবে ও কেইবা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। অথবা অধ্যবসায় স্থলে বা যে কোন কারণে স্বামীর মৃত্যুই যদি ঘটিল, তখনই বা কে তাহার স্ত্রীর উত্তর কালীয় পোষণকর্ত্রী ও রক্ষণকারী

হইবে ; যাহারা আত্মীয় ছিল, তাহারা ত বহুপরিবার প্রথারাহিত্যে এখন পর হইয়া গিয়াছে। কাজেই তখন স্ত্রীকে আপনার রক্ষণোপায় আপনি করিতে হইবে ; তাহা হইলেই ইউরোপীয় ধরণে সতীত্ব ধারণা, আত্মরক্ষণে ক্ষমবান অবস্থা ও তজ্জনিত স্বাধীনতা, আবশ্যকে উপার্জ্জন-ক্ষমতা, বয়স্থা-বিবাহ এবং অবশেষে অকূলে উত্তরকূল স্বরূপ বিধবা বিবাহ, এ সকল অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এরূপস্থলে পারিবারিক শাসন ও বন্ধনের পরিবর্ত্তে, স্ত্রীকে সুপথে রাখিবার নিমিত্ত, একমাত্র অস্থিরদৃক্‌ ও দূরবিক্ষিপ্ত সামাজিক শাসনমাত্র তৎস্থলীয় হয় এবং আমরা জানি, সামাজিক শাসন অপেক্ষাকৃত অনেক দৃষ্টিহীন ও অনেক শিথিল এবং অনেকটা খামখেয়ালিতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

কিন্তু বহু পরিবার প্রথায়, আত্মীয়তার বন্ধন ঘনীভূত থাকায় স্ত্রীও, স্বামীর জীবনান্তে,আত্মীয়গণের মায়া কাটাইয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না ; আত্মীয়েরাও, আপনার একজন পরের হইবে, ইহা দেখিতে ভাল বাসে না ও সম্মত হয় না। তাহারপর, অনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পরিজনবর্গসহ সংমিলিত হইতে হইলে, বাল্যকাল হইতে পরিজন মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক ; যেহেতু তদন্যথায়, পরিজনের তোষকরী মতি গতিতে আনত মতি গতি হওয়া সম্ভবপর হয় না। এই সকল এবং অন্যান্য অপরবিধ কারণেও, বহুপরিবার প্রথা যতদিন থাকিবে ; ততদিন কখনও বয়স্থা-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও সম্যক্‌ স্ত্রীস্বাধীনতা, এ সকল সম্পূর্ণরূপে বলবান হইতে ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু এখন কথা এই, বহুপরিবার প্রথার অভাবে মানুষ যেরূপ বহুচ্ছাগামী অধ্যবসায়শীল হইতে পারে ; বহুপরিবার প্রথা থাকিলে সেরূপ হইতে পারিবে কি না ? জাতীয়ষগণ সেরূপ অধ্যবসায়শীল না হইতে পারিলেও, জাতীয় উন্নতি, জাতীয় অভ্যুত্থান ও জাতীয় গৌরব প্রচুর লাভ হয় না। মানবীয় যে কিছু ব্যাপার ও ব্যবহার, সে সমস্তেরই ভালমন্দ বিচার কর্ম্ম-ভূমির কর্ম্মযোপযোগিতা অনুসারে ; অন্য যে কিছু খাতির তাহারা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ও পরবর্ত্তী ভাবে বিবেচ্য। তাই বলি, বাল্যবিবাহ ও বহু পরিবার প্রথাদি,সে অধ্যবসায়শীলতাকে যদি পূর্ণ দৌড় দিতে না পারে তবে, বহুপরিবার প্রথা ও বাল্য বিবাহাদিতে যতই কেন গুণ থাকুক না, তাহা রদ হওয়া উচিত

এবং বয়স্থা ও বিধবা-বিবাহাদিতে যতই কেন দোষ থাকুক না, তাহা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। পুনর্ব্বার বলি, অন্যরূপে হাজার ভাল হইলেও, যাহা কিছু কর্ম্ম-পথে বাধাজনক, তাহাই মন্দ : এবং সেইরূপ অন্যরূপে হাজার মন্দ হইলেও, যাহাকিছু কর্ম্মপথের অগ্রসারক, তাহাই ভাল। সে ভাল মন্দ বিচারে, ভাল পক্ষ বজায় রাখিয়াও, যাহা উপরন্তু ভাল সাধন করিতে পারে, তাহাই গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ ; তদন্যতরে আর সমস্ত অগ্রহণীয় ও অপকৃষ্ট।

কিন্তু আশঙ্কা বৃথা। বহুপরিবার প্রথা এবং সঙ্গে তাহার বাল্যবিবাহও, সুভাবে চালিত হইলে, মানবের কোন অধ্যবসায়, কোন কর্ম্মেই, কখন বাধা-দায়ক হয় না ; বরং তাহা অধিকন্তুরূপে কর্ম্মপথের অগ্রসারক স্বরূপ হয়। কিন্তু ইহাও বলি যে, যেপর্য্যন্ত তোমার বহুপরিবার মধ্যে ষষ্ঠীপূজা থাকিবে ও সন্তান সন্ততি ষষ্ঠীর দাস হইবে ; সে পর্য্যন্ত বহুপরিবার প্রথা সম্পূর্ণত এবং সত্য সত্যই সকল কর্ম্মপথে বাধা জন্মাইতে থাকিবে এবং একজনকে উপার্জ্জনক্ষম দেখিলে, আর তাবতে আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর ভূতের স্বরূপ চাপিয়া বসিবে। পুনশ্চ ষষ্ঠীদাসেরাই কেবল, যুবতী স্ত্রী ঘরে দেখিলে, ঘরের বাহির হইতে চাহে না। দুর্ব্বল শরীর মন ও বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকেরাই, ইন্দ্রিয়ের দাস, সহজ ভোগের দাস ও লালসার দাস অধিক হইয়া থাকে। দেখ, এই হিন্দু সংসারে বাল্যবিবাহ ও বহুপরিবার প্রথা চিরকাল হইতেই আছে, অথচ হিন্দুরা এক সময়ে না করিয়াছেন এমন দুষ্কর কার্য্যই নাই ; কোন অধ্যবসায়তেই তাঁহাদিগকে কেহ বাধা দিতে পারিত না এবং তাঁহারাও কোনটায় পিছ্‌পাও হইতেন না। মহা-রাষ্ট্রীয় ও রাজপুতকামিনী, সেদিনও স্বামী পুত্রকে স্বহস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছে এবং সেহেন প্রিয়তমগণেরও প্রাণের আশা অখেদে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করিতে সোৎসাহ আদেশ করিয়াছে। কিন্তু হায় ! যুগ-মাহাত্ম্যে আজ কাল তাহারাও ষষ্ঠীদাসী হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক, ভারত এতটা অধঃপাত-গত, তথাপি এখনও হিন্দুস্থানী সেপাহিকে, তাহার স্ত্রী কন্যা ও আত্মীয়গণ, মরিবার জন্য ও যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইবার জন্য, অকাতরে ও অকুণ্ঠিত মনে বিদায় দিয়া থাকে। সংস্কারবন্দী বা আলোকিত ভ্রাতাদিগের বয়স্থা-

বিবাহিত ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত কন্যা কামিনীদিগকে, আজিও সেরূপ বিদায় দিতে,দেখা যায় নাই। মিসর কাবুলে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া আজিও বাল্য বিবাহ-প্রপীড়িত ও বহুপরিবারবেষ্টিত হিন্দু সন্তানই গিয়া থাকে; সংস্কারক বা উন্নতি-শীল তাঁহারা যান না। নেপালও হিন্দু-প্রথার বন্ধনজ্বালায় জলিত! অতএব কেমন করিয়া বলিব, বহুপরিবার প্রথা মানুষের উদ্যম ও অধ্যবসায়কে বাধা দিয়া থাকে। বাঙ্গালীর ঘরে উহা, আপাতত সর্ব্বদা বাধাজনক বটে; কিন্তু সে শিক্ষাহীনতা ও ষষ্ঠীপূজার প্রভাবে। কিন্তু সে শিক্ষাহীনতা ও ষষ্ঠীপূজাই বা আর কতদিন তিষ্ঠিতে পারে। শিক্ষাহীনতা ও ষষ্ঠীপূজা অন্তর্হিত কর, দেখিবে আর উহা কোন রকমে বাধাজনক হইবে না। তদ্ভয় দূর করিতে হইলে, পরিবার মধ্যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব প্রযত্নে সুশিক্ষা পরিচালন করা আবশ্যক। স্ত্রীলোককে সুশিক্ষিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, বটে, কিন্তু ইহাও বলি যে, সে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও তথায় উপাধি গ্রহণের দ্বারা সুসম্পাদিত হয় না। হিন্দু কামিনীর প্রকৃত শিক্ষা তখন হইবে, যখন তাহা হিন্দুভাবে, হিন্দু ধরনে, হিন্দু সুশাস্ত্রানুসারে এবং সীতা ও সাবিত্রী প্রভৃতির আদর্শে সুসম্পাদিত হইবে। নতুবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তি জন্য যে শিক্ষা, সে শিক্ষা ছাগলের গলস্থিত স্তনের ন্যায়। এদেশে লোকমাতা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির অনুকৃতি আবশ্যক; রোলন্দ দেস্তেল আদির আবশ্যক নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া যে কেহ, এ পর্য্যন্ত ভাল স্ত্রী বা ভাল জননী হইতে পারিয়াছে এবং জাতীয়-ত্বেরও যথেষ্ট সমাদর করিতে শিখিয়াছে, ইহা এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

পূর্ণ জাতীয়ত্ব ও স্বজাতি বৎসলতা যাহাদের অন্তরে বিরাজ করে, তাহারা কখনও বিজাতীয়ত্বভাসে ভাসিত ও অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস এই যে, বহুপরিবার প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধতা, এ সকল যাহাদের দ্বারা আচরণীয়, তাহারা যদি উপযুক্তরূপে শিক্ষিত ও উপদেশিত হয় এবং প্রথা সকল যদি আবশ্যক অনুরূপ সংস্কৃত হয়; তাহা হইলে ঐ ঐ প্রথা সকল, বহুপরিবার বিরোধিতা, বয়স্কাবিবাহ, বিধবাবিবাহের অযথা বহুল প্রচার এবং ইউরোপীয় ধরণে স্ত্রীস্বাধীনতা, এ সকল হইতে বহুগুণে, এমন কি সহস্রগুণে, অধিক সুফল প্রসব করিতে

পারে। এখনও হিন্দুজাতি তাবত জাতির অপেক্ষা গৃহসুখে অধিক সুখী; কিন্তু তখন সে সুখ আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে, অথবা যে বাহিরের সুখে এখন আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, তাহাও তখন বিমল ধারায় করতলগত-ভাবে স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কিন্তু হায়, এ সকল কথা কাহাকে বলিতেছি? বাঙ্গারামকে!—যে বাঙ্গারাম দুইমাস বিলাত বাস করিতে পাইলেই জাতীয়ত্ব ত্যাগে ফিরিঙ্গী হইয়া যায়;—সেই জাতীয়ত্ব, যাহার জন্য বাঙ্গালী ভিন্ন জগতের আর তাবত জাতি জলধারার ন্যায় অকাতরে স্বীয় রক্তধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। আমি এ সকল কথা বলিতেছি হাওয়াকে!

'যেমন দেখা গেল, স্ত্রী যেমন কথা এবং কার্য্য, উভয়তই সম্পূর্ণরূপে সমধর্ম্মিনী এবং মানবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পথে অন্তরায় স্বরূপ হওয়া দূরে থাকুক, বরং সম্পূর্ণরূপে সহকারিণী; অন্যান্য পরিজনবর্গ সম্বন্ধেও, সম্বন্ধের দূরতা বা সন্নিকর্ষতা অনুসারে, অল্প বিস্তর উক্তরূপ কথা বলা যাইতে পারে। স্ত্রী ও পরিজনগণ, কি ধর্ম্ম, কি কর্ম্ম, উভয় পথেই, সঙ্গী সহকারী ও সাহায্যদাতা বলিয়াই, তাহাদের কথা প্রবন্ধের এইস্থলে অবতারণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। ফলত যে ব্যক্তি স্বয়ং যথার্থত ধর্ম্মবান এবং ধর্ম্ম হেতু কর্ম্মবান, এ জগতের তাবত জন এবং তাবত পদার্থ ও বিষয়ই তাহার নিকট সহকারী সদৃশ হইয়া থাকে। কেহই তাহার শত্রু ও সমস্বরূপ নহে। স্ত্রী-সাহায্য সর্ব্বোপরি গরিয়সী; ধর্ম্মী ও কর্ম্মী যে সে জীবস্বরূপ, স্ত্রী তাহার চেতনা।

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

৮

কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা,
কিং নামতে ত্বং কুতো আগতোঽসি।
এতন্মম ব্রূহি মম সুপ্রসিদ্ধং,
মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি।"
"নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষো,
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।

ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো,
ভিক্ষুর্নচাহং নিজ বোধরূপঃ॥"

"উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং,
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং,
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো॥"

মানবীয় কর্ম্ম মাত্রেই ব্যাত্মক; অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা মানস জগৎ এবং আধিভৌতিক বা দেহ জগৎ, এতদুভয় ব্যাপী ও উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। যে কোন কর্ম্ম, কেবল চিন্তামাত্রে পর্য্যবসিত বা চিন্তা ভিন্ন কেবল ভৌতিক উপকরণে প্রকটিত, ইহার কোন একতর অবলম্বনে সমাধান প্রাপ্ত হয় না। কর্ম্ম যে কোনরূপই হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই তাহার উভয় ব্যাপিত্বের ব্যতিক্রম হয় না। যে কোন বিষয়, একবার চিত্তোদিত হইলে, আর তাহা ভূতলিপ্ত না হইয়া পর্য্যবসিত হইতে পারে না। আবার যে কোন বিষয়, আগে চিত্তোদিত না হইলে, তাহার ভূতসংক্রমণ হইতে পায় না। ব্যাত্মকভাবের মানসভাগ ধর্ম্মাধিকার, ভৌতিকভাগ কর্ম্মাধিকার; আমরা কেবল কর্ম্মাধিকারকেই সাধারণত কর্ম্মনামে অভিহিত করিয়া থাকি, নতুবা বস্তুত উভয় অধিকারের একীকরণে সম্পূর্ণ কর্ম্ম।

কর্ম্ম সাধারণত, চক্ষু কর্ণ নাশিকা জিহ্বা ত্বক ইত্যাদি স্থূলেন্দ্রিয় এবং মন, ইহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্থূলেন্দ্রিয় সকল ভূতাত্মক এবং মন ভূতাত্মা উভয়াত্মক। মন যদিও আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় বটে, কিন্তু ভৌতিক শরীরে আবদ্ধহেতু, ভূতাত্মকও তাহাকে হইতে হইয়াছে। মন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ও আধিভৌতিক জীবন, এতদুভয়ের সন্ধি সূত্র ও সংযোগ রজ্জু স্বরূপ। মনের শক্তি অপরিমিত, স্থূলেন্দ্রিয় সকলের শক্তি তাহার সঙ্গে তুলনাতেই আইসে না, অথবা অন্য কথায় স্থূলেন্দ্রিয় সকলের শক্তি সসীম, মনের শক্তি অসীম। মন রাজরাজেশ্বর, স্থূলেন্দ্রিয়গণ তাহার দাসানুদাস স্বরূপ। কিন্তু মন যত বেশী পরিমাণে আধিভৌতিক প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয় ততই, তাহার শক্তি ভূতসীমতায় বাধাযুক্ত হইবার, তাহা সুপ্তবৎ

দৃষ্ট হইতে থাকে। আবার আধিভৌতিক প্রকৃতির শিথিলতায়, যতই আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বিকশিত হইতে থাকে; মনের অপরিমিত শক্তিও ততই প্রকটিত হইতে আরম্ভ করে।

সাধারণ লোকদৃষ্টিতে আধিভৌতিক প্রকৃতিই অত্যন্ত প্রবল, এজন্য সাধারণত কর্ম্মনিষ্পাদনার্থে, মন সহ স্থূলেন্দ্রিয় সমস্তই একমাত্র অবলম্বন রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মনুষ্যজীবনে, জীবনের এমনও একটি অবস্থা আছে যে, যে অবস্থায় স্থূলেন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া, একমাত্র মানসশক্তির প্রয়োগেই তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে,তদতীতে স্থূলেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যের অতীত এমন সকল কর্ম্মও নিষ্পাদন করিতে পারা যায়, যাহা সাধারণত অলৌকিক বোধে বোধিত ও তদ্রূপে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যাহাকে জড়বিজ্ঞানবাদীরা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী বলিয়া বর্ণনা ও তাহার সম্ভবতার প্রতি অবিশ্বাস ও উপহাস বর্ষণ করিয়া থাকে। জড়বিজ্ঞানবাদীদিগের বিশ্বাস যে, তাহারা যে পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছে, তদূর্দ্ধ আর প্রকৃতিক নিয়মে নূতন কিছু হইতে পারে না বা থাকিতে পারে না। যাহা হউক, তাহাদের সে ভ্রান্ত বিশ্বাস লইয়া আমাদের এখানে তর্কবিতর্ক ও কালক্ষেপ করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বস্তুত, মানসশক্তির দ্বারা লৌকিক এবং তদতিরিক্তে অপরিসীম অলৌকিক রূপে পরিচিত কার্য্য সকলও করিতে পারা যায়। এরূপ মানসশক্তিপ্রসূত কার্য্য সকলকে, এদেশীয় অজ্ঞ লোকেরা দৈব এবং ইউরোপীয়েরা 'মিরাকেল' নামে নামিত করিয়াছে। এই মানসশক্তির অস্ফুট কণিকামাত্রের পরিচয় কোন কোন ইউরোপীয় ইদানীন্তন কালে প্রাপ্ত হইয়া, ইহাকে 'উইল পাওয়ার' এবং থিওসফিষ্টেরা ইহাকে 'ওকল্ট পাওয়ার' নামে নামিত করিয়া থাকে। হিন্দুজাতির মধ্যে বিজ্ঞগণের নিকট, উহা 'যোগবল' নামে আবহমান কাল হইতে পরিচিত। ফলত আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ উন্মেষকারক যোগ আচরনের দ্বারাই মানসশক্তির বিকাশ লাভ হইয়া থাকে বিনা যোগে হয় না, অথবা যোগও যে সে যোগ আচরিত হইলে তাহ লাভ হয় না। জ্ঞানযোগ সহ বিভূতিযোগের সমাবেশ হইলে, উক্ত শক্তি লাভ হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে, যে সে প্রকারে যোগাবিষ্ট হইলেই

তাবৎশক্তি ও তাবৎ বিষয় করতলস্থ হয়; ইহা মহা ভ্রম। যোগাবেশ একজন গণ্ডমূর্খতেও অভ্যাসাদিগুণে হইতে পারে, কিন্তু কেবল সেই আবিষ্টমাত্র হওয়ার ফলেই যে সে মহাজ্ঞানিত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিবে, এমন কোন কথা নাই। 'ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যসংযমাৎ' একথা সত্য; কিন্তু যোগ আচরণের দ্বারা সেই ভুবনজ্ঞানে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম কেবল সেইমাত্র ব্যক্তি, যে জানে যে ভুবনজ্ঞান বিষয়টা কি এবং যে সেই প্রধান উদ্দেশ্যেতেই যোগাবলম্বন করিয়া থাকে। যোগের আচারে কেবল উচ্চ রকমে জমি তৈয়ার হয় মাত্র; নতুবা বীজ বপন ও অঙ্কুরে জলসেচন যাহা, তাহা তোমাকে আমাকে সেই পূর্ব্ববৎই করিতে হইবে। তবে কি না যোগজ্ঞ জমিতে নিশ্চয়তা এই মাত্র যে, সে বীজবপনে ও জলসেচনে আশাতীত, গণনাতীত ও অপরিমিত ফল লাভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যোগ ও যোগফল ইউরোপখণ্ডে এখনও উপন্যাস ও উপহাসের বিষয়।

তবে সত্য সত্যই কি কেবল একমাত্র মানসশক্তির দ্বারা অলৌকিক কার্য্য সকল সাধন করিতে পারা যায় এবং যদি পারা যায়, তবে কি জন্য ও কি সূত্রেই বা তাহা সম্ভবপর হইয়া থাকে? সে কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আগে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিগোচর ও সাধারণ পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে মর্ম্ম ও মর্ম্মার্থ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যথা,—

১। আমরা বয়স্থ বা বৃদ্ধ যে যে বস্তুকে যে পরিমাণের আকার বিশিষ্ট রূপে দেখিয়া থাকি, শিশুর চক্ষে তাহা অপেক্ষাকৃত আরও বৃহৎ পরিমাণের আকারে দৃষ্ট হয়;—একথার সত্যতা সকলেই, নিজের শৈশব ও বয়স্থ দৃষ্টির ত্যক্ত প্রতিভাস সকল মিলাইলে, অনুভব করিতে পারিবেন। পুনশ্চ যাহার যেমন ও যে প্রকারের দৃষ্টিশক্তি, সে ব্যক্তি বস্তু বিশেষকে সেইরূপ প্রকারেরই দৃষ্ট করিয়া থাকে এবং দ্রষ্টার নিকট দৃষ্টবস্তুও তদ্রূপ বলিয়া পরিচিত ও ধ্রুব বিশ্বাসিত হয়। এমন স্থলে কোন বস্তু প্রকৃত কিপ্রকারের ও কি আয়তনের এবং কাহার সত্য পরিমাণ কি, তাহা কিরূপে ও কোন সত্যাদর্শে নির্ণিত হইতে পারে?

২। দর্শন-ইন্দ্রিয়তে যে হীন, তাহার নিকট আঁস্তাকুড় এবং রাজ-অট্টালিকার শোভনশীলাতল উভয়ই সমান; তাই বলি তবে স্থানবৈচিত্র

পক্ষে সত্য পরিমাণ কি ? দর্শনেন্দ্রিয় না স্থানবিশেষ ? স্থান বিশেষত নয়,—নতুবা আঁস্তাকুড় ও অট্টালিকা এক বোধ হইবে কেন ? তবে কি দর্শনেন্দ্রিয়,—অনেকের দর্শনেন্দ্রিয় নাই ; তখন ? তদ্রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় যাহার নাই, তাহার নিকট বাস-পদার্থ অস্তিত্বশূন্য ; অথবা যে বাস তোমার আমার নিকট অসহনীয়, চামার মেথর বা যে কোন লোক বিশেষের নিকট তাহাই ত বিনানুভূতিতে সহনীয়রূপে দেখা যায় ; অতএব বাস বা বাসবৈচিত্র পক্ষে আদর্শ-বা সত্য পরিমাণ কি ? এইরূপ কথা অবিকল অন্যান্য তাবৎ ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।

৩। এই পদার্থ কঠিন, এই পদার্থ উষ্ণ, ইত্যাদি অনুভূতি আমার হয় কেন ?—যেহেতু আমার ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাকৃত কোমল, অপেক্ষাকৃত শীতল, এই জন্য ; কিন্তু যদি আমার ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাকৃত কঠিনতর, অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর হইত বা যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ সেইরূপ হইয়া আছে, তাহাদের নিকট সেই সেই কঠিন পদার্থ কোমল, সেই সেই উষ্ণ পদার্থ অবশ্যই শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি কঠিনতা, কোমলতা, শীতলতা, ইত্যাদি গুণের প্রকৃত আদর্শ বা পরিমাণ কি ?

৪। দৃষ্টিশক্তির হীনতা, গমনশক্তির ক্ষীণতা, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যূনতা হেতু, ব্যবধান বোধ হইতে দেশ বুদ্ধি ; কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তির সেই সেই ন্যূনতা না থাকিলে, দেশ-বুদ্ধি কোথায় থাকিত ?—দেশ-বুদ্ধি না থাকিলে কাল-বুদ্ধিই বা কোথায় থাকিত ; অতএব দেশ ও কাল প্রকৃতপক্ষে পদার্থটা কি ?

৫। চক্ষুবিশেষ অনুসারে বর্ণের তারতম্য হয় ; জিহ্বা বিশেষ অনুসারে স্বাদের তারতম্য হয় ; রুচি বিশেষ অনুসারে একই রূপে রূপের ভাল মন্দ ভেদ হয় ; অথবা তারতম্য ভাল মন্দ ভেদ বলিই বা কেন,—কখন কখন অস্তিত্ব অনস্তিত্বেরও বাধ হইয়া থাকে। অতএব বর্ণ, স্বাদ, রূপ, ইত্যাদি পদার্থ বিষয়ের আদর্শ বা সত্যতা কোনখানে ? ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রশ্নেরই একরূপ পুনরুক্তি বটে, কিন্তু তথাপি একটু বিশেষ আছে। জন লুবক নামক এক ইংরেজ বিজ্ঞ বলিয়া থাকে যে,অনেক ইতরজীবে এমন অনেক প্রকার ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানতা আছে, যে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়ের ধারণা আমাদের আদৌ

একেবারে নাই; সুতরাং তাহারা এমন অনেক বিষয় অনুভব করিয়া থাকে, যাহা আমাদের বোধেই আইসে না,—এজন্য কাজেই বলিতে হয় যে সে সকল বিষয় আমাদের নিকট একেবারে অস্তিত্ব শূন্য। তাই জিজ্ঞাসা করি, তবে আছে বা কি, নাই বা কি; প্রকৃত অস্তিত্ব তবে কাহার, ইন্দ্রিয়ের না ইন্দ্রিয়-বিষয়ের? ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলেই বিষয় প্রকটিত হয়; আবার ইন্দ্রিয় মলিনতার সঙ্গে বিষয়ও অন্তর্হিত হইয়া যায় কেন?

৬। সুখ, দুঃখ, দৈহিক ক্লেশাদি, যে যত বেশী মনে করে, সেই তাহাতে তত ব্যাকুল হয়; যে অল্প মনে করে, সে অল্প ব্যাকুল হয়, অর্থাৎ তাহার সুখ দুঃখাদি অনুভব অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। আবার এমনও লোক আছে, যাহারা সুখ দুঃখাদিকে একেবারেই মনে করে না। ফলত দেহ ও মনের অনেক আবেগ, অনেক ঘটনা, মনে করিলেই হয়; মনে না করিলে হয় না। বেশী মনোযোগীর নিকট সেই সেই বিষয়ের বেশী অস্তিত্ব; অল্প মনোযোগীর নিকট অল্প অস্তিত্ব; আবার অমনোযোগীর নিকট উহা অস্তিত্ব শূন্য। যে উপলক্ষ্যে যে কার্য্য, অতি মনোযোগীর নিকট হইতেছিল; অমনোযোগীর নিকট ত সে উপলক্ষ্য সত্ত্বেও সে কার্য্য হইল না। মনে কর, অস্ত্রাঘাতে, অতি মনোযোগীর গায় ক্ষত হইল এবং তাহাতে তাহার বিষম যন্ত্রণারও উৎপাদন করিল; কিন্তু অমনোযোগীর গায়ে তাহাতে কেবল ক্ষতমাত্রই হইল, কই যন্ত্রণারূপ কার্য্যত হইতে পাইল না। তবে কে জানে, ক্ষত বিভাজক ইন্দ্রিয়-শক্তি না থাকিলে, হয় ত ক্ষতও হইতে পাইত না; আরও সূক্ষ্মতরে ইন্দ্রিয়-শক্তির অভাব হইলে কি তবে অস্ত্রের অস্তিত্বও থাকিতে পাইত না? অথবা অস্ত্রতরে, অস্ত্রের ক্ষতকারক শক্তিই হয় ত থাকিত না; অথবা তদ্বিপরীতে অস্ত্র, শুভকারক শক্তি সম্পন্নরূপেই হয় ত প্রতীয়মান হইত। যে জলাভ্যন্তর স্থলচরের প্রাণবিঘাতক, তাহাই জলচরের পক্ষে প্রাণপ্রদায়ক। প্রত্যাহার সিদ্ধ ব্যক্তির নিকট ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়-বিষয় অস্তিত্ব শূন্য হয়।

৭। মনের গুণে ভাল বিষয়ও মন্দ হয় ও মন্দ ফল দেয়; আবার মন্দ বিষয়ও ভাল হয় ও ভাল ফল দেয়। কথা আছে, অজ্ঞাতে সাপের বিষ খাওয়া যায়। একটা গল্প আছে এবং গল্প সত্য বলিয়াই গৃহীত যে, একদা এক ব্রাহ্মণ সর্পভক্ষিত দধি অজানত খাইয়াছিল এবং প্রথমে

তাহাতে তাহার কিছুই হয় নাই, যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনিই ছিল। কিন্তু তিন চারিদিন পরে সে যখন শুনিল যে সর্প-উচ্ছিষ্ট দধি খাইয়াছে, তখনই তাহার শরীরে বিষ ব্যাপিল ও সে অবিলম্বে মরিয়া গেল। কে না বুঝিবে যে, ইহার এ দশা ও মৃত্যু ইহার মনের কাজ নহে! ফলত অনেক লোক মনের হুতাসে মরিয়া যায়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, সাহসী বা দৃঢ়চিত্ত যে, আসল বিপদেও তাহার কিছু করিতে পারে না। শরীরের অনেক রোগ মনের বিশ্বাসে ভাল হয়। অনেক পদার্থ, মনের বিশ্বাস বশতঃ চলিত গুণ হইতে অন্যরূপ গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। কাঁচপোকার ভয়ে অভিভূত তেলাপোকা, মনের গুণে কাচপোকা হইয়া যায়। যে সাধারণ নিত্য দৈহিক ব্যাপারের অভাবে জীবন তিষ্ঠে না এবং যাহা যাহা মানবের অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি বলিয়া বিশ্বাসিত; যোগীগণ, মনকে স্ববশে আনিয়া, সেই চিরবিশ্বাসের প্রতিকূলে, সে প্রকৃতি ও সে ব্যাপার সমস্তকেই জয় করিয়া থাকেন। অন্ততঃ সাক্ষাৎ-দৃষ্ট যোগী হরিদাস ও ভুকৈলাশের আনিত যোগী ইহার প্রমাণ স্থল। অতএব জিজ্ঞাস্য, অস্তিত্ব কাহার? প্রকৃতি বা পদার্থ সকলের, অথবা তাহাদের জয়কারী ইন্দ্রিয় বা মনের?

৮। এ সংসারে অনেক বিষয়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে আবিষ্কারের পূর্ব্বগামী ও পূর্ব্বসূত্র মনঃকল্পনা। আগে সূক্ষ্মতর বস্তুর অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে, তবে তোমার অণুবীক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে; যেমন এ বিষয়ে, তদ্রূপ এ সংসারের তাবৎ আবিষ্কার ও আবিষ্কৃত বিষয় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

৯। অতর্কিত মনের নিকট, স্বর, শব্দ, রূপ ও বৃহৎ পদার্থকেও, অস্তিত্ব শূন্য হইতে দেখা যায়; আবার তর্কিত মনে অবস্তু স্থলেও বস্তুর আরোপ হয়। রজ্জুকে সর্প দেখে, কর্ত্তিত পদার্থকে অকর্ত্তিত দেখে; আবার সাপেতেও রজ্জু দেখে, অকর্ত্তিত পদার্থকেও কর্ত্তিত দেখে, ইত্যাদি। তুমি বলিবে এ সকল ক্ষণিক; তা বটে, কিন্তু ক্ষণিক আর স্থায়ীর সত্য পরিমাণ কি বলিতে পার? যাহা স্থায়ী, তাহা অন্যের তুলনে ক্ষণিক; যাহা ক্ষণিক, তাহা অন্যের তুলনে স্থায়ী; অতএব স্থায়ী ও ক্ষণিক বলিয়া প্রকৃত কোন পদার্থ আছে কি? পুনশ্চ স্থূলেন্দ্রিয়, একহাত অন্তরে কার্য্য

করিতে হইলেই, না নড়িয়া পারে না; কিন্তু মন একস্থানে বসিয়াই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ ও অবলোকন করিতে পারে। মনের কি গুণ বশতঃ এরূপ এরূপ ঘটনা হয়?

সাধারণের বিচার আকর্ষণ ও মীমাংসা হেতুই, উক্ত ঘটনাগুলির তালিকা করা হইল।

অতঃপর আর বিষয় সকলের তালিকা বাড়ানর আবশ্যক নাই। যাহা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম তাহা দ্বারাই, বোধ হয়, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাহা স্পষ্টত সকলের বুদ্ধিগোচরে আসিবে। তালিকার দ্বারা আমার ত ইহা স্পষ্টতই প্রতীত হইতেছে যে, এ সংসারে কোন ভৌতিক বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের আদর্শ বা সত্য পরিমাণ নাই; তাবৎ পদার্থই অপেক্ষিক এবং দ্রষ্টা সকাশে, তাহাদের গুণাগুণ এবং অস্তিত্ব অনস্তিত্ব ভাব পর্য্যন্তও, সম্পূর্ণরূপে দর্শনসাধক ইন্দ্রিয়ানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ফলত আমাদের ভৌতিক শরীর ও ভূতগ্রাহী ইন্দ্রিয়গণ আছে বলিয়াই, ভূতজগৎ 'বিষয়' রূপে আমাদিগের গোচরীভূত হইতেছে; নতুবা,শরীর ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ যদি না থাকিত, তাহা হইলে কখনই তদ্রূপ গোচরীভূত হইতে পারিত না এবং যখন শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ না থাকিবে,তখন গোচরীভূত হইতে পারিবেও না। এই সূত্রে একটা কথা মনে পড়িল, অনেকে নির্ব্বোধের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে, মানুষ যখন মরে তখন মানুষ কোথায় যায় এবং এই পৃথিবীর অতীত বা ইহারইকোন স্থানে তাহারা থাকে কি না। কিন্তু ইহা তাহারা বুঝে না যে, যতক্ষণ জীবের এই স্থূলশরীর ও স্থূলতাগ্রাহী ইন্দ্রিয়ের স্থিতি; ততক্ষণই এই স্থূলরূপা পৃথিবী আয়ত্তযোগ্যা, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব। মৃত্যুতে স্থূলশরীর ও স্থূলেন্দ্রিয় সহ, এই স্থূলরূপা পৃথিবীও অদৃশ্য এবং তিরোহিত হইয়া থাকে। তখন জীবের সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয়, বা তাহার যে কোনরূপ শরীর ও তদনুরূপ ইন্দ্রিয়, যেরূপ অনুভূতি শক্তি বিস্তার করিবে, সে তখন সেইরূপ যে কোন প্রকার সূক্ষ্মাত্মক নূতন পৃথিবীকে অবলোকন করিবে ও সেইরূপ নূতন পৃথিবীতে যাইবে। যখন যে প্রকারের ও যে জাতীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়, তখন তাহারা যে কেবল সেইরূপ বিষয়কেই অনুভব ও গ্রহণ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু পারে না,

ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; বরং উহাই যুক্তিসিদ্ধ এবং নিয়ম। তুমি যে গ্যাসকে দৃষ্ট করিতে পারিতেছ না, সে কেবল তোমার দর্শনেন্দ্রিয় সেরূপ নহে বলিয়া। তবে যে তুমি গ্যাসকে অন্যরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছ, সে তোমার অপরাপর ইন্দ্রিয়-শক্তির অনুকূলতা প্রসাদাৎ। কিন্তু সে অপরাপর ইন্দ্রিয়ও যদি দর্শনেন্দ্রিয়ের ন্যায় তুল্যরূপ স্থূল ও প্রতিকূল হইত, তাহাহইলে নিশ্চয় জানিও, সেই গ্যাস কোন কালেই তোমার অনুভূতির ভিতর আসিত না, সুতরাং তোমার নিকট তাহা সর্ব্বদাই ধারণার অতীত ও অস্তিত্বশূন্য থাকিত; পুনশ্চ, যদিই বা কেহ কখন কোন দিন কোন দৈবপ্রাপ্ত সূক্ষ্মশক্তি প্রসাদাৎ গ্যাসকে অনুভব করিতে সমর্থ হইত, তুমি হয় ত সগর্ব্বধৃষ্টতা সহকারে তাহাকে বাতুল বা কুসংস্কারাপন্ন ও বিশ্বাসপ্রবণ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে—যেমন এখন কোন কোন বিষয়েতে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিয়া থাক! বস্তুত, মানব মরিয়াও কোথায় যায় না এবং জন্মিয়াও কোথাও আইসে না। আমরা যেখানকার সেইখানেই অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি; কেবল জীবত্ব প্রেতত্ব আদি নানাবিধ অবস্থা সকল আমাদিগকে পর পর পর্য্যায়ক্রমে আক্রম ও অতিক্রম করিয়া যাইতেছে মাত্র। পর্ব্বতের মেরুদণ্ড সদৃশ অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরদণ্ড বরাবর সমানই দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে; কালবশে ও ঋতুবশে তাহাকে বেড়িয়া যেমন মৃত্তিকা, তৃণ, উদ্ভিদ, জীব, ধাতু, শীলা, ইত্যাদি নানাবিধ বস্তন্তর ও অবস্থান্তর সকল স্তরে স্তরে, যুগে যুগে, পর পর, নব দৃশ্য দেখাইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে; আমাদের আত্মাকেও বেষ্টন করিয়া তেমনি জন্মপূর্ব্ব, জন্ম ও জন্মান্তর, তাহাদের সহকারী ও সমবায়ী লোক সকল, ইত্যাদি অবস্থান্তর ও ভাবান্তর, পর পর পর্য্যায়ক্রমে, আক্রম ও অতিক্রমে, যাওয়া আসা করিয়া থাকে। অথবা একই দণ্ডবেষ্টনে ঊর্দ্ধাধভাবে পর পর বিবিধ বর্ণ বিন্যাসে বর্ণ বৈচিত্র যেমন; আমাদিগকে বেষ্টিয়া জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যন্তর ও জন্মান্তর এবং ইহলোক, পরলোক, পুনরিহলোক প্রভৃতি অবস্থা বিন্যাসে অবস্থাবৈচিত্রও সেইরূপ। পর্ব্বতাভ্যন্তরস্থ প্রস্তরদণ্ড ও তাহার অধিষ্ঠান ভূতা দেশকে যে ব্যক্তি পৃথিবীর আদিমকালে দর্শন করিয়াছে; যুগান্তর-পরিণত সেই পর্ব্বত এবং যুগান্তর-পরিবর্ত্তিত সেই দেশকে এখন সে একবার

আসিয়া যদি হটাৎ অবলোকন করিতে পারে তাহা হইলে, পর্ব্বতকে অভিনব বস্তু এবং দেশকে স্থানান্তরবিশেষ রূপে নিঃসন্দেহ উপলব্ধি করিতে থাকিবে। আমাদেরও সেইরূপ অবস্থান্তর হেতু জন্মান্তরতা এবং ভাবান্তর হেতু দেশান্তরতা ও কালান্তরতা অনুভূত ও প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বস্তুত আমাদিগের জন্ম ও জন্মান্তর সকল, অবস্থা ও অবস্থান্তর সকল মাত্র এবং লোক ও লোকান্তর সকল, তদাশ্রিত ভাব ও ভাবান্তর সকল মাত্র। অবস্থান্তর বশে আমরা কখন জন্মাই, কখন মরি এবং ভাবান্তরবশে কখন এখানে থাকি ও এটা দেখি, অথবা কখন সেখানে যাই ও সেটা দেখি, এতদ্রূপে প্রতীয়মান হয়; ঠিক যেন দেখায় জন্ম এবং পৃথিবী স্থির, ঘুরিয়া বেড়াই কেবল আমি;—যেমন সূর্য্যকে ঘুরাইয়া পৃথিবী স্থির, তদ্রূপ। ফলে কিন্তু, যেমন সূর্য্য ঘোরে না পৃথিবীই ঘোরে; তদ্রূপ আমি যেখানকার সেই খানেই আছি; ঘুরিতেছে কেবল অবস্থা ও ভাব, জন্মান্তর ও স্থানান্তর এবং স্থানান্তর হেতু কালান্তর। স্থান এবং কাল, উভয় উভয়ের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। পরন্তু উল্টাদৃষ্টিতে তাবত পদার্থই উল্টা দেখাইয়া থাকে; তাই সচরাচর দেখায় যেন, অবস্থার আধার ভাব, জীবের আধার জগত, জন্মের আধার লোক; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু অবস্থা হইতেই ভাব, জীব হইতেই জগত এবং জন্ম হইতেই লোক। বিশেষতঃ সেই উল্টা দৃষ্টি হেতুই, অসত্য স্বরূপ জগত-প্রপঞ্চকে সত্যস্বরূপ বোধ হয়; অসত্যস্বরূপ জীব-প্রপঞ্চকে সত্যস্বরূপ বোধ হয়; লোকে অসত্যকে সত্য-স্বরূপ ভাবিয়া মোহিত হয়। এ কথায় কিন্তু বাঞ্ছারাম ভাবিয়াই অবাক!

আত্মাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থা, অবস্থার ব্যাপ্তিতে ভাব। অবস্থা এবং ভাব, এ উভয় একই পদার্থের দুই দিক; —কিন্তু কোন্ পদার্থের এ দুই দিক, কি নামে তাহাকে অভিহিত করিব, বলিতে পার?—মায়া। ভাল তাহাই হউক, মায়া বলি-য়াই আপাতত তাহাকে নামিত করা হউক। অবস্থা যাহা তাহা ব্যাপক এবং ভাব যাহা তাহা ব্যাপ্তি। অবস্থা জীবত্ব এবং ভাব ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জগত। অবস্থাবৈচিত্র এবং ভাববৈচিত্রই এ বিশ্বে জীববৈচিত্র ও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জগতবৈচিত্র। আত্মার জীবস্বরূপতা এবং জীব সম্বন্ধে জগতস্বরূপতা, এতদুভয় এই অবস্থা এবং ভাব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়

বলিয়াই, তালিকায় বর্ণিত বিষয় সকলের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও অপরিমাণতা। যে জীবস্বরূপে যে অবস্থা ও সেই অবস্থাজনিত তাহাতে যে ভাবের আরোপ ও সমাবেশ, সে ভাবে শরীর এবং ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ এবং জগত ও জগতস্থবিষয় সকলও তাহার নিকট তথাবিধরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অবস্থা বৈচিত্র এবং ভাববৈচিত্র; ইহাদেরই এক অন্যতর প্রকার হইতে ইহজাগতিক অস্তিত্ব অনস্তিত্ব, আলোক অন্ধকার, শীত উষ্ণ, কঠীনতা কোমলতা, ছোট বড়, শক্ত অশক্ত, বর্ণ অবর্ণ, রূপ অরূপ, ইত্যাদি এবং ইহাদিগের মধ্যেও বিবিধ অংশ ও অণু বৈচিত্র যাহা কিছু তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা, ভোজবাজির খেলা সদৃশ যে এই জীবপ্রপঞ্চ এবং জগতপ্রপঞ্চ, ইহারা যে অবস্থা এবং ভাব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই অবস্থা এবং ভাব প্রকৃত পক্ষে পদার্থটা কি; কোথায় ছিল, কোথা হইতে আসিয়াই বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কেনই বা আমাদিগকে এ তুফান তরঙ্গে পাতিত ও ওতপ্লুত করিয়া মোহাভিভূত করিয়া ফিরিতেছে? কে এ খেলার খেলক এবং কেনই বা আমরা খেলিত হই?—বলিতে পার বাঞ্ছারাম? বলিতে পার বাঞ্ছারাম, কে আমাদিগকে এ বিষম সমস্যা পুরণার্থে বুদ্ধি প্রদান করিতে সক্ষম?

"য একোঽবর্ণ বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

কোথা হইতে সে অত্যাশ্চর্য্য অবস্থা এবং ভাবের উপস্থিতি হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন,

অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণবর্ণাং
বহবীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ॥

প্রধানা প্রকৃতিই ইহার মূল এবং তিনিই অবস্থা ও ভাবের উৎপাদনে, অথবা স্বয়ং অবস্থা ও ভাবস্বরূপে পরিণতি পূর্ব্বক, এই জীব ও জগৎ প্রপঞ্চের

বিকাশ করিতেছেন, এ বিষম ভোজবাজির খেলা খেলিতেছেন। কিন্তু কে সে প্রধানা প্রকৃতি, কে তিনি? শ্রুতি তাহাকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সে মায়া, সে অভাবনীয়া, সে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদিকা-এবং প্রলয় সময়েও "সৈষা যা প্রলয়ে সমস্ত জগতাং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী," এবম্ভূত সে মহামায়ার মায়ী কে? সে মায়া কি আপনিই এ ভোজবাজির খেলা খেলিতেছেন, না কেহ তাঁহাকে খেলাইতেছে?—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।

সেই ভগবান মহেশ্বরই এই মায়ার মায়ী এবং তিনিই উহাকে খেলাইতেছেন এবং তাঁহা হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইতেছে। কিন্তু কেন তিনি এ মায়ার খেলা খেলেন, যাহাতে আমরা পাপী তাপী, সুখী দুঃখী, নানা অবস্থান্তর ও ভাবান্তর প্রাপ্ত হই? এতগুলি জীবকে নানা বিকল্প তরঙ্গে ওতপ্রোত করার অপেক্ষা, চুপ করিয়া স্বীয় আনন্দে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিলেইত তাঁহার পক্ষে উত্তম শ্রেয়ঃ ছিল? আমাদের এ পাপ তাপ, সুখ দুঃখাদি দেখিয়া তাঁহার আনন্দের কি কিছু বৃদ্ধি হয়; অথবা বালক্রিড়া বশতই কি এরূপ করিয়া থাকেন? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে বলিবে?

মূর্খ মানব ক্লেশ পাইলেই ঈশ্বরের নিন্দা করিয়া থাকে; সুখ পাইলে কেহবা ধন্যবাদ দেয়, কেহবা দেয়ও না। কিন্তু সে সকলের দ্বারা ব্রহ্মের রোষ বা তোষোৎপাদিত হওয়ার কল্পনা যেমন অলীক; তিনি যে তোমার আমার জন্য পাপ তাপ সুখ দুঃখ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এ কল্পনা এবং এ বুদ্ধিও তেমনি অলীক। তিনি কাহার পাপোৎপাদক কারণেরও সৃষ্টি করেন না, অথবা পুণ্যোৎপাদক কারণেরও সৃষ্টি করেন না; অথবা এইরূপ সৃষ্টি ও সৃষ্টিবৈচিত্র রচনা করিব বলিয়াও সৃষ্টি করেন না। তাঁহার মায়িক নিয়ম বা নিয়োজন এবং জীবাত্মার বাসনা বা কর্ম্ম, তদুভয় হইতে সে সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'মায়া' তাঁহার স্বভাব এবং প্রকৃতি; যাহা স্বভাব এবং প্রকৃতি তাহার সম্বন্ধে 'কেন?' এ প্রশ্ন খাটে না। অথবা কোথা হইতে স্বভাব ও প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে, এ প্রশ্ন করাও যেমন সঙ্গত;

কোথা হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি হইয়াছে, এ প্রশ্নও তদ্রূপ সঙ্গত। যেখানে যেমন কারণ, সেখানে সেইরূপ ফলোৎপত্তি; ইহাই মায়ার নিয়োজন। অতএব ব্রহ্মপ্রকৃতিরূপা মায়াকে ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মনিয়মও বলা যাইতে পারে এবং এই নিয়ম সম্বন্ধ হেতু, ব্রহ্ম ক্রিয়াবান ও কর্ত্তা না হইলেও, তাঁহাতে নিয়ন্তৃত্ব, সুতরাং কর্ত্তৃত্বের আরোপ হয়। পুনশ্চ, মায়ার এক পরিচয় যেমন কারণানুরূপ কার্য্য নিয়োজনে; মায়ার তেমনি আর এক পরিচয় আছে যে, যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহাই-করিয়া দেখান;—কিন্তু দেখান্ কাহাকে? সেই ভ্রান্ত-দর্শনের উপযুক্ত যে ভ্রান্ত দর্শক, তাহাকে। যে যেমন ভ্রান্ত, তাহাকে সেইরূপ ভ্রান্তি-দৃশ্যই দেখাইয়া থাকেন। তাই তিনি, ভ্রান্ত ও অজ্ঞান মানব সকাশে, ব্রহ্ম যদিও শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ভূতদেহীরূপে দেখাইয়া থাকেন; ব্রহ্ম অকর্ম্মশীল, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে কর্ম্মশীল রূপে প্রতীয়মান করাইয়া থাকেন; ব্রহ্ম রোষ তোষ সৎ অসৎ ইত্যাদির অতীত, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে তাহাতে আসক্তের ন্যায় দেখাইয়া থাকেন; ইত্যাদি। এই সকল মায়ার কার্য্য। সেই মায়ার কার্য্য হইতেই সৃষ্টি প্রপঞ্চ, সৃষ্টিকর্ত্তা ভাব, সৎ অসতের পরিণাম বিধি, ইত্যাদি সমস্ত বিহিত হইয়া থাকে। মায়ার জন্ম ভাব হইতে ঈশ্বরত্ব এবং জনিত ভাব হইতে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ও তৎ-পরিণাম। জনিত ভাবে ক্রিয়াত্মকতা হেতু, মায়ার অপর নাম শক্তি। পুনশ্চ, দৃশ্য-ভ্রম যেরূপ; দর্শকের স্বগত কারণ হেতু দর্শকে ভ্রান্তি যাহা,তাহাও সেইরূপ মায়িক নিয়োজন। এরূপে, ভ্রান্তি এবং ভ্রান্ততা উভয়েরই উৎ-পাদিকা বলিয়া, বেদান্তশাস্ত্রে মায়াকে অবিদ্যা নামেও নামিত করিয়াছে।

যেমন তুলার কণা বা কেশেঘাসের ফুলের কণা বায়ুভরে উড্ডীন হইলে, জীবনবিশিষ্ট উড্ডীয়মান কীটাণুরূপে দৃষ্ট হয়; মায়াও ব্রহ্ম-সত্তা ভাসে সেইরূপ ক্রিয়মাবা ঈশ্বরীরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মায়াশক্তিপটে, অনুরূপ কারণ প্রতিঘাতে যে অনুরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাই জীব-জগতে অদৃষ্ট বা ঈশ্বর দত্ত ফল রূপে গণিত হয় এবং তাহা হইতেই ঈশ্বরের ফল-দাতৃত্ব। নতুবা নিগূঢ়ভাবে দেখিতে গেলে, সে ফলের সাক্ষাৎ কর্ত্তা সেই, যে মায়াশক্তিপটে কারণের প্রতিঘাতকারী অর্থাৎ জীবাত্মা স্বয়ং। ভাল, তাহাই যদি হইল, আমাদের পক্ষে

তবে তেমন ঈশ্বর স্মরণে ফল? ফল আছে; যেমন স্মরণ, পরমাত্ম-সাযুজ্য তথা পরিমাণ লাভে, মায়াবন্ধন ক্ষীণ হয়;—সমধর্ম্মী পদার্থ স্মৃতি-আকর্ষণে সন্নিকবতা প্রাপ্ত হয়। মায়াবন্ধন ক্ষীণ হইলে, সুফলের বিকাশ এবং লাভ হইয়া থাকে। মায়ার আবেশের গাঢ়তায় কুফল, বা শিথিলতায় সুফল। মায়ার গাঢ়তা যত অধিক, আত্মা স্বীয় শুদ্ধাবস্থা হইতে ততদূরে গিয়া পতিত হয়; এজন্য তাহা কুফল। আবার মায়া-শিথিলতা যত, আত্মার স্বীয় অনন্ত শুদ্ধাবস্থা ভাবের তত বিকাশ ও প্রকাশ. তাই তাহা সুফল বলিয়া গণিত হয়। যখন যে প্রকারের মায়া-গাঢ়তা বা শিথিলতা, তখন সে প্রকারের কুফল বা সুফল লাভ। আত্মার অনন্ত বিকাশ ও বিভূতি-শীলতা হেতু, অনন্ত কুফল বা সুফল, উভয়েরই সম্ভবতা আছে। মায়াবেশের গাঢ়তা বা শিথিলতা, এ দুই সাধন আমাদেরই হাত।

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥

এখানে পরমাত্মা ও তাঁহার মায়া স্বরূপ প্রকৃতি সহ, জীবাত্মা ও তাহার নিজ প্রকৃতির যে সম্বন্ধ, তাহা একটু খোলসা করিয়া বলা যাউক। পরমাত্মার যে ব্যষ্টিরূপ চৈতন্য, জীবত্ব প্রাপ্ত হয়েন; সুবিধার নিমিত্ত তাঁহাকে জীবাত্মা নামেই অভিহিত করা গিয়াছে ও যাইতেছে। জীবাত্মা যেরূপ পরমাত্মার, জীবাত্ম-প্রকৃতিও সেইরূপ পরমাত্ম-প্রকৃতির, ব্যষ্টিরূপ। জীবাত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার প্রকৃতিও পরমাত্ম-প্রকৃতির ন্যায়, সাম্যাবস্থায় থাকে। এই সাম্যাবস্থায় স্থিত প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতি বলাযায়। জীবভাবাপন্ন অবস্থার সহ তুলনে, স্বরূপস্থ জীবাত্মা যদিও সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু তথাপি সমষ্টিরূপ পরমাত্মার সহ তুলনে, জীবাত্মা ব্যষ্টিরূপতা হেতু অসর্ব্বজ্ঞ। এই অসর্ব্বজ্ঞতা জন্য প্রবৃত্তি ও প্রলোভনে, স্বরূপস্থ জীবাত্মা যখন স্বীয় প্রকৃতিস্থগুণ সকল উপভোগ করিতে বাসনাযুক্ত হয়েন; তখন সুতরাং 'স্বরূপ' বৎ সংকে অতিক্রম পূর্ব্বক, তদতীত বা তদন্যতর রূপ যে অসৎ তাহার উপভোগে অভিলাষী হইয়া থাকেন। ইহাই

খৃষ্টীয় শাস্ত্রাদিতে, শয়তান প্রমুখ দিব্য দূতগণের স্বীয় দিব্যাবস্থা হইতে অতৃপ্ততা হেতু পতন, এতৎ উপাখ্যানের দ্বারা আভাসিত বা রূপক কল্পিত হইয়াছে।

সৎভিন্ন কিছুই অভিলষণীয় হইতে পারেনা; কিন্তু এখানে অসৎ অভিলষণীয় হওয়ায়, নিশ্চয় দৃষ্ট হইতেছে যে মায়ার প্রথম ভ্রমোৎপাদন এখানে; যেহেতু অসৎ, সৎরূপে দৃষ্ট না হইলে, জীবাত্মা কখনই তাহাতে আকৃষ্ট ও পতিত হইত না। সাধারণ লোকযাত্রাতেও দেখিতে পাইবে যে, লোকে যখন অসৎকে কামনা করে, সে স্বীয় সম্বন্ধীয় দৃষ্টিতে অসৎকে সৎ ভাবিয়াই কামনা করিয়া থাকে। সে কথা যাউক, বাসনা জন্য মায়াবিকার, মায়াবিকার জন্য ভ্রম, ভ্রম জন্য পতন; বাসনা—অজ্ঞতাদোষদুষ্ট স্বেচ্ছাশক্তির ফল। উপভোগের নিমিত্ত বাসনা জন্য স্বীয় প্রকৃতির বিকারে নিজের ভ্রান্ততা এবং নিজের ভ্রান্ততা জন্য, পরমাত্ম প্রকৃতিতে অধ্যাসিত বিকারে ভ্রান্তিভাবের উৎপত্তি হয়। ভ্রান্ততা এবং ভ্রান্তি এ উভয়ই, বিকার জন্য পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার বহির্ম্মুখতা হেতু, পরমাত্ম-প্রকৃতির নিয়োজনে উৎপন্ন হয়। অথবা অন্য কথায় উহাই জীবাত্ম-প্রকৃতি; উহাই পরমাত্ম-প্রকৃতি। ভ্রান্ততা এবং ভ্রান্তি, এতদুভয়ের মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া, জীবাত্মা ওতপ্রোত ও ঘূর্ণিত হইতে থাকে;—ইহারই নাম মায়াবন্ধন এবং তদ্রূপ বিকার প্রাপ্ত প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলে। জীবাত্মা এরূপে আদি বাসনাবশে অবস্থা ও ভাবপ্রাপ্ত হইলে, স্বীয় পূর্ব্বতন বিমল সুখচ্যুতিতে, প্রথম দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; তখন এক বাসনা জন্য দুঃখকে দূর করিবার আশায়, অপর বাসনার সৃষ্টি করে এবং এই রূপে, পর পর বাসনা-আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হওত, পুনঃ পুনঃ অবস্থা ও ভাব সকলে জড়িত হইয়া অধঃপাতের পথে যাইতে থাকে। জীবাত্মার বিকার প্রাপ্তির এই দ্বিতীয় পর্ব্বকে, খৃষ্টীয় পুরাণোক্ত আদম-চরিত, পার্শ্ববর্ত্তী প্রলোভক ভ্রান্তিকে শয়তান এবং উত্তর অধঃপতনকে ইডেনচ্যুতি বলা যাইতে পারে; যে পর্য্যন্ত আবার স্বীয় আত্মবোধ ও পরমাত্ম-জ্ঞান রূপ যিশুখৃষ্ট তাহার জন্য উদয় না হইবে, জীবাত্মা সেইপর্য্যন্ত ক্রমাগতই অধঃপাতের পথে যাইতে থাকিবে। এই অধঃপাত-পথের যাহা বর্দ্ধক, তাহাই অসৎ

ও দুঃখকরী এবং যাহা তাহার নিবারক বা সাম্যকারক, তাহাই সৎ ও সুখকরী। এই সৎ অসৎ, সুখকরী দুঃখকরী এবং তৎসূত্রে পাপ পুণ্যাদি, এ সকল পৃথকত্ব ও তদ্বোধক সংজ্ঞা সকল আসিল কোথা হইতে? যেহেতু জীবাত্মা তদ্রূপ তদ্রূপ অনুভব করে বলিয়া;—উহাও মহামায়ার মায়িক নিয়োজন। ভেদবুদ্ধির বশবর্ত্তীতা ভিন্ন, পরমাত্মার আত্মিক ভাব হইতে পৃথক্ ভাবে মায়িক উপভোগ বাসনা উঠে নাই; সেই ভেদবুদ্ধিই, মায়িক নিয়োজনে, সুখ দুঃখাদি রূপ উত্তরকালীয় তাবৎ সম-বৈষম্য সংস্কার জ্ঞানের কারণ। ভেদবুদ্ধি ভিন্ন, সম-বৈষম্য সংস্কার থাকিতে পারে না; ভেদবুদ্ধি বাসনার সমবায়ী এবং উহাও অজ্ঞতা সূত্রে উদ্ভূত। ভেদবুদ্ধির অভাব হইলেই, মায়াবন্ধন কর্ত্তিত হয় এবং সেই জন্যই শাস্ত্রে এরূপ উক্ত যে, সুখ দুঃখাদি এবং সেই সূত্রে উৎপন্ন সমস্ত বিষয়ে, যে পরিমাণে অনাশক্ততা জন্মিবে, সেই পরিমাণে মায়াজনিত উত্তর অধঃপাত গমন স্থগিত হইতে থাকিবে এবং তাহাতে আবার ভেদ-মূল স্বার্থের প্রতি বিরাগ সহ জ্ঞানের সংযোগ হইলে, মায়াবন্ধন শিথিল হইতে থাকে। তাহার পর, পরমাত্মা বা পরমাত্মা স্বরূপ ঈশ্বর স্মরণে, পরমাত্মা সহ নিজ সম্বন্ধ এবং নিজেরও আদিম শুদ্ধাবস্থা, এতদুভয়ের আভাস মনোমধ্যে পুনঃ প্রতিভাত হওয়ায়, সতে মতি ও অসতে বিরাগ উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাও মায়াবন্ধনের শিথিলতা সাধন পক্ষে, বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। জীবাত্মার আত্মবোধ, যাহাকে জ্ঞান বলা যায়, তাহা কোন অবস্থাতেই জীবাত্মাকে একেবারে পরিত্যাগ করে না; কিন্তু জীবাত্মা, কেবল ভ্রান্তিমোহে সে জ্ঞানকে ক্লেশকর বোধে, তাহার প্রতি স্বেচ্ছা-বিমুখ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি পুরুষকার প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছাশক্তির চালনে সে একবার সেই জ্ঞানমুখী হইতে পারে, তাহা হইলে আর তাহার কোন অভাব থাকে না এবং সকল বিষয়ে সফলকাম হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, মায়াবন্ধনের শিথিলতা বা গাঢ়তা সাধন, এ দুইই আমাদের হাত এবং ঈশ্বর স্মরণে বিশেষ ফল আছে।

কিন্তু জীবাত্মার বাসনা বশে পতন, ইহা কবে ঘটিয়াছে; কতদিনই বা সমস্ত সাম্যাকারে ছিল এবং কতদিন হইতেই বা বিকার ঘটনা হই-

য়াছে, এবং এই পতন ও বিকার ঘটনা কি সাদি না অনাদি? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে বলিবে? সাদি হইলে সম্পূর্ণ মোক্ষ একদিন সম্ভব; কিন্তু অনাদি হইলে, উৎকর্ষপক্ষে অনন্তকাল উন্নতিমুখে গতিমাত্রই সম্ভবপর হয়। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিব আমি এই অনন্ত উন্নতি পথে ধাবিত হইতে চাই। হয়ত জীবাত্মার পতন অনাদি; তাহা হইলে, জীবাত্মার উন্নতিও অনন্ত। জীবাত্মার পতন অনাদি হইলে, পরমাত্মার নির্গুণ ও নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও, তাঁহার ও তাঁহার প্রকৃতির স্রষ্টা ও সৃষ্টিরূপত্ব অনাদি হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্ট এই সম্বন্ধ বিধানে, ব্যবহারিক বুদ্ধি যাহা আদেশ করে, তাহাও একেবারে বৃথা যাইতেছে না। কিন্তু এখানে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, যদিও অনাদিভাবে বটে, তথাপি স্রষ্টা ও সৃষ্টিরূপত্ব, পরমাত্মা ও পরমাত্ম-প্রকৃতিতে জীবকর্ত্তৃকই অধ্যাসিত হইয়া রহিয়াছে; পরমাত্মা কর্ত্তৃক স্বয়ং উহা গৃহিত নহে।

সতের বিরাম নাই; অসতেরই বিরাম আছে অথবা অসৎ স্বভাবেই শূন্য বা বিরাম স্বরূপ। অসৎ স্বরূপ মায়াবিকারজনিত কর্ম্মপথে জীবাত্মা সেই বিরামের অধীন। এই বিরাম প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিদিন, প্রতিকাল ও প্রতি যুগ ধরিয়া দৃষ্ট হয় এবং ইহা হইতেই বিশ্রাম, নিদ্রা, মৃত্যু, খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়াদি সংঘটন হইয়া থাকে। এই বিশ্রামকালে, জীবাত্মা ক্ষণেকের নিমিত্ত আত্ম-অবস্থার বিস্মৃতি বা তাহা পরিত্যাগে, পরমাত্মায় পরম নির্ভর পূর্ব্বক শান্তিকে অবলম্বন করে; কিন্তু বিকার ও বিকার হেতু কর্ম্মসূত্র জন্য নিয়ত সে ভাবে থাকিতে পারে না; আবার, মায়াবীজের পুষ্টতা সহ, সুপ্তোত্থিত হইয়া স্বীয় অনুরূপ অবস্থা ও ভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত হয়। যে হিসাবে মুহূর্ত্ত-বিরাম; মৃত্যু ও প্রলয়-বিরামাদিও সেই হিসাবে। যেমন মৃত্যু-বিরামে; মুহূর্ত্ত-বিরাম ও প্রলয়বিরামেও সেইরূপ অবস্থান্তর ও ভাবান্তর প্রাপ্তি হয়;—যদিও মুহূর্ত্ত-বিরামে সামান্য পরিমাণ হেতু, সাধারণতঃ তাহা অননুভবনীয় বটে। মহাপ্রলয়ে মহাবিরাম হেতু, মহাসৃষ্টিরও সেইরূপ বিলয় হয় এবং আবার প্রলয় অন্তে, মায়াবীজ পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইলে, নব অবস্থা ও নবভাবরূপ নূতন জীব ও নূতন মহাসৃষ্টির উদয়

হইয়া থাকে। প্রলয়কালে চরাচর সমস্তই, বিষ্ণুপদ আশ্রয় করিয়া বিরাম লাভ করিতে থাকে; প্রলয় অন্তে, নূতন সৃষ্টি সহ, আবার তাহাদের জীবরূপে পুনঃপ্রকাশ হয়।

যে বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে, তাহা এমনই গুরুতর যে বুদ্ধি এখানে ধৈর্য্য পরিত্যাগে আকুলতা প্রাপ্ত হয়। অতএব কি বলিতেছি, কি হইতেছে, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। পরমাত্মার মাহাত্ম্য অনন্ত! কাহার সাধ্য নাই যে একেবারে ও একাধারে সে মাহাত্ম্য সন্নিবিষ্ট করিতে ও কহিতে পারক হয়; অথবা কহিতে গিয়া নানা পুনরুক্তি ও নানা অসংলগ্ন দোষে দোষী না হইয়া থাকিতে পারে। যখন যেমন দর্শক ও তাহার যেরূপ ধারণা আদি শক্তি, সে তাঁহার বিভূতি সেই রূপেই অনুভব ও প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপে অনন্তকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইতে থাকিলেও, সে বিভূতি-বর্ণনের অন্ত হয় না; অথচ প্রতি দর্শকও আত্মশক্তি অনুরূপ, চিত্তের শান্তিকর ভাবে, সে বিভূতি অনুভবে বঞ্চিত হয় না। যে তত্ত্ব আলোচনা আমি করিলাম, তাহাই যে পর্য্যাপ্ত বা ঠিক, তাহা নহে; তবে এই পর্য্যন্ত ঠিক যে সেইরূপ ও সেই পর্য্যন্ত মাহাত্ম্যই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। অথবা আমিই বা কে?—তিনি যে পর্য্যন্ত আমার ন্যায় মূঢ়কে দেখিতে দিতেছেন, বলিতে দিতেছেন, আমি কেবল তাহাই দেখিতেছি ও বলিতেছি এবং উহাই আমার সাহস। জয় জগদীশ হরে।

বাসনা জন্য মায়াবন্ধন; তজ্জন্য অবস্থা ও ভাব এবং তজ্জন্য সুখ দুঃখাদি; যদিও প্রাকৃতিক নিয়োজন হেতুই প্রবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু যতদূর দেখা গেল, তাহাতে জীবাত্মাকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে সমস্তের কর্ত্তা বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। জীবাত্মা জীবরূপ অবস্থা এবং তাহার প্রকৃতি তৎসম্বন্ধে ভাব স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে, জীবাত্মার সমক্ষে পরমাত্মা ও তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ দৃষ্ট এবং অনুভূত হইয়া থাকেন; পুনশ্চ প্রাকৃতিক নিয়োজন এবং জীবাত্মার বাসনা জন্য, স্থূল সৃষ্টি প্রপঞ্চের উদয় লক্ষিত হইলেও, পরমাত্মা তাহাতে কিপ্রকারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন; তাহা যদিও উপরে একরূপ আলোচিত হইয়াছে, তথাপি আরও অতি সংক্ষেপে একটু বিশদরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। অবশ্যই ধৃষ্টতা আমার অপরিমিত!

কিন্তু ধৃষ্টতা পূর্ব্বক দর্শন পথে যদিই ধাবিত হওয়া গিয়াছে, তখন আরও একটু অগ্রসর কাজেই হইতে হইবে। হয়ত যাহা বলিব তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন লাগিবে; এমনি যাহা বলিয়াছি, হয়ত তাহাই কত অসংলগ্ন লাগিয়াছে; কিন্তু হাত নাই। উপরে নানাস্থানে বলিয়াছি যে, সমষ্টি চৈতন্যেও মায়া-বিকারের অধ্যারোপ হইয়া থাকে, যদ্ধেতু সমষ্টি চৈতন্যে ঈশ্বরত্ব রূপ অবস্থার আরোপ এবং তাঁহার প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্বের ভাবরূপ এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের আরোপ হয়। এ আরোপ জীবাত্মার নিজ বিকৃত দৃষ্টি ও অনুভূতি বশাৎ। নতুবা পরমাত্মার প্রকৃতি যাহা তাহা শুদ্ধ প্রকৃতি, তাহার কখন বিকারও হয় না, এবং তজ্জন্য আত্মপ্রকৃতিবশে পরমাত্মাও কখন বিকৃত অভিধানের বিষয়ীভূত হয়েন না। পরমাত্মা স্বীয়প্রকৃতি সহ নিত্যকালই সমশুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা যে,সেই আত্মপ্রকৃতির বিকৃতি সাধনে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যখন যেমন ও যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, তখন সে পরমাত্মপ্রকৃতি ও পরমাত্মাকেও সেইরূপ বিকৃতভাবে অবলোকন করিতেছে; যেমন কামলা রোগের রোগী সূর্য্যকে পীতবর্ণ রূপে দৃষ্টি করে। সব সময়েই দেখিয়া থাকে; যে বর্ণের চস্‌মা চখে দেও, তাবত পদার্থই সেই বর্ণবিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। জীবাত্মার এইরূপ বিকার জনিত দৃষ্টিহেতুই, পরমাত্মার মায়াবিকার হইতে ঈশ্বরত্ব; এবং ঈশ্বরত্ব হইতে সৃষ্টিপ্রপঞ্চের অধ্যাস হয়। স্পষ্টরূপে বলিতে গেলে, পরস্পরে সম্বন্ধ এই দাঁড়াইতেছে;—স্বীয় বাসনা জন্য স্বীয় প্রকৃতি-বিকারে, জীবাত্মা একপক্ষে নিজে জীব ও তাহার প্রকৃতি জীবভোগ্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে পরিণত হইয়াছে; অপর পক্ষে তাহার বিকৃত দৃষ্টি বা অনুভূতি বশাৎ, তাহার পরম-আশ্রয় পরমাত্মা ঈশ্বরত্বে এবং তাহার প্রকৃতির আশ্রয় পরমা প্রকৃতি মহা-সৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছে। জীবত্বে এই চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ। জীবভোগ্য ভাব ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে অনেক স্থানেই নির্ব্বিশেষে উক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু সে বক্তব্য জন্য সুবিধার খাতিরে,নতুবা পৃথকত্ব তাহার এরূপে। জীবাত্মা যত স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, পরমাত্মার প্রতিও তাহার দৃষ্টি তত স্থূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই হেতু ক্রমাধ স্থূলতায়, পরমাত্মা ক্রমে ইন্দ্র চন্দ্র, ক্রমে রক্তদন্তাভূতাদিতে পর্যান্ত পরিণত হওয়ার পক্ষেও ত্রুটি হয় নাই। জীবাত্মার এরূপ পতন ও এরূপে অসত্যের উৎপত্তি, সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই অল্প বিস্তর আভাসিত

দেখিতে পাওয়া যায়; দলবল সহ শয়তানের পতন, দলবল সহ অজ সৈন্যর পতন, ইত্যাদি তাহার নিদর্শন। পুনঃ স্বীয় প্রকৃত অবস্থাবোধ,—আত্মবোধ রূপ জ্ঞানের উদয়ে মুক্তি; এই জ্ঞানাবতারের ভাবী উদয়ও, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই অল্প বিস্তর আভাসিত হইয়াছে। জীবের জ্ঞানোদয় জন্য উন্নতি, বিবর্ত্ত নিয়মের দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, এক জন্মান্তরবাহী অপর কালান্তরবাহী। বাসনা হইতে বাসনান্তর বিবর্ত্তিত এবং এই বিবর্ত্তন পাত্রে ভেদে, ব্যষ্টিরূপে,কখন উর্দ্ধ কখন অধঃ উভয় মুখে হইয়া থাকে, একারণে এ সংসারে, ব্যষ্টিভাবে, কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, সকল বিষয়েতে উর্দ্ধাধঃ ভেদে, বিবর্ত্ত নিয়মের কার্য্য দ্বিমুখগামী দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় বিশ্বাস,বিবর্ত্ত নিয়ম কেবল এক অধঃ হইতে উর্দ্ধ মুখেই কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, উর্দ্ধ হইতে অধঃ মুখেও তাহার কার্য্য হয়। কেবল এক সমষ্টি দৃষ্টিতেই, সমষ্টি সৃষ্টিকে উত্তর বা একমুখগামী বলা যাইতে পারে।

জীবাত্মা পরমাত্মার ব্যষ্টিরূপ বলিয়া; পরমাত্মাই তাহার আশ্রয় স্থল; কোন অবস্থাতেই,তাহার সে আশ্রয়চ্যুৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। আধেয় আধার ছাড়া নাই এবং যেমন আধেয়, তেমনি ও তদুপযুক্ত আধার হয়; সুতরাং জীবাত্মা যখন যেমন অবস্থা লাভ করিয়াছে, পরমাত্মাকে তখন সুতরাং তৎ সমধর্ম্মী ও তদনুরূপ রূপে দৃষ্ট করিয়াছে। জীবাত্মার এই মূল স্বভাবক্রিয়ার অপ্রতিহত প্রভাব হইতেই, মানুষ এখন পর্য্যন্তও আপনার দেবতা আপনি সৃষ্টি বা কল্পনা করিয়া থাকে; আপনার পাপ পুণ্য আপনি রচনা করিয়া থাকে; সুতরাং আপনার শুভাশুভের কারণ আপনিই হয়। ভাল, তবে পূজা করি কাহাকে? অর্চ্চনা করি কাহাকে, ডাকি কাহাকে এবং কেন, ফল দেয় কে? এ সকল কথার আলোচনা এই প্রবন্ধের স্থান বিশেষে সবিস্তারেই করা হইয়াছে; এই এখনই মাত্র খানিক উপরে করিয়াছি; সুতরাং আর এখানে পুনরবতারণা করার আবশ্যক নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরমাত্মা নিত্যই পরিশুদ্ধ অবস্থায় আছেন। তাঁহার স্বীয় মায়ার বিকার এবং তজ্জন্য মায়াভিমানে ক্রিয়মান ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি, ব্যবহারিক ধারণা মাত্র। ঈশ্বর সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ও ফলদাতা এবং আমিও সাক্ষাৎ সৃষ্ট ও ফলের ভোক্তা,ইহা আরও স্থূল ব্যবহারিক। অতঃপর ক্রমোত্তর সূক্ষ্ম স্থূলাদি

বিষয়ক ব্যবহারিক বুদ্ধির অনুসরণে, সহজ বোধের নিমিত্ত,যেরূপ পূর্ব্বে পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সেইরূপে এখান হইতেও মূল প্রবন্ধের অনুসরণ করা যাউক।

জয় জগদীশ হরে।

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥

মায়াবচ্ছিন্ন সমষ্টি চৈতন্য ঈশ্বররূপ; মায়াবচ্ছিন্ন ব্যষ্টিচৈতন্য জীবরূপ। সমষ্টি চৈতন্য এবং ব্যষ্টি চৈতন্য পদার্থ ভাগে উভয়েই এক এবং একই স্বভাবের, এ জন্য একের অভিনয় অপরের সঙ্ক্ষেপরূপ; কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে, সমষ্টিত্ব হেতু ঈশ্বরচৈতন্যের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং ব্যষ্টিত্ব হেতু জীবচৈতন্যের অজ্ঞত্ব। জীবচৈতন্য সেই অজ্ঞত্ব বশে নানা অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বর তাহা প্রাপ্ত হয়েন না। সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু মায়াশক্তি ঈশ্বরের বশ্য; কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু, জীবচৈতন্য মায়াশক্তির বশ্য। মায়াশক্তি ঈশ্বরকে বাসনাবান রূপে প্রতীয়মান করাইলেও, ঈশ্বরের সমষ্টিত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু তাহাতে একটা সীমা আছে; কিন্তু জীবচৈতন্যে সেরূপ সীমা না থাকায়, জীব বাসনা বশে অনন্ত অবস্থান্তর সকলও প্রাপ্ত হইতে পারে। মায়িকগুণোপভোগ জন্য বাসনা, কি ঈশ্বর কি জীব, উভয়েরই অবস্থা এবং ভাব প্রাপ্তির কারণ। সমষ্টি চৈতন্যের সেই অবস্থা হেতু ঈশ্বরত্ব এবং ভাব হেতু সৃষ্টি; ব্যষ্টি চৈতন্যেরও সেই অবস্থা হেতু ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবত্ব এবং ভাব হেতু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমস্ত। সমষ্টিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু, ঈশ্বরের সে অবস্থা এবং ভাব, উভয়ই পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ; কিন্তু ব্যষ্টিত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু, জীবের অবস্থা এবং ভাব উভয়ই অপরিচ্ছন্ন ও অশুদ্ধ। এই জন্যই, ঈশ্বর কর্ত্তা এবং জীব কর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হয়েন এবং জীব নানা বিকার প্রাপ্তে সুখ দুঃখাদিতে মুহ্যমান হয়।

বাসনা স্বরূপ যাহা, তাহা ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং বাসনা জনিত যাহা, তাহা ভোগ্য। বাসনা স্বরূপ যাহা তাহাই, জীবত্ব বা অবস্থা এবং বাসনাজনিত যাহা তাহাই জীবভোগ্য বিষয়াদি বা ভাব; একটি অন্তর্জগত,

অপরটি বহির্জগত ; একটি জীববিশেষ, অপরটি জীবভোগ্য বিশেষ। অবস্থার উৎপত্তিতে, তদবলম্বনে ও তৎসমবায়ে ভাবের উৎপত্তি ; অবস্থা বিশেষের বিনাশে ভাব বিশেষের বিনাশ ; আবার অবস্থান্তরের উদয়ে, ভাববিশেষের উদয় হইয়া থাকে। জীবচৈতন্যের অবস্থা এবং ভাব যাহা গতাগতি করিতেছে, পরমাত্মচৈতন্যের অবস্থা এবং ভাব তাহার অবলম্বন ও আধার স্বরূপ। এই নিমিত্তই, অবস্থা ভাগে জীবচৈতন্য পরচৈতন্যে আকর্ষিত এবং ভাব ভাগে মহাসৃষ্টির অঙ্কশয়নশায়ী ; পুনশ্চ অবস্থা ও ভাব, উভয়ে একই পদার্থের দুই দিক বলিয়া, উভয়ে উভয়ের অকাট্য সম্বন্ধসূত্রে সংবর্দ্ধিত। ভূতাতীত চৈতন্যস্বরূপ যিনি, তিনি দেশ কালাদির অতীত ; ভূতসংসারাবধিই দেশকালাদির অধিকার। অতএব ভূতসম্বন্ধ পরিত্যাগে শুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, আত্মা দেশেরও অধীন নহেন, কালেরও অধীন নহেন এবং সেই জন্যই একস্থানে বলিয়াছি যে, আমরা জন্মিয়াও কোথায় আসিনা, মরিয়াও কোথায় যাই না ; আত্মা স্বস্থানে সর্ব্বদাই সুস্থির রহিয়াছেন ; তাঁহার বাসনা জন্য অবস্থা ও ভাব সকলই কেবল, পর পরাদিক্রমে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, দেহ, ভোগ্য, দেশ, কাল, ইত্যাদির অভিনয় করিয়া যাইতেছে।

উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা অংশত হিন্দুশাস্ত্রশীর্ষ শ্রুতির অনুমোদিত ; কিন্তু বক্তব্য কথাগুলি ঠিকমত বলিতে পারিয়াছি কিনা, তাহা ঈশ্বরই জানেন। বলিলাম অংশত শ্রুতির অনুমোদিত, কিন্তু শ্রাত জাহাজ আর আমরা আদার ব্যাপারী। সত্য বটে আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কোন আবশ্যক নাই ; কিন্তু এখানে ব্যাপারী ক্ষান্ত হইতে চাহিলেও, জাহাজ যে ব্যাপারী ও আদার খবর লইতে ক্ষান্ত হয়েন না।

অতঃপর আইস বাঙ্গারাম, আমরা আমাদের সোজা বুদ্ধিগম্য পথে গমন করি। কেমন করিয়া মায়াশক্তি ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্যকে বাসনাবানের ন্যায় প্রতীয়মান করাইয়া থাকে ; কেমন করিয়া পরচৈতন্য মায়া বশে ঈশ্বরত্বে পরিণত হইয়া থাকেন এবং কেমন করিয়া সৃষ্টিপ্রপঞ্চ প্রকাশ হয়, সে সকল বড় কথায় আর আমাদের এখন কাজ নাই ; যখন উপযুক্ত হইতে পারিব, তখন সে সকল কথায় কাজ থাকেত আবার দেখা যাইবে। আপাতত

সৃষ্টি হেতুক সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব হেতু ঈশ্বরে কামনা বা বাসনার সম্ভবতা, এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এটুকুও জ্ঞাতব্য যে ঈশ্বর চৈতন্যের ব্যষ্টিস্বরূপতা হেতু,আমরাও বাসনা-বিলাস হইতে বিমুক্ত নহি। সমষ্টি চৈতন্য বা পরমাত্মার বাসনা স্বরূপ যাহা, তাহাই তাঁহার অবস্থা বা ঈশ্বরত্ব এবং বাসনা ফলরূপ ভাবস্বরূপ যাহা, তাহাই এই সৃষ্টি ,— যাহা জীবক্রিড়ার পক্ষে আধার স্বরূপ হইতেছে। এই বাসনার প্রবাহ গুণই, ক্রিয়াশীল শক্তিরূপা। শক্তির আভাসব্যাপ্তি কাল। কালের বেষ্টন সমষ্টি যাহা তাহাই দেশরূপে অনুভূত,হয়। ব্যষ্টি চৈতন্য বা জীবাত্মার বাসনা স্বরূপ যাহা, তাহাই তাহার অবস্থা বা জীবত্ব; ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট দেহধারকতা যাহার বর্ত্তমান পরিচয় এবং বাসনা জনিত ফল যাহা, তাহাই ভাবস্বরূপ বা জীবভোগ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য জগত যাহার বর্ত্তমান পরিচয় স্বরূপ হইতেছে। ঈশ্বর সমষ্টি স্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ; এজন্য মায়া তাঁহাকে বিমোহিত করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কেবল আশ্রয় মাত্র করিয়া আছে; কিন্তু জীব ব্যষ্টি এবং অজ্ঞ, এজন্য সে মায়াতে মোহিত হইয়া তৎসমীপে আশ্রিত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই আশ্রয়দাতা ও অশ্রয় গ্রহীতা ভাব হইতেই, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে, কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব ভাব সংঘটন হইয়া থাকে; অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তা এবং জীব কর্ম্মস্বরূপ। অজ্ঞতা হইতে মানবের বাসনাবিকার উপস্থিত হয়, বাসনাবিকার হইতে তাহার চিদ্‌-বিমুখী অধঃপাতের পথে গতি হইয়া থাকে। ইহলৌকিক অজ্ঞতার কারণ মায়াবিকার বা জড় আবরণের অবরোধক ভাব; জড় আবরণ বাসণা জনিত; বাসনা মায়া জনিত; মায়া যাহা তাহা ব্রহ্মপ্রকৃতি এবং ব্রহ্মে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। একথাগুলি, পূর্ব্বে একস্থানে কথিত কথাগুলির অনেকাংশে দ্বিরুক্তি স্বরূপ হইয়া পড়িল ইহা সত্য, কিন্তু ইহা স্মর্ত্তব্য যে এখানে যাহা বলা যাইতেছে তাহা ইহলৌকিক দৃশ্যানুসরণে।

"এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥"

বাসনা যাহা তাহা অবস্থা এবং বাসনা জনিত যাহা তাহা ভাব। যতদিন বাসনার ধ্বংস না হইবে, ততদিন অবস্থা এবং ভাব কাহারই ধ্বংস নাই; ততদিন জীবত্ব এবং জীবভোগ্যত্ব উভয়ই বর্ত্তমান থাকিবে। অধিকন্তু বাসনায় স্থূলত্ব ঘটিলে, জীবত্ব এবং জীবভোগ্যত্ব উভয়ে আরও স্থূলতা আসিয়া জুটিবে। এরূপে স্থূলত্ব হেতু যেমন স্থূলতা ঘটে, বাসনার সূক্ষ্মতায় আবার জীবত্ব এবং জীবভোগ্যত্বে সূক্ষ্মতাও সেইরূপ সাধিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম এখন তাহা বলি। বাসনা স্বভাবেই উহা অস্থায়ী; পরমেশ্বরের বাসনাজনিত সৃষ্টি যাহা, তাহাতেও প্রলয় ঘটনা আছে, সুতরাং সে মহা বাসনাতেও কোন স্থায়িত্ব দেখা যায় না। সে বাসনাতেও পরিবর্ত্তণ, সুতরাং ঈশ্বর ও ঈশ্বর সৃষ্টিতেও অবস্থান্তর ও ভাবান্তর উভয়ই ঘটিয়া থাকে। যখন ঐশ্বরিক বাসনাই এরূপ অস্থায়ী বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীববাসনার ত কথাই নাই। জীব এই বাসনাবশে নানা অবস্থান্তর সকল প্রাপ্ত হয় ও ভাবান্তর সকল উপভোগ করিয়া থাকে এবং তজ্জনিত কর্ম্মসূত্রে জন্ম, মৃত্যু, লোকান্তর গতাগতি, ইত্যাদি বিষয় জীবাত্মাকে বেষ্টিয়া অভিনীত হইতে থাকে। অজ্ঞতা হেতু বিকৃত বাসনা বশে জীব দারুণ অধঃপাতের অবস্থা ও ভাবেও পতিত হইয়া থাকে। অধঃপাতের পরিচয় জড়তা ও অজ্ঞতার বৃদ্ধি এবং জীবভাবে উপার্জ্জিত স্বীয় সংস্কারানুরূপ বোধ সকাশে, ক্লেশের আতিশয্য প্রাপ্তি। আবার অন্যদিকে জড়তা যত শিথিল হয়, ততই সংস্কারানুরূপ সুখের বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পুষ্টতা সাধন হইতে থাকে। এবং যতই অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়, ততই জীবাত্মা আত্মবিভূতি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া, চিদভিমুখী অর্থাৎ পরমাত্মাভিমুখী হইতে পারে। যে পরিমাণে যাঁহার এই চিদভিমুখীত্ব বা উৎকর্ষ প্রাপ্তি সাধিত হয়, সেই পরিমাণে তাঁহার ঈশ্বরের সহ সাযুজ্য ও সারূপ্য প্রাপ্তি বলা গিয়া থাকে। এই সাযুজ্য প্রাপ্ত্যাদির চূড়ান্ত সীমা ঈশ্বরের আশ্রিত পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ মায়াপ্রকৃতিতে উপনীত হওন। কিন্তু হায়, সে শুভঘটনা, সেদিন, তোমা আমা হইতে না জানি কতই অনন্তগুণ দূরে অবস্থান করিতেছে!

এই স্থলে আরও একটা কথা। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে যে

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বাসনার উপর কেন এত চটা। বাসনাই অবস্থান্তর ও ভাবান্তর প্রাপ্তির মূল কারণ বলিয়া,শাস্ত্রকারেরা বারম্বার উপদেশ দিয়াথাকেন যে, বাসনাকে সংযত কর, বাসনাকে বিনাশ কর এবং বাসনা ক্ষয়ে কর্ম্মে নিষ্কামতা অবলম্বন কর ; যেহেতু তাহা হইলে আর তোমার কর্ম্মবন্ধনে, বাসনাবন্ধনে অধম অধম অবস্থান্তর ও ভাবান্তর ঘটিতে পাইবে না। এরূপ বাসনাক্ষয় ও নিষ্কামতা চেষ্টার পরেও যদি কিছু অবস্থা এবং ভাবাবশেষ রহিয়া যায়, তাহাতে আশঙ্কিত হইও না, যেহেতু সে অবস্থা ও ভাব উভয়েই সূক্ষ্মরূপ এবং দেখিতে পাইবে যে তোমার বর্ত্তমানের তুলনে তাহা প্রকৃতই পরম তৃপ্তিকর ও পরম সুখকর। ইহার পরেও যদি একেবারে বাসনার বিনাশ করিতে পার, তাহা হইলে একেবারে অবস্থা ও ভাব প্রাপ্তি হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ইহাও বলি যে, একেবারে পরিত্যাগ আমাদের ন্যায় শরীরীর পক্ষে কখনও সম্ভব পর হয় না। ক্রমে নিষ্কামতা ও ক্রমে কর্ম্মোৎকর্ষ দ্বারাই বাসনার সঙ্কোচ ভাব ও পরিচ্ছন্নতা সাধিত হইয়া আসিতে থাকে ; এবং যতই সাধিত হয়, ততই মানবীয় আত্মার উৎকর্ষ প্রাপ্তি হইতে থাকে। কিন্তু সে উৎকর্ষের শেষ সীমা কোথায় ও কতদূরে, সে বিষয় লইয়া এখন তর্কবিতর্ক করা আমাদের পক্ষে কেবল অনধিকার চর্চ্চা স্বরূপ হয়। সর্ব্ব অনর্থের মূল স্বরূপ যে বিষম জড় আবরণ বাসনা জন্য জীবাত্মায় আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে, তাহা ক্ষয় করিবার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সুকর্ম্মাচরণই একমাত্র মুখ্য ও অনন্য উপায় স্বরূপ জানিবে!

বাসনা যে কেবল এই জন্ম এবং ইহলোকেই উৎপন্ন ফলিত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। উহা আদি মূল স্থানে উৎপন্ন, তথা হইতে অবিরত ধারায় উহার স্রোত এ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে এবং ইহার পরেও কেজানে আরও কতদূরে উহা প্রবাহিত হইয়া যাইতে থাকিবে। যুগান্ত ধরিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সকলে, যে বাসনারাশিকে উৎপন্ন ও প্রবাহিত করিয়াছিলাম, এই জন্ম এবং ইহলোক ভোগ তাহারই অখণ্ডনীয় ও অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। এখন কর্ম্মেরদ্বারা তাহার যে যে অংশ ক্ষয় করিতেছি তাহা ক্ষয় হইতেছে ; যাহা ক্ষয় করিতেছি না তাহা পূর্ব্ববৎ রহিয়া যাইতেছে এবং যে বাসনা আবার নূতন সৃজন করিতেছি অথচ যাহা অতৃপ্ত রহিয়া

যাইতেছে, তাহা তাহাতে আসিয়া যোগ হইতেছে। সেই যোগজ সমষ্টির ফলে, আবার অনুরূপ অবস্থান্তর, লোকান্তর বা জন্মান্তর সকল পরিগ্রহ করিব এবং অনুরূপ কর্ম্মতরঙ্গে নিপতিত হইব। জন্ম প্রাপ্তে যত কর্ম্মবান হইতে পারা যায়, ততই ভাল; নতুবা কর্ম্ম কেবল জমা হইয়া ঘাড়ে চাপিতে থাকে, এই মাত্র লাভ। কর্ম্মসূত্র এবং কর্ম্ম, ইহাদের কথনও ধ্বংস নাই; অনুষ্ঠানযোগে এক সময়ে না এক সময়ে তাহাদিগকে সমাহারসীমায় আনিতেই হইবে, কোন রকমে তাহা হইতে ছাড়ান নাই। এখন তৎপর হও, ভার কমিবে; না হও, বাড়িতে থাকিবে; ক্রমে বৃদ্ধি হইবায় এক সময়ে হয়ত তোমাকে সে ভারে একেবারেই বিকলাঙ্গ ও দূর অধঃপাত প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই বাসনা সমষ্টিরই অবিরোধি বিরোধি ভাব, ক্ষেম অক্ষেম ভাব, ফল অফল ভাব, ইত্যাদি, কালান্তরে অবস্থান্তরে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সৎ অসৎ, ইত্যাদি বুদ্ধিতে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধিই মানবের চিত্ত সংস্কার নামে কথিত হয়। যাহার যেরূপ সংস্কার, সে সেইরূপেই ফলাফল সকল অনুভব করিয়া থাকে এবং সেই জন্য একই বিষয়ে লোক ভেদে অফলে ফল, ফলে অফল, এতদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কেহ নরহত্যাতেও সুখলাভ করে, কেহ বা আবার অতর্কিত কীট হত্যাতেও কাতর হয়; কেহ বা যে এক পদার্থকে শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণ করে, আর একজন তাহাকেই মহা অশ্রেয়স্কর বলিয়া দূষিত করিয়া থাকে; ইত্যাদি।

বাসনা যতদিন অজ্ঞান জড়িত থাকে, ততদিনই তাহা কখন যে কি অবস্থান্তরে ও ভাবান্তরে লইয়া উপস্থিত করিবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। কিন্তু একবার উহা যথাসম্ভব জ্ঞানমিশ্রিত হইলে, আর উহার সে অস্থিরতা প্রায় থাকে না; তখন উহা সর্ব্বদাই দিগ্দর্শন যন্ত্রের সুচির ন্যায়, চিদভিমুখীন্ পথ নির্দ্দেশ করিতে থাকে। মায়া বা অবিদ্যা জড়িত হওয়ার নাম অজ্ঞান; মায়ার পাশ ভেদে আত্মবোধে প্রবুদ্ধ হওয়ার নাম জ্ঞান। যে পরিমাণে মানব আত্মবোধে প্রবুদ্ধ হয়; সেই পরিমাণে তাহার জ্ঞানের বিকাশ বলা গিয়া থাকে; মানব যখন সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইতে পারিবে, তখন জ্ঞান অজ্ঞান উভয় অভিধানই তিরোহিত হইয়া যাইবে। পূর্ণ আত্ম

বোধের বিভূতি সর্ব্বজ্ঞত্ব; সুতরাং তখন শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না, সম-বিষম বিচার শক্তিরও আবশ্যক হয় না। অজ্ঞান অবস্থায়, সুখ ও দুঃখের অনুভূতি-সংস্কারই জ্ঞানপথের প্রদর্শক স্বরূপ হয়। সাত্বিক চেষ্টায় যে সুখানুসরণ, অজ্ঞান মানবের নিকট তাহাই সর্ব্বদা সুপথ মুখে পথ-দর্শকের স্বরূপ হইয়া থাকে; তদ্রূপ সাত্বিক দুঃখ বুদ্ধি যাহা, তাহা কুপথকে পরিহারার্থে দেখাইয়া দেয়; অসভ্য পর্য্যায়ের মানব, প্রায়ই এই দুই মাত্র নিদর্শন ও উপায় অবলম্বনে ক্রমশ আত্মোন্নতি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অনুরূপ বাসনা জন্য অনুরূপ সংস্কার এবং অনুরূপ ইন্দ্রিয় ও শরীরাদি প্রাপ্তি হয়; যেহেতু তাহা না হইলে, বাসনা ও সংস্কার-বিষয়ের উপযুক্ত অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। সুতরাং ইহাও স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে যে যাহার যেমন সংস্কার ও যাহার যেমন শারিরীক ও ঐন্দ্রিয়ক শক্তি, সে ভূতজগত ও জগতস্থ বিষয় সকলকে সেইরূপেই দর্শন ও অনুভব করিয়া থাকে। বাসনা যখন নিজে স্থিরতাশূন্য ও পরিবর্ত্তণীয় এবং যখন তাহা লোক অনুসারে পৃথক্ পৃথক্; তখন তজ্জনিত অনুভূতি ও সংস্কারাদিও অবশ্যই লোক অনুসারে তদ্রূপ স্থিরতাশূন্য ও পরিবর্ত্তণীয় এবং পৃথক্ পৃথক হইবে। একারণেই, ভাবরূপ জগতস্থ পদার্থ সকলের প্রকৃত কোন স্থায়িত্ব নাই,আজি যাহা দৃঢ় কালি তাহা স্বপ্ন স্বরূপ; সেইরূপ সত্য পরিমাণও তাহাদের কিছুই নাই, যেহেতু যখন যেমন দৃষ্টি বা অনুভাবকতা আদি সংস্কার, তখন তাহারা সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শীতলের কাছে যাহা উষ্ণ, উষ্ণের কাছে তাহাই শীতল; যে পদার্থকে আমি যেমন দেখি, তুমি তেমন দেখ না; অথবা তুমি যাহা দেখ, আমি তাহা দেখি না বা দেখিতে পাই না। ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা সেই সেই পদার্থ যে সেই সেইরূপে সেখানে রহিয়াছে, তাহার কারণ কেবলমাত্র সেইরূপ দ্রষ্টা বা অনুভাবক সেখানে উপস্থিত আছে বলিয়া। দ্রষ্টা না থাকিলে দৃষ্ট পদার্থও সেখানে থাকিত না; অথবা দ্রষ্টা যখন চলিয়া যাইবে, দৃষ্টপদার্থও তখনই তাহার সঙ্গে তিরোহিত হইবে। তুমি বলিতে পার যে, অমুক ব্যক্তি অমুক পদার্থ দেখিতেছিল এবং তাহার পর সে ব্যক্তি মরিয়া গেল ইহা সত্য, কিন্তু কই অমুক পদার্থত তাহার সঙ্গে নষ্ট হইল না? তাহারা তখন যেমন ছিল,

এখনও ত তেমনিই দেখিতেছি। ঠিক কথা, কিন্তু অমুক পদার্থ যে গেল না এ ঘটনাটা দেখিতেছে কে? তুমি! কিন্তু তুমিত মর নাই। যে মরিয়াছে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা কর যে সে দেখিতে পাইতেছে কি না; নিশ্চয় জানিও, তাহার ভূতশরীর বিচ্ছেদের সঙ্গে, এই ভূতজগতও বিচ্ছিন্ন এবং অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি? ভাবিয়া দেখ সেগুলিও ইন্দ্রিয়-বিষয় ও ভাবস্বরূপ ভিন্ন কিছুই নহে। নতুবা দেখ যাহাদের ইতিহাস রক্ষণশক্তি নাই; তাহাদের সমস্ত বিগতকাল শূন্যময়; যাহাদের বিজ্ঞানানুশীলন সামর্থ্য নাই, তাহাদের নিকট সমস্ত পদার্থতত্ত্বই অনস্তিত্বযুক্ত।

বাসনাজনিত ভাবোৎপত্তি এবং ভাব সকল কিরূপ অস্থির, অনিত্য, পরিমাণরহিত ও আদর্শরহিত তাহা সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ দৃষ্টিতেও ত আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি অথবা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতেছি। কালি উপস্থিত বাসনা বশে যাহা প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখিতেছিলাম ও যাহাতে প্রভূত সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছিলাম; বাসনা বিলয়ে আজি তাহা চিহ্ন শূন্য হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। কালি যাহা নিত্য জপমালা স্বরূপ চক্ষের উপর ঘুরিত, আজি তাহা স্মৃতিতেও আইসে না। বাসনা বিলুপ্তে বাসনা-ভোগ্য যাহা তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ সংস্কারগত বিষয় সম্বন্ধেও দেখ; কালি যাহা ছিল আজি তাহা স্বপ্ন স্বরূপ; আজি যাহা আছে কালিকে তাহা স্বপ্ন স্বরূপ হইবে; সে দুইই আবার পরশ্ব তারিখে নামশূন্য চিহ্নশূন্য, এবং স্বপ্নাস্তিত্ব পর্য্যন্তও শূন্য হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। বলিতে পার, তোমার বাল্যাবস্থার সে বাল্যাভিনয় সকল কোথায় গেল; যে সকল সঙ্গীগণকে শৈশবের সে মহোৎসাহে সহায় করিয়া এ দুর্গম সংসারপথ বাহনে বিনির্গত হইয়াছিলে, একে একে এতদূরে তাহারা কোথায় খসিয়া পড়িল, কোথায়ই বা তাহারা লুকাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল? বাল্যকালের সে স্বভাব-রমণীয়তা, সে দিক-সুন্দরীর নিরুপম সৌন্দর্য্য, সে ভবনমাধুরী, যাহাতে তুমি নিত্য পুলোকিত হইতে; নিত্য মোহিত হইতে; নিত্য নব নব ছবি, যাহা হইতে চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া আনন্দে ভাসিতে; সে সকল স্বপ্নবৎ কোথায় পলায়ন করিল? অথবা তোমা-

রই সে মধুময় বালস্বভাব ও বাল্যসুখ এবং তাহার অবলম্বন সমস্ত বা কোথায় লুকাইল? হায়! এখনও হয়ত সময়ে সময়ে তাহারা তোমার স্মৃতিপথে জাগরিত হইয়া থাকে; কিন্তু আরও একটু অপেক্ষাকর, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। ঐ যে ওখানে, যেখানে আগে বিদ্যুত্তমা কামিনী ও কমনীয় বেষ্টিত এবং আনন্দের তরঙ্গতুফানে প্লাবিত মোহন অট্টালিকা সকল শোভা বিস্তারে বিরাজ করিত, এখন সেখানে শ্বাপদশঙ্কুল বিজন কানন হইয়াছে; যেখানে আগে সুরম্য নগর ও নগর কোলাহল বিরাজ করিত, এখন সেখানে সমুদ্র ও সমুদ্র কোলাহল আসিল কোথা হইতে? সে অট্টালিকা, সে নগর, তাহাদের সে জনকোলাহল ও আনন্দতুফান, তাহারা কোথায় গেল? অথবা যেস্থান আগে ক্লেশকর বিজন প্রান্তর ছিল, সেখানেই বা তুমি এ সুন্দর বাগিচা রচনা করিলে কেমন করিয়া?—এটা যে তোমার শ্রমফল তাহাত দেখিতেছি, কিন্তু তোমার সে শ্রমপদার্থটা কই দেখাইতে পার কি? ফলত এ বাগিচা তোমার বাসনাবিকাশ স্বরূপ, তুমি স্বরূপ জীবত্বের দ্বারা প্রসবিত বা অবলম্বিত উহা একবিধ ভাবমাত্র; এই আছে এখনই থাকিবে না। সে অট্টালিকা, সে নগরও সেইরূপ বহুতর তুমি রূপ জীবত্বের অবলম্বিত ভাব মাত্র। তুমি বা তোমার বাসনাসংস্কার সহ, তাহারাও বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ তাবতই হইতেছে ও যাইতেছে এবং হইবে ও যাইবে। আজি যাহা আছে, কালিকে তাহা হয়ত স্মৃতিতে পরিণত হইবে এবং পরশ্ব তারিখে আবার একেবারেই বিলোপ প্রাপ্ত হইবে; আবার তাহাদিগের স্থানে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে থাকিবে। এইরূপে পর পর এক হইতে থাকিবে, আর যাইতে থাকিবে। এইরূপেই পর পর এক হইয়া থাকে, আর যাইয়া থাকে।

আমরা যে কেবল বাসনা অনুসারেই ভাবোপভোগ করি, তাহার আরও একটা সহজ নিদর্শন দেখ। অনেকে বৃদ্ধ হইয়াও বাল্য-অবস্থা ও তাহার ভাব উপভোগ করিয়া থাকে; আবার অনেক বালককেও বৃদ্ধের অবস্থা এবং ভাব উপভোগ করিতে দেখা যায়। আমাদের এই জন্মরূপা একবিধ অবস্থাচক্রের মধ্যেই বাল্য, যৌবন, জরা আদি কত অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে এবং প্রতি অবস্থান্তরে, আমরা কতই ভাবান্তর বিশেষের উৎপাদন করিয়া তাহা

উপভোগ করি। একা এবং এক জন্মের অবস্থান্তর ও ভাবান্তরই যখন এত পরিবর্ত্তনশীল ও অভিনব এবং তাহা যখন এত ভাব পরিবর্ত্তনে সক্ষম; তখন সমস্ত জন্ম ও সেই জন্ম সকলের বাসনা ও সংস্কারজনিত ভাবসকল সমষ্টিভূত হইলে, জীবদৃষ্ট এই জগদ্ভাবের বিকাশ ও প্রকাশ হয় কি না তাহা কল্পনা করিয়া দেখদেখি। সমধর্ম্মী বাসনা বা সমধর্ম্মী সংস্কারসম্পন্ন জীবগণ সকলেই, এক সমানাকারা ভাবজগতকে অবলোকন করিয়া থাকে। আবার এই অবলোকনক্রিয়ার বিশেষ ও সাধারণ ভাব হইতেই ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও মনুষ্য বংশ; মনুষ্য এবং প্রাণিজগত; সচল জীবজগত এবং অচল জীবজগত; ইত্যাদি একত্ব এবং পৃথকত্ব ও একতাপূর্ণ বহুত্ব যুক্ত সৃষ্টিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। জীবের বহুজন্মবাহী বাসনাগণ সংস্কারে পরিণত হয়; সেই সংস্কার বশে, যেন অবশ্যম্ভাবীরূপে, নূতন নূতন অবস্থা ও ভাব সকল উদয় হইয়া থাকে। এজন্য, অনেকস্থলে ইচ্ছা না করিলে, অতর্কিত থাকিলে, স্বীয় সংস্কারে অজ্ঞ হইলে এবং সম্পূর্ণরূপে মূঢ়বৎ ঔদাস্যযুক্ত থাকিলেও, সংস্কারজাত অবস্থা ও ভাব যাহা, তাহা যেন দৈববৎ আপনিই আসিয়া তাহাকে আক্রম ও অতিক্রম করিয়া থাকে। জন্মান্তরীণ সংস্কার সকলই, বিষয় ও ঘটনাদি ভেদে, স্বভাব ও অংশত দৈবরূপে প্রকটীকৃত হয়। বাস্তবিক উহাই অন্যতর দৈব এবং অদৃষ্ট ও অনাদি কার্য্যকারণ পরম্পরা। ইহজন্মগত সংস্কারও, কখন কখন সেরূপ দৈববৎ ফল বা ভাব যে উপস্থিত না করিয়া থাকে এমন নহে। স্বীয় স্বীয় ক্রিয়াফলে শরীরে রোগ স্বাস্থ্যাদি এবং মনে তজ্জনিত অনুভূতি শক্তির রূপান্তর ও ভাবান্তর প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। সংস্কারোৎপাদিত ফল বাসনার পরোক্ষ ক্রিয়া এবং দৃষ্টত স্বেচ্ছোৎপাদিত ফল, বাসনার অপরোক্ষ ক্রিয়া। বাসনা সকল কূটালীভূত * হইয়াই সংস্কারে পরিণত হয়। কিন্তু এ সংস্কার, এ বাসনা, ইহাদিগকে প্রতিরোধ দ্বারা, অবস্থা ও ভাবের উপর প্রভুত্ব করিবার কি কোন উপায় এ সংসারে নাই?

কিন্তু সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একটা বড় গোলমেলে কথা উঠিতেছে। বাসনাও অবশ্যই স্বেচ্ছাশক্তিসম্ভূত; তাহার পর, পূর্ব্বজন্মান্তরে

* Crystalized.

এবং ইহজন্মে,সর্ব্বত্রেই বাসনার প্রবলতা ; ভাল, তাই যদি হইল, তবে লোকে ভাবী ফলাফল গুণিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে কি বলিয়া, যথা ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকাদি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি ভবিষ্যতই অবশ্যম্ভাবী রূপে গণিতে পারা গেল, তবে আর স্বেচ্ছাশক্তির কার্য্য রহিল কোথায়? সকলই ত তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট এক নিয়তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত; অথবা গ্রহনক্ষত্রাদিই তাহা হইলে প্রকৃত অদৃষ্ট স্থানীয় এবং তাবত বিষয়েতেই, আকর্ষণ বিকর্ষণ যোগে তাহারা যেরূপ আদেশ করিতেছে, আমরা কেবল তাহাই করিয়া যাইতেছি। অতএব পাপপুণ্য, শুভাশুভ, ইত্যাদি একেতর যে কোন বিষয় বল, তাহাদের প্রতি আমাদের চেষ্টা ও আমাদের পুরুষকার প্রয়োগাদি এবং দায়ীত্বও যাহা কিছু,তাহা কেবল ভ্রম ও অলীক ধারণা মাত্র। চুপ করিয়া বসিয়া থাক, গ্রহনক্ষত্রাদি রূপ অদৃষ্ট যাহা করাইবে, তাহা আপনা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইবে। আরও দেখ, তাহা হইলে দেবানুগ্রহ বা আত্মশক্তির ফলদায়ীত্ব, যাহাই বল, সে সকলও অলীক কল্পনা হইয়া দাঁড়ায়।

কথাটা বড়ই গোলমেলে বটে, অথচ কিন্তু তাহা যথোপযুক্ত রূপে আলোচনা করিবার সময়ও ইহা নহে এবং স্থানও এখানে নাই। যাহা হউক, তথাপি সংক্ষেপত একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমি নিজেও কিঞ্চিৎ ফলিত জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; ফলিত জ্যোতিষের ফল ধ্রুব নহে। কতকগুলি ফল যে সে রকমে মিলিয়া যায় বটে, কিন্তু দেখা যায় যে অধিক ভাগই প্রকৃত ঘটনা হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। ফলিতের গণনাদি যাহা, তাহা সম্পূর্ণই বৈজ্ঞানিক এবং গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সাধিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ফলের আদেশ যেগুলি, তাহার কোন মূলও নাই বা তাহার কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রও নাই। অমুক গ্রহ এই এই ভাল ফল দেয়, অমুক গ্রহ এই এই মন্দ ফল দেয় ; কিন্তু কেন অমুক গ্রহ সেই সেই ভাল ফল দেয়, কেন অমুক গ্রহ সেই সেই মন্দ ফল দেয়, তাহার কোন সূত্রই নাই। কোন্ গ্রহনক্ষত্রের কে ভাল মন্দ তৎসম্বন্ধে যে বুদ্ধি তাহা, বোধ হয়, গ্রহনক্ষত্র বিশেষের সহ সমনামধারী পৌরাণিক চরিত

বিশেষের ভাল মন্দ বিচার হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; যেমন বৃহস্পতি দেবগুরু, যিনি দেবগুরু তিনি কখনও মন্দ হইতে পারেন না, অতএব বৃহস্পতি গ্রহ বড়ই শুভ ফল দাতা; সেইরূপ শনি ও রাহু, ইহারা পুরাণেও যেমন নিন্দিত চরিত, জ্যোতিষেও সেইরূপ নিন্দিত ফলদাতা; ইত্যাদি। যাহা হউক, গ্রহগণের এই ভাল মন্দ অভিধান অনুরূপ ফল, সত্য সত্যই ফলিত হয় কি না, সে বিষয়ে যাঁহারা ভূয়োদর্শন সম্পন্ন তাঁহারাই ভাল বলিতে পারেন। আমি যে কয়েকখানি কোষ্ঠী তৈয়ার করিয়াছি ও যে যে কোষ্ঠী আমার হাতে পড়িয়াছিল, সেই সেই কোষ্ঠী লিখিত মত ভাল মন্দ ফল ফলিতে এখনও দেখি নাই এবং দেখিতে এখন বিলম্বও আছে। যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহাতে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি না যে, গ্রহাদির এই এই সংযোগ হেতু এই এই ফল ফলিয়াছে। তাহার পর, অন্যান্য কোষ্ঠী দর্শক সম্বন্ধে যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে কেহ বলে এই এই সম্বন্ধে ফল ফলিয়াছে; কেহ বা বলে ফলে নাই; আবার যাহারা অধিক বিশ্বাসপ্রবণ বা যাহারা ব্যবসায়দার, তাহারা সকল বিষয়েতেই ফল ফলিতে দেখিয়া থাকে এবং যে বিশ্বাসপ্রবণ সে কাকতালীয়বৎ একটা ঘটনা মিলিতে দেখিলে, আর শতটা অমিলকে সেই বলে হজম করিতে সমর্থ হয়।

ফলিত জ্যোতিষের কতকগুলি আদেশ যে অতি সুন্দরভাবে মিলিয়া থাকে, তাহার একটি উদাহরণ বলি। জ্যোতিষে নির্ণিত আছে যে লগ্ন বিশেষের অমুক দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মিবে, অমুক দ্রেক্কাণে কণ্যা জন্মিবে এবং সে নিয়মের অন্যথা হইবে না। এই নিয়ম সত্য কি না তাহা ১৪ টি জাতক সহ মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ১৩ টি ঠিক এবং একটিতে মাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে। * কিন্তু ইহাও বলি যে, এরূপ বিষয়ে শতকের মধ্যে একটার

---

* প্রবন্ধের এই অংশ যখন যন্ত্রারূঢ় হইয়াছে, তখন এই দ্রেক্কাণজন্ম বিষয়ক অনুসন্ধান শেষ হওয়ায় জানিতে পারিলাম যে, পুত্র বা কন্যা ইহারা যে সকল সময়ে দ্রেক্কাণ অনুসারে জন্মে তাহা নহে; জ্যোতির্ব্বিদেরাই শাস্ত্রাদেশকে ঠিক রাখিবার জন্য, পুত্র বা কন্যাজন্ম অনুসারে, লগ্নের দ্রেক্কাণ অংশ সংশোধন করিয়া লইয়া থাকেন। সুতরাং অমুক দ্রেক্কাণে যে পুরুষে জন্মে, অমুক কন্যা জন্মে; এ বিষয়ে জাতক সহ শাস্ত্রাদেশের মিল

ব্যতিক্রম ঘটিলেই, তাবত নিয়মের স্থিরতা ভাঙ্গিয়া যায়; আবার অপর পক্ষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যেখানে ১৩টি ঘটনা ধারাবাহিক মিল হয়, সেখানে কিছু সত্য না থাকিয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, এখানে আর এ বিষয়ের বাহুল্য আলোচনার প্রয়োজন নাই; প্রবন্ধান্তরে ফলিত জ্যোতিষ্ সম্বন্ধে বাহুল্য আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে এইমাত্র বলি যে, জ্যোতিষ্ সম্বন্ধে যত দূর দেখা যায় তাহাতে আদিষ্ট ফলের স্থিরতা নিরূপণ হয় না এবং হইলেও, সে ফল যে সর্ব্বদা ধ্রুব শাস্ত্রেও এমন কথা বলে না। গ্রহ যামল ও তন্ত্রাদিতে এরূপ লিখিত আছে যে, শান্তি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা গ্রহদোষ সকল কাটিয়া যাইতে পারে; আবার অপকার্য্যের দ্বারা, গ্রহাদিষ্ট ভাল ফলেরও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। অতএব গ্রহদিগের শুভাশুভ ফলদাতৃত্ব স্বীকার করিলেও, যে সকল শাস্ত্র সেই ফলের আদেশ করে, সেই সকল শাস্ত্রানুসারেই দেখা যায় যে সেই ফল অখণ্ডিত ও ধ্রুব নহে এবং পুরুষকার বা তথাবিধ কারণের দ্বারা তাহার ব্যত্যয় হইতে পারে। সাধারণতও বচন আছে যে, জ্যোতিষিক গণনা বিষয়ে যাহার যেমন বিশ্বাস, সে সেইরূপ ফললাভ করিয়া থাকে;—

"দেবেতীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

ইংরেজি ফলিত জ্যোতিষের ব্যবসায়ীরাও বলিয়া থাকে যে, গ্রহাদিষ্ট ফলকে স্বেচ্ছাশক্তি ও পুরুষকারের দ্বারা অন্যথা করা যাইতে পারে। *

হওয়ার কিছুই বৈচিত্র নাই। আমি নিজে যে পাঁচটী জন্মের লগ্ন ঠিক করি, তাহাতে কিন্তু বাস্তবিকই চারিটি মিলিয়াছিল, একটি মাত্র মিলে নাই। যাহা হউক, ফলিত জ্যোতিষ কতদূর বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্য; উক্ত শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় বিচার সহ একটি প্রবন্ধ সময়ান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এখনও, উক্ত শাস্ত্রসম্বন্ধে অপর খানকয়েক পুথিসংগ্রহ এবং আরও দুই এক-জন নামজাদা জ্যোতির্ব্বিদকে পরীক্ষা করণ, প্রবন্ধ লেখার এই দুই পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া বাকি রহিয়াছে।

* জ্যাডকিয়েল নামক ইংরাজী ফলিত জ্যোতিষ ব্যবসায়ী এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে:—"The word fate does not here imply *inevitable* fate: for though

যাহাহউক, মোটের উপর এখন এই পর্য্যন্ত বলি যে, ফলিত জ্যোতিষ, যে পর্য্যন্ত বিশেষরূপে পরীক্ষিত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহাকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ভাল নহে; এ পৃথিবীতে হাসিয়া উড়াইবার জিনিষ কিছুই নাই। আবার অন্যদিকে, উহাতে একেবারে বিশ্বাসপ্রবণ হইয়া স্বীয় পুরুষকারকে নষ্ট করাও ভাল নহে। যদিই জ্যোতিষের ফল গণনা বহু পরিমাণে সত্য হয়, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে কেবল এই একটি বিষয় লক্ষিতব্য যে, কি এদেশীয় কি বিদেশীয়, উভয় দেশীয় ব্যবসায়ীরাই বলিতেছে যে, পুরুষকারের দ্বারা আদিষ্ট ফলের ব্যতিক্রম করিতে পারা যায়। যদি পুরুষকারের দ্বারাই ব্যতিক্রমসিদ্ধ হইল, তখন আর গ্রহনক্ষত্রের ফলকর্তৃত্ব জন্ম মানুষকে কখনই তাহাদের হাতে অদৃষ্টক্রিড়নক স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, গ্রহনক্ষত্রাদি কর্তৃক যে কিছু ফলাদেশ, তাহা যদিই সত্য হয়; তাহা হইলে তাহা, অপরাপর বিষয়ের ন্যায়, বুদ্ধিব্যতিক্রম এবং বাসনানুজাত বিশ্বাস জনিত জন্মান্তরীণ সংস্কার হেতুই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে কর্ম্মসূত্র ও জন্মান্তরীণ সূত্রে সংস্কার অনুরূপ জীবত্ব, দেহ, সংসারাদি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; ব্যক্তি বিশেষে গ্রহ নক্ষত্রাদির বলাবল ও ফলাদেশ বিশেষও অবিকল সেই সূত্রে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। পুনশ্চ, যখন জন্মান্তরীণ অপরাপর সংস্কার ও সূত্র সকল ইহ জন্মের পুরুষকার ও কর্ম্মদ্বারা নির্জ্জিত হইতে পারে, তখন গ্রহনক্ষত্রাদির যে বলাবল ও ফলাফল, তাহাও তদ্রূপ স্বচ্ছন্দে নির্জ্জিত না হইবে কেন? অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহারও মূলে প্রকারান্তরে বাসনা ও স্বেচ্ছাশক্তি প্রবলা এবং তাহাদিগের কর্তৃকই উহা প্রকারান্তরে প্রবর্ত্তিত। অতঃপর কর্ম্মবান জীবের পক্ষে এক্ষণে মোটের উপরে এইমাত্র উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ দাঁড়াইতেছে যে, মানব গ্রহনক্ষত্রাদির ফলের প্রতি দৃষ্টি-

---

the planets produce a certain influence on the natives affairs, yet the influence is capable of being opposed by the *human will*, and may by that means be either overcome entirely or greatly mitigated. If, however, it be not attended to, but allowed its full scope, it will then certainly produce its full effect, and the reader must remember that astrologers, in predicting events, always presuppose that this last circumstance will be the case."

পূর্ব্বক, আপনাকে অদৃষ্টবদ্ধবৎ দৃষ্টে অবসন্ন না হইয়া এবং তৎপ্রতি একেবারেই দৃষ্টি না রাখিয়া, সর্ব্বদা পুরুষকারের দ্বারা সৎপথাভিমুখে আপনাকে পরিচালিত করে। ইহাতে পরম লাভ; প্রথমত ইহাদ্বারা, গ্রহনক্ষত্রাদির আদিষ্ট কুফল থাকিলে তাহা ত নষ্ট হইবেই, দ্বিতীয়তঃ সুফল যাহা কিছু সেই গ্রহাদির দ্বারা আদিষ্ট আছে, তাহাও শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাপেক্ষা অধিক লাভ আর কি হইতে পারে! দিনক্ষণ না মানায় যে কিছু অমঙ্গল, তাহা পুরুষকারের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবলমাত্র পদার্থশূন্য ভীরু কাপুরুষেরাই দিন ক্ষণাদির ভয়ে অবসন্ন হইয়া থাকে এবং যে অমঙ্গল গ্রহনক্ষত্রাদিকে না মানিলে হয় ত ঘটিত না, তাহা মানিতে গিয়া ঘটাইয়া বইসে। কাপুরুষেরা সর্ব্বদাই দিন ক্ষণ দেখে, অথচ কুফল তাহাদের এক দিনও ছাড়ায় না; কিন্তু পুরুষার্থবানেরা দিনক্ষণ না দেখিয়াও নিত্য সুফলের ভাগী হয়। বস্তুত, অদৃষ্ট ও অদৃষ্টদর্শান, অকর্ম্মা অবৈধকর্ম্মা ও কাপুরুষেরই মনঃপ্রবোধ স্বরূপ হয়।

যাহা হউক অতঃপর দেখা যাইতেছে যে, বাসনা এবং বাসনা জনিত সংস্কার যাহা তাহাই জীবের পক্ষে, অবস্থা এবং ভাব, শুভাশুভ এবং অদৃষ্ট দৃষ্ট, ইত্যাদি তাবত বিষয়ের একমাত্র মূলসূত্র ও প্রবর্ত্তক। বাসনাতেই এতদূর করিয়া থাকে বলিয়া, শ্রুতি এবং গীতা উভয়েই সর্ব্বদা উপদেশ করিয়া থাকেন যে, যখন কেবল বাসনা হইতেই বন্ধন ও অধঃপাতের সংঘটন হয়; তখন সর্ব্ব প্রযত্নে সেই বাসনা সকলকে ধ্বংস কর এবং কর্ম্ম সকলে নিষ্কাম হও। কর্ম্মে নিষ্কামতা না হইলে, যে বাসনা তাহা পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল এবং তাহা হইলে, তাহাই আবার প্রতি নব উপকরণে উত্তেজিত হইয়া, প্রতি নূতন বন্ধনের উপাদান স্বরূপ, নানা নূতন বাসনা সকল বিবর্দ্ধিত করিতে থাকিবে। এ বন্ধন আর কিছুই নহে, উহাও সেই অনুরূপ অবস্থা এবং ভাবাদির প্রাপ্তি। সুবাসনা হেতু অবস্থা ও ভাবাদি পরিচ্ছন্ন হয়; কুবাসনা দ্বারা তাহা পাপ হইতেও পাপতরে পতিত হইয়া থাকে। বাসনার ক্ষীণতায় ও সত্ততায়, অবস্থা ও ভাবাদির বন্ধন ক্রমে শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। আত্মস্বার্থে ধৃত বাসনা যাহা, তাহাই জীব আত্মাকে জড়িত করিয়া থাকে; তদন্ততরে তাহা আত্মাকে জড়িত না করিয়া

মহাবাসনার আলয় স্বরূপ মহাপ্রকৃতিতে সংমিলিত হওত, তথায় স্বীয় কার্য্যফল বিস্তার করিতে থাকে। তাই বলি, আত্মস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া, জাগতিক স্বার্থে স্বার্থ মিলাইয়া, সুকার্য্যপথে সোৎসাহিত হও; তাহা হইলে সকল দিকেই মঙ্গল ও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে।

এ সংসারে জীবের যাবতীয় কার্য্য মনের দ্বার দিয়া উদ্ভাবিত, চিন্তিত, বিবেচিত এবং কৃত হয়। তাহার পর, যাহা কিছু উদ্ভাবিত এবং কৃত; সে সমস্তই বাসনা বা সংস্কারজনিত এবং মন, তাবত জন্মান্তরগত এবং ইহ জন্মজাতও, সেই সমস্ত বাসনা বা তজ্জনিত সংস্কার সকলের ভাণ্ডার গৃহ ও ভাণ্ডারী স্বরূপ। সেই মন, যখন যেরূপ সংস্কার মুখে আনত হয়, তখন সেইরূপ অবস্থা ভাবাদিকে প্রকাশ এবং তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকে। আবার যাহা হইতে এবং যতক্ষণের নিমিত্ত মন অপসারিত হয়, ততক্ষণের নিমিত্ত তাহা মনের সকাশে অস্তিত্ব শূন্যের ন্যায় বোধ হয়। দৃষ্টান্তও দেখা যাইতেছে, মনের অনবধানে সাপের বিষও অমৃত হইয়া যায় এবং দুষ্ট অবধান হেতু অমৃতও বিষ হইয়া উঠে। সুরূপও কুরূপ হয়, কুরূপও সুরূপ হয়; কুস্থানও সুস্থান হয়, সুস্থানও কুস্থান হয়; যাহা ছিল না তাহা অস্তিত্ব যুক্ত হইয়া থাকে; যাহা আছে তাহা অস্তিত্ব শূন্য হইয়া যায়, ইত্যাদি। এরূপ অসাধারণ ও অলৌকিক ভোজবাজীর খেলক স্বরূপ যে মন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই জীবাত্মার পুরুষকার শক্তির বশীভূত। এক্ষণে কথা এই যে, মনের উপর সেই পুরুষকার শক্তি যদি সম্যকরূপে চালিত হয়, তাহা হইলে সেই মনের দ্বারা কিনা করিতে পারা যায় বা না যায়। ফলত, মনকে উপযুক্তরূপে পুরুষকার শক্তির বশীভূত করিতে পারিলে, তখন এমন কি, ইচ্ছা ক্রমে আত্মা ভূতাতীত ভাবেও উঠিতে পারে; আবার ইচ্ছা করিলে, আরও স্থূল ভূতাত্মক অবস্থায় নামিতে পারে; অথচ সে সমস্তই স্বেচ্ছাধীনে, তোমার আমার মত ইচ্ছাশূন্য অদৃষ্ট পরিচালিতের ন্যায় নহে। অদৃষ্ট শক্তি তাহার নিকট অদৃশ্য হইয়া যায়; যে পদার্থ আছে তাহাকে সে নয় করিতে পারে এবং যাহা নাই তাহাকে সে হয় করিতে পারে; এক কথায় মন-বশ্যতা হেতু সমস্ত ভূত-ব্যাপার যাহার করতল গত হইয়াছে, তাহার পক্ষে সাধ্যই বা কি নয় এবং অসাধ্যই বা কি হইতে পারে। সংস্কারাত্মক অবস্থা এবং

ভাবাদির উপর এরূপে যাহার আধিপত্য স্থাপিত; সে আত্ম হইতে অবনত অবস্থাপন্ন তাবত জীবেরই অবস্থা এবং ভাবের উপর সুতরাং অপরিমিত আধিপত্য করিতে সক্ষম। সুতরাং মৃতকে বাঁচাইতে, রোগীকে আরোগ্য করিতে, ইত্যাদি বিষয় সেরূপ উন্নত জীবাত্মার পক্ষে কিছুই কষ্টের বা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দেশ এবং কাল, যাহা সংস্কার জনিত ভাবান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাও কখন তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না এবং স্থূল অবরোধেও কখন তাহার গতিরোধ হয় না। বাঞ্ছারামের নিকট নিশ্চয়ই এ সকল কথাগুলি বড় আশ্চর্য্য ও অত্যন্ত গাঁজার খেয়াল বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এ সকলই সম্ভব এবং তাহাও এক অতি সামান্য উপায়ে, অর্থাৎ মন এবং মনের যাবন্ত সংস্কারপুঞ্জকে সম্পূর্ণত পুরুষকারের বশ্যতাধিকার মধ্যে আনয়ন করার দ্বারায়।

কথিত আছে পূর্ব্বতন ঋষিগণ উক্তরূপ বা তথাবিধ সাধারণ বোধাতীত ক্ষমতা সকল প্রদর্শন করিতে পারিতেন ও করিতেন। কথিত আছে যিশুখৃষ্ট মৃতকে বাঁচাইয়াছেন, রোগীকে রোগমুক্ত করাইয়াছেন। শুনা গিয়াছে, অনেকে অজ্ঞাত ভাবে সংস্কার বিশেষকে নির্জ্জিত করিয়া, ভূত প্রেতাদিতে সিদ্ধ এই বুদ্ধিতে, অনেক অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সাধন করিয়া থাকে। লিখিত আছে, হরিদাস সাধু একবার ৪০দিন ও একবার দশমাস মাটির তলায় বাস ও আরও নানা অদ্ভুত ক্রিয়া, প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যতই হউক, সকল লোকে সে সকল সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না; অলৌকিক জ্ঞানে সঙ্কুচিত হয়। বৈজ্ঞানিক নামধারী জড়জড়িত পণ্ডিতেরা উহার সম্ভবতাকে একেবারেই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্মুখে পড়িলেও, তাহারা তাহা উপযুক্তমতে পরীক্ষা করিতে রাজি হয় না; উদ্দেশেই উড়াইয়া দিয়া বলিয়া থাকে যে উহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ,—যেন প্রাকৃতিক নিয়ম সমস্তই তাহারা করতলস্থ করিয়া বসিয়াছে। তাহাদের নিকট যাহা কিছু অপরিচিত বা যাহা কিছু পরিচিতের ন্যায় সমানধর্ম্মী নহে, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত;—বৈজ্ঞানিকের পরিচিতাতীত কোন নিয়ম যেন এ অনন্ত বৈচিত্র বহুল মহাপ্রকৃতিতে থাকিতে পারে না ফলত, প্রাকৃতিক নিয়মের অনন্তাংশের

একাংশও আজি পর্য্যন্ত মনুষ্যবুদ্ধির গোচরে আইসে নাই। অথবা এই এই ও এতগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সে সীমার বহির্ভূতে প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে পারে না, এরূপ কোন নিশ্চিত জ্ঞানও মনুষ্যের আয়ত্তাধিকারে এ পর্য্যন্ত আইসে নাই। তবে কেমন করিয়া বলিতে সাহস করা যায় যে, এইটি প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত বা এইটি উহার বহির্ভূত নয়। আমরা দেখিতেছি যে যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম নামে পরিচিত হইতেছে; তখন যাহা কিছু সম্ভব হইতে পারে, তাহাই বা প্রাকৃতিক নিয়মান্তর্গত না হইবে কেন? তবে একথা ঠিক বটে যে আজি পর্য্যন্ত সে বিশেষ প্রকৃতিক নিয়ম,আমাদিগের নিকট সর্ব্বসাধারণভাবে ও সম্যকরূপে পরিচিত হয় নাই ও আয়ত্তাধিকারে আইসে নাই। যাহা আজিকে সম্ভব হইয়াছে বলিয়া দেখিতেছ, তাহাই এক সময়ে অপরাপর অনাগত বিষয়ের ন্যায় "সম্ভব হইতে পারে" ছিল। কিন্তু আমাদেরই বা এ বুঝাইতে চেষ্টা কেন? বৈজ্ঞানিক বাঙ্গারামের অপূর্ব্ব লীলা! যে বাঙ্গারাম চুরটের ধুঁয়া উড়াইয়া ভাবে এই ধুঁয়ায় হিমালয় হাঁটাইব, সেই আবার সধৃষ্টতায় অপ্রাকৃতিক নিয়মগুলির বাধক ও ব্যাখ্যাকারকরূপে আপনাকে আপনি অধিষ্ঠিত করিয়া থাকে। বাঙ্গারাম যত নীচ জাতি ও নীচানুকরণ হয়, ততই তাহার বৈজ্ঞানিকতার ভাগ অত্যন্তাধিক হইয়া থাকে;—বিশেষ চাষা গোয়ালাদি বংশোদ্ভবতায়, যে বংশ ও জাতিতে ষষ্টি বর্ষেও সাবালকত্ব আইসে না! সে যাহাহউক, কি ভৌতিক বিজ্ঞান কি আত্মিক বিজ্ঞান উভয়েতেই, তাহাদের একান্ততরের একক ভাবে অনুশীলন ক্রিয়ার এমন একটা সীমা আছে, যে সীমায় উত্তীর্ণ হইলে উভয়ের সম্মিলিত অনুশীলন ব্যতীত, আত্মা এবং আত্মিক ও বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েতেই বিকার এবং বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যায়। এখানে আরও একটা কথা স্পষ্টত জ্ঞাতব্য যে, কেবল অধুনাতন জড়বিজ্ঞানকেই প্রকৃত বিজ্ঞান বলে না।

ফলত যে কোন প্রকারে ভূতপদার্থ চালিত হইতে পারে, তাহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলা যায়; তবে কি না আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থায় তাহার মধ্যে, সাধারণ এবং বিশেষ, ইত্যাদি বিভাগ করিলে তাহাতে অবশ্য ক্ষতি নাই। ঔষধাদির দ্বারা রোগ ভাল করাকে সাধারণ

প্রক্রিয়া বলিতে পারা যায় ; কিন্তু একজন কেবল বাক্যাদেশ বা স্পর্শ মাত্রে সে রোগ আরোগ্য করিল। তুমি সেই সাধারণ প্রক্রিয়াকেই এখন প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া থাকি, আর একটিকে তাহার বহির্ভূত বল ; কিন্তু কেন? আর একটিও প্রাকৃতিক নিয়ম, তবে তাহা বিশেষ প্রক্রিয়া এই মাত্র প্রভেদ। সাধারণত রৌদ্রতাপে তৃণাদি শুষ্ক হয়, কিন্তু রৌদ্র-তাপের বিপরীত যে নীহার, হটাৎ সেই নীহারপাতেও ত অবিলম্বে তৃণাদি শুষ্ক হইয়া থাকে। এ হটাৎ নীহারপাত-ফলকে কি প্রাকৃতিক নিয়ম বলিবে না? এ হটাৎ নীহারপাতও, তৃণাদি সম্বন্ধে, সাধারণ রৌদ্রতাপ তুলনায় যে শ্রেণির প্রাকৃতিক নিয়ম ; স্পর্শ মাত্রে রোগ আরোগ্য করাও সেই শ্রেণির প্রাকৃতিক নিয়ম। ঔষধাদি প্রক্রিয়ায় রোগ আরোগ্য যাহা তাহা সাধারণ নিয়ম; জনবিশেষের স্পর্শ মাত্রে যে রোগ আরোগ্য তাহা বিশেষ নিয়ম, কেবল এই মাত্র প্রভেদ। সূর্য্যতাপে তৃণাদি শুষ্ক হওয়া সাধারণ নিয়ম ; হটাৎ নীহারপাতে তৃণাদি শুষ্ক হওয়া ইহা বিশেষ নিয়ম। কি শারীরিক কি মানসিক, কি আত্মিক, যে প্রকারের শক্তি বা শক্তি সমষ্টিই হউক না কেন, যাহার দ্বারাতেই ভূত পদার্থ পরিচালিত হইতে পারে, তাহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম নামে নামিত করিতে পারা যায়।

অতএব স্বেচ্ছাক্রমে একদেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ, আকাশে উড্ডীন হওন, ভূতাবরোধের অতিক্রম ইত্যাদি ভূত সম্বন্ধে যে কোন প্রকার ও যে কোন শ্রেণির আতিভৌতিক ক্রিয়া সকল, তাহাদিগকে কোনক্রমেই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত বলিতে পারা যায় না। মনের বাসনা এবং বাসনাজনিত সংস্কার হইতে যখন ভূতভাবের উৎপত্তি, তখন সেই সংস্কার সহ মনকে সম্পূর্ণত স্ববশে আনিতে পারিলে, আতিভৌতিক ক্রিয়ায় পারক হইতে না পারা যাইবে কেন। মনের সংস্কার হইতেই যে ভূতভাবের উদয় ও পরিণতি এবং মনকে বিপরীত মুখে আকর্ষণ করিলে যে চালিত ভূতভাবের ব্যতিক্রম ও তাহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, উপস্থিত অজ্ঞ সময়েও তৎসম্বন্ধে যে যে কিছু পরিচয় ও নিদর্শন দৃশ্যত ও সাধারণত বর্ত্তমান আছে, তাহাই অংশত প্রদর্শনার্থে এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ স্থলে কতকগুলি ঘটনা-উদাহরণের উল্লেখ করা গিয়াছে। সেই গুলি স্থির চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে,

মনকে বশীকরণ দ্বারা কতদূর কি করিতে পারা যায় বা না যায়, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আলোচকের মনে অবশ্যই উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে।

এখন যাহা তমসাচ্ছন্ন আছে, কালে তাহাই আবার বিমলীকৃত হইয়া সত্যস্বরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। জগতের তাবত আবিষ্কৃত বিষয়ই এক সময়ে এরূপ তমসাচ্ছন্ন ও অসম্ভব ছিল; আর এক সময়ে তাহাই অত্যন্ত বিমলীকৃত হইয়া সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মনঃ-সংস্কারের অতীতগামী যে মানস শক্তির বিকাশ, যাহার বিষয় উপরে কথিত হইল এবং যাহা এক্ষণে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ও তমসাচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, নিশ্চয়ই এক সময়ে তাহা, গত তাবত নবাবিষ্কৃত বিষয়ের ন্যায়, সত্য-স্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকিবে। এবং প্রতিভাত যে হইবে ইহাও নিশ্চয, যেহেতু দেখা যাইতেছে যে মানবের তাবত বর্ত্তমান জ্ঞানলিপ্সা, জ্ঞানচর্চ্চা ও জ্ঞানোন্নতি সেই একই মুখে প্রধাবিত হইতেছে ও দিগদর্শন-সূচির ন্যায় সেই একই মুখে দেখাইতেছে। ভোগ-বিলাসাদি মানবের শারীরিক আকাঙ্ক্ষা; শারীরিক আকাঙ্ক্ষা যত সহজে পূরণ হয় ও তাহার দ্বারা যত পরিমাণে অবকাশ পাওয়া যায়, মানব সেই পরিমাণে মানসিক আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিতে সক্ষম হয়। তাহার পর, মানব যে পরিমাণে বিষয়ানুপ্রবেশ ও জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে থাকে; মনও তাহার ততই স্থূল সূক্ষ্মক্রমে, সংস্কার সকলকে অতিক্রম করিতে পারে। যতই সংস্কার সকলকে অতিক্রম করে, ততই স্বীয় আতিভৌতিক শক্তিকে অনুভব করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে, বর্ত্তমান জগতের ভোগ বিলাসাদি সাধনের সহজ উপায়াবিষ্কারই বল, বিষয়ানুরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই বল, বা এক কথায় সাধারণ জ্ঞানোন্নতিই বল; সকলেই সেই কথিত মানসশক্তির বিকাশ করণ মুখে, প্রতি উন্নতি সহ অবিরত গতিতে ও অপ্রতিহত বেগে প্রধাবিত হইতেছে। উপভোগ-বাসনা জন্য জীবত্ব; সুতরাং জগতগত জীবের ভোগ বিলাসাদির আকাঙ্ক্ষা অপরিহার্য্য। অতএব সৎভাবে যতই তদর্থে কর্ম্মানুসরণ করিবে, ততই তাহার হাতে অব্যাহতি পাইয়া ঊর্দ্ধগমনে সক্ষম হইবে। সে হিসাবে

ধরিলেও, কর্ম্ম সর্ব্বদা বিধেয় হইতেছে। গীতা শুনার পরেও, রাজ্যভোগার্থে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

মানবীয় বর্ত্তমান কর্ম্মানুসরণ, কর্ম্মাচরণ পর্ব্বে এখনও শিশুশিক্ষা স্বরূপ। কথিত মানসশক্তির যে দিন বিকাশ হইবে, সেই দিন এবং সেই দিনই মানুষ ইহলৌকিক পূর্ণ কর্ম্মক্ষমতায় পৌঁছিবে এবং সেই দিনই কর্ম্মের সম্পূর্ণতা সম্পাদনে, মানুষ আপন জীবনের সর্ব্বত্র সার্থকতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এ অনন্ত কর্ম্মসংসারে ও জীবনসংসারে সম্পূর্ণত শব্দ প্রয়োগ করা কিছু বিসদৃশ বটে, কিন্তু উহা আপেক্ষিক মাত্র। আমাদের ধারণা সহ সম্বন্ধ তুলনাতেই কেবল উক্ত শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। হিন্দু ঋষিরাই উক্ত মানসশক্তির সম্ভবতা প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন; ঈশ্বর করুণ, তাঁহাদের বংশধর হিন্দুসন্তানের দ্বারাই উহা যেন জগতে পুনঃ প্রকাশিত ও পুনবিকশিত হয়। ইহাও নিশ্চয় যে, যে দিন উহা এজগতে পুনঃ প্রকাশিত ও পুনবিকশিত হইবে, সে দিন মনুষ্য দেববৎ এবং এই পৃথিবী স্বর্গের আকার ধারণ করিবে।

কিন্তু বাঞ্ছারাম, একটা কথা আছে। পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থা এবং ভাবের আলোচনা করিতে গিয়া, সকলই মায়িক ভাবস্বরূপ সুতরাং সত্যস্বরূপের অন্তর পদার্থ ভাবিয়া, সকল বিষয়েতেই যেন ঔদাস্যযুক্ত হইও না। প্রকৃত ঔদাস্যযুক্ত হওয়া প্রার্থনীয় এবং সেরূপ ঔদাস্য উন্নতির উন্নত সীমাতেই লইয়া গিয়া থাকে, যদ্বারা কথিত আতিভৌতিক মানসশক্তির লাভ হয়; কিন্তু সে প্রকৃত ঔদাস্যযুক্ত হইবার সাধ্য ত তোমার নাই। যে অবস্থাসূত্র ও ভাবসূত্রে তুমি পতিত, তাহা যতক্ষণ ছিন্ন করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তোমাতে প্রকৃত ঔদাস্য আসিবে না। ততক্ষণ যে কিছু ঔদাস্য আসিবে, তাহা তোমার বুদ্ধির দোষোদ্ভূত এবং তাহা ভাক্ত ঔদাস্য; সে ঔদাস্য কেবল কর্ত্তব্যকে পরিত্যাগ করাইয়া, অকর্ত্তব্য মুখে লইয়া যায়। তোমাতে যে প্রকৃত ঔদাস্য আইসে না, তাহার প্রথম ও প্রধান নিদর্শন এই যে, তুমি স্বার্থ ত্যাগ করিতে চাহিলেও ত্যাগ করিতে পার না; অধিকন্তু তাহা আরও প্রবলরূপে তোমাকে আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং কর্ম্ম করিতে না চাহিলেও তোমার শারীরিক ও মানসিক কর্ম্মশক্তি

কর্ম্মার্থে সঞ্চালিত হইতে ক্ষান্ত থাকে না। তাই বলি, যতক্ষণ তুমি তোমার এ অবস্থা ও ভাবে পতিত, ততক্ষণ তদন্তর্ভূত কর্ম্ম যখন তোমাকে করিতেই হইবে; তখন তোমার কর্ম্ম যাহাতে কর্ত্তব্য অনুরূপ হয় তাহা প্রার্থনীয়, এবং তাহা হইলে সেই কর্ম্মই তোমাকে প্রকৃত ঔদাস্য অর্থাৎ উন্নত পথে লইয়া যাইতে পারিবে নতুবা, অকর্ত্তব্য দ্বারা জড়িত হওত আরও অধঃ-পাতের মুখে যাওয়া তোমার অনিবার্য্য বলিয়া জানিবে। তোমার বর্ত্তমান অবস্থায়, ঔদাস্য মাত্রেই অকর্ত্তব্য সাধক। যে অবস্থা ও ভাবে পতিত হওয়া যায়, সেই অবস্থা ও ভাবের অবলম্বন এবং তাহারই সাহায্য ও অনুষ্ঠানে কেবল তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। ইহাও জ্ঞাতব্য, ভাব পরিত্যাক্ত হইলে, অবস্থা পরিত্যাগ আপনা হইতেই সহজ হইয়া আইসে। কিন্তু ভাবকে পরিত্যাগ করিতে হইলে, ভাবকে সম্যক জ্ঞাত হইতে হয়। বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিক্ষাদি, সে ভাবের স্থূলতা হইতে সূক্ষ্মতরে লইয়া যায় এবং একমাত্র কর্ম্মই সে পথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। ঈশ্বর ও পরমাত্মা সম্বন্ধে, ব্যবহারিক স্রষ্টা সৃষ্ট সম্বন্ধ এবং তদুপাসনা ও নীতি আদি সে পথের প্রবর্ত্তক ও নিয়ামক। এখানেও একটা কথা। আত্মার অসাধারণ শক্তিশীলতা এবং তাহারই বাসনা জনিত স্থূল প্রপঞ্চের উদয় এবং পরমাত্মার নির্লিপ্ত ভাব, এ সকল আলোচনা করিয়া ইহাও যেন ভাবিও না যে পরমাত্মার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অতি অল্পই। সত্য বটে, তোমার পাপজনিত যে স্থূল প্রপঞ্চ এবং তাহার যে ফলাফল, তাহাতে অপরোক্ষভাবে পরমাত্মার স্রষ্টৃত্ব এবং কর্তৃত্ব কিছুই নাই; কিন্তু পরোক্ষভাবে আছে,—সে সকল তোমার বাসনা বশে কেন যে তদ্রূপ প্রবর্ত্তিত হয়, পরমাত্মার মায়িক নিয়োজনই তাহার মূল কারণ। ঐ মায়াকে পরমাত্মার প্রকৃতি, নিয়ম, কামনা, যাহা বলিতে চাও, তাহাই বলা যাইতে পারে। তাহার পর, তোমার স্থূল সূক্ষ্ম আদি স্থিতি পরিণতি প্রভৃতি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সম্ভব হয়, সেখানে আর তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নৈকট্যের কমি কি? তাহার পর আরও দেখ, তোমার সংস্কারই যখন স্রষ্টা সৃষ্ট ভাবের অববোধক, তখন তুমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ইচ্ছা করিলেও ত তাহার অন্যথা করিতে পার না। সুতরাং তেমন স্থলে স্রষ্টা

সৃষ্ট ভাবের অনুসরণ করাই তোমার পক্ষে বিধি। যাহা হউক, অতঃপর এই সকল উপায় ও অনুষ্ঠান যোগে, যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ভাবসূক্ষ্মতায় উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার আত্মভাব বিমলীকৃত হইয়া থাকে। আত্মভাব যে পরিমাণে বিমলীকৃত হয়, আত্মজ্যোতিও তথা পরিমাণে বিকীরিত হওয়াতে, শিক্ষা ও কর্ম্মাদিতে আনন্দাতিশয্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে। সেই আনন্দই স্থূলতানিগ্রহী নির্লেপিতা বা দিব্য ঔদাস্যমুখে লইয়া যায়। অতএব আবার বলি, যে ঔদাস্য এখন তোমার সাধ্য নয়, তাহা অবলম্বন করিতে যাইও না; যাহা অসাধ্য, তাহা করিতে গেলে বিকার উপস্থিত হয়। মূলে যে বাসনা গুণে যে অবস্থা ও ভাবের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা হইতে যদি ক্রমোত্তীর্ণ হইতে চাও, তবে শিক্ষা দীক্ষা ও ধর্ম্মানুগত হইয়া প্রাণপণে ও অনন্যমনে কেবল মাত্র জ্ঞানাচরণ ও কর্ম্মাচরণ কর, তাহা হইলেই সকল দিকে সফলতা লাভে চরিতার্থ হইতে পারিবে। জ্ঞান ও কর্ম্মেই পরমা গতি ও পরমা মুক্তি। তদুভয়ের উপার্জ্জনার্থে এবং তৎসমন্বয়ে, তোমার সম্বন্ধে এই পৃথিবী স্থিরা এবং এই পৃথিবীস্থ তাবত পদার্থ স্থির এবং সত্য। ইহাই যুক্তি এবং ইহাতেই মুক্তি।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্ম বিবৃদ্ধজন্ম॥
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥"

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

ইতি মানবীয় ধর্ম্ম।

মানবীয় কর্ম্ম।

১২৮৭।

১

স্মারক লিপি।

১। অনুস্মৃতি।

১। অথ কর্ম্মজিজ্ঞাসা। ১।

২। নামরূপবিশিষ্ঠত্বে কর্ম্ম। ২।

৩। ব্যষ্টি কর্ম্মে ব্যক্তিরূপ তথা ব্যক্তি-কর্ত্তৃত্ব। ৩।

৪। সমষ্টি কর্ম্মে প্রকৃতিরূপ তথা প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্ব। ৪।

৫। প্রকৃতি ঐশ্বরিক মহা কাম্যে কর্ম্মস্বরূপা। ৫।

৬। কাম্যৈক বিশেষে অনন্ত কাম্য, কর্ম্মৈক বিশেষে অনন্ত গতকর্ম্ম বিনিহিত। ৬।

৭। প্রতিকর্ম্ম অনন্ত অনাগত কর্ম্মে আয়োজনংশা-স্বরূপা। ৭।

৮। অহং-কৃত কর্ম্মে মানবীয় সংজ্ঞা; তদতীতে তদন্য-তরে বা প্রাকৃতিক। ৮।

৯। ইহৈক প্রয়োজন মানবীয় কর্ম্মে। ৯।

১০। কর্ম্মকারক ভেদ কর্ম্মক্ষেত্র ভেদে। ১০।

১১। তদুভয় ভেদতায় কর্ম্মবৈচিত্র। ১১।

১২। কর্ম্ম-বৈচিত্র হেতুত্বে ব্যক্তিসমাজজাত্যাদি ভেদতা। ১২।

১৩। মানবীয়কর্ম্ম শারীর-মানস দ্বৈত শক্ত্যুপায়সাধ্য। ১৩।

১৪। স্ফুরিত মানস-শক্তির সমষ্টিরূপ মানসিক সংস্কার। ১৪।

১৫। মানসিক সংস্কার পূর্ণায়তনে মানবীয় ধর্ম্ম। ১৫।

১৬। মানসিক শক্তি সঞ্চালনে কর্ম্মাধ্যাত্মিকতা। ১৬।

১৭। শারীরিক শক্তি সঞ্চালনে কর্ম্মাধিভৌতিকতা। ১৭।

১৮। উভয় সংযোগে কর্ম্মে পূর্ণরূপত্ব। ১৮।

১৯। তৎ-পূর্ণব্যাপকতা অনন্তায়তনে। ১৯।

২০। তৎ-পূর্ণ সফলতা আত্মোন্নয়নে। ২০।

২১। তৎ-পূর্ণ-পরিণামশীলতা প্রকৃতি পরিবর্দ্ধনে। ২১।

২২। কর্ম্মধর্ম্মানুসারিণী। ২২।

২৩। কর্ম্মজীবন ধর্ম্মজীবনের বহির্ব্বিকাশ। ২৩।

২৪। কর্ম্মশক্তির বিকাশ কর্ম্মযোগে। ২৪।

২৫। কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানেই স্বনিহিত শক্তিপরিমাণ পরিচিত হয়। ২৫।

২৬। কেবল শ্রমপরিমাণ, নিঃশেষ কর্ম্ম-পরিমাণ নহে।২৬।

২৭। নিহিতশক্তিপ্রয়োগ-পরিমাণে তৎপরিমাণ। ২৭।

২৮। অপূর্ণশক্তিপ্রয়োগে কর্ম্মক্ষুণ্ণতা, কর্ম্মক্ষুণ্ণতায় জীবনোদ্দেশ্যের ক্ষুণ্ণতা। ২৮।

২৯। তদুভয় ক্ষুণ্ণতায় আধ্যাত্মিক পাপ। ২৯।

৩০। তদন্যতরে তদন্যতর। ৩০।

৩১। সদসদ্ দ্বিবিধ কর্ম্মশ্রেণি। ৩১।

৩২। প্রযুক্ত শক্তির পূর্ণ সার্থকতায় সৎ। ৩২।

৩৩। তদন্যতরে অসৎ। ৩৩।

৭৬। লুপ্তার্থ দেবকর্ম্ম অনর্থকরী। ৭৬।

৭৭। মনঃ-উত্তেজক ও তদবশ্যতাবর্দ্ধক দৈবকর্ম্ম অনর্থকরী। ৭৭।

৭৮। অবশ মনে সংসারবিরাগতা প্রবর্ত্তক দৈবকর্ম্ম অনর্থকরী। ৭৮।

৭৯। দৈবকর্ম্মের মঙ্গলকারিতা নীতিবর্দ্ধনে। ৭৯।

৮০। লৌকিক বিষয়ে উৎসাহবর্দ্ধনে। ৮০।

৮১। কর্ম্মপ্রবর্ত্তনে। ৮১।

৮২। কর্ম্মসামঞ্জস্য সাধনে। ৮২।

৮৩। জাগতিক প্রীতিত্ব বিধানে। ৮৩।

৮৪। প্রকৃত দৈবকর্ম্ম তাবত সৎকর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধায়ক। ৮৪।

৮৫। গার্হস্থ্য কর্ম্ম গৃহ পালন। ৮৫।

৮৬। স্বীয় শিক্ষাদীক্ষাদির পোষণস্থলী গৃহ। ৮৬।

৮৭। গার্হস্থ্যকর্ম্মই জীবনকর্ম্মের প্রথম সোপাণ। ৮৭।

৮৮। যথা সম্ভব আত্মরক্ষণে ও পোষণে সৎ গার্হস্থ্য কর্ম্ম। ৮৮।

৮৯। তথা পারিবারিক সম্বন্ধে। ৮৯।

৯০। সৎ গার্হস্থ্য কর্ম্ম, যাহা ভবনকর্ত্তব্যাতীতে ভুবনকর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত। ৯০।

৯১। যাহা শারীরিক ও মানসিক উভয়ত সর্ব্বতোভদ্র। ৯১।

৯২। যাহা সর্ব্বথা সুপথ বিকাশক। ৯২।

৯৩। যথায় লিপ্তে নির্লিপ্ততা। ৯৩।

৯৪। অবস্থাজাত লিপ্তভাব অবস্থা পরিহারে দমনীয়। ৯৪।

৯৫। গার্হস্থ্যকর্ম্ম সামাজিকতার ব্যষ্টি অঙ্ক মাত্র। ৯৫।

৯৬। তদ্বৎ অনুষ্ঠান বিরহে অনর্থোৎপত্তি। ৯৬।

৯৭। তদনর্থ জাতীয়মাত্রা পর্য্যন্তে অপার অবনতি সাধক। ৯৭।

৯৮। আত্মপর উভয়ত অধঃপতনোপায়। ৯৮।

৯৯। ইহ পারলৌকিক উভয়ত পাপবিধায়ক। ৯৯।

১০০। গার্হস্থ্য-উৎকর্ষেই সর্ব্বথা জাতীয়োৎকর্ষ। ১০০।

১০১। ব্যষ্টি সমষ্টি উভয়ত জ্ঞানোৎকর্ষ তথা বিভবোৎকর্ষ। ১০১।

৪। অনুস্মৃতি।

১০২। গার্হস্থ্যকর্ম্মের পরিপাক ও বিস্তার সামাজিক কর্ম্মে। ১০২।

১০৩। সমাজদেশাদি বিষয়িনী তাবৎ কর্ম্মের সামাজিক সংজ্ঞা। ১০৩।

১০৪। গার্হস্থ্যভাব স্বীয় স্বার্থতঃ, সামাজিকতা জাগতিক স্বার্থতঃ। ১০৪।

১০৫। জাগতিক স্বার্থানুসরণে পরমাগতি। ১০৫।

১০৬। লোকত এবং ধর্ম্মত। ১০৬।

১০৭। স্বার্থত এবং অস্বার্থত। ১০৭।

১০৮। পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠনে সামাজিক কর্ম্ম অদ্বিতীয় উপায়। ১০৮।

১০৯। সামাজিক কর্ম্মের পূর্ণতা সমবেত চেষ্টায়। ১০৯।

১১০। তদর্থে কর্ম্মস্বাধীনতার প্রয়োজন। ১১০।

১১১। ভাব স্বাধীনতার প্রয়োজন। ১১১।

১১২। গতি-স্বাধীনতার প্রয়োজন। ১১২।

১১৩। বন্ধে ছন্দে বন্ধুরতা, হীনতা ও ধ্বংসতা। ১১৩।

১১৪। স্বাধীনতা ব্যতীত স্বভাবাবলম্বন অসম্ভব। ১১৪।

১১৫। স্বভাবাবলম্বন সর্ব্ব সৎ ও মহৎকর্ম্মের মূলোপকরণ। ১১৫।

১১৬। স্বভাবাবম্বনে অধ্যবসায় ও উৎসাহ প্রয়োজন।১১৬।

১১৭। উৎসাহ যাহা অনন্তপ্রসারিণী, অধ্যবসায় যাহা জিব-নান্তগামিনী। ১১৭।

১১৮। সামাজিক কর্ম্ম কেবল মাত্র স্বক্ষেত্রে ও ক্ষেত্রভাবে সুবর্দ্ধিত হয়। ১১৮।

১১৯। তথা স্বধর্ম্মে ও স্বজাতীয় ধর্ম্মাশ্রয়ে। ১১৯।

১২০। স্বপ্রকৃতি বৈপরিত্বে পরধর্ম্ম ও পরক্ষেত্র। ১২০।

১২১। পরস্থান মাত্রে কুস্থান, তত্রস্থ রত্নমাত্র গ্রহণীয়। ১২১।

১২২। সুকর্ম্ম মাত্রেই ক্রমপঞ্চে সিদ্ধ, যথা গার্হস্থ্য তথা সামাজিক। ১২২।

১২৩। শিক্ষাক্রম, শরীরমনাদিতে। ১২৩।

১২৪। পবিত্রতা, বাহ্যভ্যন্তরে।১২৪।

১২৫। কর্ত্তব্যবুদ্ধি, স্রষ্টাদিষ্টভাবত্বে। ১২৫।

১২৬। সাত্ত্বিকতা, আত্মসংস্থভাবে। ১২৬।

১২৭। প্রয়োজনীয়তা, স্বজাতীয়ত্বভাবে। ১২৭।

১২৮। সামাজিক কর্ম্ম কালানুরূপতায় ফলপ্রদ।১২৮।

১২৯। কালানুরূপ কর্ম্মেই উন্নতি। ১২৯।

১৩০। তদ্রূপ উন্নতিই সভ্যতা আখ্যায় আখ্যাত। ১৩০।

১৩১। সাময়িক শক্তিবিকাশের পরাকাষ্ঠা কালানুরূপতা-সাধনে। ১৩১।

১৩২। তদনুসরণের অক্ষমতায় অবনতি। ১৩২।

১৩৩। অনুসরণের অগ্রপদতায় ক্রমোন্নতি। ১৩৩॥

১৩৪। ক্রমোন্নতিশীলের নিকট অবনতের পদানতি ভাব স্বাভাবিক। ১৩৪।

১৩৫। অবনতিতে কর্ম্মজীবনের ক্রমক্ষীণতা হেতু, লোক ও সমাজে পাপের সঞ্চার ১৩৫।

১৩৬। পাপে অধঃপতন বা মৃত্যু।১৩৬।

১৩৭। কাম্যরূপে সামাজিক কর্ম্মানুষ্ঠানেও অনুন্নতি। ১৩৭।

১৩৮। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেই ইহলৌকিক উন্নতি। ১৩৮।

১৩৯। সাংসারিক ও সামাজিক সৌভাগ্য প্রাপ্তি। ১৩৯।

১৪০। নিষ্কাম কর্ম্মাচরণই মুক্তির উপায়। ১৪০।

কর্ম্ম।

অনেক স্থানেই বলিয়াছি, মানবীয় জীবনের উদ্দেশ্য, পরিণতি এবং পরিণাম কর্ম্মে। এ কথা অল্প বিস্তর বুঝেও সকলে; আবার বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না সকলে,—বিশেষত ভারতীয় সন্তানগণ,—বিশেষত ভারতস্থ বঙ্গনামধারীগণ। কর্ম্মও অল্প বিস্তর আচরণ করিয়া থাকে সকলে; অথচ প্রকৃত কর্ম্ম কি, প্রকৃত কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, তাহা বুঝে না সকলে এবং বুঝিলেও করিতে চায় না সকলে। ক্ষণমাত্রও, কর্ম্ম ব্যতীত মানুষের বসিয়া থাকার সাধ্য নাই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কর্ম্ম তাহাকে করিতেই হইবে; অথচ কিন্তু এমন কর্ম্ম করিবে না, এমন কর্ম্ম করিতে চাহিবে না, যাহাতে তাহার ইহলৌকিক সৌভাগ্য লাভ হয়, যাহাতে তাহার পারলৌকিক শ্রেয়ঃলাভও হয়। তাই বলি, একবার বল দেখি, বিশেষ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বল, মানুষের মত নির্ব্বোধ, অসার, অপদার্থ জীব এ জগতে আর আছে কি না। দেখ, এ জগতে, এ বিশ্বে, জড় অজড়, চেতন অচেতন, সকলেই প্রাণপণে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে; কিন্তু কেবলমাত্র করিয়া যাইতেছে না কে? মানব!—মানব একাই কেবল এ জগতে অলস থাকিতে চায়, বসিয়া থাকিতে চায়, কর্ত্তব্যের নাম শুনিলেই দূরে পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। হায় বিধাতা, মনুষ্যের কেন এ রোগ, কেন এ দশা, কেন তুমি তাহাকে এমন বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত করিয়াছ; কি রাগ তোমার, দয়া কি হয় না? পিপীলিকাটিও না খাটিয়া খাইতে চায় না; কিন্তু মানুষ কেবল পায়ের উপর পা—এক গোঁপে তা দিয়া রাজা হইতে চায়।

কর্ম্ম কাহাকে বলে, সে কথাও অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং অনেকবার অনেক রকম তাহার উত্তরও পাইয়াছি। বঙ্গসন্তান বলেন, কর্ম্ম আহার বিহার; ভাল, তাহাই হউক, কর্ম্ম যদি আহার বিহারেই হয়, তথাপি বঙ্গসন্তান তাহাও ত ভালরূপে করিতে জানেন না। আহার বিহার যদি ভাল কর্ম্ম, তবে তাহা ভালরূপে করিতে গেলেও ত সে সূত্রে অনেক ভাল বিষয় আসিয়া পড়িত! কিন্তু কই, বঙ্গসন্তান তাহাও ত ভালরূপে করিতে জানেন।

না? জানিবেন যদি তবে এ দশা কেন,—কখনও অনাহার, কখনও কুকুর শেয়ালের জীবনোপায়ে জীবনধারণ! ইউরোপীয়েরা কর্ম্ম বলে কাহাকে? আমরা আপাতত যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে, কর্ম্ম পরের রক্ত শোষণে। কিন্তু সে কথা সত্য হইলেও, ইউরোপীয় তোমার আমার মত কর্ম্মপথে হীন নহে; তাহা যদি হইত তাহা হইলে, সে তাহার জুতা তোমার মাথায় চাপাইত না এবং তুমিও এতকাল ধরিয়া তাহার জুতা মাথায় বহিতে না। পরের রক্ত শোষণ তাহার পক্ষে আমরা যেটা দেখিতে পাই, আমাদের সম্বন্ধে তাহা তাই বটে; কিন্তু তাহার নিজ সম্বন্ধে সে কেবল তাহার আহার বিহার চেষ্টার কিঞ্চিৎ আতিশয্য ভাব মাত্র,—তাহাও তাহার অতি-কর্ম্মশীলতার অন্যতর লক্ষণ মাত্র। বলিতে কি, প্রকৃত পক্ষে, তোমার সঙ্গে তুলনায়, ইউরোপীয় কর্ম্মবান যথেষ্ট এবং আচরিত কর্ম্মও যাহা তাহা, তাহা অতি গুরুতর;—কর্ত্তব্যবুদ্ধিও তাহার অনেক এবং কর্ম্মনীতি যাহা, তাহাও নিতান্ত সামান্য বা নিষ্কামতাশূন্য নহে। ফলত আত্ম স্বার্থের ঊর্দ্ধে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির অবলম্বনে, ইহারা যদি বিচরণ করিতে না পারিত; তাহা হইলে, নিশ্চয় জানিও, ইউরোপে আজি আমরা নিত্য নূতন উন্নতি, নিত্য নূতন আবিষ্কার, আফ্রিকার মধ্যদেশে স্থিতি, উত্তরকেন্দ্রমুখে গতাগতি, স্বদেশ ও স্বজাতীয়ের জন্য জীবন আহুতি, এ সকল ইউরোপীয়ের মধ্যে দেখিতে পাইতাম না। বিনা নীতি, বিনা প্রকৃতিগুরুতা, বিনা তদ্ভক্তয়, কখনও কোন মহৎ কর্ম্ম সংসাধিত ও সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা যাহাকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলি, ইউরোপীয়েরা তাহাকেই 'ডিউটী' এবং আমরা যাহাকে জগতহিতবাদীত্ব বা নিষ্কামতা বলি, ইউরোপীয়েরা তাহাকেই "পবলিক স্পীরিট' নামে নামিত করিয়া থাকে। নাম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, বিষয় এক। সেই 'ডিউটী' বুদ্ধি হেতুই ইউরোপীয় লোক তাদৃশ গুরুতর কর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়; নতুবা ইহা মনে করিও না যে, সে সকল গুরুতর কর্ম্ম সামান্য নীতিবশে সম্পাদিত হইতে পারে। ভারতসন্তান, তোমাতে সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সে নিষ্কামতা, সে নীতি কোথায়? তোমাতে তাহার কণিকা মাত্রও নাই বলিয়া, তোমাতে তাদৃশ গুরুতর কর্ম্মসাধনের কণিকামাত্রও এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না। অথচ কিন্তু তুমি ভাবিয়া থাক,

ইউরোপীয় বড় পাষণ্ড, বড় পররক্ত শোষক। সে যে সেই সেই দোষদুষ্ট পিশাচ, তাহাও মানি; কিন্তু আবার ইহাও মানি যে ইউরোপীয় যদি দোষ দুষ্ট একগুণ, তুমি দোষদুষ্ট তাহার শতগুণ! মানুষের মুখ্য পুরুষার্থ মনুষ্যত্বে; ইউরোপীয় সেই মনুষ্যত্ব লভিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছে না; আর তুমি? মনুষ্যত্ব একেবারেই লাভ কর নাই। তাই দোষদুষ্টতায় তোমাতে আর ইউরোপীয়তে এই প্রভেদ! হায়, ভারতসন্তান! দিব্যাদর্শ সকাশে যে ইউরোপীয় জীবনভাগে পাষণ্ড, নীতিভাগে পশু এবং ব্যবহারে পিশাচ, তোমার তুলনায় তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত করিতে হইতেছে; তোমার অধঃপতন কি দুরন্ত! হায়, ভারতসন্তান! তাহারা বানরবংশে জন্মিয়াও মানুষ হইল; আর তুমি দেববংশে জন্মিয়াও বানর হইলে। কি পরিতাপ, কি পরিতাপ!

অধঃপতিত উচ্চঘরের মূর্খ সন্তানের যে দশা, তোমার দশা তাহার অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছে! তুমি হিন্দুসন্তান, তোমার বড় গুমর যে তুমি ধার্ম্মিক, ভক্তিমান, নীতিবান এবং ভালমানুষ; আর ইউরোপীয়?—সে ম্লেচ্ছ, সে পশুবৎ, সে পাষণ্ড, সে পররক্ত শোষক ইত্যাদি! কিন্তু তোমার সে ধর্ম্ম, সে ভক্তি, সে নীতি, সে ভালমানুষী, তাহার ফল?—ফল ত এই দেখিতেছি যে সেই নীতি ভক্তি আদিতে তোমার দশা এই দাঁড়াইয়াছে যে, সেই নীতি ভক্ত্যাদিও এখন গা মেলিয়া আচরণ করিতে পার না; করিতে পাইবে কি না পাইবে, তজ্জন্য অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। পোড়াকপাল তোমার ধর্ম্মের, পোড়াকপাল তোমার নীতির! যে নীতি ও যে ধর্ম্ম আপন ঘরই বজায় রাখিতে অক্ষম, সেইই তোমাকে অনন্ত সুপরিণাম পথে লইয়া যাইবে? জীবন্ত ধর্ম্ম ও জীবন্ত নীতি যাহা তাহারা আগে আপন ঘর আপন অধিকারে সর্ব্বদাই বজায় রাখিয়া থাকে; বিপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডশক্র একত্রিত হইলেও ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই বলি তোমার ও ধর্ম্ম ধর্ম্মও নয়; তোমার ও নীতি নীতিও নয়; উহা গতাসু ধর্ম্ম এবং গতাসু নীতির ছিন্ন বসনাংশ মাত্র! তাহার পর তোমার ভালমানুষী?—কেন, পড়িয়া মারি খাইতে পার বলিয়া নাকি! ভালমানুষের চিহ্ন ওরূপ নহে; যথার্থত যে ভালমানুষ সে অনর্থক বিবাদ বিতর্কেও কখন

প্রবৃত্ত হয় না; আবার সার্থক বিবাদ বিতর্ক স্থলেও কখন পৃষ্ঠ দেয় না! প্রকৃত নীতিবান্ ও অনীতিবানে প্রভেদ কত দেখিবে? এই দেখ, একজন ইউরোপীয় স্বজাতীয়ত্বের জন্ত অকাতরে স্বীয় রক্তধারা বর্ষণ করিতে থাকে; আর তুমি ইউরোপে দুই দিন থাকিতে পাইলে বা তাহাদের নাই দেওয়া পাইলেই, অমনি স্বজাতীয়ত্ব পরিত্যাগে ফিরিঙ্গী হইয়া বইস। কোথায় বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান, আর কোথায় চুণাগলির ফিরিঙ্গীখ্যাতি; তাহাতেও তুমি লজ্জিত নহ, তাহাতেও তুমি কাতর নহ! ধিক তোমাকে! ইউরোপীয়, একজন স্বজাতীয় সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহার জীবন রক্ষা করিতে কত তৎপর; আর তুমি সেই ইউরোপীয়ের বাহবার আশায়, একজন স্বদেশীয় সহস্র গুণসম্পন্ন হইলেও, তাহাকে ফাঁসীকাঠে উঠাইয়া দিতে কত তৎপর! একজন ইউরোপীয় ক্ষমতা পাইলে, কেমন স্বদেশীয়ের উপকার সাধনে উন্মত্ত হয়; আর তুমি ক্ষমতা পাইলে, কেমন স্বদেশীয়ের ছিদ্রানুসন্ধানে ও অপকার সাধনে উন্মত্ত হও। ইউরোপীয়ের স্বজাতীয় উপরে অপরিমিত সৌভ্রাত্র; আর তোমার স্বজাতীয় উপরে অপরিমিত ছিদ্রান্বেষী শত্রুতা। ইউরোপীয় আত্মহিত ভুলিয়া জাতীয় হিতার্থে পাগল হয়; আর তুমি আত্মহিতে পাগল হইয়া জাতীয় হিত পদে পদে পদদলিত করিয়া থাকে। ইউরোপীয় নিত্য কর্ম্মোপায় ও কর্ম্মযন্ত্র উদ্ভাবনে পটু; আর তুমি নিত্য বচন বিস্তারে ও অকর্ম্মস্থাপনে পটু। কর্ম্মকীর্ত্তি অনুসরণে ইউরোপীয় স্বীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কি দুর্গম স্থানেই না যাইতেছে, কি অনিচ্ছনীয় অবস্থাকেই না পাইতেছে; আর তুমি, ঘরের মানুষ আজি বাহিরে শুইয়া জানিতেছ, 'কালি বা কোথায় আজি বা কোথায়, কালি বা কি ছিলাম, আজি বা কি হইলাম,'—দূর কর, আর কাজ নাই! তাই বলি, তোমাতে আর ইউরোপীয়েতে অনেক তফাত। ইউরোপীয় অনেক মন্দ মানুষ এবং অসম্পূর্ণ মানুষও বটে, কিন্তু সে কেবল তোমার জগৎপূজ্য পিতৃপুরুষগণের তুলনে; নতুবা তোমার সঙ্গে তুলনা করিলে; তাহারাই যথার্থ কর্ম্মবান, সুতরাং পুণ্যবান ও ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র; আর তুমি অকর্ম্মবান, পাপী ও ঈশ্বরের অপ্রিয়পাত্র। কেবল জপমালা লইয়া নিরীহ ভাবে আলোচালের হবিষ্য করিলেই

ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও পুণ্যবান হইতে পারা যায় না। প্রাচীন ঋষিরা হবিষ্যও করিতেন, আবার আবশ্যক হইলে লাঠিও ধরিতেন; বনেও থাকিতেন, আবার আবশ্যক হইলে রাজনীতি ও রাজ্যও চালাইতেন; গাছের বাকল পরিতেন, আবার আবশ্যক হইলে বিলাসকলার ব্যবস্থা বিধানেও ক্রটী করিতেন না; আধ্যাত্মিকতা প্রভাবে ঈশ্বরবাক্যও প্রচার করিতেন, আবার অন্যদিকে সংসাররাগেও কুণ্ঠিত হইতেন না; ইত্যাদি। তাঁহাদের ন্যায় এমন মহান্ মহিমান্বিত দিব্য ও আদর্শ লোকচরিত কি আর কখন হয়; জগতে কখন হয়ও নাই, হইবেও না। ইহাদের সহ তুলনে বটে ইউরোপীয় যথার্থতই পশু ও পিশাচ। এই বংশে জন্ম বলিয়াই, হিন্দুসন্তান আজি যদিও দারুণ অধঃপাতগত, তথাপি এখনও বাহ্যিক দৃশ্যে নৈতিকতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু হায়, সে সেই বাহ্যদৃশ্য মাত্রই, নতুবা ভিতর ভাগে সারশূন্য হইয়া গিয়াছে।

যে জাতীয়স্থগণ যেমন পুণ্যবান ও যেমন কর্ম্মবান, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় জাতীয় আদর্শ কর্ম্মশীলগণও তাহাদের আচরিত আদর্শ কর্ম্মের দ্বারা। ভারতসন্তান, তোমার জাতীয় আদর্শ কর্ম্ম যাহা যাহা, তাহাত দেখিতে পাইতেছি অথবা পরে দেখিব; আগে একবার তোমার আদর্শ জাতীয় কর্ম্মশীলগণকে বাহির করিয়া দেখাও দেখি। ভাল ভাল, দেখাও একবার, দেখি একবার, আইস সকলে মিলিয়া তাহাই একবার দেখি, দেখায় ফল আছে;—ঐ দেখ খোল করতাল ঘাড়ে এক চীৎকার-চটক, কে উনি? হিন্দুবীর!—"পৃথিবীর সকলই মিছা, কেবল এক হরিনাম সার!" আর এক দল ঐ তাহার পশ্চাতে ধ্বজগজে 'একমেবাদ্বিতীয়ং,' কে উনি?—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!" আর একজন ঐ দাড়ি চস্‌মায় বক্তৃতাবিহ্বল, কে উনি? —রাজনৈতিক, "বাক্যাৎপরতরং নহি।" ধনাধিকার উদয় হইলেন মিমোরিয়াল লিখাইতে; গ্রন্থকার আসিলেন, বর্ণমালা ও ভূগোলপ্রবেশ হাতে; বৈজ্ঞানিক আসিল, কুইনাইনের ব্যবস্থা করিতে; জ্যোতির্ব্বিদ আসিল, নূতন পাঁজি শুনাইতে; সওদাগর আসিল, পেন্সিলের তাড়া ও শ্লেট কাঁধে; অধ্যবসায়শীল আসিল, বহুকাল আচরিত অবৈতনিক এপ্রেণ্টিসগিরীর পরিচয় দিতে; রাজপুরুষ আইল, ডিপুটী বাবু; লোক,

পুরুষ আইল, পঞ্চায়েৎ বাবু; জলবিক্রেয়ের উদয় হইল, খেয়াঘাটের মাঝি, মূল্যবিক্রম আইল, কিওমার্সাল পদীর মা সম্মার্জ্জনী ঘুরাইতে ঘুরাইতে; মহাভারত! মহাভারত! পরদাক্ষেপ কর, আর কাজ নাই। ভারতসন্তান, এই তোমার আদর্শ জাতীয় কর্ম্মশীলগণ! অতঃপর তোমার আদর্শ জাতীয় কর্ম্ম আর কি দেখিব বা দেখিতে প্রবৃত্তিই বা হইবে কেমন করিয়া। ইউরোপের যে সে একটা নাম এবং তাহার যে সে একটা আচরিত কর্ম্ম একবার স্মরণ, একবার একটু তুলনা করিয়া দেখ দেখি। ইউরোপীয়ের প্রকৃতি-গাম্ভীর্য্য এবং প্রকৃতি-গুরুত্বের সহিতও একবার নিজেকে তুলনা করিয়া দেখ দেখি। প্রকৃতি-গাম্ভীর্য্যাদি গাছে ফলে না বা ইচ্ছা-গৃহিতও হয় না, উচ্চকর্ম্মধারণা ও কর্ম্মাচরণের গুরুভার হইতে উহা আপনা আপনি আসিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। এ নগণ্য নির্ব্বাণে আর কত কাল পতিত হইয়া থাকিবে; ঘৃণা বোধ হয় না, ধিক্কার বোধ হয় না? ছি ছি, এখনও চেতন হও! অথবা চেতন কি তুমি হইয়াছ? হও, হও, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু এ অনুকরণবৃত্তি অবলম্বন করিতেছ কেন? অনুকরণে কি কখন আসল লাভ, পুরুষার্থ লাভ হয়? অথবা প্রথম চেষ্টায় নানাদিকে দৌড়িতে হয়, নানা দৌড়াদৌড়িতে আসল পথের দেখা পাওয়া যায়। ভাল, অনুকরণই যদি করিবে, তবে একটা কথা;—আর যাহাকে ইচ্ছা অনুকরণ করিতে হয় কর, কিন্তু ভারতীয় ইউরোপীয়কে যেন অনুকরণ করিও না; বড় অনুরোধ, এ কথাটি রাখিবে কি?

ভারতসন্তানের সাধারণ কর্ম্মধারণা, যে সে রূপে কিঞ্চিৎ আহার সঙ্কুলান পূর্ব্বক, নিরীহভাবে হরিনাম করিয়া দিন কাটান; তাহা হইলেই জীবনোদ্দেশ্য অতি শ্রেষ্ঠরূপে সম্পাদিত হইল। তাই, দেশ এত নির্জ্জীব, এত অধঃপাতগত, তবু নিত্য নূতন ধর্ম্মবিপ্লব; তবু নিত্য নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় উঠিতেছে ও যাইতেছে; গুনিয়া তাহাদের সংখ্যা হয় না। কিন্তু কর্ম্মবিপ্লব ও কর্ম্ম সম্প্রদায়ের দেখা ত একটিও নাই? যথার্থ ধর্ম্মসম্প্রদায় কোনটা হইলে, কর্ম্ম তাহার সঙ্গে আপনিই আসিত; কিন্তু হায়, ধর্ম্মের সহ কর্ম্মের যে সম্বন্ধ আছে, এ জ্ঞানই এখন ভারতসন্তানের নাই। এ ভ্রষ্ট কর্ম্মধারণা যে কেবল আজিকালি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে; প্রাচীনেরাই ইহার উৎপাদক,—

কিন্তু আবার ইহাও বলি যে, অত্যন্ত প্রাচীনেরা নহেন। অত্যন্ত প্রাচীনগণের কর্ম্মধারণা সেরূপ ছিল না বলিয়াই, ভারতকে তাঁহারা গৌরবের উচ্চ গগনে উঠাইয়াছিলেন এবং আজি পর্য্যন্ত তাঁহারা জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।

প্রাচীনদিগের কর্ম্মধারণা ভ্রান্ত। ধর্ম্মানুসরণে অতি ব্যাগ্রতা হইতে, ফলের অঙ্কে অতি বাহুলতা এবং স্থলবিশেষে অতি পাষণ্ডতারও অনুসরণ পর্য্যন্ত কার্য্যত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মূল ধর্ম্মার্থ ও শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগে, কেবল উপর উপর স্থূল শাস্ত্রার্থই ধর্ম্মপদে বরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ ধর্ম্মপথ বিশেষে সাইনবোর্ড স্বরূপ; উহা কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দেয় যে, এই পথে এই ধর্ম্মদেশবিশেষ অভিমুখে যাইতে পারা যায়; নতুবা, তদতীত পথ বাহন ও তাহাতে যে অনুষ্ঠান, বুদ্ধিব্যায়, সতর্কতা ও শ্রমশীলতা, এসমস্তই, ধর্ম্মী যে তাঁহার নিজের উপর সম্পূর্ণত নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু কালে ভারতীয়গণ এমনিই সারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপথ বাহনে প্রতি পদক্ষেপেই তাহাদের সাইনবোর্ড বা অন্ধের নড়ির আবশ্যক। নিজের বুদ্ধির ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সাইনবোর্ডের নিদর্শনে ভুল হইতে পারে না;—এই ধারণা হইতেই বোধ হয় তাহাদিগের মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে শাস্ত্রানুসরণের আবশ্যকতা এতটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই হিন্দুদিগের মধ্যে, এত উপশাস্ত্র এবং উপশাস্ত্র জন্য এত উপধর্ম্মেরও প্লাবন!—এরূপ দৃশ্য জগতে আর কোথায় এবং কোন কালেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব এবং কর্ম্মতত্ত্ব যাহা, তাহা এই উপশাস্ত্র সমূহের স্তূপে অনেক কাল হইল চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদিগের ন্যায় শাস্ত্রভীত জাতিও কোথায় নাই, অথচ তাহাদিগের উপশাস্ত্রাদির ন্যায় অভাবনীয় অনিষ্টদায়ক আস্পর্দ্ধা এবং ধৃষ্টতাও আর কোথায় দৃষ্ট হয় না। এই সকল উপশাস্ত্র মানুষের সামান্য চলা ফেরাকে পর্য্যন্ত বন্ধে ছন্দে বাঁধিতে ক্রটী করে নাই। উঠিতে বসিতে হাঁচিতে কাশিতে, মুখ ধুইতে ও দাঁত মাজিতে পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রেই শাস্ত্র ব্যবস্থা; সর্ব্বত্রেই শাস্ত্র নিয়ম। এত বাঁধা ছাঁদার দৌরাত্ম্যে লোকচিত্ত সঙ্কীর্ণ, আকুল ও অকর্ম্মণ্য না হইয়া যাইবে ত যাইবে

কি সে? যেখানে বেণী বাঁধাবাঁধি, সেইখানেই কুফলের ভাগ অত্যধিক। এরূপ স্থলে পরিসর কর্ম্মক্ষেত্র এবং কর্ম্ম উভয়ই দূরে পলায়ন করিয়া থাকে এবং যেখানে পরিসর কর্ম্মের অভাব, সেখানে পরিসর ও সংধর্ম্ম যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তদুভয়ের মধ্যে যে কোন একতরের অভাবে, অপরের অভাব অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর কতদিনে যে আবার হিন্দু সন্তানের মতি ফিরাইবেন; কতদিনে যে আবার হিন্দুর সংশাস্ত্র ও সংধর্ম্ম পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বিশাল ও সংস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নামক যে দ্বিবিধ মহা পন্থা, তাহা আজিও হিন্দুসন্তান যদিও একেবারে ভুলেন নাই সত্য; কিন্তু আচরণে তাহাকে যেরূপে পরিণত করিয়াছেন, তাহাতে তাহা অপেক্ষা ভুলিয়া যাওয়াই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা এখন এই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সংসার ত্যাগে গাছতলা সার না করিলে, তাহা কখনও আচরিত হইবার বিষয় নহে; জ্ঞানকাণ্ড অর্থে ইহাদের মতে সন্ন্যাস—কর্ম্মসন্ন্যাস বা জ্ঞানসন্ন্যাস নহে; আকৃতি-সন্ন্যাস! তাহার পর কর্ম্মকাণ্ড: উপশাস্ত্র প্রভাবে কর্ম্মশব্দে অবশেষে ইহাদের ধারণা এই দাঁড়াইয়াছে যে, কর্ম্ম যাহা তাহা কেবল দেবার্চ্চনা ও দেবোদ্দেশে যাগ যজ্ঞাদি; তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু, তাহা কর্ম্ম নামের যোগ্য নহে। মহাশাস্ত্র শ্রুতি এবং গীতাদি পর্য্যন্তকেও, এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে অবনমিত করা হইয়াছিল। শ্রুতি এবং সংশাস্ত্রপ্রোক্ত যাবতীয় যাগ যজ্ঞাদি, জ্ঞানত এবং ফলতঃ, সংসার-যজ্ঞের সঙ্কেতদৃশ্য মাত্র;—রাজসূয়, অশ্বমেধ, দুর্গোৎসব, এ সকল কেবল বামণবিদায় ও দেবোপাসনা নহে; গর্ভদৃশ্য উহার জগত-অধিকার, দেশ-অধিকার, শত্রুনাশে বিভূতি লাভ, ইত্যাদি। অন্য তাবৎ যজ্ঞাদিতেও অনুরূপ গর্ভদৃশ্য নিহিত করা রহিয়াছে; এক সময়ে সে সকল বুদ্ধিবিষয়ীভূত ছিল, ফলিত এবং কাজে আসিত। কিন্তু হায়, এখন সে সকল নষ্টস্বপ্নের দূরস্মৃতি ইহাতেও দূর-বিলুপ্ত! এখন সে সকল বস্তুত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ধর্ম্মবাজারের মহার্ঘ্য মণিহারী, খরিদবিক্রয়ের বিষয়ীভূত, পয়সা ফেলিলেই কিনিতে পাওয়া যায়! অতএব এমন স্থলে সাংসারিক ও ইহলৌকিক বিষয়াদি যে একেবারে নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে,

তাহা বলা অধিকন্তু মাত্র। তাই বিদ্যাবিজ্ঞান শিল্পাদির এরূপ অবনতি। অতি প্রাচীন হিন্দু অতি সৎ ও প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং অতি সৎ ও প্রকৃত কর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাই বিদ্যা বিজ্ঞান শিল্পাদি প্রভৃতি তাঁহাদের সময়ে কি ত্বরিতপদে ও কি অভাবনীয় উন্নতিই না প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেই মহাজাতীয়গণের তিরোভাবের সঙ্গে, সে বিদ্যাবিজ্ঞানাদি এমন ভগ্নপদ ও অচল হইয়া পড়িয়াছে যে, আজি পর্য্যন্ত আর কেহ তাহাঁদিগকে উঠাইতে ও হাটাইতে পারিল না বা পারিতে চেষ্টাও কেহ করিল না; অধিকন্তু বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, বিদ্যা বিজ্ঞান শিল্পাদি প্রাচীনেরা যে পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অতিরিক্তে যাওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে। উন্নতি দূরে থাকুক, আরও অবনতি পাইয়া ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইতেছে!

যে ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে ভারতকে বিদ্যা বিভব ও জ্ঞানের উচ্চ গগনে উঠাইয়াছিলেন; সেই ব্রাহ্মণেরাই আর এক সময়ে উক্ত হীন ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম এবং কর্ম্মবুদ্ধির প্রথম প্রণেতা ও পোষয়িতা। পরে সেই ব্রাহ্মণদিগের আদর্শে রাজন্যবর্গ, ক্রমে অপরাপর লোক সকলেও, অধঃপাতের পথে গমন করিয়াছিল। তাহাদেরই ধারাবাহিক রক্তে জন্ম, তাই আজিও হিন্দুসন্তান প্রকৃত কর্ম্মপন্থা পরিত্যাগে, নানা ভেক ধরিয়া, কেহ "জগতে হরিনামই একমাত্র সারপদার্থ," কেহ "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" এবং "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর," এই সকল তুকতরঙ্গে উন্মাদিত হইয়া ফিরিতেছে!

পুণ্য ব্যতীত পরকালে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না; কর্ম্ম ব্যতীত পুণ্য হয় না। কেবল দেবার্চ্চনা, দেবোপাসনা ও পরকাল চিন্তায় কর্ম্ম হয় না। তুমি ইহলোককে তুচ্ছ ভাবিয়া পরলোক লাভের উপায়কেই প্রধান কর্ম্ম বলিয়া থাক, তাহাজানি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে উপস্থিত ইহলোক রক্ষণেই অপটু, সে অনুপস্থিত ও অস্থির-ধারণীয় পরলোক রক্ষায় কি কখনও সক্ষম হইতে পারে? কে তাহার সে শক্তিতে বিশ্বাস করিবে, ঈশ্বর স্বয়ংই করিবেন কিনা সন্দেহ। পরলোক ইহলোকের উপরই স্থাপিত,—ইহলোক পরলোকের ভিত্তি-স্বরূপ; সুতরাং যে ইহলোক রক্ষায় অপটু, স্বপ্নেও মনে করিও না যে সে পরলোক রক্ষায় কখন সক্ষম হইতে পারিবে।

ভারতসন্তান, আর কতকাল এ নভাবে থাকিবে? তোমার কর্ম্মবুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ আয়তন হইতে উদ্ধার করিয়া বিশাল আয়তনের উপর স্থাপিত কর। উপশাস্ত্র ও উপধর্ম্ম মোহে ভুলিও না; তোমার কর্ম্মশক্তিকে বন্ধনমুক্ত কর। সামান্য স্ত্রীসুলভ কমনীয়গুণ ও কমনীয় নীতির মোহে মোহিত হইয়া, কেবল ক্ষমা দমাদিতে অভিভূত হইও না; পৌরুষগুণ ও পৌরুষ নীতির অবলম্বন কর, —যে গুণ ও যে নীতি গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনে রাখিও, স্থান ভেদে, পাত্রভেদে, সময়ভেদে ও কর্ম্মভেদে, এ সংসারে সকল পদার্থেরই ব্যবহার ও আবশ্যকতা আছে; সুতরাং পৌরুষ ও কমনীয় এ উভয় গুণ ও নীতিরও সদ্ব্যবহার ও আবশ্যকতা আছে। পুনশ্চ, তদুভয়ের সংযোগ ব্যতীত কখনও ফলের সম্ভব হয় না। অন্তর্জগত ও বহির্জগত, আপন ও পর, গৃহ এবং দেশ, পুরুষকার যোগে উভয়ত সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিই, পরলোকে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পরম কারণ। তদুভয়ত, ইহলোকে যাহার মলিনতা; পর-লোকেও সে এবং তাহার জাতি মলিনতা প্রাপ্ত হয়। সেরূপ শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তি কেবল সৎভাবে ও সপ্রাণ কর্ম্মানুষ্ঠানে হয়। কি বৈষয়িক, কি আত্মিক; কি ভোগ্য কি ধর্ম্ম্য; এ সংসারে যাহা কিছু সৎভাবে প্রয়োজনীয়, তাহাই কর্ম্ম। একটা ধর্ম্মকার্য্য সাধনেও যে পুণ্য, নিশ্চয় জানিও সাত্ত্বিকভাবে একটা সামান্য বৈষয়িক কর্ম্মসাধনেও তদপেক্ষা কম পুণ্য নহে; বরং শুষ্ক মাত্র দেবোপাসনা পরায়ণের মহা দেবোপাসনা অপেক্ষাও, সে সামান্য বৈষয়িক কর্ম্মে পুণ্যাধিক্য নিরূপিত হয়। মানব আত্মা এবং ভূত উভয় নির্ম্মিত; অতএব উভয়ত কর্ম্ম সম্পাদনেই ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণতা। বাঞ্ছারাম, আরও কি কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক হইবে?

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥"

(যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন কোন এক অভাবনীয় সূত্রে নিম্ন-লিখিত কাগজটি হস্তগত হয়। বোধ হয়, এই প্রবন্ধসহ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই উহা আমার হস্তগত হইয়াছিল। অতএব, উহা এই স্থানে সংযোজিত করিয়া দিলাম।)

'সূর্য্য, নীহারিকা, খদ্যোত, হিমালয়, নির্ঝর, মেঘখণ্ড, বায়ু, পৃথিবী,

বহ্নি ও গতিমন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত সৌরগ্রহমণ্ডল,সমস্তই কর্ম্মে চালিত, কর্ম্মপ্রভাবেই অবস্থিত।

'যদি কাহারও চাঞ্চল্য না থাকিত, গতি না থাকিত, তবে জগতের ভাব বড়ই ভয়ানক হইত। সে ভাব মনে করিতেও হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইবে।

'আপেক্ষিক ক্রিয়াশূন্য একটি পুষ্করিণীর সহিত একটি নিরন্তর চাঞ্চল্যমতী নদীর তুলনাকর, প্রবাহিত স্রোতস্বতীর।

'ক্ষুদ্র আর কিছুই নয়, নিকৃষ্ট আর কিছুই নয়, আপেক্ষিক কর্ম্মের অল্পতা নিবন্ধন ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট ; আপেক্ষিক কর্ম্মের আধিক্য নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ।

'জড় কিসে ? কেবলমাত্র বৃক্ষ যে স্থানের বৃক্ষ সেই স্থানেই অবস্থিত ; সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে না, সুতরাং বৃক্ষ জড়, পর্ব্বত জড়, পুঞ্জীকৃত মৃত্তিকাস্তূপ জড়। আর মানুষ সতত চঞ্চল, সতত গতিশীল, সুতরাং মানুষ চেতন।

'জীবজগতেও কর্ম্মাধিক্য ও কর্ম্মাল্পতাই, নিকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতার কারণ। আবার মানুষের মধ্যেও তথা। ব্রাহ্মণ অধিক কর্ম্মের কর্ম্মী, এই জন্য শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়াদি তদপেক্ষা ন্যূন—ইত্যাদি।

"কর্ম্মণা স্বর্গতাং গতং" কে অস্বীকার করে ? কিন্তু কর্ম্ম সেই পদার্থে আছে বলিয়াই সে সেই পদার্থ, আবার সে পদার্থে আছে বলিয়াই সে সেই কর্ম্ম।

'ঋগ্বেদে জাতিভেদ নাই * ;—

"বিশাং কবিং বিশ্‌পতিং মানুষীরিষঃ।—৩।২।১০

"ঋতাবানং যজ্ঞিয়ং বিপ্রমুক্থ্যমায়ংদধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ং।"—৩।২।১৩।

"বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপ্রোরত্না বিধন্ত ধরুণেষু গাতবে।"—৩।৩।১

"কেতুং যজ্ঞানাং বিদথস্য সাধনং বিপ্রাসো অগ্নিং।"—৩।৩।৩

"উদ্‌গাতেব শকুনে সামগায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি।"—২।৪৩।২

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"—১।১৬৪।৪৬

"প্রত্যগ্নি রুষসশ্চেকিতানোঽবোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাং।"—৩।৫।১

"ত্বামগ্নে দম আবিশপতিং বিশস্তাং রাজানং —২।৫।৮

"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।"—১।১৬৪।৪৫

* এটা কি বিদ্রূপ-উক্তি ?—বোধ হইতেছে তাহাই।

৩। কর্ম্ম ফলের আশা।

শুন বাঞ্ছারাম, গোটা দুই কথা বলি, কথা গুলা ভাল লাগে শুনিও, না লাগে শুনিও না। তোমার ন্যায় জেষ্ঠ্যত্বপূর্ণ ধড়িবাজের কোন কথা শুনায় আবশ্যক নাই, তা জানি; তথাপি মন বুঝে না, বিশেষ বয়োধর্ম্ম হেতু।—

'কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, ফলের আশা পরিত্যাগ কর';—এ কথা ঠিক নহে। এ কথা ঠিক হইলে, কার্য্যে প্রবৃত্তিই ঘটে না। প্রবৃত্তির অভাবে, চেষ্টা-শূন্য জড়াপণ্ডতে পরিণত হইতে হয়। ফলতঃ আশা মানবীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। মহাঘোর, মহা অন্ধকার, মহা বিপদসাগর, মানব যেখানেই পতিত হউক, আশাই কেবল তাহার একমাত্র অবলম্বন দণ্ড স্বরূপ হয়; কেবল আশাই তাহাকে বিবিধ বিপাক মধ্যে, বিবিধ মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহিত করিয়া জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। যে আশা এমন, যাহা অন্ধ মানবের যষ্টি অপেক্ষাও অধিকতর; মানবীয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাহাকে যদি বিতাড়িত কর, তাহা হইলে কি আর কথনও কর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে? ফলত আশা মানবীয় জীবনের পরিমাণ এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তিবিষয়ক, উভয়ই। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ফলের আশা না থাকিলে ফলধারণা, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কর্ম্ম প্রণালী ও কর্ম্ম সম্পাদন, এ সকলই অসম্ভব।

কিন্তু ফলের আশা ও পুরস্কারের কামনা এ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। পুরস্কার কামনায় উন্মাদিত হওয়া অতি নীচ প্রকৃতির কার্য্য। আশা নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতেও উদয় হইতে পারে, কিন্তু পুরস্কার কামনা স্বার্থবুদ্ধির আশ্রয় ব্যতীত উদয় হয় না। স্বার্থ এবং সৎকর্ত্তব্য বুদ্ধি এ উভয়ের একত্র সামঞ্জস্য হইতে পারে না। যে সার্থক-জন্মা স্থির সৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, তাহার মনে পুরস্কার কামনা স্থান পায় না। সর্ব্বদা তদ্রূপ কামনার অভি-ঘাত হইতে থাকিলে, কার্য্য এবং ফল, উভয়তই অনর্থ হইয়া থাকে। সৎ আশা কর্ম্মসুসম্পাদন রূপ ফল মাত্র চাহে।

এখন বলা বাহুল্য যে কর্ম্মারম্ভ করিয়া ফলের আশা পুরা করিবে; তদ্বিষয়ে নীতিবেত্তা হউন আর যিনিই হউন, কাহারই মানা শুনিও না কিন্তু করিবে না, ইহাতে একটি বিষয়; তাহা এই,—কর্ম্মে সফলতা হইলেও হর্ষে উন্মাদ হইও না; বা বিফলতা হইলেও বিমর্ষে হতজ্ঞান হইও না

অথবা কিরূপ করিলে লোকে ভাল বলিবে, তাহার দিকেও তাকাইও না। অথবা এক কথায়, সফলতা বা বিফলতা, উভয়ই ... চিত্তপ্রসাদ যুক্ত হইবে। পুরস্কার কামনা যাহাদের নাই বা তৎপ্রতি যাহারা অনাস্থা-যুক্ত, তদ্রূপ সৌভাগ্যবানেরাই সেইরূপ হইয়া ও করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র হইতে মহত্তম, এ সংসারের যাবতীয় সৎস্বরূপ কার্য্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত এবং তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য কৃত হয়; তুমি আমি কেবল উপলক্ষ ও কর্ম্মকারক মাত্র। এজন্য, যথার্থপক্ষে, কর্ম্মের সফলতা বা বিফলতার পরিণাম যাহা, তাহা সেই ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে; এবং তাহার ফল বা পরিণামও সুতরাং তাঁহাতে অর্পিত হইয়া থাকে। এমন স্থলে, তোমার সফলতায় উন্মাদিত বা বিফলতায় বিষাদিত হওয়ার আবশ্যক? যদি হও, তাহাতে প্রভূত ক্ষতি করিয়া থাকে; তাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য লোপ এবং কার্য্যশক্তি অবসন্ন হয়; হইলে, যে কর্ম্মার্থে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে আসা, যাহা আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য এবং যাহাতে আমাদিগের জীবনের সার্থকতা, সেই কর্ম্মার্থে আমরা বহুলাংশে অকর্ম্মণ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সুতরাং, এই অল্পস্থায়ী জীবন এবং কাল, উভয়েরই কিয়দংশ মিছামিছি অপব্যয় হইয়া যায়। যে সকল লোকের জীবন সাধারণতই কেবল অপব্যয়ের সমষ্টি, তাহাদের পক্ষে এ ক্ষতি অবশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে; কিন্তু তাহা যাহাদের নহে, তাহাদের পক্ষে এ ক্ষতি অভাবনীয় ও অনন্ত শোচনীয়।

কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ জাতি কিরূপ কর্ম্মপরায়ণ ও কর্ম্মঠ, তাহা সময়ের ব্যয় অপব্যয় বিষয়ে তাহাদের যত্ন-পরিমাণ দেখিয়া অবধারিত হয়। বঙ্গসন্তান, শত দিবা গত হইলেও তাতেন না; কিন্তু ইউরোপ ভূমের যে কোন জাতীয় লোক এক মুহূর্ত্তমাত্র লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হয়। ফল, সেই ইউরোপীয় এক জাতি আজ আমাদের নির্দ্দয় প্রভু এবং আমরা আজি তাহাদিগের সহিষ্ণু ও রাজভক্ত দাস।

কেবল আপন সুখভোগে রত থাকিবে, এ বলিয়া মানবের সৃষ্টি হয় নাই। কেবল আপন সুখভোগ সম্ভব হইত, যদি মানবের আপনা-আপনি সৃষ্ট হইবার ক্ষমতা থাকিত। কিন্তু মানব যখন তাহা না

হইয়া অন্যের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার
[illegible] ই স্রষ্টার অভিপ্রায় সিদ্ধিরূপ ঋণ পরিশোধান্তে, তবে আপন সুখের চেষ্টা দেখাই বিধি ; নতুবা স্রষ্টা যিনি, তিনি ছাড়িবেন কেন। মানব ভ্রান্ত! মানবের ন্যায্য আত্মসুখ যাহা, তাহা সেই স্রষ্টার ঋণ শোধের সঙ্গেই সংযোজিত ; কিন্তু ভ্রান্ত মানব, ঘোর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। যাহা হউক, মানব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে কর্ম্মমজুরের ন্যায় বিবেচনা করিবে। আরব্ধ কার্য্যে, কি ফলের উৎপত্তি হইল, তাহা লইয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা নহে। অবশ্য ফলের আশা বা ফলধারণার অবলম্বন ব্যতীত কার্য্যপ্রবৃত্তি হয় না ; কিন্তু কার্য্যশেষে ফল অনেক সময়েতেই ধারণা অনুরূপ পাওয়া যায় না। সেইজন্য একই নিশ্বাসে একবার ফলের আশা করিতে বলিতেছি ; আরবার ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নিষেধ করিতেছি লক্ষ্য রাখিলেই, সফলতা বা বিফলতায় হর্ষ বিষাদাদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায়, অনর্থোৎপাদন হইয়া থাকে। তাই আবার বলি, ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না। ফল যাহাই হউক না কেন, মানব যদি যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি আপনাকে কার্য্যে নিয়োজন করে, প্রাণান্তপণে তাহাতে নিরত হয় এবং সামর্থ্য থাকিতে কখনই তাহা হইতে বিচলিত না হয়, তাহা হইলেই তাহার জীবনকে সার্থক জীবন বলা যায়। কারণ, সার্থকতার পরিমাণ, কে কতখানি কার্য্য সম্পাদন করিল, তাহা লইয়া নহে ; কে কত খানি তাহাতে সাত্বিকভাবে আত্ম নিয়োজিত করিল, তাহা লইয়া। আমরা, আমাদের যতদূর সাধ্য, তাহা করিয়া যাইব ; তাহার পর তাহাতে যদি আশানুরূপ ফল না ফলে, তাহাতে আমাদের দোষ কি ? অতএব তেমন কর্ম্মকারক, ফলের বেলায় নিষ্ফলতা হইলেও, ঈশ্বরের নিকট সে পূর্ণ প্রীতিভাজন হইয়া থাকে। এখানেও কর্ত্তব্যবুদ্ধি, মানবকে খাড়া রাখিবার জন্য, একমাত্র সহায়।

কার্য্যারম্ভে, মানব ফলহেতুক পুরস্কার বা যশাদির প্রার্থী হইলে, তাহাতে বিশেষ দোষ ; তাহাতে আত্মস্বার্থ আসিয়া সংযোজিত হয়। যে কোন প্রকারে আত্মস্বার্থের সংযোগ হইলে, কার্য্যবিশেষের করণ ও অকরণ অবধারণে একরূপ স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয় ; নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সে স্বাধীনতা আসিতে পায় না ; যে কার্য্য স্রষ্টা কর্ত্তৃক নিয়োজিত বা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া

জ্ঞান, তাহাতে স্বেচ্ছানীতি অবলম্বন ও করণ না করণপক্ষে স্বাধীনতা কোথায় ? যাহা হউক, স্বাধীনতা উপস্থিত হইলে, মানবের অলস ভাব বা নীতির ব্যত্যয় উপস্থিত ও তাহা হইতে কার্য্যের হানি হইতে পারে ;—কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তীতায় কখনও সেরূপে কার্য্যহানি হয় না। অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র সমরে, আত্মস্বার্থ সংযোগ হেতুই স্বাধীনতা অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি যুদ্ধ করিব না। কিন্তু ভগবান দেখাইলেন যে আত্মস্বার্থ কেবল মোহজনিত ; নিঃস্বার্থ বা জাগতিক স্বার্থ যাহা, তাহাই সত্য এবং তাহাতে যে কর্ম্মারব্ধ, তদ্বিষয়ে করণ অকরণ পক্ষে স্বাধীনতা নাই, যেহেতু তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীনে যে কর্ম্ম কৃত তাহাই নিঃস্বার্থতা হেতু, প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মরূপে গণিত হইতে পারে। উহাই গীতা শাস্ত্রের মর্ম্ম; তাই অর্জ্জুন ত্যক্ত ধনুর্ব্বাণ পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাই সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেও, বনে গমন না করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

এ সংসারে সকল কার্য্যেরই ফল যে সহসা উৎপন্ন বা অনুভূত হয় তাহা নহে ; বা সকলেরই ফল হাতে হাতে একই দিনেও ফলে না। আশুফল যদিও অনেকের অতি অল্পকালে ফলে বটে, কিন্তু মহাপরিণাম বা দূরফল যাহা তাহা সর্ব্বদাই বহুকাল বা অনন্তকালে সম্পন্ন হয় ; এদিকে কিন্তু মনুষ্য জীবন আবার তেমনই অল্পকাল মাত্র ব্যাপক। এ কারণে কোথায় সফলতা বা কোথায় বিফলতা—অথবা আপাতত যাহা নিষ্ফলতাযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বস্তুত নিষ্ফলতাযুক্ত কি তাহা ভাবী সফলতার পূর্ব্ব সূচনা ;—অথবা আপাতত যাহা সফলতাযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বস্তুতই সফলতাযুক্ত কি তাহা ভাবী নিষ্ফলতার পূর্ব্ব সূচনা, তাহা ঠিক অবধারণ করিবার সাধ্য আমাদের নাই। ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কোন কোন বিষয়ে কখনও পরিণামটা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি এই মাত্র। এই সৃষ্টি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ পরম্পরায় ক্রমোত্তর ও ক্রম পরম্পরা কর্ম্ম সমষ্টির পরিণতি স্বরূপ ; উহা আবার সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় ভেদে অনন্ত কাল লইয়া ব্যাপ্ত। সুতরাং সফলতা বা বিফলতা, পর পর কোথায় আসিয়া যে উঠিতেছে বা কোথায় নাসিয়া যে মিলিতেছে, যাঁহার অনন্ত চক্ষু, কেবল এক মাত্র তিনিই তাহা সামূলত দেখিতে ও নির্ণয় করিতে পারেন ; তোমার আমার সে সাধ্য নাই।

কার্য্য মাত্রেরই দ্বিবিধ ফল, এক নিকট অপর গৌণ। নিকট যাহা, তাহা এই মুহূর্ত্তে বা দশ দিনে বা দশ বৎসরে সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু গৌণ যাহা তাহার ব্যাপকতা অনন্ত কালের উপরে। নিকট ফল ভাক্ত, গৌণ ফলই সত্য। আমরা স্থূলদর্শী, নিকট ফল মাত্রই দেখিতে পাই ও তাহাতে আকৃষ্ট হই; গৌণ ফল দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই সুতরাং তাহা গণনাতেও আনিতে চাহি না; অথচ কিন্তু সামান্য শক্তি হেতু যতই সামান্য ভাবে হউক না কেন, এই গৌণ ফল গণনা করিবার চেষ্টায় আমাদের অধিক লাভ। কিন্তু মোহভ্রান্ত মানব ভাক্তকেই সত্য জ্ঞান করিয়া, আদত সত্যকে একেবারে অবহেলা করে। গৌণ ফল অস্পষ্ট ভাবেও সম্মুখে রাখিলে, আর সফলতা বিফলতারূপ দ্বন্দে বিতাড়িত হইতে হয় না। তাই আবার বলি, যে কোন কার্য্যফল লইয়া আমাদের উন্মাদিত ও বিষাদিত হওয়ায় ফল কি? যে আদি মানব প্রথমে অগ্নি উৎপাদন করিতে গিয়া দগ্ধ হইয়াছিল, জানিও তোমার ষ্টীম এঞ্জিন ও তদবলম্বিত রেল গাড়ী প্রভৃতি সুখের সূত্রপাত, সেই আদি মানবের অগ্নিদাহনে। হরিণশীকারের যে নিস্ফলতা ও তদানুষঙ্গিক যে কারাবরোধ প্রভৃতি, সেই সকলের দূর ফলে সেক্ষপীয়রের অপূর্ব্ব কবিত্ব। যে ডালের উপরেতে ভর, সেই ডাল কাটিতে গিয়া কালিদাস কালিদাস হইয়াছিল! বাঞ্ছারাম, এ দ্বন্দ্বের গূঢ় গুহ্য রহস্য ধারণার অতীত, বোধের অতীত! তাই বলি, সোজা পথে চলাই সৎপরামর্শ।

ফলের কল্পনা বা আশা কর, কিন্তু সফলতা বা নিস্ফলতায় উন্মাদিত বা বিষাদিত হইও না। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুসরণে কর্ম্ম কর, স্বার্থের অনুসরণ করিও না। কর্ত্তব্য নিয়োজক ঈশ্বরের রোষ তোষের প্রতি দৃষ্টি রাখ; মানুষের রোষ তোষ বা যশ অযশের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না।

৪। যথার্থ কর্ম্মশীলতা।

যে কোন সৎকার্য্যে হউক, যথানীতি যথা বুদ্ধি ও যথাশক্তি পূর্ব্বক মানবের যে সাত্ত্বিকভাবে পরিশ্রমশীলতা, তাহাকেই তাহার ঈশ্বর সকাশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা ও প্রার্থনা বলিয়া জানিও। যে উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা মানব তাহার ঈশ্বরের নিকট, বিশেষ পুরস্কার প্রার্থনা ও সেই পুরস্কার প্রাপ্তির আশা

করিতে পারে, সে উপাসনা ও প্রার্থনা উক্তবিধ। কেবল নিয়মিত যাগযজ্ঞ, আহ্নিকাদি জপতপ; ব্রাহ্মমন্দিরে চক্ষু বুজিয়া নিদ্রাকর্ষিতবৎ অর্দ্ধাহুতি; খৃষ্টানের গির্জ্জাঘরে পাথার বাতাসে সুখাসনে খোস মেজাজে পুস্তক হস্তে উপবেশন; অথবা মুসলমানের ভক্তি বিগলিত ভাবে যে সে স্থানে নেজামে রতি, ইত্যাদি দ্বারা সেরূপ পুরস্কারের আশা করিতে পারা যায় না; আমার বোধ হয় যে ব্যক্তি আশা করে, সে বহুলাংশে বা একেবারেই ভ্রান্ত। ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ, একমাত্র তিনিই কেবল জানেন যে কি সে কি হয়; তথাপি যে আমি উক্তবিধ বলিতেছি, সে কেবল ঈশ্বরের করুণায় আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহা মাত্র। প্রকরণযুক্ত পূজা এবং উপাসনা ও বাচনিক প্রার্থনা প্রভৃতিতে যে একেবারে ফল নাই, একথা কখনও বলি না; তবে কি না লোকে যতটা ভাবিয়া থাকে ও যে ভাবে তাহাতে যতটা ফলের কামনা করিয়া থাকে, সে ফলের ভাগ অতি অল্পই। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের আংশিক শিক্ষা, ঈশ্বরকে কেবল নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিলেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। অন্যান্য ধর্ম্মে যদিও সেরূপ স্থূল শিক্ষা নাই, কিন্তু উপাসকদিগের মধ্যে কাজে দাঁড়াইয়া থাকে তাহাই। ঈশ্বর অবশ্যই সামান্য মানবের ন্যায় তোষামোদের বশ নহেন, অথবা সুখ্যাতি অখ্যাতি বা যশেরও প্রার্থী নহেন; সুতরাং ভ্রম হইতে অনন্বিত ভাবে যে উপাসনা ও প্রার্থনা আদি, তাহাতে কি ফল ফলার সম্ভব হইতে পারে? তবে ঈশ্বর করুণার বশ বটেন, কিন্তু তাঁহার সে করুণা আকর্ষণ ত কেবল বচনে হয় না। তাই আবার বলিতেছি, এরূপ অনন্বিত উপাসনা আদিতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আকর্ষণ পক্ষে ফল অতি অল্পই। তবে উপাসকের আত্ম-পক্ষে ফল ইহাতে অনেক আছে। প্রকরণ যুক্ত উপাসনা ও বাচনিক প্রার্থনা আদির দ্বারা আর কিছু না হউক, অন্তত এটি ঘটে যে মনোমধ্যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের শাসন ও নীতি জাগরুক হওয়ায়, মন পবিত্র হয়। শরীর ও মন উভয় পবিত্র হইলে এবং সে শরীর ও মন যদি সুক্ষেত্র হয়, তবে মানবের আত্মবোধ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিও সে সূত্রে হয়ত জাগরুক হইয়া উঠে। যাহাহউক, যে কোন প্রকারে মানব কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তীতায় যখন যথার্থ কর্ম্ম পথের পথিক হয় এবং যখন কথিত যথানীতি যথাবুদ্ধি ও
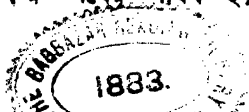
যথাশক্তি সাত্ত্বিক শ্রমশীলতা দ্বারা সত্য উপাসনা ও প্রার্থনায় সক্ষম হয়, তখনই কর্ম্ম উৎপাদন দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ও নিজেও যথাযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করিতে পারে। কিন্তু এ কথা বুঝে ও বুঝিবে অতি অল্পই লোকে। সে যাহাহউক, ইহা একটি অতি স্মর্ত্তব্য উক্তি যে, যাহারা পুরুষার্থ প্রণোদিত হইয়া শ্রমশীলতায় আপনি আপনার সাহায্য করে, ঈশ্বরও তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

লোকে কৃতপাপের উপর অনুতাপের একটা ফল গণনা করিয়া থাকে। গণনা কিছু মন্দ নহে। কিন্তু অনুতাপ বলিতে এমন বুঝিও না যে কতকটা বিলাপ পরিতাপ করিলেই, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন ও অমনি তাহার পূর্ব্বকৃত তাবৎ পাপ মার্জ্জনা করিয়া, তাহার জন্ত স্বর্গরাজ্যে খানিকটা জায়গা আলাহিদা করিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রাখিয়া দেন; সে পক্ষে তিনি কিছুই করেন না। লোককে অনুতাপযোগে আপনা আপনি শোধিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বস্খলিত কর্ম্ম সকলের সাধন দ্বারা, নিজের ক্ষতিপূরণ নিজেকে করিয়া লইতে হয়। ইহাকেই প্রকৃত অনুতাপ বলে, নতুবা আর যে কিছু তাহা অনুতাপ নহে। মানব বচন বিন্যাসে যতই অনুতাপ, বিলাপ, প্রার্থনা বা উপাসনা করুকনা কেন, যতক্ষণ সে আত্মপবিত্রতা সাধনপূর্ব্বক, প্রকৃতভাবে স্বশক্তির পরিমাণ অনুরূপ কর্ম্মপথের পথিক না হইবে, ততক্ষণ তাহাকে ঈশ্বর সকাশে শূন্যস্থলীয় বলিয়া জানিও;—অনন্ত হিসাব পুস্তকে নিশ্চয়ই সে নামশূন্য! আমি বলিয়াছি অনুতাপ করিলেই ঈশ্বর মুক্তি দেন না, লোককে আপনার মুক্তি আপনি করিয়া লইতে হয়, তাহা এইরূপে।—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব পাপে লিপ্ত বা অকর্ম্ম রত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহার নিজ উৎপত্তি পক্ষে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া থাকে। সুতরাং জীবন তাহার নিষ্ফল ও পরিণাম তাহার শূন্য হয়। অনুতাপের দ্বারা মানব যখন সেই পাপ বা অকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; এবং প্রতিনিবৃত্ত হইলে যখন তাহার প্রকৃতিতে পবিত্রতা আদি উপস্থিত হওয়ায়, কর্ম্মপথে তাহার পুনর্ব্বার গতি আরম্ভ হয়; তখন তাহার মুক্তির পথও প্রশস্ত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে ও তখনই অনন্ত হিসাব পুস্তকে তাহার নাম উঠিবার সূত্রপাত হয়। কর্ম্মপথে যে গতি, তাহা নিজের স্বেচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে; সুতরাং অনুতাপ দ্বারা সুপথে

আশায় যে মুক্তির পথ পরিষ্কার করা, তাহাও তাহার নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আরও, প্রকৃত অনুতাপ তাহাকে বলে যদ্দ্বারা, যেরূপ পাপের জন্য অনুতাপ, সেই পাপে চিরবিরতি ও সেই পাপে যে কর্ম্মহানি করিতেছিল, সেই কর্ম্মে নিত্য বৃত্তি সাধিত হয়। নতুবা এই পাপ করিলাম, এখনই অনুতাপ উপস্থিত হইল, আবার পরক্ষণেই সেই পাপে প্রবৃত্ত হইলাম; তাহাকে অনুতাপ বলে না। অনুতাপকালে ঈশ্বরের নাম গ্রহণে মনে অনেকটা শান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহাতে যে পাপ মার্জ্জনা হইল, সেটা তাহার চিহ্ন স্বরূপ নহে; সে কেবল নামের গুণ মাত্র। সুবুদ্ধি যে, সে তদ্দ্বারা চিনিয়া লয় যে, যখন এক নামের গুণে এত শান্তি, এত সুখ; তখন ঈশ্বরের প্রকৃত পথে বিচরণ করিলে, আরও না জানি কত অধিক সুখ ও শান্তির আশা করা যাইতে পারে।

লোকে পাপ অর্থে নানাপ্রকার ব্যাখা করিয়া থাকে। ব্যাখার সংখ্যা দেশভেদে কালভেদে এত যে, তাহা মানবীয় সামান্য শক্তিতে সমগ্রত আয়ত্ত পূর্ব্বক সমালোচন করিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু এত ব্যাখ্যার কিছুই প্রয়োজন নাই। মানবের সুকর্ম্মপথে যে প্রতিব্যতিক্রম, তাহার নাম পাপ। পুণ্য যাহা তাহা সত্য ও নিত্যপদার্থ; সুকার্য্যরূপ দ্বার দিয়া তাহা মানবীয় সৃষ্টিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই পাপ ও পুণ্য, দেশ ও কালভেদে, কর্ম্মশক্তির গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে, গুরু বা লঘু আকার ধারণ করিয়া থাকে;—লঘু কর্ম্মশক্তির ব্যতিক্রমে লঘু পাপ, গুরু কর্ম্মশক্তির ব্যতিক্রমে গুরু পাপ। কিন্তু ইহারা আকারে গুরু বা লঘু হইলেও, প্রত্যেকে পূর্ণমূর্ত্তি বটে, যেমন চক্র ছোট হউক বা বড় হউক প্রত্যেকেই যে পূর্ণ অবয়বে চক্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে জীবনের কেবলমাত্র মিথ্যা ও অনিত্য পদার্থ অবলম্বন, তাহা ক্রমে সেই মিথ্যা ও অনিত্য পরিণামেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

অনেক অজ্ঞান মানব ঠিক পায় না যে কর্ম্মক্ষেত্র বা কতখানি ও যথানীতি যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি সাত্বিক শ্রমশীলতাই বা কাহাকে বলে। অনেকে আশঙ্কা করে যে, হয় ত সেই সকল তাহাদের নিত্য ও প্রত্যাহিক সাংসারিক বা যে কোন স্বীয় আচরণযোগ্য কার্য্যসীমার অতীতে অপর কোন বস্তু বিশেষ হইবে, সুতরাং সে সকলে হস্তপ্রসারণ ও তাহার আয়ত্তীকরণ সহজে হইবার

নহে ; যাহারা ভাগ্যবান্, কেবল তাহাদিগেরই তাহা সম্ভবে, সকলের তাহা সম্ভবে না। অবশ্যই, বলা বাহুল্য যে ইহাতে শেষ ফলাকর্ষণ এই,—বাপ্ রে! সে কি আমার সাধ্য, আমি আদার ব্যাপারী আমার জাহাজের খবরে কাজ কি, আমার যেমন বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাহাই ভাল! আমাদিগের দেশে বস্তুত সাধারণ লোক মাত্রের মধ্যে এই একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে, 'যথার্থ ধর্ম্মপথ যাহা, তাহার অনুসরণ ও অনুষ্ঠান সংসার আশ্রম পরিত্যাগ ভিন্ন কোনমতেই ঘটিয়া উঠা সম্ভব নহে। সংসারে থাকিলেই অধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয় এবং সে অধর্ম্মে পাপ নাই ; অসত্য ও অধর্ম্ম সংসারের অঙ্গস্বরূপ।' কি ভ্রান্তি এবং কি বিপরীত বিশ্বাস ; বলা বাহুল্য যে এ সকল বুঝিবার ভুল? সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হয় না ; বরং সংসার আশ্রম পরিত্যাগে পুণ্য যত হউক বা না হউক, প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আরও অধিক। আমাদের দেশে এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের অধিকার-আয়তন বড় সামান্য নহে ; আমি দেখিয়াছি, এমন অনেক লোক আছে, যাহারা ইচ্ছাবান থাকিলেও কেবল এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া, অনাস্থাকে-প্রশয়নশায়ী হয় ও আপনার জীবনকে মিছামিছি ধ্বংসপথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। ভারতসন্তান, ভয় নাই, ভ্রান্তি ত্যাগে চক্ষু উন্মিলন কর, তোমার ধর্ম্মপথ ও কর্ম্মপথ তোমার হাতের উপরেই রহিয়াছে; তজ্জন্য তোমাকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না।

বাঞ্ছারাম, তোমার অবস্থা বশে, তুমি যে সাংসারিক কর্ম্মসীমার মধ্যে স্বাভাবিকবৎ আবদ্ধ রহিয়াছ এবং যাহার অতিরিক্তে যাওয়া তোমার পক্ষে এখন একরূপ অসাধ্য বলিয়া বুঝিতেছ ; তুমি ভ্রম ক্রমে বুঝিতে পারিতেছ না বটে, কিন্তু তাহাই আপাতত তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা। সেই ক্ষেত্রসীমা অবলম্বনেই যথাশক্তি সাত্বিক শ্রমশীলতায় কর্ম্মারম্ভ কর ; দেখ তাহার পর, তাহাতে তোমাকে কোথায় লইয়া যায়। সত্য বটে, সেরূপ সীমা অতিক্রম করিয়াও যাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের 'বিস্তার, সেরূপ লোক কতকাংশে এ জগতে দুর্লভ এবং লোকেও সাধারণত সেরূপ লোককে ক্ষণজন্মা ব'লয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু কে সেরূপ ক্ষণজন্মা, কে সেরূপ ক্ষণজন্মা নহে, তাহাত সহসা বুঝা যায় না এবং ক্ষণজন্মা যে, সে নিজেও হয়ত তাহা

প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে না। অতএব কে সেরূপ ক্ষণজন্মা, কে সেরূপ ক্ষণজন্মা নহে, তাহা যদি সত্য সত্যই বুঝিতে চাও, তাহা হইলে মানবের সেই উপস্থিত কর্ম্মক্ষেত্রকেই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনপূর্ব্বক, তাহাতে যথাসাধ্য কর্ম্মরত হওয়া বিধি; কারণ কেবল কর্ম্মেই কর্ম্মের বিস্তার; কর্ম্মারম্ভ ও কর্ম্মযোগেই কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন বিকাশ ও পরিচয়; এবং কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারণ সম্ভব হয়। অতএব ক্ষণজন্মা হউক, অক্ষণজন্মা হউক, যখন সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম্ম,—তখন প্রত্যেকে যে অবস্থাচক্রে পতিত ও যে অবস্থাচক্র অতিক্রম করা আপাতত তাহার পক্ষে অসাধ্য এবং সে তদবস্থায় যেরূপ কর্ম্মের আয়োজন ও উপকরণ আদি সংগ্রহ করিতে পারগ, তাহাকে সেইরূপ কর্ম্মই করিতে দেও; যেহেতু সেই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ও তাহাই তাহার কর্ম্মক্ষেত্রস্থ উদ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। সেই কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মের অবলম্বন দ্বারা সে, ক্ষণজন্মা হইলে, ক্ষণজন্মা ভাবেও পূর্ব্বসীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে; আবার যদি ক্ষণজন্মা না হয়, তবে অক্ষণজন্মাভাবেও যথাসীমাতে আপন জীবনের সফলতায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ও কর্ম্মহেতু ইহলোক পরলোক উভয়ত্র যথোপযুক্ত পুরস্কার লাভেও সমর্থ হইতে পারে। মনে কর,—কোন ব্যক্তিকে সংসারস্থলীতে পড়িয়া, সময় ও অবস্থাগুণে বা যে কোন কারণে, কেবল চাষ কর্ম্ম ও হল চালনে রত হইতে হইয়াছে। এরূপ লোকের পক্ষে, যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি এবং সৎভাবে ও প্রাণপণে চাষ কর্ম্ম ও হলচালন করাতেই তাহার কর্ম্মের সার্থকতা এবং তদ্দ্বারাই সে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকে, পুরস্কারের ভাগী হইতে পারে। ফলত, দেখা যাইতেছে যে কেহ বা কেবল লাঙল চালাইয়াই স্বীয় জীবনের সফলতা প্রাপ্ত হয়; আবার কেহ বা সর্ব্বস্বান্তে উচ্চ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াও সফলতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার কারণ আছে। একজন হয় ত, তাহার হলচালনা কার্য্য যথানীতি যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিয়াছে; আর এক জন হয় ত, সর্ব্বস্বান্তে যে উচ্চ ব্রত, তাহাতে ব্রতী হইলেও, তাহার কার্য্যে যথানীতি যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি সাত্ত্বিকশ্রমশীলতার কোনরূপ বা কিয়দংশ অভাবে, সফলতার ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। কার্য্যমাত্রে তদ্রূপ কার্য্যসাধক গুণগুলির (অর্থাৎ যথানীতি যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি

সাত্ত্বিক শ্রমশীলতা প্রয়োগের) পূর্ণবিকাশ ও তাহাদের চালনার জন্য, আত্মপবিত্রতা সুতরাং সদাচার প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। আত্মপবিত্রতা ভিন্ন, সাত্ত্বিকতায় পূর্ণত্ব আইসে না। আত্মপবিত্রতা সদাচার হইতে; সদাচার নীতি হইতে নীতি ; ঈশ্বর পরায়ণতা হইতে হয়। ইহা ধ্রুবনিশ্চয় যে, আত্মপবিত্রতার পরিমাণ অনুসারে, কর্ম্ম-সফলতা-সাধক গুণগুলিরও বিকাশ ও পুষ্টতা এবং কর্ম্মসফলতারও পরিমাণ নির্ণয় হইয়া থাকে। একটি অপরের অনুসরণ করে; একটি আসিলে, আর সকল গুলিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিতে হয়। উক্তবিধ আত্মপবিত্রতা সহ যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি যে কর্ম্মনিয়োজন, তাহাকেই স্ব-নিহিত বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি বলা যায়। তদ্ভিন্ন বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির অপর কোন অর্থ নাই। পুনশ্চ, 'মানবে যত প্রকার উপাধিবিশিষ্ট শক্তি আছে, সে সমস্তেরই সার্থকতা থাকা অত্যাবশ্যক বিধায়, তাহাদের সকলেরই সম্যক্ প্রয়োগ চাই' ;—একথা বলিলে এমন বুঝায় না যে উপাধিবিশিষ্ট সকল শক্তিরই এ জীবনকালের মধ্যে অন্ততঃ একবার, অথবা একে একে, অথবা একইকালে যুগপৎ প্রয়োগ বা তথাবিধ কিছু করিতে হইবে। ফলতঃ যে কোন আরব্ধ কার্য্যবিশেষে, তৎ সমধর্ম্মী ঔপাধিক শক্তিবিশেষের অবশ্যই পূর্ণ প্রয়োগ চাই এবং তাহা হইলে, অপরাপর ঔপাধিক শক্তিগুলিও আপনা হইতে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাহার সহকারী হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই ঔপাধিকশক্তিগুলির সার্থকতা সাধিত হয়। পুনশ্চ, কোন গুরুতর কার্য্যানুরোধে কোন সামান্যশক্তি, প্রয়োগের অপ্রয়োজন হেতু তাহা চালিত না হইলেও, তাহাতে কোন দোষ হয় না ; কিন্তু ক্ষুদ্র কার্য্যানুরোধে, গুরুতর কার্য্যসাধক শক্তি যদি পরিত্যক্ত ভাবে পড়িয়া থাকে, তাহাতে সমূহ প্রত্যবায় আছে। এরূপ বিবেচনায় শক্তি প্রয়োগেরই নাম, স্বনিহিত শক্তি সকলের সম্যক ব্যবহার বলা যায়।

এখন দেখ, লাঙ্গল চষা পর্য্যন্তে যখন কর্ম্মের সার্থকতা আছে, তখন মানবকে কর্ম্মানুসন্ধানে অধিক ভাবিবার ত বিষয় কিছুই নাই। সকলেই, অন্তত স্বীয় স্বীয় জন্মজন্য প্রাপ্ত কর্ম্মক্ষেত্রকে মাত্র অবলম্বন করিয়া, কর্ম্ম আচরণের দ্বারা আত্ম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহার বৃহৎক্ষেত্র ও বৃহৎ শক্তি, সেও যেমন সার্থকতার ভাগী, যাহার ক্ষুদ্র ক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র শক্তি,

সেও তেমনি সার্থকতার ভাগী হইতে পারে। কিন্তু এক কথা, যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি কাহাকে বলে, তাহা একটু বলা উচিত। বাপুরাম, বিশ্বাস করিবে কি, আদি মানবের আদিম কর্ম্মক্ষেত্র যদিও অতি সামান্য ও অতি ক্ষুদ্র আয়তন ছিল বটে, কিন্তু তথায় এই 'যথাবুদ্ধি' ও 'যথাশক্তি' গুণ চালনা হেতুই, মানব বন্য অবস্থা হইতে এই উন্নত সভ্য অবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছে। আবার দেখ, তাহারই আংশিক অভাব হেতু, ভারতীয়েরা এখন পূর্ব্বাবস্থা হইতে কতই না অধম অবস্থায় পতিত হইয়াছে। যাউক, এখন ঐ জিনিস দুটা কি তাহা দেখা যাউক।

যে কোন কাজ করিতে হইলে, তাহার জন্য পরিশ্রম দ্বিবিধ প্রকার আছে, এক শারীরিক, অপর মানসিক। কোন্ কার্য্য কিরূপ করিলে কিরূপ দাঁড়াইবে, কিরূপ করিলে ভাল হইবে, কিরূপ করিলে মন্দ হইবে এবং কিরূপ করিলে কার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা তাহার উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে; তাহার পর এতৎ সূত্রে আরও অপর কোন্ কোন্ নূতন কার্য্যের পন্থাদি পরিষ্কার বা অপরিষ্কার হয়, দোষ বা অদোষ যুক্তই বা কিসে হয়, এই সকলের যে সম্যক্ অবধারণা তাহার নাম মানসিক শ্রম। যে যে বিষয় মন্দ এবং অবনতি ও অপূর্ণতা বিধায়ক, তাহার যথাসাধ্য পরিহার করণ; যে যে বিষয় ভাল এবং উন্নতি ও উত্তর পরিণাম বিধায়ক ও পূর্ণতা সাধক, তাহার যথাসাধ্য অবলম্বন ও অনুসরণ; এবং আরব্ধ কর্ম্মে দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় ও উৎসাহ চালন, মানসিক শ্রমের মধ্যে এই সকলকেই 'যথাবুদ্ধি' গুণ কহা যায়। তাহার পর শারীরিক শ্রম। মানসিক শ্রমের কার্য্য যাহা তাহা বলিলাম; সেই মানসিক শ্রমফল, উপকরণ যোগে শরীরের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করাকে, শারীরিক শ্রম বলে। শারীরিক শ্রমে শরীরকে সম্যক্ নিয়োজন করার নামই 'যথাশক্তি' গুণ। সম্যক্ অর্থে প্রয়োজনীয় শারীরিক শক্তি সকলের সামঞ্জস্য সাধন পূর্ব্বক, যথাবশ্যকীয় ভাবে তাহাদের সম্পূর্ণত নিয়োজন। যে তদ্রূপ যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি মন এবং শরীর নিয়োগে হেলা করে, তাহাকে তৎ পরিমাণ অনুরূপ 'যথাবুদ্ধি' ও 'যথাশক্তি' গুণের ব্যত্যয়-কারী বলিয়া, প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে শারীরিক ও মানসিক, দুই প্রকারেই, ত্রুটি হেতু প্রত্যবায়ের ভাগ আছে;

কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটু বিশেষ আছে। শারীরিক শ্রমের হেলায়, কার্য্যের কেবল শারীরিক ভাগই ব্যতিক্রম যুক্ত হয় মাত্র এবং সে ব্যতিক্রমও অতি সহজে সুধারাইতে পারা যায়; কিন্তু মানসিক শ্রমের হেলায়, কার্য্যে মানসিক ও শারীরিক (যথাশক্তি শ্রম করিলেও), উভয় ভাগেরই ব্যতিক্রম ঘটনা হইয়া থাকে এবং সে ব্যতিক্রম সহজে সুধরাইতে পারা যায় না। শরীর মনকেই অনুগমন করিয়া থাকে; এবং পরিদৃশ্যমান কার্য্য সকল মানসিক বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া বিশেষ বা কল্পনারূপের বাহ্যপ্রচারস্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে, শারীরিক শ্রমের ব্যত্যয়ে কেবল একদিক মাত্র পণ্ড; কিন্তু মানসিক শ্রমের ব্যত্যয় হইলে, সকল দিকই পণ্ড হইয়া থাকে। সুতরাং মানসিক শ্রম চালনার ন্যূনাতিরেকেই বেশী পাপ বা পুণ্যের আশঙ্কা করিতে হয়।

আরও একটু বিশদ করিয়া বলা যাউক। মনে কর, এক ব্যক্তির লাঙ্গল চষাই কার্য্যসীমা। এমন স্থলে তাহাকে প্রাণপণে যথা যোগ্য লাঙ্গল চষিতে দেখিলে, অবশ্য সেখানে তাহার কার্য্য পক্ষে আপাতত সার্থকতা বলিয়াই বলা যায়। কিন্তু যদি সে মনুষ্যের আরও খেলাইবার যোগ্য এমন বুদ্ধি থাকে যে, যথারীতি লাঙল চষার মধ্যেও সে চেষ্টা করিলে সাধারণ অপেক্ষা ভাল লাঙল চষিয়া ভাল ফল উৎপন্ন করিতে পারে, বা নিজ লাঙলেরই এমন কোন উন্নতি সাধন করিতে সমক্ষ হয় যাহা চলিত অপেক্ষা ফলপ্রদ; অথচ সে যদি তাহা না মনে, না কাজে, না উভয়ত, কিছুই না করে এবং কেবল অলসে তাহার সে ক্ষমতার অপলোপ বা বিকৃতি সাধন করিতে থাকে; তাহা হইলে তখন আর সেখানে তাহার কার্য্যক্ষেত্রের কার্য্যে কখনই সম্যক্ সার্থকতা বলিব না। হইতে পারে সে যথাশক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে যথাবুদ্ধি প্রবৃত্ত হওয়া যাহা, তাহা সে হয় নাই। যথারীতি পুরা লাঙল চষিলেও, আত্মশক্তির সম্যক্ চালনার ব্যতিক্রম করিতেছে বলিয়া, সে ব্যক্তি যে অত্যন্তই প্রত্যবায় বা পাপের ভাগী, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পুনশ্চ, সেইই ব্যক্তি যদি আবার লাঙল চষার অপেক্ষাও কোন উন্নত কার্য্যের জন্য পারগ হয় এবং দেশ কাল পাত্র সকলই যদি সে পক্ষে তাহার অনুকূল থাকে, বা তাহার বুদ্ধি-আয়তন-সাধ্য অল্প চেষ্টাতেই অনুকূল হইতে

পারে, অথচ সে ব্যক্তি যদি তাহা না করে; তাহা হইলেও, সে ব্যক্তি সেইরূপ অত্যন্ত পরিমাণে প্রত্যবায় বা পাপের ভাগী হইয়া থাকে। সহস্র জপ তপ উপাসনাদি সে যাহাই করুক, কিছুতেই তাহার সে পাপের ক্ষালন হয় না। যতক্ষণ সে সেই কার্য্যে আবার যথাসাধ্য প্রবৃত্ত না হইবে; বা যতক্ষণ অপর কোন উপযুক্ত কার্য্য বিশেষে তাহার তথা পরিমাণে শক্তি প্রযুক্ত না হইবে, ততক্ষণ তাহার পাপ হইতে কখনই নিষ্কৃতি নাই। কর্ম্মস্থলে যথাবুদ্ধি পরিশ্রমের প্রবর্ত্তনা নিমিত্ত, সাময়িক সুযোগানুরূপ যথোপযুক্ত শিক্ষার একান্ত আবশ্যক। শিক্ষা ভিন্ন, শরীর ও মন উভয় ভাগে ঈশ্বর যে কিছু শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তাহা যথোপযুক্ত রূপে পরিচিত, স্ফুরিত ও কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। শিক্ষালাভ করাও একটা মহাকর্ম্মের প্রস্তুতিস্বরূপ বটে। অতএব শক্তি ও সুযোগ উভয় থাকিলেও, যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে না, তাহাকেও কর্ম্মক্ষতি জন্য অনুরূপ পাপে পাপী হইতে হয়। শিক্ষায় শক্তি সকলকে স্ফুরিত করে; নীতিতে কর্ম্মসদসদ্ বোধ করায় এবং সাত্বিকতা কর্ম্মস্থলে ফাঁকি ও গোঁজা মিলানের চেষ্টা নিবারণ করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মতত্ত্ব।

অতঃপর আবার পুনরুক্তি স্বরূপ বলিতেছি যে, মনের শ্রমসাধ্য ভাব যতদূর, শরীরের শ্রমসাধ্য ভাব যতদূর, এই উভয় সাধ্য ভাব একত্র করিয়া মানব যতক্ষণ তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিবে, ততক্ষণ তাহার কর্ম্মস্থলীতে পূর্ণ সার্থকতা ও পূর্ণ পুণ্যবানতা কখনই আসিবে না। এইরূপ করিবার জন্য ও তাহার করণযোগ্য কর্ম্ম উদ্বোধনের নিমিত্ত, মানবকে যে বিশেষ ভাবিয়া আকুল হইতে হয়, তাহা নহে। কার্য্য বিশেষের প্রতি মনের যে আনতি ও স্বাভাবিকী যে আকাঙ্ক্ষা এবং সেই কার্য্য অন্যের অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে যে সম্পাদন করিতে পারি এই যে ধারণা, ইহারাই কর্ম্মস্থলে করণযোগ্য কর্ম্ম নিরূপিত এবং শারীরিক ও মানসিক উভয় শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবান সে, যে সেই আকাঙ্ক্ষাদির দেখা প্রাপ্ত হইয়াও চিনিতে পারে না, বা তাহাদের উদ্দেশ্য ও তাড়না অবহেলা করিয়া থাকে। জানিও, কথিত আকাঙ্ক্ষাদি ও যথোক্ত ধারণা ক্রিয়া—এ সকলের ক্রীড়া হইতেই জগৎ

এতদূর উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কর্ম্মই মনুষ্য জীবনের একমাত্র সার পদার্থ ও শ্রেষ্ঠ পরিণামোপায়; বাচিক উপসনাদি নহে। বাচিক পাসনাদি যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মনুষ্য কেবল বচনবাগীশ হইয়াই জন্মিত, এরূপ নানা কর্ম্মশক্ত্যাদি লইয়া জন্মিত না। ঈশ্বর কাহাকেই কোন বিষয় বৃথা অর্পণ করেন না এবং প্রকৃতিও বিনা অভিপ্রায়ে কোন পদার্থকে উদ্ভাসিত হইতে দেয় না।

এ জগতে কোদালপাড়া হইতে ঋষির বেদগান বা জ্যোতিষীর আকাশ দর্শন অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্করণ, কোন কার্য্য ও কাহারও কার্য্য, হেয় নহে। এ বিশ্বস্থলীতে, এ ক্রিয়াব্রহ্মাণ্ডে, সকলেই আদরের এবং সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। অতি উচ্চদরের না হইলেও, স্ব সীমান্ত মধ্যে, শারীরিক ও মানসিক শক্তি চালনার অন্তিম সীমা সৈনিক পুরুষে। জীবনান্ত যাহার কার্য্যের পরিণাম, তাহার অপেক্ষা শক্তি চালনার উচ্চতম সীমা আর কি হইতে পারে? এ জগতে সৈনিক পুরুষের যে এত আদর, এত নাম, তাহার যথার্থ কারণ এই। কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে ইহাও এক শ্রেণীস্থ চূড়ান্ত কর্ম্ম, সুতরাং ইহার জ্যোতিঃ বিস্ফুরণ হেতু যশ-বিস্ফুরণও এরূপ চূড়ান্ত এবং এই জন্যই জগতে তাহা এতটা ধ্বনিত হয়; নতুবা তাহাদের কার্য্য কেবল মানুষ মারা ও ডাকাতি করা বলিয়া ধরিলে, সে কার্য্যের কি কখনও এতটা সমাদর ও মান সম্ভব হইত? এই কর্ম্ম বিশেষে একদিকে মানবের সাক্ষাৎ জীবন লইয়া খেলা; অপর দিকে আত্মরক্ষার বৈপরীত্য সমাবেশ হেতু, আরব্ধ কার্য্যে মানসিক ও শারীরিক উভয় শক্তিরই চূড়ান্ত বিকাশ হয়। এই জন্যই গূঢ়জ্ঞ হিন্দু ঋষি, সম্মুখ সমরশায়ী যোদ্ধার পক্ষে একেবারে সকল পাপের নিষ্কৃতি ও মৃত্যু অন্তেই কর্ম্ম পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গারোহণ অনুভব করিয়া, তদনুরূপ অভিপ্রায় ও ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই বটে, কেবল সম্মুখ যোদ্ধারই অক্ষয় ও অবিলম্ব স্বর্গ; যেহেতু আরব্ধ কার্য্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের ন্যূনতা ব্যতীত, কখন রণে পৃষ্ঠ দেওয়া সম্ভবে না, অথবা পূর্ণতা ব্যতীত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্তিও ঘটে না। উহাই পুরুষার্থ এবং সত্য; উহাই পুরুষার্থ এবং সত্য।

ইতি মানবীয় কর্ম্ম।

স্বস্তি নিত্যম্।

১২৮৬।

ইংরাজী ভাষায়, কার্লাইলের * গ্রন্থাবলীর তুল্য, আধ্যাত্মিকতা ভাবপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থাবলি আর নাই। কিন্তু কার্লাইলের পুস্তক সমূহ, বিশেষতঃ সার্টর্ রিসার্টস্, উৎপত্তি মাত্রেই পাঠকমণ্ডলীতে অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আদৃত হইতেছে। ইহাদিগের যথোচিত সম্পূর্ণ সমাদর প্রাপ্ত হইতে এখনও বহু দিবস গত হইবে। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ভৌতিকতা ও নাস্তিকতার কুহক ভেদ করিয়া, কিরূপে উর্দ্ধে উত্থান করিতে হয়; মনুষ্য-জীবনের মহত্ত্ব কতদূর ও তাহার উদ্দেশ্য কি; সত্যের নিত্য-ভাব ও অসত্যের নশ্বরতা এবং কার্য্যসদসৎ ভেদে তাহাদের ফল কিরূপ অখণ্ডিত অব্যর্থভাবে আমাদিগের জীবনের সর্ব্ব কার্য্যেই অবশ্য ফলিত হইয়া থাকে; কিরূপেই বা চিত্তের বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, এই জগৎক্ষেত্রে স্রষ্টার নিয়োজিত কর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক, জীবনের যাথার্থ্য সম্পাদন করিতে হয়; ইহা যাহার ইংরাজীতে ও ইংরাজী ধরণে জানিতে ও শিখিতে বাসনা হইবে, আমি তাঁহাকে কার্লাইলের গ্রন্থ সমূহ, বিশেষতঃ সার্টর্ রিসার্টস্, চিন্তার সহিত ও মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বারম্বার পাঠ করিতে উপদেশ দিই। এ পৃথিবীর কোন বস্তুই নির্দ্দোষ নহে, সুতরাং কার্লাইলের রচনা সমূহও যে দোষশূন্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য। কার্লাইলের লেখার যে দোষ, তাহার পরিহার উপায় কার্লাইলের পাঠকেরা কার্লাইলের লেখা হইতেই শিক্ষা করিতে পারিবেন; সুতরাং তজ্জন্য অপর-কৃত সাবধানতার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই।

এক সময়ে আমার এরূপ বাসনা হইয়াছিল যে, সার্টর্ রিসার্টসের বঙ্গ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপহার দিই। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, অপাঠ্য কাব্য-নাটক-প্লাবিত বঙ্গে সে কল্পনা বৃথা। তবে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে পারিলে একরূপ হইতে পারে, কিন্তু আমার তত রঙ্গও লাগে নাই এবং ততদূর দেশহিতৈষী আজিও হইতে পারি নাই। যাহা হউক, বাঞ্ছারাম, ঐ সার্টর্ রিসার্টস্ হইতে, অদ্য এস্থলে কিঞ্চিৎ অবিকল অনুবাদ করিয়া তোমাকে উপহার দিব। ভাল লাগিবে কি?

---

* সময়ান্তরে এই মহাপুরুষের গ্রন্থাবলীর সবিস্তার সমালোচন করিবার ইচ্ছা রহিল।

সার্টর্ রিসার্টস্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। নবম অধ্যায়।

বিস্ময়-আপ্লুত চিত্তে ত্যুফেল্‌সড্রক্ (Tuefels droch) কহিতেছেন,—"গহন কান্তারে প্রলোভন-প্রতারণা বিস্তার, কথা কি যথার্থ! আমরা এই সংসারক্ষেত্রে সকলেই কি সেই প্রলোভন-প্রতারণা যোগে পরীক্ষিত হইব না? মনে করিও না যে, সেই বৃদ্ধ আদম্ যে বংশানুক্রমে তোমাতে বর্ত্তমান এবং যাঁহার রক্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে তোমার ধমনীতে বহিতেছে, সহজে তাহাকে স্বাস্থ হইতে বিদূরিত বা অধিকারচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে। আমাদিগের এই জীবন প্রয়োজনজালে বেষ্টিত; অথচ এই জীবনের অর্থ ধরিতে গেলে, উহা স্বাস্থবশ্যতা এবং স্বেচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং আমরা এই সংসারে অনন্ত সংগ্রাম রত, বিশেষতঃ জীবনের প্রথম যাত্রায় এই সংগ্রাম কূটতর আকার ধারণ করিয়া থাকে। 'সুকাজে কার্য্যনিরত হও,' এই যে ঈশ্বরকৃত আজ্ঞা, যাহা আমাদিগের এই হৃদয়পটে অপৌরুষেয় উপাংশুময় প্রমথীয় অক্ষরে গুহ্যতম ভাবে লিখিত রহিয়াছে; যতক্ষণ আমরা তাহার রহস্য ভেদ এবং তদনুগমনে অগ্রসর না হইব এবং যে পর্য্যন্ত আমাদিগের কার্য্যযোগে তাহা পরিদৃশ্যমানভাবে স্বাস্থবশ্যতা ঘোষক স্বয়ম্ভূবাক্যরূপে কার্য্যে পরিণত না হইবে, তাবৎকাল তাহার হস্তে রাত্রি দিবা ক্ষণমাত্রের জন্যও শান্তির প্রত্যাশা নাই। পুনশ্চ, অন্যদিকে আবার 'খাও এবং উদর পূর্ত্তি কর,' এই পার্থিব আজ্ঞা, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে পর্য্যন্ত ঘোষিত হইয়া, মোহময় আকর্ষণীশক্তি বিস্তার করিয়া যখন আত্মঘোষণ করিতেছে; তখন যে এ জীবনকার্য্যে সুনীতির জয় সাধনের পূর্ব্বাহ্নে, বিপ্লব, কলহ, সংগ্রাম, এ সকল কাহার সাধ্য এড়াইতে সমর্থ হয়?

"আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, যখন এই ঈশ্বরকৃত আজ্ঞা মনুষ্য-সন্তান বিশুদ্ধ হৃদয়ে দৈবোদিতভাবে প্রথম প্রচারিত হয়; এবং যখন সেই পার্থিব অনুজ্ঞার নিকট, হয় জিত নতুবা নির্জ্জিত হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তখন যে তাঁহাকে আত্মিকভাবে ঘোর নিদারুণ কান্তারে

নীত হইয়া প্রলোভক মহামোহকে পরাস্ত, বিদূরিত এবং তুচ্ছে নিক্ষেপণ পর্য্যন্ত, তাহার সহ সম্মুখীন হইয়া ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক আর কিছুই হইতে পারে না। উহাকে যেরূপ নামে ইচ্ছা নামিত করিতে চাও কর। এই ঘোরকান্তার, তাহা তোমার উপলবালুকাপূর্ণ প্রাকৃতিক মরুস্থলই হউক, অথবা নীচতা এবং আত্মম্ভরিত্বের প্রতিরূপ জনপূর্ণ নৈতিক মরুকেই তৎপদস্থ কর; তথায় সয়তান সাক্ষাৎদৃশ্যমানই হউক বা অদৃশ্য রহুক; তৎসহ এরূপ প্রলোভন-সংগ্রামে আমাদিগের সকলকেই একে একে যথা নির্দ্দিষ্ট রূপে নিয়োজিত হইতে হইবে। যদি না হই, তাহা আমাদিগের দারুণ দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিও! যাহার হৃদয়ে সেই ঐশ্বরিক লিপি স্বচ্ছন্দ সৌরকর রূপে, সর্ব্বান্ধকারহন্তা ভাবে আজি পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হয় নাই; সে এখনও অস্থির ক্ষীণালোকের মধ্যে সন্দেহদোদুল্যমান হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিতেছে। অথবা যে একান্ত পার্থিব ব্যাপাররূপী তমসাচ্ছন্ন হইয়া, যন্ত্রবিধা ভাবে দুঃখাভিঘাতে লীন হইয়া যাইতেছে, তাহার তুল্য দুর্ভাগ্যবান আর কে হইতে পারে; মনুষ্যসমূহে সে অসম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ মনুষ্য পদে বাচ্য। নাস্তিকযুগবাহিনী এই বিস্তারময়ী পৃথিবীই আমাদিগের পক্ষে এখন সেই কান্তারভূমি; এতকাল ধরিয়া আমরা যে অনাহারে এবং অনুতাপে বর্ষানুক্রম অতিক্রম করিতেছি, ইহাই আমাদিগের চত্বারিংশৎ দিবস। কিন্তু এ সকলেরও সীমা আছে, ইহারাও সময়ে তিরোহিত হইয়া থাকে। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আমিও, জয় না হউক, অন্ততঃ আমি যে সংগ্রামলিপ্ত তত্ত্ববোধন এবং যাবৎ এ জীবন বা মনীষা শক্তি তিষ্ঠিবে তাবৎ তাহাতে দৃঢ়সঙ্কল্প স্থাপন, এতদুভয় হইতে বঞ্চিত হই নাই। ইহাও এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি আপাততঃ যদিও এই কর্কশ শব্দ, বিকটদৃশ্য, প্রেতনিবাসিত মোহকান্তার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি বটে; কিন্তু তেমনি এ শক্তিও আমাকে প্রদত্ত হইতে ক্রটি হয় নাই যে, যাহার সঞ্চালনে এই ক্লিষ্টতম হইতে ক্লিষ্ট এবং শ্রান্ত ভ্রমণাবর্ত্তনান্তর; সেই পর্ব্বত,যাহা শৃঙ্গসীমান্তশূন্য, বা যাহার সীমা কেবল উচ্চরাজ্যেই সংলগ্ন হইয়াছে, তাহার সেই উচ্চতর সৌরকরবিহসিত শোভনতম সানুদেশে পথ নিরূপণ এবং তদারোহণে সমর্থ হইতে পারি।”

তিনি আরএক স্থানে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ শ্লেষাত্মক বাক্যে এরূপ লিখিতেছেন। বলা বাহুল্য যে শ্লেষাত্মক বাক্যই এ লেখকের একরূপ দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ।— "তোমার এই সমকালীয় মানবমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল অহংপূর্ণ মানব দেখিয়া আসিতেছ, ভাবিয়া দেখ তোমারও এই জীবন কি এক সময়ে তদনুরূপ ছিল না? উহা কি? হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যৌবনসুলভ নবাঙ্কুরের অযথা বিস্তার মাত্র;—সারপূর্ণ পতিত ক্ষেত্র যদৃচ্ছা উদ্ভিজ্জপূর্ণ হইবার ন্যায়; ওষধিও যত, ঘাসও তত। জানিও এই যদৃচ্ছা সংঘটিত উদ্ভিজ্জ ঘটা, বাহিক এবং আভ্যন্তরিক শ্রদ্ধাশূন্যতারূপী অনাবৃষ্টি তেজে দগ্ধ এবং নষ্ট হইয়া, কায়িক এবং মানসিক, উভয়ত নৈরাশ্য রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই নৈরাশ্য বারংবার সংঘটিত হইলে, তাহা হইতে সন্দেহের উৎপত্তি; ক্রমে সন্দেহ আসিয়া নাস্তিকতায় দৃঢ়ীকৃত হয়। কিন্তু যদি আমি কখনও আবার এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিতে পারি, তখন দেখিতে পাইবে আমার এই ক্ষেত্র কেমন হরিত শোভাপূর্ণ, আমার রোপিত বৃক্ষ কেমন ছায়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে এবং কেমন তাহার ছায়ায় বসিয়া সন্দেহরূপী সকল তাপদহনকেই উপহাস করিতে সমর্থ হই। এখানে আমি ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিই যে, এ পথে আমি একা নহি, দৃষ্টান্ত শূন্য নহি, আমার পূর্ব্বেও অনেকে এই পথ বাহন করিয়া গিয়াছে।"

এখন দেখা যাইতেছে যে ত্যুফেল্সড্রকের চিত্তেও, এক সময়ে এইরূপ গুড় চিত্তবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহাকেও, ইঁহার উপদেষ্টৃত্ব এবং প্রচারণ কার্য্যে (ইহার কর্ত্তব্য ও কৃতকার্য্যকে এই রূপেই অভিহিত করা যায়) প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বোধশূন্য ভাবে ছায়ানুসরণ এবং তদাকৃষ্টভাবে তদভিগমনরূপী, গহনকান্তারে প্রলোভন-প্রতারণা রূপ পরীক্ষা যোগে পরীক্ষিত এবং বিশুদ্ধ হইতে হইয়াছিল; প্রলোভন-প্রতারণা এক্ষণে পরিক্রান্ত, সয়তানও বিধ্বস্ত, নির্জ্জিত এবং বিদূরিত হইয়াছে। ভাল! সেই পারিস্ নগরীর রাজপথে, যে সময়ে সয়তান তাহার কর্ণে কর্ণে কহিয়াছিল যে, 'আমার উপাসনা কর বাঁচিবে, নতুবা এই সংসার-ক্ষেত্রে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব,' এবং যখন তিনি তাহার উত্তরে 'দূর হ সয়তান' বলিয়া সগর্ব্বে তাহাকে তাড়না করিয়াছিলেন; তবে কি

সেই সময় হইতেই তাঁহার এই যুদ্ধভাগ্য প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল? অদ্ভুত ত্যুফেল্‌স্‌ড্রক, তোমার এই অদ্ভুত কাহিনী যদি একটু সাদা কথায় বলিয়া যাইতে! কিন্তু সে আশা বৃথা! এই পর্ব্বত-প্রমাণ দপ্তর রাশির মধ্যে তজ্জন্য যতই চেষ্টা কর, সমস্তই বিফল। যেখানে খুজিবে, হয় ইঙ্গিত, নয় খেয়াল, নতুবা শ্লেষ, ইহাতেই সকল কাগজ পূর্ণ;—কোথাও ছায়া প্রতিরূপ, কোথাও খেয়াল বিকম্পন, কোথাও বা ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ উপদেষ্টৃ-অনোচিত বচন-প্রবাহ; কিন্তু যে ধারাবাহিক যুক্তিগ্রথিত কোন বিষয়ের প্রতিরূপ, তাহা কোথাও পাইবার যো নাহি। এতৎপক্ষে তিনি এক স্থানে শ্লেষ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "মনুষ্যআত্মার মধ্যে যে সকল বিষয় যাতায়াত করিয়া থাকে, তাহা কেমন করিয়া, কোন্ রঙের দ্বারা চিত্রিত করিয়া তোমার স্থূলেন্দ্রিয় চক্ষু সমক্ষে ধরিব; অথবা তোমার এই উদরবৃত্ত সময়ে এমন কোন্ শব্দ প্রচলিত আছে যে তদ্দ্বারা দুরূহ-তম কথাতীত বিষয়কেও কথনায়ত্তে আনিতে পারা যায়।" ভাল! তাহাই হউক, আমরাও ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করি, সময় যেন উদরবৃত্ত হইল হউক, কিন্তু বাপু তোমার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল যে, তুমি কথায় কথায় কতক পেটে, কতক মুখে, এরূপে অনাহত অন্ধকারে ফেলিয়া, সেই সময়কে হাবুডুবু খাওয়াইতে অগ্রসর হও? ফলতঃ আমাদের এই অধ্যাপক শুদ্ধ কেবল অপরিজ্ঞেয় গূঢ়গুহ্য লইয়া থাকেন না, খেয়ালগিরিতেও অদ্বিতীয়। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ এখানে এমন অপরিজ্ঞেয় কূট আবরণে আত্ম আব-রিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, দেখিতে দেখিতে চক্ষে ধাঁধাঁ জন্মিয়া যায়। যাহা হউক, অতঃপর ইহার উত্তরোত্তর বিষয়ের আভাস গুলি, এখানে অবিকল উঠান যাইতেছে, পাঠকবর্গ যাহার যেমন দৌড় আপন আপন অর্থ আপনি করিয়া লইবেন।

তিনি কহিতেছেন "যে মরু-তপ্ত দুর্দ্দান্ত হার্মাদন বায়ুপ্রবাহ আমাতে এতদিন প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল; এবং প্রবল স্বন্ স্বন্ শব্দও বিলীন হইয়া আসিতেছে। শব্দ-বধির আত্মা এতক্ষণে তাঁহার শ্রুতিশক্তি সঞ্চালনে সামর্থ্য লাভ করিলেন। আমিও এক্ষণে আমার যদৃচ্ছা,ভ্রান্ত-ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া উপবেশ-

াত্তর, চিন্তা চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; যেহেতু আমার বোধ হইতে-ছিল যেন অদৃষ্ট প্রতীক্ষার কাল এতদিনে শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমার চিত্ত যেন কাহাকে আত্মদান করিব, কাহাকে আত্মদান করিব বলিয়া ব্যাকুল হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন পূর্ব্ব সহচরদিগকে সঙ্গবিচ্যুত করিয়া দিই এবং বলি, তুমি প্রতারক মিথ্যা আশা, তুমি দূর হও; আর আমি কখনও তোমাকে অনুসরণ করিব না। ভাবিও না যে, আর আমি কখনও তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব। তুমিও বিকট কঙ্কালমূর্ত্তি ভয়, তোমাকেও বলিতেছি, তোমাকেও আমি আর গণনায় আনিব না, তোমারও সমস্ত কেবল ছায়া এবং মিথ্যাসার মাত্র। আমি আর তোমাদিগের কুহকে ভুলিব না, আমি এইখানেই বিশ্রাম অবলম্বন করিব। আমি পথ-শ্রান্ত, জীবন-শ্রান্ত; যদি কেবল মরিবার জন্যই হয়, তথাপিও আমি এইখানে বিশ্রাম করিব; যেহেতু জীবন বা মৃত্যু আমার পক্ষে এখন উভয়ই সমান, উভয়ই আমার নিকট সমান তুচ্ছ।" পুনশ্চ কহিতেছেন, "যখন আমি এই স্থানে আমার অনাস্থাবৃত্ত মধ্যে কেন্দ্রশায়ী হইয়া সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলাম, এবং যে সুষুপ্তি নিঃসন্দেহই ঊর্দ্ধদেশিক নিয়োজন বলিয়া এখন প্রতীত হইতেছে, সেই সময়েই ঐ নিদ্রাযোগে ভীষণতর স্বপ্ন সমূহ ক্রমে ক্রমে আমার মন হইতে অপসারিত হইয়া আসিল; জাগ্রত হইলাম, দেখিলাম নূতন স্বর্গ, নূতন পৃথিবী আমার সমক্ষে মনোহর শোভায় শোভমান। নীতিমার্গ বাহনে সর্ব্বপ্রথম কার্য্য আত্মত্যাগ অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া আসিল। আমার মানস-চক্ষু উন্মোচিত এবং মানসহস্ত শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া কর্ম্মক্ষমতায় সামর্থ্য লাভ করিল।"

এই যে নিম্নে যে অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং যথায় তিনি উপত্যকাভূমে তাঁহার ভ্রমণ-দণ্ড পরিত্যক্ত ভাবে ফেলিয়া ক্লেশাপহারক নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন; এবং যে নিদ্রাজনিত বিশ্রাম হইতে সুফলও ফলিবার এক্ষণে উপক্রম দেখা যাইতেছে; আমরা যদি তদ্দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার বাসগ্রাম নিরূপক বলিয়া অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে কি নিতান্ত অসঙ্গত হয়? এ বিষয়ে আমরা কিছুই সাব্যস্ত হইয়া বলিতে পারিতেছি না, যেহেতু বর্ণনা গুলি এরূপ কূট পাগলত্ব্য ও বিদ্রূপপূর্ণ যে

তাহা হইতে কিছুই নিঃসন্দিগ্ধভাবে স্থির করিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, ত্যুকেন্ সক্রকেতে কিন্তু একরূপ অদ্ভুত দ্বৈতভাবের আশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায়;—যখন দেখিবে বাহির বাড়ীতে মধুর সেতার সঙ্গীতে মৃদু মৃদু নৃত্যামোদ চলিতেছে; তখনই আবার ভিতর বাড়ীতে চাহিয়া দেখ, দুঃখের গুণ গুণ শব্দ এবং কান্নাহাটির তুফান। এই স্থানে আমরা সমগ্র অংশই উদ্ধৃত করিতেছি।

" এই আকাশরূপী চন্দ্রাতপতলে চিন্তাচঞ্চল এবং ভাবপূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া থাকিতে কি সুন্দর!—স্থানটি উচ্চ উপত্যকা ভূমি; পর্ব্বতরাজি সম্মুখে, ঊর্দ্ধে এবং পার্শ্বে সুনীল গগণ গৃহ-আচ্ছাদন ও গৃহ-আবৃতি রূপে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; দিগ্বাহি বায়ু চতুষ্টয় চতুর্দ্দিকে প্রাবরণরূপে ঝুলিতেছে, আলম্বন-দণ্ড অবলম্বনে তাহাদের আকুঞ্চন ও বিক্ষেপ ক্রিয়া প্রত্যক্ষবৎ। এদিকে আবার গিরিদুর্গ বেষ্টিত অধিত্যকা ভূমে যে সুরম্য অট্টালিকা সকল রহিয়াছে, যথায় হরিত কপিশ পুষ্পবাটিকা এবং শ্বেতা কোমলাঙ্গী ললনা সকল পর্য্যায়ক্রমে শোভা পাইতেছে. তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখ। অথবা তথা হইতে আরও সুন্দর ঐ তৃণাচ্ছাদিত কুটীর মণ্ডপে যথায় গৃহজননী সন্তানবেষ্টিত হইয়া আহার আয়োজন করিতে রত, তথায় নেত্রপাত করিয়া লও। সকলেই যেন জড় সড় পর্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া বহির্দৌরাত্ম্য নিরাসক অধিত্যকা কুটিমে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি 'জানিও উহারা জীবন্ত; উহাদিগের প্রতি আমার এই দর্শন সঞ্চালনও যেমন সন্দেহ রহিত, উহাদিগের জীবন্ত ভাবেও তদ্রূপ। অথবা যথায় আমার এই পর্ব্বতবাস বেষ্টন করিয়া শারি শারি নয়টি গ্রাম ক্রমান্বয়ে ব্যাপৃত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, অন্ততঃ মনে মনে কল্পনা যোগেও দেখ। ইহারা পরিচ্ছন্ন দিন পাইলেই স্ব স্ব গির্জাচূড় হইতে ধাতুজিহ্ব ঘণ্টাধ্বনিতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ; এবং কি পরিচ্ছন্ন কি অপরিচ্ছন্ন প্রায় সকল দিনেই উৎক্ষিপ্ত স্তম্ভাকার ধূমরাশির দ্বারা আত্ম অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আমিও ইচ্ছা করিলে ঐ ধূমরূপী রন্ধনঘড়ি হইতে দিবামান গণনা করিয়া লইতে পারি। উহা রন্ধনধূম। স্নেহশালিনী গৃহপত্নীগণ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যার

স্বামীসন্তানাদির জন্য আহারীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সুনীল ধূমরাশি শারি শারি পর্য্যায়ক্রমে, অথবা হয়ত একত্রেই একেবারে নয়খানি গ্রাম হইতে উত্থিত হইয়া, সাধ্যানুসারে জ্ঞাপন করিয়া থাকে;—'ওগো আজি আমাদিগের এখানে এই এই দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।' ফলতঃ দৃশ্যটি কি নেহাত মন্দ! ঐ দেখ তোমার সমস্ত গ্রাম উহাদিগের যাবতীয় বিষয় লইয়া এবং প্রেমের মাখামাখি, পরকুচ্ছের হেটাহেটি, বিবাদ বিসংবাদ, কলহ কচ্‌কচি, বিলাস, কৌতুক, সকলেরই তুফান হৃদয়ে ধরিয়া; শেষে আসিয়া কেমন সামান্য পটমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে; তাই কি তুমি তোমার টুপি উলটিয়া একেবারেই সকলকে সহজে ঢাকিয়া ফেলিতে পার। এত কাল ধরিয়া, এই পৃথিবীতলে আমার অবিশ্রান্ত গতি যোগে, যদিও আমি সাংসারিক বিষয়ের কেবল অংশাণু-অংশ মাত্র খণ্ডে খণ্ডে লইয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এস্থান আবার একধারে দর্শনস্পষ্ট সার্ব্বভৌমিক উপপাদ্য নির্ব্বাচন ও তাহা হইতে যথাসম্ভব ফলাকর্ষণের পক্ষে তেমনিই উপযুক্ত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

"আমি আরও এখানে বসিয়া কতবার দেখিয়াছি, ঘোর প্রবল বাত্যা করাল কায় রোষ বিস্ফারিতশরীরে ঐ দূর প্রান্তর মথিত করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। সম্মুখে বহিঃশির নিবিড় নীল পর্ব্বতলগ্ন প্রস্তরখণ্ড, বাষ্পভারভূত ঘূর্ণাবায়ু তাহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখন আবর্ত্তন, কখন সংলগ্ন, কখন বা উন্মাদিনীর কেশজালের ন্যায় তাহাতে বিনত হইয়া পড়িতেছে। কতক্ষণে আবার চাহিয়া দেখ কে কোথায় পলাইল; তোমার নিবিড় নীল নিবিড় শ্বেত হইয়া স্মিতমুখে সূর্য্যকরে দণ্ডায়মান, যেহেতু তোমার ঐ ঘূর্ণাবায়ু এতক্ষণ তুহিনকণা বহন করিতেছিল। মাতঃ প্রকৃতি, এই বিপুল জগৎক্ষেত্রে তোমার জাগতিক কর্ম্মকুটীরে, না জানি সেই সুবিশাল কর্ম্মকটাহে কি অদ্ভুত কি অভাবনীয় ভাবেই এই অপার ভূতরাশির পরিপাচন, সঙ্কোচন ও তাহার বিস্তার সাধন করিয়া থাক। অথবা প্রকৃতিকে যে ডাকিতেছি সেই প্রকৃতিই বা কে? হায়, আমি ভ্রান্ত। ভূতেশ, ঈশ্বর, প্রকৃতিকে না ডাকিয়া তোমাকে না ডাকি কেন? প্রকৃতি কে?—তুমি না এই ভূতেশের বহির্বসন মাত্র? হরি, হরি! তবে কি সত্য সত্যই এ তিনি

সেইই, যিনি তোমারই হাত দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন; যিনি সেইরূপে তুমি আমি উভয়েতেই বাস এবং উভয়কেই স্নেহাভিভূত করিতেছেন? ("How thou fermentest and elaboratest, in thy great fermenting vat and laboratory of an atomsphere, of a world, O Nature!—Or what is nature? Ha! Why do I not name thee God? Art not thou the "Living Garment of God"? O Heavens, is it, in very deed, He then, that ever speaks through thee; that lives and loves in thee, that lives and loves in me?")

"সেই যথার্থ সত্য, এবং সকল সত্যের যাহা আদি, তাহার এই পূর্ব্বসঙ্কেতই বল, বা জ্যোতির্বিকাশের পূর্ব্বভাসই বল, গূঢ়তম অপরিজ্ঞেয় ভাবে আসিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিল। ভগ্নপোত শীতনিপীড়িত নবজেম্লাবাসীর নিকট বসন্তোদয় যেমন মধুর; ঘোর অজ্ঞাত লোকারণ্যে পথবিভ্রষ্ট রোরুদ্যমান শিশুর নিকট মাতৃকণ্ঠস্বর যেরূপ শান্তিসঞ্চালক; সেইরূপ ধীর মধুরতম স্বরলহরীপূর্ণ দেবসঙ্গীতবৎ এই সুসন্দেশ আমার চিরতাপসন্তপ্তহৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিশ্ব তবে সত্য সত্যই মৃত, ভৌতিক বা কেবল ভূতের বাসা নহে! ইহা দেবমূর্ত্তি দেববৎ, ইহা আমার পিতৃসম্পত্তি!

"এক্ষণে আমার সহচর মানববর্গকেও বিভিন্ন চক্ষে, অপার প্রেম, অপার করুণ দর্শনে দর্শন করিতে সামর্থ্য লাভ করিতেছি। হায়, ভ্রান্ত ভ্রামক, আত্মসর্ব্বস্ব, নিরাশ্রয় মানব! তুমিও কি আমার ন্যায় পরীক্ষিত, পেষিত, বেত্রবিকম্পিত হও নাই? ভ্রাতঃ তুমি রাজমুকুটেই তোমার শিরোবেষ্টন করিয়া থাক, বা ভিক্ষার ঝুলিই তোমার অঙ্গভূষণ হউক, তুমিও কি সেইরূপ ভারভূত, সেইরূপ তাপসন্তপ্ত নহ, এবং তোমারও শান্তিশয়নের জন্ত শেষ কি এই পৃথিবীতল নিরূপিত হয় নাই? হায় ভ্রাতঃ, তাই রে, কেন আমি তোমাকে আমার এই হৃদয়ে চাপিয়া তোমার চক্ষুজল মুছাইতে পারিতেছি না। ঐ যে অপার বহল স্বরসংশ্লিষ্ট মনুষ্য কলরব, যাহা আমার নির্জ্জন দেশ ভেদ করিয়াও মানস-শ্রুতি কুহরে আসিয়া পশিতেছে; এখন

দেখিতেছি, সত্য সত্যই তাহা যদৃচ্ছা সংঘটিত বাতুল কোলাহল নহে, উহা কারুণ্য পূর্ণ;—বাগ্‌বিরহিতের তাপসন্তপ্ত শ্বাস বিমিশ্রিত গদ্গদ-কণ্ঠোদ্ভব স্বরের ন্যায়, যাহা উর্দ্ধদেশ সমক্ষে ভক্ত্যনুস্থচনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই সামান্য-সুখভরসা ক্ষীণা অবনী, এখন হইতে আমার প্রয়াশা স্নেহশালিনী জননী, কুটিল-হৃদয়া বিমাতা নহেন। মানব, উন্মাদবৎ আকাঙ্ক্ষা-ক্ষিপ্ত এবং নীচ প্রবৃত্তিশীল হইলেও, তথাপি এখন হইতে সে আমার নিকটে প্রিয়তর; তাহার সহস্র পাপ তাপ সত্ত্বেও তাহাকে আমি এই প্রথম ভ্রাতৃনামে সম্বোধন করিলাম। এইরূপে নাজানি কতই অদ্ভুত, দুরগম্য দুরারোহ পথ বাহনে পরিচালিত হইয়া, অবশেষে এই দীনতা মন্দিরের (Sanctuary of sorrow) অলিন্দবক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইলাম। অবিলম্বেই ইহার দ্বার উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা। এবং তখন এই দৈন্যতার দিব্য গভীরতা কত (Devine depth of sorrow) তাহাও সম্মুখে প্রকাশমান দেখিতে পাইব।”

আমাদিগের অধ্যাপক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে গাঁইট তিনি এত দিন ছাড়াইতে না পারিয়া, তাহাতে বাধিয়া হতাহত হইতেছিলেন, এই খানেই তাহার উপর তাঁহার প্রথম নেত্রপাত হয়, এবং নেত্রপাত হওয়াও যেমনি, ইনিও অমনি তাহা ছেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। তিনি লিখিতেছেন,—“আমরা এখন যাহাকে ‘অশুভের কারণ ও মূল’ বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি, তাহাই বা তদ্রূপ কোন না কোন বিষয়, ইহা লইয়া জগৎ সৃষ্টির দিন হইতে প্রতিমানবের মনে, কতই কূটতর তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। যে কোন মানবচিত্ত, যন্তবিব্যভাবে দুঃখানুবিদ্ধ অবস্থা হইতে, যদি শক্তিসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইতে চাহে; তাহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য স্বরূপ এই বিষয়কেই সর্ব্বাগ্রে নিবৃত্তি করিতে হইবে। আমাদিগের সময়ে, অনেকেই এই বিষম কচ্‌কচিকে সহজে সহজে কোন প্রকারে থাবাথুবিতে চাপা দিয়া, আপনাকে আপনি সন্তুষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকে; আবার কেহ না কেহ আছে, যাহাদিগের পক্ষে বিষয়ের কোন না কোন স্থির মীমাংসা একেবারেই অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। প্রতি যুগে যুগেই তদুপযোগী তদ্রূপ মীমাংসা সকল, যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে

উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার যেমন সেই যুগ বিগত হয়, তেমনি তাহার মীমাংসাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত ও অকার্য্যকর হইয়া আইসে। কারণ, মনুষ্য-প্রকৃতির স্বভাবই এই যে, যুগভেদে ইহাদের কথা পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া থাকে, ইচ্ছা করিলেও তাহার বিরতি করিবার সাধ্য নাই। তোমার এ যুগের ব্যাখ্যান পুস্তকে, ভাগ্যক্রমে আমার আজি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত ঘটিয়া উঠে নাই; সুতরাং কাজে কাজেই এ বিষয়ের, অন্ততঃ আমার নিজের ব্যবহারের জন্যও, আমি এরূপ মীমাংসা করিয়া লইতেছি। আমি যতদূর নিরূপণ করিয়া জানিয়াছি, তাহাতে মনুষ্যের যে দুঃখ, তাহা মনুষ্যের মহত্ব হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে; কারণ মনুষ্য আত্মিকভাবে অনন্ত এবং ইহা, সে যতই শঠতা কৌশল বিস্তার করুক, কখনই অন্ত বস্তুদ্বারা চাপা রাখিতে পারিবে না। আচ্ছা ভাল, তোমার এই ইউরোপ খণ্ডে, যত যত রাজস্ব সচিব, যত যত শিল্পকুশল শিল্পী, এবং যত যত উৎকৃষ্ট পাচকদল আছে, বলিতে পার ইহারা সকলে একত্র মিল ও সমবেত হইয়া ঐ জুতাঝাড়া চামার বেটাকে সুখী করিবার ভার লইতে পারে কি না? তাহারা হঠাৎ পারিবে বটে, কিন্তু এক আধ ঘণ্টা কালের অতীত আর পারিবে না; কারণ ঐ যে চামারটাকে দেখিতেছ এবং যাহাকে দেখিয়া হেয় ভাবিতেছ, উহাও কেবল তোমার উদর-সার নহে, উহারও একটি আত্মা আছে। যদি তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিও উহার স্থায়ী আনন্দ এবং সুখসিক্ততার জন্য এই মাত্র চাহে, এবং তাহার কমও চাহে না বা অধিকও চাহে না, যে ঈশ্বরের এই অনন্ত রাজ্য আমি সমগ্রই ভোগ করিব, সেই ভোগে পুনঃ অপার তৃপ্তিবান্ হইব এবং বাসনার উৎপত্তি মাত্রে তখনই তাহা পূরণ হইবে। হখিমিরের সুরাসমুদ্র (Oceans of Hochheimer) বা তচ্ছোষক অফ্যুকুসের কণ্ঠনালী, তাহাদের কথা কি কহিতেছ! অনন্ত আত্মার আত্মা-ধান্ তোমার ঐ জুতা ঝাড়ার নিকট তাহারা তুচ্ছাদপিতুচ্ছ মাত্র। তুমি আসমুদ্র পূরণ করিয়া সুরা ঢালিয়া দেও, অমনি দেখিবে সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিতে থাকিবে, মদটা যদি আর একটু ভাল পাকের হইত! ভাল, উহাকে একবার বিশ্বরাজ্যের অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং তদুপযুক্ত শক্তিও দান

করিয়া দেখ দেখি, অমনি দেখিবে পরক্ষণেই সে অপরার্দ্ধ লোলুপ হইয়া তদধিপতির সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসিয়া আছে; শুধু তাহা নহে, মাঝে মাঝে আবার এক একবার গলা ছাড়িয়া মনের দুঃখে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেছে, ' আমার যেমন, মানুষের মধ্যে এমন লক্ষ্মীছাড়া হতভাগ্য কপাল আর কাহারও নাই।'—সূর্য্যদেবে কলঙ্কদাগ কখন ছাড়া! অথবা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, উহা আত্মছায়া মাত্র; আপন ছায়ায় আপনি ভুলিয়া তাহার সহিত কেবল কোন্দল করিয়া থাকি।

"ফলতঃ আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা প্রায় এইরূপ। আমরা আপন আপন ওজন এবং আকাঙ্ক্ষা অনুসারে গণিয়া গাঁথিয়া শেষে একটা স্থির করিয়া মনে মনে ভাবি যে এই পর্য্যন্ত হইলেই, আমার এ সংসারযাত্রা, ভালও নহে মন্দও নহে, অথচ যথাস্বচ্ছন্দভাবে কাটাইয়া যাইতে পারি; এবং সেই হইতে মনে মনে ইহাও ধারণা হয় যে ঐ পর্য্যন্ত প্রাপ্যই আমার উপযুক্ত, সুতরাং উহাই আমার অবশ্য প্রাপ্তব্য। উহা আমার আধিক্য অনাধিক্য-শূন্য ন্যায্য পাওনা মাত্র, সংসারযাত্রার উপযুক্ত বেতন, সুতরাং আমার হক্, তজ্জন্য বিষাদ বা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। যদি ইহার উপর কিছু বেশি হয়, তাহা হইলেই বটে সুখ। আর যদি কম হয়, তাহা হইলেই দুঃখের সঞ্চার বলিতে হইবে। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, এইরূপে আমরা আপন আপন সারত্ব এবং মূল্য কেমন আপনাপনি করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি; এবং আমাদিগের এই নির্দ্ধারণকার্য্যে আত্মগরিমা ও আত্মশ্লাঘার ঘটা বিস্তারই বা কি দুরন্ত। অতঃপর যদি তুলাদণ্ড কোন দিকে ঝুঁকিতে দেখিয়া কোন মূর্খ চীৎকার করিয়া উঠে, 'দেখেছ, দেখেছ, কি অন্যায় শোধ, ভদ্রলোকের উপর এমন দাগাবাজি এমন অভদ্র ব্যবহার কি আর কেহ কখন দেখিয়াছ?' তাহাতে কি আর তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে? মূর্খ! আমি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, তুমি যে সেই সেই বিষয় তোমার অবশ্য ভাবিয়া চীৎকার করিতেছিলে, তাহা কেবল তোমার আত্মগরিমার ফল মাত্র। তাহার সাক্ষ্য মনে কর যেন তোমার ফাঁসি হইবে (তোমার ভাগ্যেও আমি বোধ করি বস্তুতঃ তাহাই ঝুলিতেছে), এমন স্থলে গুলির ঘায়ে প্রাণত্যাগ কি

তোমার পক্ষে সুখের বলিয়া বিবেচনা করিবে না? আবার মনে কর যেন ফাঁসে ঝুলিবে, কিন্তু ছোবড়ার কাছিতে;এখন মনে করিবে দড়িটে যদি সোণের হইত!

"আমি পূর্ব্বেই যাহা বলিয়া আসিয়াছি, এখন দেখ তাহা কতদূর সত্য;— জীবনাংশরূপী এই ভগ্নাংশ, অঙ্কে হর (Denominator) কমাইলে যেমন সহজেই তাহার মূল্যাধিক্য সাধন করিতে পারা যায়, লব (Numerator) বৃদ্ধি দ্বারা সেরূপ হয় না। অথবা আমার বীজগণিত-জ্ঞানে যদি না ভ্রান্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পূর্ণসংখ্যাকে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে, ক্ষয় রহিত পূর্ণই থাকিয়া যায়। তুমিও একবার তোমার দাওয়া দাবিকে শূন্যে নামাইয়া দেখ দেখি, তুমিও দেখিবে সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতলে আনত হইয়া রহিয়াছে; আমাদিগের সমকালিক বিজ্ঞসমূহ যথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ধরিতে গেলে, কেবল ত্যাগস্বীকারের পর হইতেই জীবনকার্য্যের যথার্থ আরম্ভ হয়।

"আমিও এখন একবার আপনাপনি আত্মপ্রশ্ন করিয়া ভাবিলাম যে, আমিও যে এতকাল ধরিয়া কেবল খুটিনুটি, উঠপড়া, দুঃখের কান্না, এই সকলে আত্মদগ্ধ করিয়া আসিলাম; ভাল, তাহারই বা কারণ কি, কাহার জন্য করিলাম? সহজ কথায় উহার এইই উত্তর যে, তুমি কখনও সুখানুভব করিতে পাও নাই। কারণ কি? না ভদ্রসন্তান তুমি, তোমার 'তুমি' মহাশয়ের সম্ভ্রম রক্ষা যথেষ্ট রূপ হয় নাই, আহারের কষ্ট, বিছানার কষ্ট, কেহই তাহার উপর যতদূর যত্ন দেখান উচিত, তাহার কিছুই দেখায় নাই। মরি! মরি! কিন্তু তোমার যত কিছু আইন চক্র সকলই একে একে খুলিয়া বল দেখি যে, কোথাও তাহাতে এমন কোন ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে কি না, যে তাহার শাসনে তোমাকে সুখী হইতেই হইবে,সুখী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই? সুখ ত সুখ! তফাতে থাকুক, ইহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, কিছু পূর্ব্বে তোমার 'তুমি' হওয়াই কোথায় ছিল,—তোমার 'তুমি' হওয়ার উপর তোমার দাবী দাওয়া সব কিছু ছিল কি না। তেমনি বিবেচনা কর যেন তুমি কখন সুখ ভোগ করিতে জন্মাও নাই, অদৃষ্ট যেন তোমার ভাগ্যে কেবল দুঃখভোগই লিখিয়াছেন, তাহা হইলেই বা তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

আহার লালসায় গগণসাগর সন্তরণ করিয়া যে সকল গৃধ্রকুল উড্ডীয়মান হইতেছে, উহাদিগের হইতে তবে কি তোমার কিছুই ইতর বিশেষ নাই; তুমিও কি উহাদিগের মত মৃতমাংসের অপ্রতুল দেখিলেই, নৈরাশ্যে তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকিবে? বাপু, ক্ষান্ত হও, তোমার বায়রণ ঢাক, গেটে খোল।"

আর এক স্থানে লিখিতেছেন,—"বটে বটে, এতক্ষণে আমি ইহার আভাস পাইতেছি! ভ্রাতঃ এই মনুষ্যহৃদয় কেবল তোমার সুখ-বাসনার আধার নহে, তথায় উহা হইতে আরও উচ্চতর বস্তু অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য সুখ সাপেক্ষতা ভাব পরিত্যাগ করিলেও, সে তৎপরিবর্ত্তে স্বচ্ছন্দে কৃতকৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতে পারে। একাল ধরিয়া এত এত অসংখ্য ঋষি এবং উৎর্গিত মহাপুরুষবর্গ, কবি এবং উপদেষ্টৃগণ, যে সকল বাক্য ঘোষণা করিয়া এবং তজ্জন্য নানা লাঞ্ছনা সহিয়া গিয়াছেন, তাহা কি?—এই উচ্চতর বস্তুর প্রচারণা মাত্র। মনুষ্যে যে ঈশ্বর-প্রতিরূপ নিবাস করিয়া থাকেন, এবং সেই ঈশ্বর-প্রতিরূপের উপরেই যে আমাদিগের স্বেচ্ছা এবং শক্তিসমূহ নির্ভর করিয়াথাকে, জীবন মরণে তাঁহারা তাহারই প্রতি সাক্ষ্য দান করিয়া, সেই উচ্চতর বস্তুর প্রচারণা করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতঃ, তুমিও সেই ঈশ্বর-অনুজ্ঞাত অপৌরুষেয় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সাদর-নির্ব্বাচিত হইয়াছ। যতক্ষণ তুমি অনুতপ্ত এবং শিক্ষা-নিরত না হইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই দিব্য পুরুষ কারুণ্যপূর্ণ খেদানুসূচন হইতে কখনই বিরত হইবেন না। ইহারই জন্য আবার বলিতেছি, তোমার ভাগ্য সমক্ষে ধন্যবাদপরায়ণ হও; যাহা পাইয়াছ তাহাই সানন্দমনে গ্রহণ কর, উহা তোমার কার্য্যে আসিবে; এবং স্বার্থকে আত্ম হইতে বিদূরিত করিয়া ফেল। রোগ স্থায়ী এবং পুরাতন হইলে, যেমন শুভোৎপাদিনী জ্বরযন্ত্রণাযোগে তাহাকে বিদূরিত করিয়া,মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়; তুমিও, চেষ্টা দুরন্ত হইলেও, বহুকালসঞ্চিত মলরাশি হইতে সেইরূপ আত্ম-ধৌত করিয়া লও। তাহা হইলে এ দুরন্ত কাল তরঙ্গে তুমিও গ্রাসিত হইবে না; তদুপরি ভাসিতে ভাসিতে স্বচ্ছন্দে সেই শোভনতম অনন্ত-হৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে। আমোদপ্রিয় হইও না, ঈশ্বরপরায়ণ হও। উহাই সেই 'স্বস্তি নিত্যম্', যাহাতে যাবন্ত অমীমাংসা মীমাংসিত

হইয়া থাকে। উহার আশ্রয়ে যে কেহ সঞ্চরণ করিবে এবং কর্ম্মনিরত হইবে, জানিও তাহারই পক্ষে মঙ্গল।"

পুনশ্চ, "তোমার প্রাচীন গ্রীকপণ্ডিত জিনো যেরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই পৃথ্বীসংসারকে তাহার দুঃখানিষ্ট সহ পদদলিত করা অতি সহজ কার্য্য। ভ্রাতঃ, তুমি ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কার্য্য সাধনে পটু; এই পৃথ্বীসংসার যাহা নিত্য তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে, এবং নিত্য তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে বলিয়াই, তুমি তাহারও উপর প্রেমপূর্ণ হৃদয় ধারণে সমর্থ। ইহার শিক্ষকতা গ্রীকপণ্ডিত জিনোর কর্ম্ম নহে, জিনো অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তির আবশ্যক। তোমার ভাগ্যে সেই উচ্চতর ব্যক্তিও প্রেরিত হইয়াছিল। অষ্টদশাধিক শতাব্দী গতপ্রায়, দীনতার যে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথায় দীনতার সেই অর্চ্চনা কি বিস্মৃত হইয়াছ? সত্য বটে ঐ দেবমন্দির এখন ভগ্নপ্রায়, জঙ্গলপূর্ণ, কীটপতঙ্গাদি নানাবিধ হিংস্র এবং কদর্য্যজীবের বাসস্থান; কিন্তু তথাপি বিমুখ হইও না, অগ্রসর হও, দেখিবে বহুল ভগ্নাবশেষ মধ্যেও, উহার নগণ্যতম গুহাস্থলে দেবস্থান এখনও তেমতি জাজ্জ্বল্যমান;—এবং সম্মুখে চিরপ্রদীপ্ত পবিত্র দীপ এখনও তেমনিই প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"

উপরে যে সকল অদ্ভুত উক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করা গেল, আমরা এমন আস্পর্দ্ধা করি না যে উহার উপরে কোন মতামত প্রকাশ করিব; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উহার পর পর যে উক্তিগুলি, তাহা নিতান্ত সুচারুর নহে। প্রথমতঃ তাহার ভাবার্থ সর্ব্বসঙ্গত বা বিবাদশূন্য নহে, বরং অধিক পরিমাণেই বিবাদপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ তাহা সাধারণ ধারণার অতীত; এবং স্থানে স্থানে এমন কূটপূর্ণ যে, স্বয়ং বক্তাকেই তন্মধ্যে হাবু ডুবু খাইতে দেখা যায়। ধর্ম্মবোধ, নরচিত্তযোগে অপৌরুষেয় বচন প্রচারের নিমিত্ত ভাব, ভবিষ্যদ্বচন, আমাদিগের সাময়িক সত্য প্রচারক অথবা অসত্য নিয়ামক উপদেষ্টৃগণ, ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর মতামত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা গুলি ফলতঃ অধিকাংশই ধড়ফড় রহিত, কিন্তু প্রতিভাশালিত্বেরও অপ্রতুল নাই। যাহা হউক তথা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই অদ্ভুত বর্ণনীয় বিষয়ের উপসংহার করা যাউক।

অধ্যাপকটি শ্লেষাত্মক স্বরে কহিতেছেন, "পূজ্যপাদ বল্টেয়ার মহাশয়, আপনি একটু থামুন, আপনার ঐ সুস্বর কণ্ঠ একটু নিবৃত্ত করুন দেখি; যে কার্য্যের জন্য এ সংসারে আপনার আগমন, তাহা হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম অষ্টম শতাব্দীতে যেরূপ ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেরূপ নাই, এই সামান্য কথা, না হয় ইহা গুরুতর কথাই হউক, ইহা ত যথেষ্টই প্রমাণ করা হইয়াছে, তবে আর কেন? হায়, হায়, এত কাল জীবন ভরিয়া এই ছত্রিশ খণ্ড পুস্তক, আরও কত কত খণ্ড, কত কত সংখ্যা, কত কত কাগজ লিখিয়া আসিলে, তাহা কি শেষ আমাদিগকে কেবল এই একটু সামান্য কথা বুঝাইবার জন্য! ভাল, তাহাই বুঝিলাম, কিন্তু তাহার পর? তাহার পর তোমার সেই নিন্দিত ধর্ম্ম-ভাবকে যাহাতে নূতন বসন, নূতন ভূষণদানে আমাদিগের উপযোগী নূতন মূর্ত্তি করিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে তদ্দ্বারা আমাদিগের ধ্বংস-প্রায় আত্মাকে শীতল এবং পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হই, সে বিষয়ে সহায় এবং পথ প্রদর্শক হইতে পারিবে কি? পারিবে না,—সে পক্ষে তোমার শক্তি নাই, শক্তিশূন্য! তবে কেবল ভাঙ্গিতে আসিয়াছ, গড়াইতে আইস নাই? তবে আর কেন, আস্তে আস্তে আমাদের সেলাম লইয়া আপনার পথ দেখিলেই ত ভাল হয়!

"সে যাহা হউক যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মভাব বা ধর্ম্মতত্ত্ব দেখা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে আমার সহিত কি সম্বন্ধ? অথবা আমার হৃদয়ে যে ঈশ্বর উপস্থিত রহিয়াছেন, এবং যাঁহাকে অন্তরাত্মার সহিত আমি অনুভব করিতেছি, তাহা কি বল্টেয়ারের সাধ্য আছে যে নয় বলিতে পারে, বা নয় করিতে পারে? যে দৈন্য অর্চ্চনা-অনুষ্ঠানের কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহার উৎপত্তি এবং বংশ নির্দ্দেশ যেরূপে ইচ্ছা করিতে চাও কর, কিন্তু তাহা যে এই এখানেই উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎপক্ষে কি আর কোন রূপ দ্বিরুক্তি আছে? তোমার অন্তরাত্মার বারেক অনুভব করিয়া দেখ দেখি, দেখিয়া বল যে উহা ঐশ্বরিক সম্পত্তি কি না? ভ্রাতঃ, এরূপ অনুভাবকতাকেই শ্রদ্ধা কহে, আর যে সমস্ত তাহা মতি মাত্র। কেবল মতির খাতিরে যে পরকে এবং আপনাপনিও তিতবিরক্ত হইতে চাহে হউক, তাহাতে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই।"

পুনশ্চ আর একস্থানে বলিতেছেন,—"তোমাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, 'পূর্ণ-সিদ্ধশক্তি,' (Plenary inspiration) বা তথাবিধ বিষয় লইয়া আপনাপনির মধ্যে পরস্পরের চক্ষু-উৎপাটক বিবাদ কন্দল করিও না; বরং সেই সিদ্ধ শক্তির কণিকা মাত্র যাহাতে আপন আপন জন্য কোন মতে পাইতে পার, তৎপক্ষে যত্নবান্ হও। এ জগতে কেবল একখানি মাত্র বাইবেলের বিষয় আমি জানি যে, যাহাতে এই পূর্ণ-সিদ্ধ-শক্তি বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ নিরসিত হইয়াছে, অথবা যাহা সর্ব্ব সন্দেহের অতীত; এবং যাহাতে ঈশ্বরকৃত লিপি আত্মনয়নে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। আর আর যাবতীয় বাইবেল, এই মহান্ বাইবেল গ্রন্থের এক একটি পল্লব স্বরূপ,—যথা, ক্ষীণবুদ্ধি জনের বোধ-সুগমের নিমিত্ত মূর্ত্তিকল্পনা প্রভৃতি।

অথবা শ্রান্ত পাঠককে কিছু শান্তি দিবার জন্যও বটে, এবং এই বিষয়টিও শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিবার বাসনায়, নিম্নস্থ এবং সম্ভবত অপেক্ষাকৃত বোধ-সুগম্য অংশ মাত্র তাঁহার অবধানার্থে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অধ্যাপকটি কহিতেছেন, "আমার বোধ হয়, আমাদের এই জীবনে, যে জীবন স্বয়ংই কাল-পুরুষ সহ চিরন্তন সংগ্রাম প্রতিরূপ, অপরাপর বিষয়-সংগ্রাম আদৌ গণনীয় কি না সন্দেহ। এই সংসারক্ষেত্রে যদি তোমার ভ্রাতার সহিত তোমার কোন বিষয়ের ভাবান্তর উপস্থিত থাকে, আমি পরামর্শ দিই, সেই ভাবান্তরের কারণ কি অগ্রে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপন মনে বিবেচনা করিয়া দেখিও। যদি উহার মূল পর্য্যন্ত কোন মতে নামিয়া দেখিতে পার, দেখিতে পাইবে যে উহা সামান্যতঃ এই ভিন্ন আর কিছুই নহে;—'এই সংসারে সুখ যে পরিমাণে তোমার ভোগ্য বলিয়া নিয়োজিত হইয়াছে, তুমি তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া আমার অংশে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপণ করিতে আসিয়াছ; কিন্তু আমি তাহা করিতে দিব না, আমি দিব্য করিয়া কহিতেছি ইহাতে প্রাণ থাকুক বা যাউক, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিব।' হায়, হায়! যে সুখের লালসে এই সমস্ত জগৎ উৎক্ষিপ্ত প্রায়, এবং সমস্ত জগৎই যাহার অংশ পাইবার লালসে লোলুপ হইয়া ফিরিতেছে, সে সুখ ফলতঃ দেখিতে গেলে কি নগণ্য;—কাড়াকাড়িতে শাঁসের বিধ্বংসে ছোবড়া চুষিবার ব্যাপার মাত্র; যাহাতে একজনেরও তৃষা নিবা-

রণের সম্ভাবনা নাই! ভাল! এমন এমন স্থলে আমরা কি স্বচ্ছন্দে এমন উত্তর করিতে পারি না,—'পামর দুরাকাঙ্ক্ষি, তোমার ক্ষুধার্ত্তগৃধ্রবৎ আস্ফালন হইতে ক্ষান্ত হও, আমার ভাগে যে নগণ্য অংশ পড়িয়াছে এবং যাহা আমার বলিয়া গণিতাম, তাহা লইয়াই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, এই লও, অম্লান মুখে দিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক; বিধাতা যদি আরও কিঞ্চিৎ আমাকে দিতেন, তাহাও আমি স্বচ্ছন্দে তোমাকে অর্পণ করিতে পারিতাম।' যদি ফিষ্টে প্রণীত (Wissenschaftslehre) পুস্তক কিয়দংশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মমূলক বলিয়া গৃহীত হয়; তাহা হইলে আমরাও যাহা বলিয়া আসিলাম, নিঃসন্দেহই উহা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তন্মূলক। আমরা এখানে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাই মনুষ্যের পূর্ণ কর্ত্তব্য নহে; কেবল কর্ত্তব্য-অর্দ্ধ মাত্র, এবং সেই অর্দ্ধও আবার কর্ম্মঠ অর্দ্ধ নহে, নিষ্কর্ম্মা অর্দ্ধ। সে যাহা হউক, আমরা বলিতে যেমন পটু, কার্য্যেও যদি সেই পরিমাণে পটু হইতে পারিতাম!

"কিন্তু মনুষ্যের বোধ এবং বিশ্বাসভাব যতই উৎকৃষ্ট গুণময় এবং দৃঢ় হউক না কেন, যতক্ষণ তাহা কার্য্য এবং আচরণে আসিয়া পরিণত না হইবে, ততক্ষণ তাহা বৃথা। অথবা তাহা কেন, সেরূপ পরিণতি না হওয়া পর্য্যন্ত, বিশ্বাসকে 'বিশ্বাস ভাবই' বলা যায় না। বিশেষতঃ আমাদিগের অনুধ্যান ক্রিয়া স্বভাবতঃ অসীম, অপার, আকারশূন্য, অসাব্যস্ত হইতেও অসাব্যস্ত; কেবল উহা সন্দেহশূন্য এবং বহুদর্শনজাত বৈধতার অনুভূতি হইতেই, স্বীয় আবর্ত্তনকেন্দ্র প্রাপ্ত এবং তদনুবন্ধে 'রচনা' রূপে পরিণত হইতে সমর্থ হয়। জনৈক বিজ্ঞ যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে, 'সন্দেহ যে প্রকারেরই হউক না কেন, উহা কেবল একমাত্র কার্য্য যোগেই বিদূরিত হইতে পারে।' অতএব আবারও বলিতেছি যে, যে কেহ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ইতিকর্ত্তব্যতার ঘোর অন্ধকারে বা মিথ্যালোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাগ্রহে দিবালোকের প্রার্থনায় চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে; সে যেন আমার এই উপদেশটি গ্রহণ করে, আমি ইহা স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া প্রদান করিতেছি;—'যাহা যাহা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, এবং তাঁহার মধ্যে যাহা সর্ব্বাগ্রে হস্ত সান্নিধ্যে পাইবে, তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে রত হও; এবং তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার তৎ

পরবর্ত্তী দ্বিতীয় কর্ত্তব্য আপনা হইতেই হাতের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।'

"সে যাহা হউক, আমরা বোধ হয় এখন বলিতে পারি যে, তোমার যে আদর্শভবননিহিত (Ideal world) অভীষ্ট লাভের আকাঙ্ক্ষায়, এতদিন কায়মনে অদৃষ্ট-সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলে এবং যাহার শ্রমে এখন শ্রান্ত হইয়া আসিতেছ, যখন সেই আদর্শ-ভবন (Ideal world) তোমার সমক্ষে আবিষ্কৃত এবং প্রকাশমানভাবে আত্মভাণ্ডার খুলিতে আরম্ভ করিবে; এবং উইল্হেলম্ মিষ্টরের লোথারিওর (Lot hario) ন্যায় তুমিও যখন বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে বলিতে পারিবে যে 'আমেরিকা হয় এখানে, নতুবা আমেরিকা কোথাও নাই', তখনই জানিও যে, তোমার আত্মিক ভাবে প্রকৃতিস্থ হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এমন কোন ভবনই এ পর্য্যন্ত মনুষ্যকর্ত্তৃক অধিবেসিত হয় নাই, যাহা তাহার আদর্শ শূন্য, যাহা তাহার কর্ত্তব্য শূন্য। বিষয়ের যে এই বস্তুতঃ ভাব (Actual), যাহা তোমার সমক্ষে এখন হেয়, ঘৃণিত, দুর্দ্দশাপন্ন, সামান্য এবং কত কি, এবং যাহার উপরে স্থিতভাবে তুমি এখন অথবা এই মুহূর্ত্তেই সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছ, জানিও তোমার যে আকাঙ্ক্ষণীয় আদর্শ (Ideal) তাহা উহাতেই নিহিত রহিয়াছে। উহা হইতে তাহা বাছিয়া লও, বাছিয়া লইয়া তাহার সত্যতায় বিশ্বাস কর, জীবনকে তদবলম্বী কর, এবং তদ্দ্বারা মুক্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে থাক। নির্ব্বোধ! তুমি যে আদর্শ আদর্শ (Ideal) করিয়া ফিরিতেছ, তাহা কোথায়?—তাহা তোমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার আবার প্রতিবাধক যাহা তাহাও তোমাতে; তোমার কার্য্য,—তুমি কি প্রকারের হইবে, কি স্বভাবে দাঁড়াইবে, তাহাই কেবল উহা হইতে আকর্ষণ এবং সাব্যস্ত করিয়া লওয়া মাত্র। তুমি এরূপ হইবে, কি ওরূপ হইবে, কি কিরূপ হইবে, তাহাতে কি আইসে যায়? কেবল এই পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট যে, তুমি যেরূপেরই হও না কেন, সেইরূপ যেন কবি বা শূর-জনোচিত হয়। হায়! হায়! বিষয়ের 'বস্তুতঃ' ভাবনিগড়েই যাহারা আবদ্ধ রহিয়াছে; এবং নিরাশায় যাহারা নিয়তই সেবস্থানে হস্ত পদ সঞ্চালন এবং খেয়াল পুরণোচিত নূতন সংসারভূমি প্রাপ্তিলালসে দিন যামিনী গত করিতেছে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য, কি ভ্রান্ত! তাহাদের

আত্মহিতার্থে, এই কথাটি যেন ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। 'তুমি যে বস্তুর অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, হয় সেখানে আছে নতুবা কোথাও নাই; তাহা বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করিতে কেবল এক তোমার দর্শনশক্তির অপেক্ষা মাত্র!'

"কিন্তু এক কথা, জগৎসৃষ্টির ন্যায় মনুষ্য-আত্মা সম্বন্ধেও, সকল কার্য্যের প্রারম্ভ স্বরূপ সেই একমাত্র আলোক পদার্থের আবশ্যক। যতক্ষণ এই চক্ষে অন্ধকার বিদূরিত হইয়া দিব্যদর্শনশক্তির উপস্থিতি না হইবে,তাবৎকাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিরুদ্ধ বলিয়া জানিও। যে দিব্যক্ষণে, সৃষ্টিকালীন প্রলয়াবর্ত্তে ভাসমানের ন্যায় দুর্বিপাকবাত্যাবিতাড়িত আত্মায় 'আলো হউক,' সহসা এই বাক্য দেববাক্যের ন্যায় ধ্বনিত হয়, সেইক্ষণ কি মধুর! যে সকল মহান্ ব্যক্তিরা একবার ইহার মধুরতা অনুভব করিয়াছেন; অথবা যে কোন সামান্য প্রাণীরা ইহা সামান্যভাবে সামান্য আকারেই অনুভব করিয়া থাকুক; সেই হইতে তাহাদিগের নিকট ইহা কি অভূতপূর্ব্ব সাক্ষাৎ ঐশ্বরিক প্রচারণারূপে নিরন্তর অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যচিত্তের অসাব্যস্ত ভাব হইতে এই সাব্যস্তভাবে উপস্থিত হওন, দ্বিতীয় সৃষ্টিরচনার ন্যায়। প্রলয়চ্ছন্ন গহনগভীর-উৎপাত ক্রমে বিদূরিত, পরস্পর বিরোধী যদৃচ্ছাক্ষিপ্ত পরমাণু সকল ক্রমসংযোজনে ভিন্ন ভিন্ন স্থূল আকারে পরিণত হইয়া আসিতে থাকে; ভিত্তিস্বরূপ তলদেশ অতর্কিতভাবে প্রস্তরময়ী দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; শেষে নিত্যপ্রতিরূপ জ্যোতিষ্কখচিত গগণমণ্ডল ঊর্দ্ধে প্রকাশমান হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই বিস্তার করিয়া থাকে। যথায় অগ্রে নিয়ত প্রলয় উৎপাত বিচরণ করিয়া ফিরিত, এখন তথায় সানুর্ব্বরনবশোভাময়ী স্বর্গপ্রতিরূপা বসুন্ধরা মূর্ত্তি বিরাজ করিয়া থাকে।

"আমিও এখন স্বচ্ছন্দে আপনাপনি আশ্বস্ত মনে বলিতে পারি,—তুমিও আর সেই প্রলয়-উৎপাতের ন্যায় অঘোর তরঙ্গ রূপে ঘূর্ণিত হইও না। সর্ব্বশোভা-সমাবিষ্ট বসুন্ধরা মূর্ত্তি, অথবা তাহার পূর্ণরূপ হইতে না পার, অন্ততঃ প্রতিরূপ হইতেও যত্নবান্ হও। সখে! আর বৃথা কালক্ষেপ ভাল নহে। কর্ম্মরত হও; আবার বলিতেছি কর্ম্মরত হও; আত্মধ্বংস করিও না। তোমার শক্তি যদি পরিমাণে কেবল অণুমাত্রই হয়, তোমার

দেবতার দোহাই! সেই অণুমাত্র শক্তি তাহার অনুরূপ অণুমাত্র কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়া আত্মসফলতা কর, অপব্যয় করিও না, তোমার মঙ্গল হইবে। সখে. উঠ উঠ, হতাশকে বলি দেও, আর ভাবিও না, যাহাই সম্মুখে কার্য্য বলিয়া পাইবে, তাহাতেই রত হও, তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সম্পাদন কর। দিন থাকিতে থাকিতে করিয়া লও, যেহেতু নিশা আগত প্রায়; নিশাগমে কর্ম্মসুযোগ সকলং বিনষ্ট হইয়া থাকে।*

ইতি স্বস্তিনিত্যম্।

কাব্য—কবি—বাঙ্গালা কবি।

১২৮৯।

(১)

শুনিয়াছি নাকি মলয়পর্ব্বতে ভেরেণ্ডা-বৃক্ষ জন্মিলেও; স্থান-মাহাত্ম্যে তাহা চন্দন-বৃক্ষে পরিণত হইয়া থাকে। বোধ করি বিধাতার সেই নিয়ম অনুসারেই, বঙ্গভূমির সাহিত্যক্ষেত্রে যে কোন ছন্দোবদ্ধ বাক্য ছাড়িয়া দিলে, তাহা কাব্যে পরিণত ও গণিত হইয়া যায়। না হইবে কেন? এখানকার স্থান-মাহাত্ম্য অনেক! যেখানে ভিক্ষুকব্রাহ্মণকে দুই পয়সা দানে ধার্ম্মিক; সম্বাদপত্র সম্পাদককে ঘুষ দিলে বিদ্বান; এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বলিলে ব্রাহ্ম হইতে পারা যায়; সেখানে তোমার আমার তাহার, খণ্ড গণ্ড বা ভণ্ডকাব্য কাব্যপদবাচ্য; এবং তুমি আমি তিনি 'কবি', 'প্রসিদ্ধ কবি', 'মহাকবি' ইত্যাদি বলিয়া গণিত না হইব কেন? বঙ্গভূমিতে কাব্যের এখন কি শস্তা বাজার! পথে ঘাটে মাঠে, যেখানে যাও, সেইখানেই কাব্য পাইবে। এখানে বালকপাঠ্যের জন্য কাব্য তৈয়ার হয়, স্ত্রী-পাঠ্যের জন্য কাব্য তৈয়ার হয়, এবং নিরক্ষর বৃদ্ধ-পাঠ্যের জন্যও কাব্য তৈয়ার হইয়া থাকে; আবার সংকল্প পূর্ব্বক কাব্যের সাময়িক পত্রিকা পর্য্যন্ত বাহির হইতে দেখা যায়। যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় হইয়াছে, সেও কাব্য লিখিতে যেমন ব্যস্ত; যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া অভিমানী, সেও কাব্য লিখিতে তেমনি ব্যস্ত; ক অক্ষর সম্বলে কালিদাস,—এখানে মেয়ে লেখে, পুরুষ লেখে, বউ লেখে, ঝি লেখে; ঘরে বাহিরে কালিদাস এবং সাফো! পাঠশালার বালকেরা পর্য্যন্ত কাব্যের ঝাঁকা কাঁধে করিয়া পথে পথে ফেরি করিয়া ফিরিতেছে। অথবা কেবল বাঙ্গালা দেশকেই বা একা এ গৌরব বা কলঙ্কের ডালির ভাগী করি কেন; কাব্য নামে, কাব্য লীলায়, বিলাত বাঙ্গালা সবাই সমান। তবে কি না বাঙ্গালায় কিছু বাড়াবাড়ি এবং আমরা বাঙ্গালী,—অন্যদেশ উড়িয়া পুড়িয়া গেলেও আমাদের যায় আসে না; কিন্তু বাঙ্গালা উড়িয়া পুড়িয়া

গেলে অনেক যায় আসে; তাই বাঙ্গালার কথা বলিতেছি। কিন্তু বাঙ্গালার কাব্যরঙ্গে আজি কি ঘটা! কি সৌভাগ্য! আজি কালি কাব্য লেখা এবং কবি নামের এত আবশ্যকতা হইয়া উঠিয়াছে, অথবা এ হুজুগ কিনারা ছাপাইয়া এতই উথলিয়া পড়িয়াছে যে, যাহারা পদ্য রচনা করিতে জানে না, তাহারা নেহাত পক্ষে গদ্যে উপন্যাস বা তথাবিধ অসার প্রবন্ধাদি লিখিয়া, তাহার মধ্যেও কাব্যের অস্তিত্ব এবং রাজত্ব প্রকটন করিয়া থাকে। কাব্য এখন গদ্য পদ্য নাটক নবেল অথবা কালির আঁচড়, সকল রকমেই। কি অপূর্ব্ব কাব্যামোদ! কি রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি! এবং তদধিক কি মহিমান্বিত বঙ্গসন্তানগণ! পুরাকালে এই না কাব্যের আশ্রয় লইয়া কয়েকটি ভিক্ষুক, ভিক্ষুক হইলেও রাজ্যেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া, চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে? সেই দেবশক্তিময় কাব্য কি এই? তবে এই অপক্ক-কদলি-দর্শন যদি সেই দেবশক্তিময় কাব্য হয়, তবে না জানি কাব্য কি অদ্ভুত বস্তু! আইস, বাঞ্ছারাম, এত গোলমাল যখন, তখন একবার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; আইস দেখি, সুবিধা পাইলে, তুমি আমিও কেন এই সুযোগে কাব্য লিখিয়া, কবি বলিয়া গণ্য হইয়া না যাই?

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, খাটি হিন্দুবুদ্ধি যদিও সঙ্কীর্ণ-আয়তন-বিহারী বটে, তথাপি গভীরতা তাহার অপরিসীম ছিল। বিজাতীয় বা ম্লেচ্ছশিক্ষায় অনভিজ্ঞ হিন্দুর বিষয় আয়ত্তক-শক্তি বহ্বায়তন না হইলেও, সহজ-জ্ঞানের গভীরতা হেতু, কে গভীর, কে তরল; কে গুরু, কে লঘু; তাহা দৃষ্টিমাত্রে চিনিতে পারিতেন। কাল-মাহাত্ম্যে ইহাদের বুদ্ধি এবং মতি গতি ভ্রান্ত হইলেও, তথাপি কখন ইহারা আধুনিকের ন্যায় নীচতা বা হাস্যাস্পদের পদবীতে নামিতেন না। কি আমোদস্থলে, কি লোকাচারে, ইহাদের ধীর গভীর বুদ্ধি কখন বিচলিত হইত না বা উচ্ছৃঙ্খলতায় কখন নামিত না। বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন হইয়া আসিলেও, অন্যান্য পাঁচ বিষয়ের মধ্যে কবিকে আদর ও গৌরব দান বিষয়ে, কখন মাঘ ভারবীর অপদস্থলে অবতরণ করিতেন না। ইহাদের পতন চিহ্নের উর্দ্ধ সংখ্যা দৌড়,—প্রাচীন-দিগকে ফেলিয়া মাঘ ভারবীকে ইহারা অধিক সমাদর করিতেন, এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তির সঙ্কীর্ণতা হেতু উদ্ভট কবিতায় কবি হইতেন; কিন্তু তথাপি

কে না জানে মাঘ ভারবি বা উদ্ভট কবিতায় কত গাঢ়তা ও কত রস। ইহাদের কাব্য-ধারণা কেবল অলঙ্কারসূত্রে সমাহিত হইলেও, ইহারা ফলে এত উচ্চে বিচরণ করিতেন যে,কৃত্তিবাস ও কাশিদাস প্রভৃতির গ্রন্থকেও কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন; তাঁহাদের নিকট ঐ সকল গ্রন্থের নাম ছিল 'ভাষা' বা 'পাঁচালী'। যে কথাগুলি বলিলাম, ইহা হিন্দুদিগের অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন পতন দশার চিত্র। তথাপি ঐ চিত্রের সঙ্গে যদি আমাদের এই জ্ঞানালোকে আলোকিত সময়ের চিত্র তুলনা করা যায়—যে সময়ে ম্লেচ্ছ প্রসাদাৎ জ্ঞান বিদ্যা ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশ, যে সময়ে আহাম্মকেরা 'ঊনবিংশ' শতাব্দি বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে; যে সময়ে ইংরেজী বিদ্যার জ্যোতিতে দেশে আলো-আঁধার লাগিয়া গিয়াছে; তাহা হইলে কি আক্ষেপোদ্দীপক এবং শোকাকর চিত্রই সম্মুখে প্রকটিত হইতে থাকে,—তখনকার মাঘভারবি আর এখনকার দুই চরণ পয়ার! এখানে একবার মিলাইয়া দেখ দেখি, পতিত হইতেও আমরা কি ভীষণতর অধঃপতনে পড়িয়া ওতপ্লুত হইতে বসিয়াছি! চিত্ত কতদূর নীচ এবং তরল এবং অসার ধারণায় আসিয়া নামিয়াছে! ইহা আধুনিক ম্লেচ্ছশিক্ষা ও তদনুকরণ প্রয়াসের ফল। ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপকতা বহুবিস্তৃত বটে, কিন্তু উহাতে গভীরতা, বিশেষ হিন্দুগভীরতার সম্পূর্ণ অভাব। স্বয়ং ইংরাজি যে গভীরতা শূন্য এ কথা বলি না; কিন্তু আমাদিগের বালকগণকে যে প্রণালীতে ও যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ গভীরতাশূন্য। এ শিক্ষায় এক স্মরণশক্তিরই প্রভূত প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধিশক্তির প্রয়োজন অতি অল্পই; সুতরাং বালকদেরও, বিদ্যালয়ের অতীতে যে আর বিদ্যা নীতি মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান উপার্জ্জনের কিছু আবশ্যকতা বা সম্ভবতা আছে, তাহার ধারণা প্রায় জন্মায় না। শিক্ষার প্রধান উপাদান যে মাতৃ ও পিতৃভাষা এবং শিক্ষাপথে যাহার অবলম্বন ব্যতীত কখনও বিদ্যাগাম্ভীর্য্য পৌঁছে না, তাহা দূরে নিক্ষিপ্ত; কট মট ম্লেচ্ছভাষা অভ্যাস করিতে, মনীষাশক্তি যাহা, তাহা পুষ্টতা বা পূর্ণ বিকাশ পাইতে সময় পায় না। বিষয় বিশেষে মতিগতি এবং মনে বিষয় বা কর্ম্ম বিশেষ প্রতি যে স্বাভাবিকী আকাঙ্ক্ষা, যাহা ভাবী জীবন-কর্ত্তব্য ও জীবনসফলতার পূর্ব্বাভাস স্বরূপ; শিক্ষাস্থলে বালকের সে সকলের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য

রাখা হয় না; সুতরাং যাহার বলে এবং অবলম্বনে বালক মানুষ হইতে পারিত, তাহা এইরূপে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। হিন্দু শিক্ষাপ্রণালীতে, মতি গতি ও চিন্তানতি অনুসারে বিষয় বিশেষের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ছাত্রের রুচির উপরেই একান্ত নির্ভর করিত; অধ্যাপক স্বয়ং সে বিষয়ে যথাবশ্যক উদাসীন থাকিতেন। কিন্তু এখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। অধুনাতন শিক্ষাপ্রণালীতে, শিক্ষিত বিদ্যাদি প্রকৃতিগত না হইয়া কেবল কণ্ঠগতমাত্র হইয়া থাকে; মানুষকে বিদ্বান হইতে শুনা যায় অথচ তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তণ ও চিত্ত পরিবর্ত্তণ হইতে দেখা যায়না। ফলতঃ অধুনাতন এতাদৃশ শিক্ষাস্থলে বিদ্যাদি পক্ষে বালক ক্রমে কলের মানুয হইয়া উঠে। সকলেই এক কলে এক ছাঁচে প্রস্তুত। তাহার পর যে আজিকে বালক, কালিকে সেইই আবার মানুষ হয়। সকলেরই বিদ্যা বুদ্ধির সংখ্যা সেই এক স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ও তাহার একইরূপ শিক্ষা প্রণালীতে। বিদ্যাক্ষেত্রে এরূপ কলের পুতুল যাহারা, স্কুলের পাঠ্য পুস্তকমাত্র যাহাদের ভাবদাতা ও আদর্শস্থল, এবং শত বিষয়ের শতগ্রন্থিযুক্ত ও শতটুকরাসঙ্কিত বিদ্যার বিপুল ব্যাপকতা হেতু গম্ভীরতা যাহাদের শূন্যস্থলীয়, যেখানে সকলই টুকরাস্থলীয়, পূর্ণ প্রতিরূপ কোথাও নাই; তাহাদের এরূপ কাব্যামোদ বা যে কোন বিষয়ামোদ এবং সেখানে এরূপ কাব্য সাহিত্যাদি যদি না জন্মিবে, তবে জন্মিবে কোথায়? লোকে বলে কবি তৈয়ার হয় না, কবি জন্মায়; আমি বলি কবি কেবল জন্মায় না, জন্মায় এবং তৈয়ার হয়, এই দুইই চাই। বৃক্ষশিশুবিশেষ স্বতঃ উৎপত্তি হইলেও, তৈয়ার হওয়ার গুণে বা দোষে তাহাতে সুফল বা কুফল জন্মিয়া থাকে, অথবা ফল হয়ত একেবারেই ফলে না। আরও এক আছে, জঙ্গলে গাছ আপনি হয় আপনি ফল দেয়,পাইট ঝাইটের তোয়াক্কা রাখে না; এবং গাছ ও ফল উভয়ই জঙ্গলা হইলেও, তাহাদের কেমন একটু প্রাকৃতিক মাধুর্য্য ও চটক থাকে ও তাহাদিগে বেষ্টিয়া কেমন একটি কৌতূহল-জ্ঞানও অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু এ সৌখিন সময়ে, এ খাস বাগানে, সে জঙ্গলী গাছের জঙ্গলী ফল ভাল লাগিবার অথবা জন্মিবার ও ফলিবারই দিন-কাল কি আর আছে? তাহার পর আমাদের বর্ত্তমান সময়ের সহ সাদৃশ্য হেতু গাছপালা লইয়া আরও একটি উপমা আছে,অর্থাৎ গাছেই আঁব কলে বলিয়া,

আঁবের আশায় আমড়া, আস্‌শেওড়া, যে সে গাছে বাগান পরিপূরিত হইতে দেওয়া, তাহা বাতুল ও চৈতন্যশূন্যের কার্য্য। এরূপ আমড়া ও, আস্‌শেওড়া পন্থার রচকদিগকে বাঙ্গারাম যখন দেখিবে, যে কোন উপায়ে ও যত শীঘ্র পার তাহাদিগকে নিপাত করিবে।

কাব্য লইয়া যখন এত হুড়াহুড়ি, তখন সকলেই যে 'কাব্য' 'কাব্য' বুলি ছাড়ে এবং শত জনে শত রকমে যে তাহার প্রতি বাক্যরচনা প্রয়োগ করে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু কাব্য যে বস্তুটা কি, তাহা কাহারও মুখে পরিষ্কাররূপে শুনিতে পাই না। কিন্তু তথাপি সবাই লেখে কাব্য, সবাই পড়ে কাব্য; কেতাবের দোকানে কাব্য ভিন্ন অন্য কিছু বিক্রয় হয় না। এ শুভ সময়, এ সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও, বাঙ্গারাম, একটি কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ বঙ্গভূমে যতগুলি লোক সকলেই তাহারা জ্যেষ্ঠ; কনিষ্ঠ তাহার মধ্যে কেহ নাই! সবাই লিখিতে উদ্যত, পড়িতে কেহ নাই; সবাই বলিতে উদ্যত, শুনিতে কেহ নাই; সবাই বুঝাইতে উদ্যত, বুঝিতে কেহ নাই!

কিন্তু কাব্য কাহাকে বলে? অনুপ্রাসছটা, সুমধুর পদ বিন্যাস, কৌশলময় ভাবপূর্ণ শ্লোকখণ্ড অথবা বোমের আওয়াজের ন্যায় পদ বিশেষ, ইহা কি কাব্য? আমাদিগের অভিধান খুলিয়া দেখিলাম, উহার একটাকেও কাব্য বলে না, অথবা কাব্যের কাব্যত্বপক্ষে তিলমাত্রও সহায়তা করে না। কামানল, হোমানল, দাবানল; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উলট পালট; ত্রিভুবনে খবর চালাচালি; দেবাসুর সংগ্রাম, নরকদর্শন, বজ্রপাত, ঘোর যুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি, এ সকলও একে একে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম; কিন্তু বৃথা, ইহাদিগকেও কাব্যপদে অভিহিত করে নাই। উপমা, মালোপমা, আড়ম্বর ঘটা, অলঙ্কার ছটা, আরও যে কিছু ছটা আছে, ইহাদিগকেও কাব্য বলে না। যদি বল এ সকলকে কেন কাব্য বলে না; তাহার আপাতত উত্তর এই যে, যেহেতু 'এ সকল কাব্য নহে'! এ সকল বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিক ও তাহার দাসানুদাসদিগের সম্পত্তি এবং অবলম্বন।

সাত্ত্বিক ও সত্য পদার্থমাত্রে চিরকাল ঠিক থাকে; প্রভেদ ও রূপান্তরভাব যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল তাহাদের ধারণা এবং ব্যাখ্যা আখ্যান

প্রভৃতিতে। কাব্যও সত্য এবং সাত্বিক পদার্থ, সুতরাং চিরকাল ঠিক আছে; অথচ একথাও বলা যায় যে, তাহা এপর্য্যন্ত কখনও ঠিক হইল না; অর্থাৎ ইহার ধারণা, বিকাশ, ব্যাখ্যা আখ্যান আদি যথা পূর্ব্বক হয় নাই। সত্য বটে যে, সত্য ও নিত্য পদার্থ যাহা তাহার সম্যক ধারণাদি মানব, জ্ঞানের শেষ সীমায় না পৌছিলে, কখন আয়ত্ত করিতে পারে না এবং মানব-কুলেরও আপাতত সে জ্ঞানসীমায় পৌছানর কোন সম্ভব দেখা যায় না। তথাপি, সম্যক ধারণা কোন বিষয়ের সম্ভাবনা না হইলেও, প্রতি দেশকাল ও পাত্র অনুসারে ধারণাদি অন্তত এরূপ হওয়া চাই, যাহা উত্তরোত্তর পুষ্টি ক্রমে, অন্তে সম্যক ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে;—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'সম্যক' ভাবের পোষক এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে সেই 'সম্যক' ভাবের ছায়া এবং উদ্ভাসক স্বরূপ হয়। ইহা হইলেই, চলিত কথায় তাহাকে ঠিক হইল বলিয়া বলা যায়, তদন্যতরে বেঠিক। এক্ষণে, উপস্থিত বিষয়ে, কথিতরূপ চলিত কথায় ঠিক যে টুকু হইতেছে না, সেই টুকু লইয়াই আমাদের কারবার; এবং সেই টুকু লইয়াই আমাদিগের বাক্‌বিতণ্ডা। পুনশ্চ, আবারও বলি, সময়ে সময়ে বহুতর জগৎপূজ্যগণ উদ্ভূত হইয়া বহুতর কথা বলিয়া গিয়াছেন, বহুতররূপে অন্যান্যবিষয়ের ন্যায় এবিষয়েরও মীমাংসা করিয়াছেন এবং বহুতর ব্যাখ্যাদি করিয়া লোক বুঝাইয়া গিয়াছেন; অথচ দেখা যায়, তাহা-দিগের সময় যেমন অতীত হইল অমনি লোক আর সে কথায় বুঝেনা, আর সে কথায় ভুলেনা, অবার নূতন কথা শুনিতে চায়; কেবল ব্যাখ্যাকারগণের সময় অতীত হইলেই যে এরূপ ঘটনা হয় তাহা নহে, সময় অতীত না হইতেও অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কেন? বাঞ্ছারাম, জিজ্ঞাসা করি তাহারা শুনিতে চাহিবে না কেন, ইহাতে কি আশ্চর্য্য বোধ হয়? যদি হয়, তাহা দুর্ভাগ্য, নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিও। উপরেইত বলিয়াছি যে জ্ঞানের শেষ সীমায় মানব এখনও যাইতে পারে নাই, সুতরাং সে ব্যাখ্যাদি চূড়ান্ত হইবে কেন? জ্ঞানের শেষ সীমায় এখনও যায় নাই, কিন্তু অনবরত অবিরাম গতিতে সেই মুখে যাইতেছে; যেমন অগ্রসর হইবে, তেমনি প্রশস্তভাবের বৃদ্ধি হেতু, অধিক প্রশস্ত এবং নূতন কথার কাজেই মানুষের আবশ্যক হয়। অপরিমিত উন্নতিরূপ

পরিণাম বিশিষ্ট মানবীয় আত্মার ভাবই এই। নতুবা, একই কথায় অথবা একই ব্যাখ্যায় চিরকাল ভুলিতে পারা যায় কেবল এই দ্বিবিধ অবস্থায়;—এক এই, যদি নিত্যগর্ভে আমাদের অবস্থিতি এবং আমাদের শক্তি সর্ব্বতোভদ্র হইত, দূর এবং নিকট যদি এক হইয়া যাইত, এবং কাল যদি তাহার ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাব পরিত্যাগ করিয়া একত্বে আসিয়া দাঁড়াইত; কিন্তু আমাদের তাহার কিছুই নাই, নিকট এবং দূর প্রভৃতি পদার্থে ও প্রতিপদে; গতি আমাদের অবিরত, এদিকে কাল যেমন বহুল বৈচিত্রময়, ওদিকে শক্তি আমাদের তেমনিই অতি ক্ষুদ্র। অপর এই, যদি আমরা কেবল সর্ব্বায়বসম্পন্ন সুমহান্ পাকযন্ত্র মাত্র হইতাম; কিন্তু তাহা হইলে, এই পাকযন্ত্র-গুদাম পৃথিবীতে, শ্রেষ্ঠ পদে এবং শ্রেষ্ঠ যন্ত্র স্বরূপ দাঁড়াইতেন তাঁহারা যাঁহারা এখন হেয় ও অধম মধ্যে পরিগণিত,—সেই গজস্কন্ধ, পরপীড়নোপজীবি, অযত্ন-আহার-কুশলী মহাপুরুষগণ! কিন্তু নিয়ন্তার ইচ্ছা স্বতন্ত্র।

নিয়ন্তাসম্ভব আমাদের এই জীবন সমষ্টি নিতান্ত পাকযন্ত্রস্থ বাষ্পবেগ বিশেষ নহে, অথবা ভাটীতে পঞ্চভূত চোয়ান স্পিরিট বিশেষও নহে। উহা অপরিজ্ঞেয় বিচিত্রশক্তিময়ী, দিব্য, দ্যুতিশালিনী, বিশ্ববিচারিণী, বিধাতৃবিদ্যুৎকণা বলিয়া জানিও। উহা স্বয়ং তুমি আমি হইয়াও, তুমি আমি উহার অন্ত বা তত্ত্ব পাইয়া উঠি না। উহার গতি অনন্তগর্ভ দিয়া। নিয়ন্তা অনন্ত, নিয়ম অনন্ত, জগৎ অনন্ত, কাল অনন্ত, আমাদের জীবনগতি অনন্ত এবং আমাদের জাতীয়জীবন ও মানবীয়জীবন সাধারণের গতিও অনন্ত। কিন্তু এ গতি কোথায়? কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন উদ্দেশ্য-স্থানে? বলিতে পারিনা। কিন্তু গন্তব্য স্থান যেখানেই থাকুক, আমরা অনন্ত গতিতে সেই একই স্থানাভিমুখে যাইতেছি। বাঞ্ছারাম, একটা কথা দেখাইয়া বলি, ইতিহাস পড়িয়াছ কি? প্রাচীন বৃত্তান্ত শুনিয়াছ কি? শুনিয়া থাক যদি তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, জাগতিক জাতি সমূহ, বিভিন্ন পথে হউক, কিন্তু একই গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতেছে কিনা? আমরা যাইতেছি, আমরা সকলেই যাইতেছি; আমদের পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা গিয়াছে এবং আমাদের পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে তাহারাও যাইবে; অনন্তগর্ভ দিয়া যাইবে; আসিয়াছি অনন্ত হইতে, যাইব অনন্তে।

আমরা যে যাইতেছি কোথায়, কোন উদ্দেশ্য হেতু এবং কোন স্থানে, একমাত্র তাহার আভাস প্রাপ্তি ভিন্ন, বস্তুত পক্ষে তাহা আমাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। এই অপরিজ্ঞাত ভাব হইতে, আমাদের অজ্ঞতা ভাবের উৎপত্তি; অজ্ঞতা হইতে প্রয়োজনজালের উদ্ভব। প্রয়োজন অতি গুরুতর পদার্থ, মানব কল্পনাপথে অমানুষিক দেবশক্তি সৃষ্টি করিয়াও, তাহার হাত এড়াইতে সমর্থ হয় নাই;—দেবতারাও প্রয়োজনের দাস। এই প্রয়োজনের স্বরূপ জ্ঞাপন ও অবধারণ হেতুই তত্ত্ব এবং আদর্শ, পুনঃ তদুভয়ের আশ্রয়ে পরিচালক ও পরিজ্ঞাপক নানা বিধ শাস্ত্র; পুনশ্চ, তাহার নিবৃত্তি সাধন হেতু অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম এবং তদুভয়ের আশ্রয়ে আবার মানবীয় নানাবিধ সংসার বৈচিত্র, সংঘটিত ও প্রকটিত হইয়া থাকে।

আমরা যে অপরিজ্ঞাত অন্ধতমসাবৃত পথের পথিক হইয়া চলিয়াছি, সে অনন্ত পথ যে অনন্ত অবস্থা সঙ্কুল হইবে ইহাতে কি আশ্চর্য্য বোধ হয়? ফলত পথ যেখানে অনন্ত, সেখানে অবস্থারও অন্ত নাই। যথায় পিপীলিকাটিরও গমনগতিতে সৌরজগতের দূরতম পিণ্ড বিকম্পিত এবং সৌরজগতের দূরতমপিণ্ডের বিকম্পন ও বিকাশে পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত ভাবান্তর বা ভাগ্যান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং শুভাশুভ, প্রাকৃতিক জড় এবং জৈব, যথায় সর্ব্বদা চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে, তথায় কি আর অগণিত অবস্থা সঙ্কুলতার কথা বলিতে হয়? ভাল, আমরা যে এই নিঃসহায় মানবশিশু সকল সেই অপার অবস্থা সঙ্কুল পথ অতিক্রম করিতে চলিয়াছি, আমরা কি একা? এ পথে আমাদের উৎসাহবর্দ্ধক বা পথদর্শক কি কেহ নাই? হিব্রুজাতি যখন দাসত্ব মোচনে দূর মিসর রাজ্য হইতে স্বদেশাভিমুখে আসিতেছিল, তখন তাহাদের পথপ্রদর্শকরূপে কখন অগ্নিস্তম্ভ, কখন মেঘস্তর, এবং তদতিরিক্তে অমূলত বরাবর মুসাকে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরাও কি কাহাকে পাইতেছিনা? যে ঈশ্বরের করুণায় হিব্রুজাতিরা অগ্নিস্তম্ভ প্রভৃতি ও মুসাকে পাইয়াছিল, আমারাও কি সেই ঈশ্বরের সন্তান নই? যখন আমরাও সেই ঈশ্বরের সন্তান, তখন আমরাও অবশ্য পাইব এবং পাইয়া থাকিও। আমাদের পথ যেমন পর্ব্বে পর্ব্বে বা প্রতি অংশে অবস্থা বিশেষ সঙ্কুল, তেমনি আমাদের পথদর্শকও সময় ও অবস্থা অনুরূপ বহুতর পাইবার কথা। যখন যেমন, যেটি যেমন বিষয়, তখন

তেমন ও তাহার পথদর্শকও তদ্রূপ ;—কেহ ক্ষুদ্র কেহ মহৎ, কেহ পূর্ণ কেহ অংশত, বিষয় যেমন ভেক তেমন ; তাহারই বা বলিয়া সীমা সংখ্যা করিব কত। যাহার বা যে বিষয়ের যেমন মতি, তাহার তেমন গতি এবং পথ-দর্শকও সেইরূপ;—কেহ জোনাকি, কেহ প্রদীপের আলো, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত। যাহাহউক আমরাও আগ্রহ সহকারে, যখন যাহাকে পাইয়া থাকি, তখন তাহাকেই শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলি ও পূর্ব্ব প্রদর্শক অপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা ও গণনা করি ; তাহাকে আদর্শ প্রতিরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার কৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যানে মোহিত হই এবং অধিকন্তু অনেক সময় সহচরদিগকেও মোহিত করিবার চেষ্টা করি। আবার সে সময় সে অবস্থা উলটাইয়া গেল ; আবার নূতন আবশ্যকে নূতন প্রদর্শক পাইয়া, নূতন দেখিলাম নূতন বুঝিলাম এবং তখন হইতে আবার নূতন কথা বলিতে লাগিলাম। যখন মানবীয় জীবনপথ এবং কর্ম্মপথ বাহনের সকল বিষয়েই এই রূপ, সুতরাং তখন কাব্য বিষয়েও এই মত। অতএব বাঞ্ছারাম, কাব্যের যে নিত্য নূতন ব্যাখ্যা শুনিবে এবং আজি শুনিবে ও কালি পরিত্যাগ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? যাহারা এরূপ বাখ্যা করে এবং শুনায় তাহারা ভাল এবং অবশ্য পূজার পাত্র, কিন্তু দোষের মধ্যে কেবল এই টুকু যে তাহারা আপন আপন বাখ্যাকে সম্পূর্ণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে ; বোধ করি তাহার কারণ, অজ্ঞান উপস্থিত হইয়া জ্ঞানের সসীমতা সাধন করিয়া থাকে। অথবা অজ্ঞান মানুষে কখন ছাড়া! যাহা হউক, তথাপি ইহারা পূজার পাত্র। কিন্তু আর যাহারা সূত্র নিয়মাদি রচনে একেবারেই তোমার উত্তর গমনে বাধা দিতে প্রস্তুত, অথবা যে যে জনা দর্শনশূন্য অথচ ভাক্ত ব্যাখ্যায় তোমাকে বিমোহিত করিয়া ভ্রান্ত গতি করাইতে প্রস্তুত, তাহারা? তাহারা ঘৃণার পাত্র ও শাস্তির পাত্র, তথাপি স্বীয় ঔদার্য্যগুণে তাহাদের দোষ ক্ষমা করিয়া যাইও, বিশেষ যেহেতু তাহারাও বৈপরিত্ব সাধনে বিষয়ের মূল্য ও মহিমা প্রকটন করিয়া থাকে।

তুমি কি দেখ নাই মানব জীবন বা জাতীয় জীবনের অবস্থা অনুসারে, সময় অনুসারে এবং গতি অনুসারে, কাব্যেরও স্বভাব এবং প্রয়ো[illegible] কিরূপ বৈচিত্রবহুল হইয়া থাকে? যদি দেখিয়া না থাক, তবে একবা

বিভিন্ন সময় বিভেদে এই ভারতক্ষেত্রস্থ কাব্য সমূহের আলোচনা করিয়া দেখ। রামায়ণ ও মহাভারত, এতৎ দ্বয়ে স্বভাব ভেদ কোথায় এবং কিজন্য, তাহার একবার আলোচনা কর। অথবা তুমি বা নিধুর টপ্পায় মোহিত হও কেন, আর একজন বা মেঘদূত, অথবা অপর একজন তাহাও ফেলিয়া শান্তিশতক লইয়া উন্মত্ত হয় কি জন্য? ইংরাজি সাহিত্য সংসারেও এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে, একবার মিল্টন্‌, একবার পোপ, একবার বাইরণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। উন্মত্ত বিলাসপ্রিয় দলের মধ্যে বাইরণ যত আদরের ততটা আর কেহ নহে।

এ সকলত গেল কাব্যের প্রতি বহির্দ্দৃষ্টি বিষয়ক কথা; এক্ষণে একবার অন্তর্দৃষ্টি কি তাহা একটু দেখা যাউক; অন্তর্দৃষ্টি ব্যতিত বস্তু মাত্রের স্বারূপ্য বোধ কখন সম্পূর্ণ হয় না। অতএব আবার জিজ্ঞাস্য, কাব্য কাহাকে বলে? যদি বলা যায় যে বাক্যকে ছন্দোবন্ধে বদ্ধ করিলে কাব্য হয়; অথবা শুনিয়াছি কবিরা নাকি পাগল, অতএব যদি খেয়াল লিপিবদ্ধ করিলে কাব্য হয়; তবে বঙ্গভূমির এ সংখ্যাশূন্য পয়ার রচকদের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? ইহাদের ছন্দোবন্ধেরও কমি নাই, এবং খেয়ালও ইহাদের অপার; অথবা সমস্তই খেয়াল, পাগলা গারদ হারি মানিয়া থাকে! যদি বলা যায় যে শব্দ-বিন্যাস ও ভাববিন্যাস কৌশলে কাব্য হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি উদ্ভট কবিরা উৎসন্ন হইয়া বাল্মীকি কালিদাস থাকেন কেন? যদি উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা হয়, তবে সৃষ্টির দিন হইতে একাল ধরিয়া কতলোকে নীতি শিখাইল, তথাপি লোকে শিখেনা কেন? বিশেষত পদ্যে এ পাখির ঠোকরে স্থকল ভক্ষণের অপেক্ষা, গদ্যেইত সে কার্য্য ভালরূপে সমাধা হইতে পারে। যদি উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয়,—বঙ্গীয় সাহিত্যবীরগণের নিকট আজি কালি এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি মতই প্রধান অবলম্বনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—সে যাহাহউক যদি উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, সৌন্দর্য্যের স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা যে বঙ্গীয় কবি সে নিজে অসৌন্দর্য্যের পুঞ্জ এবং রাশি হইয়া থাকে কি জন্য? সৌন্দর্য্য আবার সৃষ্টি করিবে কি? অথবা জিজ্ঞাসা করি, সৌন্দর্য্যের সত্যাসত্য ও তাহার পরিমাণ অবধারণ করিবে কি দিয়া? ঈশ্বর গুপ্ত না জীবনকালে তাহার 'সৌন্দর্য্যতে,' দেশ আচ্ছন্ন করিয়া

ফেলিয়াছিল; কিন্তু এখন সে সৌন্দর্য্য কোথায়, আগে এত বাহবা দিয়াছিলাম, এখন একটিবার তাহাকে স্মরণও ত করি না! কেন বাপু কাব্যামোদী বঙ্গীয় বাঞ্ছারাম, তোমার সৌন্দর্য্য জ্ঞান এত তরল, এত চপলা চঞ্চল কেন? বলিবে কি কাল পরিবর্ত্তণের ফল? কিন্তু সত্য সৌন্দর্য্য যাহা তাহা কালে পরিবর্ত্তণ হয় না। তাই বলি, স্থায়িত্বশূন্য, পরিমাণশূন্য, তোমার জলবুদ্বুদ প্রায় এ সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির ফল? কেমন করিয়া এ জলবুদ্বুদের উপর নির্ভর করিতে পারি? এরূপ চঞ্চলপদার্থ লইয়া সত্য প্রতিরূপ সংসারের কোন সত্য কাজ হইতে পারে কি? সৌন্দর্য্য বিশেষণ বাচক বিশেষ্য, কিন্তু উহার আশ্রয়ভূত বাস্তব বিশেষ্য কি এবং কি উপায়ের দ্বারা সত্য সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত পরিমিত এবং স্থায়ী হইতে পারে, তাহার কখনও অনুসন্ধান করিয়াছ কি?

তাহার পর যদি বল খোষ-আমোদ কাব্যের উদ্দেশ্য; তবে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীতে খোষ-আমাদের কিছু কমি আছে কি? সহজেই ত লোকে খোষ-আমোদে আত্মহত্যা করিতে চলিয়াছে; তবে আবার তথায় আগুণে আহুতি দেওয়ার ফল? খোষ-আমোদের সম্বলে কি মানুষ অমর, মানুষ ভক্তি এবং পূজার পাত্র হয়? না এত খোষ-আমোদের পুঞ্জ এবং রাশি মানুষ মাথায় বহিতে পারে? খোষ-আমোদ সম্বলে মানুষ উর্দ্ধ সংখ্যায় প্রিয় হইতে পারে কিন্তু পূজা ও ভক্তির পাত্র কখনই হয় না। তাহার পর, কাব্যের উদ্দেশ্য যদি শ্রুতিবিনোদন হয়, তাহাহইলে সুরমা কর্ণাট রাজপ্রিয়া কালিদাসের কণ্ঠে বামচরণ অর্পণ করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছিলেন; কারণ মধুর কামিনী কণ্ঠের কোমল স্বরের নিকট তোমার কালিদাস প্রভৃতি কোথায় থাকেন। তোমার কালিদাস খোল, আর পশ্চাৎ হইতে তোমার প্রণয়িণী আসিয়া তোমায় প্রিয় সম্ভাষণ করুন, দেখ দেখি একবার জয় পরাজয় কাহার হয়। তবে কি কাব্যের উদ্দেশ্য স্বভাব চিত্রন? স্বভাব চিত্রনেরও কি এত দাম হয়? তাহা হইলে ফটোগ্রাফের মূল্য চারি পয়সা কেন? যদি দেবচরিত, বীর চরিত ইত্যাদি বর্ণনে কাব্য হয়, তবে বর্ণনীয় রাজারাজড়া ফেলিয়া, বর্ণনাকারী কবির আদর এত অধিক কেন? কবেকার হোমার, কবেকার বাল্মীকি, কোথাকার কালিদাস, কতকাল ধরিয়া জীবিত রহিল এবং রহিবে— যাবত চন্দ্র দিবাকর! ভিক্ষোপজীবি, অরণ্যবাসী, সমাজ পরিত্যাগী তাহারা,

তাহাদিগকে আমরা কিজন্য পূজা করি; আর যাহারা তাহাদের রাজ্যেশ্বর ছিল, তাহাদিগকে স্মরণ করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বিস্মৃতির অন্ধতম গুহায় ফেলিয়া দিয়াছি কি জন্য? তাহারা ত তাহারা, তাহাদের সময়কে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষোপজীবিরা!—হোমার এখনও আমাদের হোমার, বাল্মীকি এখনও আমাদের বাল্মীকি। আজি যেমন আমরা 'আমাদের' বলিতেছি, এইরূপ বর্ষ যাইবে, যুগ যাইবে, আমরা যাইব, যুগান্তর পর্য্যন্ত আসিবে যাইবে,কিন্তু তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে 'আমাদের' এই শব্দ কখন যাইবে না। উহা কালের সঙ্গে, গতির মুখে, সময়ের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমান পদে ছুটিয়া যাইবে। বাঞ্ছারাম, স্তুতি গায়ক ও মহিমা গায়ক ভাটের কি এত আদর হয়? হয় মনুষ্য জাতি খেপিয়াছে, নতুবা কবিরা স্তুতিগায়ক বা ভাট নহে; কাব্যও স্তুতি বা মহিমাগান নহে। মানবের জীবনগতি সহ যাহার সম্বন্ধ নিত্য ঘনিষ্ঠ ভাবযুক্ত এবং গুরুতর, যৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনুজ্ঞা যখন অবশ্য পালনীয় এবং পালনীয়ের পালন ফল যখন শুভ, তখন সেই মানবই কেবল পূজনীয় ও ভক্তির পাত্র হয় এবং তাহাকে ভিন্ন মানব অপর কাহাকেও কখন এতটা প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইতে পারে না। ইহা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু 'সৌন্দর্য্য,' 'চিত্তবিনোদন','খোষ-আমোদ' প্রভৃতি কাব্যব্যাখ্যায়, কখন কাব্য ও কবিদিগের প্রতি তদ্রূপ ভক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। বলিতে পার, এপর্য্যন্ত কোন 'সৌন্দর্য্য' বা চিত্তবিনোদক বস্তু বা খোষ-আমোদ, কেবল উহাদেরই খাতিরে উহাদের প্রতি, মানব চিত্তকে চিরস্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? কখনও হয় নাই; স্বীয় হস্তে তাহাদের অপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্তই, তাহাদের প্রতি মানবের আদর এবং আকাঙ্ক্ষা। প্রাপ্তির পরক্ষণ হইতেই, অন্য আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া চিত্ত অধিকার করিয়া বইসে এবং চিত্ত তখন লব্ধ বিষয়ে বীতরাগ বা প্রায় বীতরাগ হইয়া অন্য বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। রামায়ণ বা ইলিওদের প্রতি চিত্তস্থির সর্ব্বজনীন্, সর্ব্বদেশীন্ ও সর্ব্বকালীন্।

বাঞ্ছারাম, উপরে যে সকল সাধারণ প্রচলিত কাব্য-ব্যাখ্যার কথা বলিলাম, কাব্য তাহার কিছুই নহে, অথচ এ সকলেরই সমাবেশ কাব্যের গঠনে আবশ্যক হয় বটে। কাব্যের বিষয়ীভূত বস্তু যাহা তাহা উহা হইতে স্বতন্ত্র; তাহা

দিব্য, অপৌরুষেয়, এবং অনন্ত দিঙ্‌ময়। অন্তবদ্ধ মানবচক্ষু বা হৃদয়ের ধারণা উপযোগী তাহার সামান্ত পার্শ্বিক দেশ মাত্র,এক এক সময়ে,আবশ্যক অনুসারে, ক্ষণানুসারে, প্রকটিত হইয়া থাকে। উপরে উক্ত পদার্থ সমূহের সমাবেশে যে গঠনের কথা বলিলাম, যথন সেই গঠনের মধ্যে এই দিব্য বস্তুর সঞ্চার হয়, তথনই তাহা জীবন্ত কাব্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগতকে পবিত্র করিতে থাকে। ইহার অন্তত্তর হইলে, তাহারই বা কিরূপ আদর,কিরূপ সম্মান, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব; অলঙ্কার শাস্ত্র যাহাকে যাহাকে কাব্যের গুণ এবং শ্রেষ্ঠত্ববাচক লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া থাকে, ভট্টনারায়ণ তাঁহার বেণিসংহারে তাহাদের সংগ্রহে কিছু মাত্র যত্নের ক্রটি করেন নাই;—এমন কি, আলঙ্কারিকদের মতে কালিদাসে দোষ আছে তথাপি ভট্টনারায়ণে দোষ নাই। কিন্তু তথাপি দেখ, আলঙ্কারিক মতে 'দোষ' সত্ত্বেও কালিদাস কত উপরে, আর ভট্টনারায়ণ গুণ সত্বেও কত নিচে! বস্তুত এখানে প্রভেদ যাহা তাহা এই,—ভট্টনারায়ণ কেবল পররুচি পরিতোষক বেশভূষা ও বাহির চটকে বলীয়ান, কিন্তু কালিদাস বলীয়ান আপ্তপদার্থে। স্বোৎপাদিত যে কোন পদার্থের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা পক্ষে, পররুচি পরিহারে স্বীয় রুচির সাত্ত্বিক তৃপ্তিই, পরিমাণ এবং পরিচয়ে গরীয়সী। জীবন্ত মানব আর সজ্জিত পুতুলে অনেক তফাত—যথার্থ কাব্য এবং সাধারণ প্রচলিত কথিত ব্যাখ্যাতেও তেমনি তফাত! কিন্তু হইলে কি হয়; বঙ্গীয় সাহিত্যবীরেরা এখন ঐ সাজ সজ্জাকেই মূল পদার্থ ভাবিয়া তদর্থে ক্ষিপ্তবৎ, রাশি রাশি অনুরূপ কাব্য উদ্গীরণ করিয়া ফিরিতেছেন। বলি, তাহাও কি ভাল সাজ সজ্জা? তাহা নহে,—ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙ্গা টুকরী, এই সব!

যে দিব্য পদার্থসঞ্চারে যথার্থত কাব্য হয়, সে দিব্য পদার্থ কি? অথবা বুঝিতে পার কি, কি গুণের জোরে দে-লিলি তাহার মার্সিলীয় সঙ্গীতে আজি পর্য্যন্ত ফরাসী জাতিকে স্বদেশ হিতৈষিতার উল্লাসে উল্লাসিত ও উত্তেজিত করিয়া থাকে? কি গুণে বা দেল্‌ফির দৈবনির্দ্দিষ্ট ত্রিচক্ষু সেনাপতি, রণকার্যে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্বেও, কেবল এক সঙ্গীতামোদে মাতাইয়া গ্রীকসৈন্যদিগকে রণজয়ে সমর্থ করাইতে সক্ষম হইয়াছিল? অনেকেই ত সঙ্গীত রচনা করে,—বিশেষ ত এদেশে জেলে মালো পর্য্যন্ত,—কিন্তু তাহার সঙ্গীতে এ অভূতপূ

ফল ফলিল কি জন্য? কি গুণে বা হোমারীয় স্তোত্রসমূহ দেবমন্ত্রে পরিণত হইয়া, গ্রীকজাতিকে সুপথে এবং ধর্ম্মপথে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে? অথবা ইলিওদের কোন্ গুণ হেতু,জগতজেতা আলেক্‌জাণ্ডার তাহাকে শিওরে করিয়া জগত বিজয়ে সক্ষম হইতে পারিয়াছিল? সে গুণ কি তাহা বলিতে পারিবে কি? পার বা না পার এবং তাহার নাম যাহাই হউক, তাহাকেই কাব্যের মূল পদার্থ এবং তাহাকেই কাব্য বলিয়া জানিও।

উপরে আভাসিত করিয়াছি যে, মানব মাত্রে এই পৃথিবীতে বাস কালীন নিয়ত প্রয়োজন জালে বেষ্টিত। এই প্রয়োজন হইতে আমরা জগতরূপী কর্ম্ম ক্ষেত্রে সকলেই কর্ম্মরত। যে অপরিজ্ঞাত অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথ দিয়া আমাদের জীবনগতি; সে পথকে যথাসম্ভব বাহিতব্য করিতে কর্ম্মপ্রবৃত্তিই কেবল একমাত্র উপায়। এজন্য ইহাকে কর্ম্মপথও বলা যায়। অনন্ত পথ, অনন্ত গতি; সুতরাং আমাদের ক্ষান্তি নাই, বিরাম নাই, অনবরত অনন্ত কর্ম্মপথে প্রধাবিত হইতেছি। কালচক্র বাহিয়া এই কর্ম্মপথের স্থিতি। কালচক্রেরও চক্রধর্ম্মানুসারে আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি আছে। এই দ্বিবিধ গতিবশে, এবং কর্ম্মপথের অবস্থাবৈচিত্রবিশিষ্ট ভাব হেতু,আমাদের জীবন যাত্রায় নিত্য অবস্থাবৈচিত্র ও নৈমিত্তিক অবস্থাবৈচিত্র ঘটিয়া থাকে। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতিগত জীবন, উভয়ের পক্ষেই এ কথা সমান প্রযুক্ত। আমরা প্রত্যেকে এবং প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক জাতি, সকলেই, দেশ কাল ও স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে, আমাদের কর্ম্মপথে প্রতিনিয়ত নিত্য বা নৈমিত্তিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে বা অবস্থান্তর ঘটনে, বিপ্লবপতিত হইয়া, পথবিতথের ন্যায় আকুলিত এবং রোরুদ্যমান হইয়া থাকি; অথচ সে বিপদের কিছু নিরাকরণ বা তাহার উপায় কিছু নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। যদি সকলেরই সে সামর্থ্য থাকিত,তাহা হইলে আজি এই পৃথিবী স্বর্গভূমী এবং মানব দেববৎ হইত; কিন্তু সে আশা এখনও অনেক দূরে। আপাতত আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষাই সার। কি যেন বলিব বলিব করিতেছি, অথচ বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কি যেন ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, অথচ কি জন্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কি যেন খুজিয়া খুজিয়া শ্রমবিধ্বস্ত হইতেছি, অথচ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বস্তু কিরূপ, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। এক কথায় একে ক্ষীণবুদ্ধি,

তাহাতে কোথায় যাইতে হইবে তাহা জানি না ; মূঢ়ের ন্যায় আঁধারে পড়িয়া দিগ্বিদিক শূন্য হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি ; অথচ কিন্তু কাল আমাদিগের পশ্চাৎ হইতে, পাছে পশ্চাৎ হইয়া পড়ি বলিয়া, অনবরত বেত্রবিকম্পনে তাড়না করিয়া চলিয়াছে। যেন বস্ত্রবদ্ধনয়ন মানব, প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অথচ যাইবার জন্য উত্যক্ত্য, যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকেই প্রাচীর কপালে ঠুকিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে ; তথাপি কিন্তু যাও যাও করিয়া বেত্রাঘাতের ত্রুটি হইতেছে না। এরূপ অবস্থা, কি ব্যক্তি গত জীবন, কি জাতিগত জীবন, উভয়েতেই সমান আসিতেছে ও যাইতেছে বটে ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি একবার ইহা কি ভয়ঙ্কর, কি শোচনীয় অবস্থা। এরূপ অবস্থায় কে কতদূর এই দুর্ব্বিপাক নিরসনে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে, কে কে বা নিষ্কৃতি পাইবার পূর্ব্বেই পৃষ্ঠ ভাসান দেয়, তাহা মানবের স্ব স্ব কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

মানবজীবনের আধিভৌতিক অংশের বিকাশ অনুষ্ঠানে, এবং অনুষ্ঠান যাহাতে স্বীয় উচ্চ সীমাকে প্রাপ্ত হয় তাহা পূর্ণ কর্ম্ম। যেমন চৈতন্য ব্যতীত জড়ের গতি অসম্ভব ; তেমনি আধ্যাত্মিকগুণের অবলম্বন ব্যতীত, আধিভৌতিকভাগ সুতরাং অনুষ্ঠান অসম্ভব এবং অনুষ্ঠানের অসম্ভবে কর্ম্মও অসম্ভব হয়। আধ্যাত্মিকগুণের প্রতিভাস ও শাসনকে অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠানাদির উৎপত্তি, স্থিতি এবং গতি। কর্ম্মেও পর পর ক্রমোন্নতি বা উত্তর গতি আছে ; সেই উত্তর গতির পর্য্যায় বিশেষের আরম্ভকালের উদয়ে, যখন আধ্যাত্মিকগুণের আবার নব প্রতিভাস ও নবশাসনের আবশ্যক কাল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্ব প্রতিভাস ও পূর্ব্বশাসনের কার্য্য যখন অবসান হইয়া আইসে ; তখন তদুভয় প্রতিভাসাদির সন্ধি সময়ে, মানব কর্ম্ম-পথে দুর্ব্বিপাক বা বিপ্লবপতিত হইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ব্বিপাক যখন সামন্য, তখন অনেক সময়ে স্বীয় চেষ্টাতেই তাহাকে উত্তরণ করা যায় ; আবার কখন বা সামান্য এবং গুরু, যাহাই হউক, দুর্ব্বিপাক উত্তরণে পর সাহায্যের আবশ্যক হইয়া উঠে।

যাঁহারা এরূপ দুর্ব্বিপাক-পতিতকালে, দুর্ব্বিপাকের নিরাকরণ করিয়া, আধ্যাত্মিকগুণের নবপ্রতিভাস দানে এবং নবশাসন জ্ঞাপনে বা নবপ্রবৃত্তিমা

প্রবর্ত্তনে উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এজগতে ধন্য এবং যথার্থ সাধুবাদের পাত্র। প্রাচীরবেষ্টনে আবদ্ধ ও বদ্ধ চক্ষু এবং বেত্রাঘাত পীড়িত মানবকে যে ব্যক্তি সহসা চক্ষুমোচন করিয়া নিরাপদ ও যথাগন্তব্য মুক্তি স্থানের সুধাভাস দিয়া থাকে ; সে ব্যক্তি সেই বন্ধনমুক্ত ব্যক্তির নিকট, কত যে কৃতজ্ঞতা, কত যে ভক্তির পাত্র হইবার সম্ভব, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখেনা। মানব জীবন, জাতীয় জীবন, ইহাদেরও কর্ম্মবিপাক হইতে তদ্রূপ উদ্ধার কর্ত্তা যাহারা, তাহারাও সেইরূপ এবং হয় ত তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়। এই সংসারে কবি এবং তত্ত্ববিদ্ প্রভৃতিগণ, যাঁহার যেমন দৃষ্টি চালনার শক্তি, যাঁহার যেমন ক্ষমতা ; দেশ কাল পাত্র অনুসারে, তাঁহারা যথাসাধ্য এই সুমহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন বলিয়াই, সংসার তাঁহাদিগের নিকট এত কৃতজ্ঞ, তাঁহাদিগের প্রতি এত ভক্তি দেখাইয়া থাকে। এবম্বিধ সুমহৎ কারণ ভিন্ন,মনে কর কি, এতটা কৃতজ্ঞতা এতটা ভক্তিপ্রদর্শন অন্যতরে কখনও সম্ভব হইতে পারিত ? এ অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে কাহাকে কবে সহজে বিনত হইতে দেখিয়াছ ? ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি ঢাকিয়া রাখিবার নয় বলিয়াই লোকে ঢাকিয়া রাখিতে পারেনা। বস্তুত ইহারা যথার্থই অপরিসীম ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র এবং সেই জন্যই,রাজা ও রাজপুরুষ আদি সকল ফেলিয়া, সকলকে ভুলিয়া, লোকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নাম স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখে। সেই জন্যই হোমার ভিক্ষুক হইলেও, হোমারের রাজ্যেশ্বরকে ফেলিয়া হোমার চিরস্মরণীয় ; সেই জন্যই আর্য্যঋষি চিরকাল ভিক্ষা-অন্ন উপজীবি এবং জঙ্গলবাসী হইলেও, লোকসমাজে দেববৎ পূজ্য। প্রকৃত পক্ষে এ সংসারে, ইহাদের সঙ্গে রাজা ও রাজপুরুষদের এরূপ সম্বন্ধ,—ইহারা কর্ম্ম-নির্ব্বাচক এবং নিয়ামক ও তাহার প্রণালী প্রদর্শক ; রাজা ও রাজপুরুষ প্রভৃতি, তদনুযায়ী, কর্ম্মকারকবর্গের কেবল সর্দ্দারমাত্র। তাঁহারা নিয়মবন্ধন করিয়া দিয়া থাকেন, রাজা ও রাজপুরুষেরা সেই নিয়ম অনুসারে লোক সকলকে খাটাইয়া লইয়া থাকে এবং তদাদেশিত উপায় অনুসারে কর্ম্মপথের বাহ্য বিপদ নিরসন করিয়া দেয়। এখন বুঝিলে, কেন তোমার রাজা রাজড়াকে ফেলিয়া কবি ও তত্ত্ববিদাদি চিরস্মরণীয় ও পূজনীয় হইয়া থাকেন ?

যেমন আধিভৌতিক সংসারে নানারূপ কার্য্যবিভাগ, শ্রমবিভাগ, পর্য্যায় বিভাগ, এবং কারকগণের মধ্যে চালক ও চালিত বিভাগ, ইত্যাদি নানা বিভাগ দৃষ্ট হয়; আধ্যাত্মিক সংসারও অবিকল ঐরূপ বহুবিভাগে বিভাজিত হইয়া, যথানিযুক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক সংসারের বহুবিভাগ হইতেই, বহু তত্ত্ব ও বহু শাস্ত্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে। এই বহু তত্ত্ব ও বহু শাস্ত্রাদি, বাহিকে কিছু কিছু বিরোধী ভাব যুক্ত হইলেও, মূলদেশে সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপোষক, এবং পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া স্থিত এবং বর্দ্ধিত। ইহাদের আয়তন ও সমষ্টি যাহা, তাহাই মানবের উপস্থিত জ্ঞান-সংসার ও জ্ঞান-সমষ্টি। মানবের এই জ্ঞান-সমষ্টি, মানবের যাবতীয় কর্ম্মের উৎপাদক, শাসক এবং বর্দ্ধক। জ্ঞান-সংসার ও জ্ঞান-সমষ্টি উচ্চ পদবীগত হইলেই, 'ধর্ম্ম' আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। সে কথা এখন যাউক, সাধারণ জ্ঞান-সংসারের কথা বলিতেছি;—বলা বাহুল্য যে কাব্যও, মানবীয় এবম্বিধ জ্ঞান-সংসারের একটি প্রধানস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক যে, কোন্ স্থান এবং কিরূপে তাহার অধিকৃত; তাহা হইলে, কাব্য যে কি পদার্থ তাহাও সেই সঙ্গে অনায়াসে স্পষ্টীকৃত হইয়া আসিবে। অন্যান্য শাস্ত্রের সহ কাব্যের সম্বন্ধ এরূপ,—যে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে, কাব্য বহির্দ্দৃশ্যত পূর্ণ ছবি এবং অন্যান্য শাস্ত্র তাহার সমগ্রত বা অংশত ভিতর ও বাহিরের তত্ত্ব প্রকরণাদি। মনে কর, সম্মুখে একটি গাছ দেখিলে; দেখিবামাত্র তোমার চক্ষু ও চিত্ত সমক্ষে যে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন সুন্দর, নয়নতৃপ্তিকর ও মনোহর অক্ষুণ্নমূর্ত্তি গাছের পূর্ণছবিটি পড়িল, সেই পূর্ণছবিটিই কাব্যস্থলীয়; সেই গাছকে কার্য্যহেতু আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত তাহার বাহিক ও আভ্যন্তরীণ বিবরণ ও তাহার শারীরস্থান প্রভৃতির তত্ত্বাদি যাহা, তাহার নাম তত্ত্ববিদ্যা; তদনন্তর সে সকলের আবার খণ্ডতত্ত্ব, আয়ত্তের প্রকরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি অপরাপর নানা বিষয় লইয়া নানা শাস্ত্রীয়বিষয়ের সম্ভব হয়। এক্ষণে উপমা ছাড়িয়া আদৎ বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া দেখ। কর্ম্মসংসারের যে বিশেষ কর্ম্মসমূহ, বা কর্ম্ম বা কর্ম্মাংশ, বা অংশের অংশ, অথবা যে কোন ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অংশ, ইহাদের দৃশ্যত যে পূর্ণ ছবি, তাহার নাম কাব্য; তাহার সমগ্রতত্ত্ব, অংশতত্ত্ব, খণ্ডতত্ত্ব, প্রকরণ ও প্রক্রিয়া, আরো

জন ইত্যাদি যাহা, তাহা লইয়া তত্ত্বশাস্ত্র ও অপরাপর তাবৎবিধ শাস্ত্র। তত্ত্বশাস্ত্র যখন গাঢ়তর ও গুরুতর বিষয়ের হয়, তখন তাহা, এমন কি, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ফলত সেরূপ অবস্থায় উত্থিত তত্ত্ববিদ্যার আসন প্রথম, কাব্যের আসন দ্বিতীয়; তন্নিম্নে অন্য সমস্ত শাস্ত্র। সাধারণ তত্ত্ববিদ্যা কাব্যের সহ সমান আসনে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কাব্য যদি কর্ম্ম বিশেষের পূর্ণ বাহ্য ছবি হয়; তবে তাহা কেমন করিয়া নানা গল্প ও নানা বিষয়ের বর্ণনাময়ী কাব্য নামধারী পদার্থে খাটিতে পারে? এ অরসজ্ঞ কথার উত্তর নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য যথার্থরূপে পড়িয়াছে এবং বুঝে, সে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইবে যে, কাব্য যে উপায় অবলম্বনেই প্রকটিত হউক না কেন, তাহার মধ্যে আমূলত কবিকৃত এক বা তদধিক বিষয়ের অক্ষুণ্ণ দৃষ্টি ও দৃশ্যবিশেষ পরিচালিত হইয়া রহিয়াছে। যাহাতে তাহা সেরূপ থাকে না, তাহা বাহ্য অবয়বে যতই কাব্য বলিয়া আপনাকে পরিচিত করুক না কেন, তাহা কাব্য নহে। কাব্যাকাব্য নিরূপণের ইহাই একমাত্র সঙ্কেত। কর্ম্ম যখন ভাল মন্দ, সুন্দর বিভৎস্য, ইত্যাদি সকল রকমেরই আছে, তখন কর্ম্ম-ছবি অর্থাৎ কাব্যও তথাবিধ যে কোন ভাব ও রসোদ্ভাসক হইতে পারে। পুনশ্চ কাব্যে যে কর্ম্ম-ছবি দেওয়া হয় তাহা আবার, যে কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে বা যাহা হইতেছে এবং যাহার ছবি পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ কর্ম্মের হইলে, তেমন বড় একটা কাজে লাগে না; সুতরাং তাহা প্রকৃত কাব্যস্থলীয়ও হয় না। তাহা কেবল সাময়িকভাবে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গেরই, ক্ষণমাত্র চিত্তভৃপ্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ কাব্যের কবিরা সাময়িক কবি; এরূপ সাময়িক কবি যেমন অনেকই হইয়া থাকে, তেমনি সময় পরিবর্ত্তনে আবার তখনই বিলীন হইয়া যায়। পুনশ্চ কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে বিজাতীয় ধর্ম্মানুগত যে কর্ম্ম, তাহার ছবিও ততটা কার্য্যকরী হয় না; তবে তাহাও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইলে, তাহার প্রতি সাহানুভূতি বিস্তর জন্মিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এ কর্ম্ম-ছবি প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত কিরূপ কর্ম্মের?—যে কর্ম্ম অনাগত, যাহার সহ পূর্ব্বগত কর্ম্মের সন্ধিস্থলে মানব সমাগত হইয়া কর্ত্তব্য দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলিত হইতেছে। এমন স্থলে যে কর্ম্ম-ছবি দেওয়া, তাহা অকূলেতে কূল দেখাইয়া

দেওয়ার ন্যায়; সুতরাং সে কর্ম্ম-ছবি পরম আদরের পদার্থ ও ছবিদাতাও পরম ভক্তির পাত্র হইয়া থাকে। এরূপ ছবির যে আবশ্যকতা, তাহা কালে অতীত হইলেও, তথাপি কৃতজ্ঞতা হেতু তাহার ও তৎকর্ত্তার প্রতি আদর ও ভক্তির ক্রটি অতি অল্পই হয়। এই ছবি এসংসারে যে যেমন উচ্চেতর কার্য্যের অথবা কার্য্যাংশের এবং যত পরিমাণে, যে ভাবে ও যেমন পূর্ণ বা অপূর্ণ মাত্রায় প্রদান করিয়া থাকে, তাহার ও তাহার দত্ত পদার্থের প্রতি আদর এবং ভক্তিও সেই পরিমাণে নিরূপিত হয়। হস্তি এবং মশক উভয়ই সৃষ্টি হয় ও দৃষ্টিপথেও পতিত হইয়া থাকে এবং এই সাংসারিক কল কৌশলে কেনা বলিবে যে উভয়েরই যথোপযুক্ত ব্যবহার আছে। পুনশ্চ, তত্ত্ববিদ্ এবং কবি, এ উভয় পদবীই যে একাধার বিশেষে নিহিত হইয়াছে, তাঁহারাই যথার্থ এজগতে সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকজন্মা। এবং যাঁহাতে যাঁহাতে এই উভয় পদবী প্রতিষ্ঠিত অথচ পদবীদ্বয় অতি উচ্চ গুণাবলম্বী, তাঁহারা প্রায়ই এজগতে দেবপদে বরিত ও তাঁহাদের শিক্ষা ধর্ম্মরূপে গৃহিত হইয়া গিয়াছে।

২

জাতীয়ধর্ম্মী অনাগত যে কর্ম্ম-ছবি তাহাকেই সাত্ত্বিক ও যথার্থ কাব্য পদে গণনা করা যায়। উহা অনাগতের ছবি বলিয়াই ঐ ছবিকে আদর্শমূর্ত্তি বলা যাইতেছে। অতএব এখন এক কথায় বলিতে গেলে, যে কোন বিষয়ের আদর্শমূর্ত্তির নাম কাব্য। এক্ষণে আবার বলা দ্বিরুক্তি মাত্র হইবে যে, আদর্শমূর্ত্তিই আমাদের কর্ম্ম সম্পর্শক অথবা অন্য কথায় কর্ম্মকেই উহার প্রকাশ এবং বিকাশ বলিলে হয়। কর্ম্ম পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে, আদর্শমূর্ত্তির সিদ্ধতা। আমরা কর্ম্মরত জীব এবং কর্ম্মই এ জীবনের পরিমাণ, সুতরাং কর্ম্মেই সুখ, এবং আদর্শমূর্ত্তির সিদ্ধিতে সেই সুখের পূর্ণতা। সেই সুখ ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন শ্রেষ্ঠ সুখ নাহি। আমি বুঝিতেছি বাঞ্ছারাম, তুমি এ কথায় বিশেষ চটিতেছ, বিশেষত তুমি যখন সুখের ভিত্তি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহ্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য এ বয়স ধরিয়া নানা ফিকিরে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছ। তুমি ভাবিতেছ সুখ যাহা তাহা বাহ্য সম্পদে। বাঞ্ছারাম, সম্পদে যদি সুখ থাকিত তবে রাজা কাঁদে কেন

হ্রাসে কেন? সম্পদের যে সুখচিত্র তাহা যতক্ষণ না আয়ত্ত হয়, ততক্ষণই তাহা মোহিত করিতে থাকে; কিন্তু আয়ত্ত একবার হইলে আর তাহার সে মোহিনী শক্তি থাকে না। যাহার সম্পদ নাই সে ভাবিতেছে সম্পদ একবার সংগ্রহ হইলে, তাবৎ সুখ করতলের মধ্যে প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যেখানে সম্পদ আছে সেখানে তাহা এবং তাহার সাহায্যে আর যাহা কিছু হইতে পারে, সে সকল চলিত বিষয়ের মধ্যে পরিণত হইবায়, এক অর্থের সদ্ব্যাবহার ভিন্ন, অন্য কোন প্রকারেই কোন বিশেষ সুখের উৎপাদন করে না। স্ব স্ব অবস্থায়, সম্পদবান ও সম্পদশূন্য উভয়ই সমান অনভিজ্ঞ ও সমান দৃক্পাত শূন্য; স্বীয় স্বীয় অবস্থার অতীত দৃষ্টিরূপ আগুণে উভয়ই সমান দগ্ধ; সুখ লালসাও উভয়ের সমান,প্রভেদ যাহা কিছু তাহা কেবল প্রার্থিত সুখের ধারণা ও প্রকরণে। অর্থের সদ্ব্যবহারে যে সুখ হইয়া থাকে, অর্থ না থাকিলেও সে সুখ হইতে পারে; অন্তত বাসনা ও ইচ্ছার সদ্ব্যবহারের দ্বারা। যথার্থ সুখ যাহা তাহা চিত্তের তৃপ্তি; সে সুখ এক যথাশক্তি সাত্বিক কর্ম্মানুসরণেই লাভ হইতে পারে; সে সুখ রাজা প্রজা সকলেরই নিকট সমান সুসাধ্য। যদি এরূপ সমান সুসাধ্য না হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির অবিচার ফলে লোকজগৎ কথনই তিষ্ঠিত না এবং ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিত। দেখা গিয়াছে ধনী দশ সহস্র অর্থদান করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হয়,নিজ আহারের অংশ হইতে মুষ্টিভিক্ষা দানে নির্ধন যে সে তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখের ভাগী হইয়াছে। কেবল এই সমতা হেতুই, উচ্চ নীচ নানা পর্য্যায়ে নানা বৃত্তি রত হইলেও, লোক সকল যথাশক্তি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বাঁচিতেছে; নতুবা বাঁচিতনা, ফাটিয়া মরিত। পুরস্কারের এই সমতা হেতু, ঐশ্বরিক শাসন ও দয়ারও সর্ব্বজনীন্ সমদর্শিতা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতঃপর, লোকের অবস্থা বৈষম্য যাহা কিছু, তাহা কেবল তাহাদিগের প্রতি ন্যাস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মের উপকরণ বৈষম্য হইতে, ইহা জানিবে।

যে সুখকে চিত্রের তৃপ্তি বলা গেল, তাহার চরমোৎকর্ষ ভাবের প্রাপ্তি, আরব্ধ বিষয়েতে আদর্শমূর্ত্তির যথাযগ্য অনুসরণ ব্যতিত হয় না। তোমার বাহ্যসম্পদ জনিত সুখ বা তাস দাবা জনিত আমোদ প্রমোদের জন্য, কয়জন লোক আত্ম উৎসর্গ করিয়াছে ও বলিদান দিয়াছে;

কিন্তু আর দেখ, আমি যে আদর্শ মূর্ত্তির কথা বলিতেছি, সেই আদর্শমূর্ত্তির খাতিরে কত অসংখ্য! নাম শুনিতে চাও, বুদ্ধদেব দেখ, যিশুখৃষ্ট দেখ, অথবা তাহার নিম্নে সক্রেটিস্ দেখ, মধ্যযুগের খৃষ্ট শিষ্যদিগকে দেখ, ইত্যাদি। এ সকল বড় বড় নাম, ইহাদের অবলম্বিত আদর্শ মূর্ত্তিও সহসা মনে ধারণা করা সুকঠিন। অতএব যাহা তোমাতে আমাতে প্রযুক্ত হইতে পারে এরূপ, অর্থাৎ অলৌকিক সদৃশ ছাড়িয়া লৌকিক সদৃশ ছোট ছোট নাম দেখিতে চাও, তবে ইতিহাস খোল; অথবা যদি চক্ষু থাকে, তবে তোমার পার্শ্বস্থ কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; দেখিতে পাইবে, স্নেহ, প্রণয়, ধর্ম্ম বা সৎকার্য্য বিশেষের খাতিরে, কত জন অখেদে সর্ব্বস্বান্ত ও জীবনান্ত করিতেছে। আরও ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, রূপক ভাবে হউক বা সত্য ভাবে হউক, আলোক-আকৃষ্ট পতঙ্গদিগের প্রতি নিরীক্ষণ কর; দেখ আকাঙ্ক্ষিতের খাতিরে তাহারা আপন প্রাণ কেমন অকাতরে বলিদান করিতেছে। যেমন এক একটা আদর্শ-মূর্ত্তির খাতিরে জীবকুল প্রাণোৎসর্গ করে; তেমনি আদর্শ-মূর্ত্তিরও এক একটার এমনই প্রভাব যে, তাহা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে সমস্ত জগতকে রূপান্তর পরিগ্রহ করাইয়া থাকে। এই আদর্শমূর্ত্তি, যাহার কথা বলিতেছি, তাহাকেই কাব্যবলে এবং এই জন্যই এ সংসারে কাব্যের এত আদর ও কাব্য লইয়া সংসার এত পাগল। সৃষ্টির দিন হইতে আঙুল গণিয়া দেখ দেখি, কাব্য বিষয়ে চিরস্মরণীয় নামের সংখ্যা কত অল্প! কিন্তু বঙ্গসন্তানেরা তাহা বুঝে না, বুঝিলে সেই কবি নাম জনে জনে সকলেই সংগ্রহ করিতে এত ব্যস্ত হইবে কি জন্য!

কাব্য অপার, অনন্ত, এবং ইহার ভাণ্ডারও ক্ষয়রহিত। আঢ়কধারী স্বয়ং অনন্ত দেব। এমন সংসারে, গ্রাহক এবং বাহকও যে অনন্ত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রাহকেরা গ্রহণ করিতে পারিলে এবং তজ্জন্য সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেই, বাহক প্রস্তুত। যদৃচ্ছা এ সংসারে বাহক আসিয়া উপস্থিত হয় না, তজ্জন্য গ্রাহকবর্গের প্রস্তুতি আবশ্যক করে। তবে এই বলা যাইতে পারে, অনন্তের এ অপার উন্নতির সংসারে গ্রাহকও বরাবর প্রস্তুত হইবে, বাহকও বরাবর আসিতে যাইতে থাকিবে। কিন্তু তথাপি অনেক মূর্খ,

অনেক আলোকাজ্ঞ আছে যে, যাহারা বলিয়া থাকে যে মানুষের উন্নতির সঙ্গে কাব্য পদার্থের ক্রম-উৎপত্তিক্রিয়ার হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতে হয়, যখন আরও অধিক উন্নতি এবং মনুষ্য আরও অধিকসভ্য হইবে,তখন কাব্যও প্রায় একেবারে হ্রাস হইয়া যাইবে। অতি সুবোধের কথা, যেন আমরা সৃষ্টি এবং কাল, উভয়েরই শেষ সীমায় আসিতেছি; কাল ভগ্নপদ হইতেছে,সুতরাং যেন এইখানেই আমাদের সকল সভ্যতার চরম হইতেছে! উন্নতি! উন্নতি! এ উন্নতি আমার নব্য বঙ্গসন্তানের "উনবিংশ শতাব্দি" বিশেষ; কাহার ঘাস জলে কাহার জাঁক! উন্নতি কাহাকে বলে? যখন আমাদের চূড়ান্ত পরিণাম কি তাহা আমরা এলোকে থাকিয়া দেখিতে পাই না, ভবিষ্যৎ যখন কালগর্ভে নিগূঢ় ভাবে আবরিত, তখন উন্নতির প্রকৃত অর্থ কি ও কোথায় তাহার সীমা, তাহা অবগত হওয়া কি আমাদের সাধ্য সম্ভব হয়? তবে আমাদের সাধ্যে যতদূর, তাহাতে আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিতেছি যে, আশু হইয়া একটা গন্তব্য স্থানাভিমুখে আমরা চলিয়াছি এবং কাল আমাদিগকে সেই পথে ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে; এমন স্থলে কালের সহ আমাদের গতির সামঞ্জস্য রক্ষাকরা ভিন্ন উন্নতি অর্থে আর কি বলিব! কাল যখন যে ভাবে ক্রমান্বয়ে আগত ও গত হইতেছে, তখন তাহারই উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হওয়াকে উন্নতি বলা যায়। বঙ্গসন্তান, একথায় 'সময়-সেবক' ভাব বা সাহেব-সেবা আদি অর্থ করিয়া লইও না; কাল সত্য পদার্থ, সুতরাং সত্যবুদ্ধিতে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, সে সত্য বুদ্ধির নিকট ওসকল স্থান পায় না।

আমাদের চলিত উন্নতির ধারণা আপেক্ষিক। ঘোড়ার গাড়ি ছাড়িয়া রেলের গাড়ি পাইয়া ভাবিতেছ, আজি তুমি অত্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়াছ; কিন্তু তুমি জানিও, মানবমণ্ডলী যেদিন গরুরগাড়ী ছাড়িয়া ঘোড়ারগাড়ী পাইয়াছিল, তাহারাও সেদিন অবিকল সেইরূপ ভাবিয়াছিল। আবার যেদিন লোকে রেলের গাড়ী ছাড়িয়া হাওয়ায় চলিতে শিখিবে, পাখির পাখনার ন্যায় পক্ষভর করিতে পারিবে, সেদিনও তাহারা অবিকল সেইরূপ ভাবিবে। অতএব ভাবনারও অন্ত নাই, কালেরও অন্ত নাই, সুতরাং উন্নতিরও অন্ত নাই। ইহারা তিনই সৃষ্টির দিনে একসঙ্গে বাহির হইয়া-

ছিল, তিনই একসঙ্গে এরূপে সমান পদে চলিয়া আসিয়াছে, এবং তিনই সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত একসঙ্গে এরূপে সমান পদে চলিয়া যাইবে; ঐ তিন পদার্থের মানবসৃষ্টি সহ অপরিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দুর্দ্দমনীয় কালই এ সকল নষ্টামির মূল; আপনিও নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে, আমাদিগকেও ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। যদি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিলাম, তবেই ভাল, তবেই উন্নতি; নতুবা অধঃপতন। কাল সহ সমান পদে গমন করিতে হইলে, কাল কর্ত্তৃক প্রতিপদক্ষেপে আনীত যে সকল প্রয়োজন ও অভাবরাশি, তাহার পরিপূরণ করিতে হয়; অতএব উন্নতি শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইহা আরও উচ্চতরভাবে ও অধিক পরিমাণে কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মবিস্তার; সুতরাং আরও উচ্চতরভাবে ও অধিক পরিমাণে আদর্শমূর্ত্তির পরিপোষণ ও সাংসাধন। এমন স্থলে, বাঙ্গারাম, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, উন্নতির সঙ্গে কাব্যহ্রাসতার সম্বন্ধ কি? উন্নতির সঙ্গে বরং দেখা যাইতেছে যে কাব্য আধিক্যেরই সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তোমার যুক্তি, এবং তোমার প্রিয় যুক্তি এই যে, যখন আমাদের অত্যুন্নতিকাল, তখন চিত্ত বহুবিষয়ে ব্যাপৃত হওয়ায়, এবং মনীষা-শক্তির সে সময়ে আরও প্রাথর্য্য লাভ হেতু যুক্তি-তত্ত্বের সমধিক প্রয়োজন হওয়ায়, চিত্তশক্তি ক্ষীণবল হইয়া উঠে; এ জন্য যথোচিত চিত্তনিয়োগের অভাবে, মানব বস্তুমূর্ত্তি ভালরূপে কল্পনে ও তাহার চিত্রনে অসমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু উপরে বলিয়াছি যে, কেবল বস্তুমূর্ত্তি গ্রহণ বা চিত্রনে কাব্য হয় না। উপরন্তু তুমি যে বহুবিষয়ে ব্যাপৃতি এবং মনীষাশক্তির প্রাথর্য্যকে কাব্যহ্রাসতার কারণ বলিয়া ধরিতেছ, আমি তদ্বিপরীতে তাহাকেই কাব্যের আরও বহুবিস্তারের সোপান ও তাহাকে তৎপূর্ব্বগত কাব্যজনিত ফল বলিয়া ধরিতেছি। আগে কাব্য, পরে উন্নতি; অথবা কালোচিত ক্রিয়াদর্শ রূপ কাব্যকেই যথাবিহিত অনুসরণ করার নাম উন্নতি। অতঃপর বলা বাহুল্য যে উন্নতির সঙ্গে কাব্য ফুরায় না। তবে আমাদের কর্ম্ম ফুরাইলে, কর্ম্মাদর্শ কাব্যও ফুরাইতে পারে বটে, কিন্তু কর্ম্মও ফুরাইবার নহে, সুতরাং কাব্যও ফুরাইবার নহে। উভয়ই অনন্ত। অদূরদর্শী, বাহির-চটক, জ্ঞানমূঢ় মেকলে যখন ইংলণ্ডে বসিয়া উন্নতির সঙ্গে কাব্য ফুরাইল বলিয়া চিৎকার

করিতেছে; ঐ দেখ, তখন জর্ম্মাণ ভূমির দিকে তাকাইয়া দেখ, কি দিব্য দৃশ্য! জ্যোতির্ম্ময়, জগত-কবি গেটে, প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় জর্ম্মাণগগণে সমুদিত হইয়া জ্যোতি বিস্তারে মধ্যাহ্ন গগণ মুখে সমাগত হইতেছে। জ্ঞানমূঢ় তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না, পাইবার কথাও নহে। গেটেকে যাহারা ভাল করিয়া দেখিবে, তাহারা গেটের অনেক কাল পরে জন্মিবার কথা!

এখনও অনেকের বিশ্বাস যে দেবচরিত, অলৌকিক লোকচরিত ও প্রাকৃতিক ছবির অতিরঞ্জিত বর্ণনা, ইত্যাদি বোমৃবেটে বিষয় লইয়াই উচুদরের কাব্য হইয়া থাকে; এজন্য দেখাও যায় অনেক যে, যাহার একটু উচুদরের কবি হইতে সাধ, সেই সেরূপ পথের পথিক হইয়া কবিতা লিখিতে যায়। কিন্তু এরূপ করিলে কত হইবে? বিশেষ কথাই আছে যে কবি জন্মায়, তৈয়ার হয় না। সুতরাং এরূপ পথের পথিকেরা নিজে বিফলযত্ন এবং যাহার জন্য যত্ন তাহাও সাধন না হওয়ায়, বিবেচনা করিয়া থাকে যে বড়-দরের কাব্য জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। এমন দিন-কাণার দল আর কোথাও কেহ দেখিয়াছ কি? ইহা একবার ভাবে না যে, তোমার বাল্মীকি আদি যখন উদ্ভব হইয়াছিল তখন এক সময়, আর এখন এক সময়! যখন কত সহস্র শতাব্দি গত হইয়াছে, যখন সকলই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তখন যে কেবল এক কাব্যের অবস্থা একইরূপ এবং অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকিবে, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তাহাদের যেমন সময়, সেই অনুসারে তাহারা দেবচরিত, অলৌকিক বিষয়াদি লিখিয়াছিল; সুতরাং মানাইয়াছিল। যাহার যেমন কর্ম্মক্ষেত্র, তদনুরূপ কর্ম্মাদর্শ ও কর্ম্মরত হইলেই কর্ম্মসফলতা, সুতরাং সর্ব্বথাসার্থকতা লাভ হয়। প্রাচীন মহাপুরুষেরা তাহা জানিতেন এবং সেই জন্যই এত সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি সেটি বুঝ কি? তাহা হইলে আপন সময়কে বিস্মরণ হইয়া, এ অপূর্ব্ব অভিনয় করিতে অগ্রসর হও কেন? তোমরা যখন এত সহস্র বর্ষ পরে উদ্ভব হইয়াছ, তখন এত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের অনুকরণ করিলে বা সে সময়কে অবলম্বন করিতে চাহিলে চলিবে কেন? তোমরাও যদি যথার্থত কবি হও, তোমাদের স্বীয় সময়ের অভাব নিরূপণ কর, বা স্বীয়

সময়কে অবলোকন কর,তদনুরূপ মত লিখ ; তোমরাও তাহা হইলে তাহাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। দান্তের নরকাদি বর্ণন, গেটের ফষ্ট, এ সকল পড়িয়াছ কি ? যে যে যুগে তাহারা জন্মিয়াছিল, সেই সেই যুগের মত লিখিয়াই তাহারা জগতে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে ! ফলত যে যথার্থত কবি, যে মানুষ হয়, সে সর্ব্বকালেই প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়, অথচ তাহাকে কোন বাঁধা নিয়মে চলিতে বা কাহারও অনুকরণের ধারধারিতে হয় না। এরূপ কবিদিগকেও কখনও কখনও প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যান আদি অবলম্বন করিতে দেখা যায় বটে,কিন্তু সে কেবল গল্প উপলক্ষ্যস্বরূপে। নতুবা কাব্য পদার্থ তাহাতে যাহা, তাহা সর্ব্বদাই অভিনব। বেশ পরিচ্ছদ উপলক্ষ্যাদি যেরূপই হউক, প্রকৃত কবি মাত্রে সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই অফুরাণ নূতনত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ লোক সাধারণত কিছু বিরল ;—একাল ধরিয়া তাহাদের সংখ্যা গণিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

কাব্য এবং তত্ত্বজ্ঞান এতদুভয়, আমাদিগের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের বিকাশক ও পূরক, উভয়ই। কাব্য আমাদিগের জীবনগতির কর্ম্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান তাহার বিজ্ঞতা। এখানে একটি কথা, কাব্যকে কর্ম্মাদর্শ ও কর্ম্মজ্ঞান ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছি ও বলিতেছি, কিন্তু তজ্জন্য যেন ইহা বিবেচিত না হয় যে, একমাত্র কাব্য হইতেই আমাদের তাবৎ পরিদৃশ্যমান কার্য্য সমূহ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। একা কাব্য তাবৎ কর্ম্মের কারণ-শরীর নহে। কাব্য স্বয়ং একটা বস্তু বিশেষ নহে, উহা মহৎস্বরূপ মানসিক ধারণা সাধারণের একটা শ্রেণিবিশেষস্থ অংশ বিশেষ মাত্র। যে মানসিক ধারণা গূঢ় এবং গুরুতম হইলে ধর্ম্মের আকার ধরে ; যাহাকে, সামান্য অবয়ব হইলে, দূরদর্শন বলা যায় ; যাহাকে, আকাঙ্ক্ষা পূরক সংকল্পাত্মক হইলে, কর্ম্মরূপ বলা যায় ; কাব্যও সেই মানসিক ধারণা-সমষ্টির মধ্যস্থানাবলম্বী একটি পর্য্যায় বিশেষ মাত্র। একই পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভাববৈচিত্র্য অনুসারে, পৃথক্ পৃথক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে মানসিক ধারণা সমষ্টির ধর্ম্মপদার্থ রূপ অংশ, সকলের উপরে অবস্থান করিয়া থাকে ; অন্য তাবৎ তদধীনে থাকিয়া যাহার যেমন শক্তি,

সে তেমনি নাম গ্রহণে তেমনি কার্য্যের প্রবর্ত্তনা করাইয়া থাকে। অতঃপর বলিয়াছি যে কাব্য আমাদিগের কর্ম্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান তাহার বিজ্ঞতা, অথবা অন্য কথায় কাব্য আমাদিগের আধ্যাত্মিক বা মনোময় দেহাংশ বিশেষের দৃষ্টমূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্য; তত্ত্বজ্ঞান তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ শারীর-যন্ত্রবিজ্ঞান বিদ্যা। আর আর সমস্ত শাস্ত্রকে তদুভয়ের আধিভৌতিক প্রয়োজন পূরক বলিলেই হয়। আমি যে কখন মাটি কাটিতেছি, কখন আকাশ মাপিতেছি, কখন বা জাহাজ চালাইতেছি, সে কেবল আমার আধ্যাত্মিক বা সেই মনোময় দেহাংশবিশেষকে প্রত্যক্ষে বা দৃশ্যমান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য। যতক্ষণ সেরূপ সাধন আমার স্থিরধারণার বিষয়ীভূত না হইবে, ততক্ষণ আমি কখনই সেই সেই কার্য্যে সুখ পাইব না বা তাহাতে একবারেই রত হইব না। আরও একটি কথা, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ভাবের এরূপ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ দেখিয়া যেন এমন বুঝিও না যে, আধ্যাত্মিক ভাব হইতে আধিভৌতিক ভাব হেয়, অতএব শেষোক্তের প্রতি পরিমাণে তাচ্ছিল্যতা দেখাইলে কিছুমাত্র ক্ষতির বিষয় নাই। সেটা ভুল, হেয় কেহই নহে। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয়ে পৃথক বস্তু নহে, উহারা একই বস্তুর দুই বিভিন্ন দিকমাত্র। ভৌতিক তাহা, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইয়াছে; এবং আত্মিক তাহা, যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রত্যক্ষ হয় নাই, কেবল চিত্তের দ্বারা প্রত্যক্ষ বলিয়া মানা যায়। এই ভৌতিক পৃথিবীতে স্থূল শরীরী হইবায়,আমাদের সমক্ষে আত্মিক এবং ভৌতিক, উভয় উভয়ের সম্পূর্ণ সাপেক্ষাধীন। সুতরাং উহাদের আজ্ঞা যথা পরিমাণে পালনে ও উহাদের সামঞ্জস্য সংস্থাপনে, আমাদের জীবনগতির সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা। ইহার যে কোন দিকে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপদ এবং একের অভাবে অপর তিষ্ঠে না।

ব্যবহারিক বুদ্ধির অনুসরণে দেখিলে প্রতীত হইবে যে, যে কোন বিষয়েতেই হউক, কেবল আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া পাগল হইলে এ পৃথিবীতে কোন কাজ হয় না। নির্ব্বোধ! খালি অভিমত গন্তব্য স্থান দেখিয়া নাচিলে কি হইবে; পায়ের সাহায্য না থাকিলে যাইবার উপায়? তবে যদি ঘ্রাণের দ্বারা কখন তোমার উদরপূর্ণ হইতে দেখিয়া থাক, তাহা হইলে একান্যতর ধরিলে ক্ষতি নাই। ফলত অনেকে, বিশেষ আধুনিক হিন্দু,

ভেক-সন্ন্যাসী, অথবা প্রায় তাবৎ আধুনিক ভারতীয় বর্গ, কেবল আধ্যাত্মিক ভাব ধরিয়া, এইরূপে প্রাণে উদরপূর্ত্তি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আধুনিক ব্রাহ্ম সৌখিনেরাও, তাহাদের উপরের আবরণ তফাত করিয়া ফেলিয়া দিলে, ভিতরে নেড়া, বাউল প্রভৃতি হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সম্প্রদায় বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে দেখ, সেইখানেই কেবল আধ্যাত্মিক কথা লইয়া নাড়াচাড়া! ভাল, একটি ছাড়িয়া কেবল একটি ধরিলে, তবে সামঞ্জস্য রহিল কোথায়? যেখানে সামঞ্জস্যের অভাব, সেখানে ফলেরও অভাব। স্ত্রীগুণ ও পুরুষ গুণের একত্র সমাবেশ ভিন্ন, কখনও ফলের উৎপত্তি হয় না। আমাদিগের এই জীবনে আধিভৌতিক প্রয়োজন সেই স্ত্রীগুণ। নাস্তিকে কিন্তু তাহা বুঝে না। এই জন্য, ভৌতিক শাস্ত্রের যে অযথা গোঁড়া. সে কখনও প্রকৃতভাবে কাব্যাদির সৌন্দর্য্য ও কাব্যাদির মহত্ব বুঝিতে পারে না; যেহেতু তাহার হৃদয় বন্ধ্যা। সেইরূপ যে কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ধর্ম্ম লইয়া পাগল, সে সৌন্দর্য্য ও মহত্ব অনুভব করিতে পারিলেও, কার্য্যে কিন্তু তাহা পরিণত করিয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে না; যেহেতু তাহার হৃদয় উদাসীন ও লেংটা। ফলতঃ যে দিকেই হউক, যে কোন বিষয়ে গোঁড়ামী উপস্থিত হইলে, অল্প হউক অধিক হউক, দোষ স্পর্শ করিয়া থাকে। কেবল শুদ্ধ আধ্যাত্মিক আলোচনা ও সাধনাও এ সংসারে না হইতে পারে এমন নহে; কিন্তু সে কখন? যখন যে ব্যক্তি তাহার জাগতিক কর্ম্মশক্তি ও সেই শক্ত্যনুরূপ জাগতিক কর্ম্মের সীমায় পৌছিয়াছে। কিন্তু বাপু বাঞ্ছারাম, তোমার পক্ষে কি তাহা খাটে? তোমার পক্ষে—যাহার জাগতিক কর্ম্মশক্তি নিত্য অব্যয়িত বা অপব্যয়িত এবং জাগতিক কর্ম্ম নিত্য অবহেলিত বা অকর্ম্মে পরিণীত?

কাব্যের অন্তঃভাব যাহা, তাহা ভৌতিক না হইয়া সর্ব্বদাই আত্মিক হওয়ায়, তদ্বিষয়ীভূত যে আদর্শমূর্ত্তি, তাহা সর্ব্বদা মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতিকে উত্তেজিত, উৎসাহিত ও গতিশীল করিয়া থাকে; এবং সেই অন্তঃপ্রকৃতি রূপ দ্বার দিয়া শেষে আধিভৌতিক উপকরণ সহযোগে, কার্য্যরূপে ভৌতিক মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। কাব্যের বিষয়ীভূত সেই আদর্শই যথার্থ আদর্শমূর্ত্তি, যাহা ভাবী বিকাশক, ভাবী কার্য্য সাধক, এবং যে যে বিষয় আমার অগোচর

ছিল; তাহাকে যাহা আমার গোচর করিয়া দেয়। যে কাব্য এরূপ আদর্শ-প্রাণ, তাহাই যথার্থত কাব্য; তাহাই বহুকাল এজগতে জীবিত থাকিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। যাহা সেরূপ নহে, তাহা কাব্যও নহে; তাহা মণির পরিবর্ত্তে কাচ, সুতরাং ক্ষীণ মূল্য হেতু তাহার ছড়াছড়িও অনেক এবং অতি অল্প পুঁজিতেই ব্যবসায় চলে; এরূপ কাব্যের জীবন কালের সংখ্যাও সেইরূপ অতি সামান্য। কথা এই, যাহার যতদিন এ সংসারে প্রয়োজন, সে ততদিন বাঁচিবে; আর সেই বস্তুরই প্রয়োজন, যাহার এসংসারে অভাব। কিন্তু যাহা আমি জানি, তাহা যদি জানাইতে আইস; যাহা শুনিয়াছি বা শুনিতেছি, তাহা যদি শুনাইতে আইস, যাহা আমি করিয়াছি, তাহাই যদি করাইতে আইস; যাহার আমার কিছু মাত্র অভাব নাই, তাহা যদি আমাকে দিতে আইস; তাহা হইলে কেন আমি তোমার দত্ত বিষয়ের সমাদর করিব? এমন স্থানে বলিতে কি, তুমি বিরক্তির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহ; তবে তুমি যদি উহারই ভিতরে নিজে ভদ্র হও, তাহা হইলে উর্দ্ধসংখ্যা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ ভদ্রতা দেখাইতে পারি এই মাত্র। এমনও কখন কখন হইতে পারে বটে যে, তুমি সেই সেই পরিচিত বিষয় নানা অলঙ্কার যুক্ত ও নানা কৌশলে আবৃত করিয়া, আমার সমক্ষে নূতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, ক্ষণেকের তরে আমাকে ভুলাইতে পার। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে কতক্ষণের জন্য? চেনা জিনিস্ চিনিতে কতক্ষণ কাল বিলম্ব হইয়া থাকে? একবার মাত্র চোখ্ চাহিয়া ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলেই তোমার গুমর ফাক! অতএব তেমনস্থলে তোমার আদর, যতক্ষণ তোমাকে আমার চিনিতে কালবিলম্ব সেই পর্য্যন্ত। এই জন্যই বাগ্মারাম, কবি নামধারী ঈশ্বরগুপ্ত, "ব্যাপ্ত চরাচর—যাহার প্রভাবে প্রভা করে প্রভাকর" হইয়াও এখন দেখ, একেবারে কিরূপ লুপ্তনাম হইয়াছে। কলিকাতা এবং দেশশুদ্ধ বাবু লোকের বাহবা লইয়া, সৌভাগ্যের গাদায় বসিয়া, প্রতিপত্তিকে সর্ব্বাংশে করতলে পাইয়া, তথাপি ঈশ্বরগুপ্ত লুপ্তনাম। আর দেখ তোমার, দিবারাত্র অনাহারী, দশ আড়ি ধান ও শালুকের নৈবেদ্য সম্বল কবিকঙ্কণের দিকে চাহিয়া দেখ, কেমন জীবিত! কবিকঙ্কণ অতি সামান্যদরের কবি, তথাপি দেখ নানাবিধ বিপত্তি অতিক্রম

করিয়াও কেমন জীবিত! যেন আজিকেরই কবিকঙ্কণ, ভিক্ষুক চণ্ডীবগলে এই দ্বারে উপস্থিত! সত্য কবি মাত্রেরই এই ভাব, চুপি চুপি আইসে কিন্তু ধীরে ধীরে চিরদিনের তরে জাহির হয়; আর ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় ভাক্ত কবি মহা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত আইসে, কিন্তু দুই দিনের মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অধুনাতন বাঙ্গালা কবিরা আড়ম্বর ও জাঁকজমক উৎপাদনের জন্য, সহি সুপারিস পর্য্যন্তেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; পরস্পর পরস্পরের সপক্ষে সহি সুপারিসেরও অভাব নাই। নির্ব্বোধের দল! সহি সুপারিসে জগত সৃষ্টি হয় নাই; সহি সুপারিসে তুমি সৃষ্টি হও নাই, তোমার কর্ম্মজীবনও সৃষ্টি হয় নাই; কালও কিছু সহি সুপারিসের বশ নহে। এ সংসার সত্য প্রতিরূপ, সহি সুপারিসের ভরে ইহাতে কতদিন খাড়া থাকিতে পারিবে?

যথার্থ কাব্য যাহা, সে সর্ব্বদাই স্বীয় উৎপত্তি সময় হইতে উত্তরগামী। তাহার বিষয়ীভূত বস্তু এরূপ যে, তাহার অঙ্কুর সেই কাব্যোৎপত্তি সময়ে হইয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ণতা তদপেক্ষা দূরতর সময়ে নিহিত। বস্তু যত গুরুতর, তাহা সেই পরিমাণে দুরারাধ্য, এবং পূর্ণতাও সেই পরিমাণ অনুরূপ দূরে অবস্থান করে। এই নিমিত্ত যথার্থকাব্য যাহা, তাহা প্রায়ই, কোন কোনটি গুরুত্ব অনুসারে একেবারেই, স্বীয় উৎপত্তি সময়ে সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয় না;—কারণ কাব্যের বিষয়ীভূত বস্তুর অঙ্কুরমাত্র সম্বল লোকে, কিরূপে তাহার সমগ্র মূর্ত্তির মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইবে? এবং যে বস্তুর যতক্ষণ মর্ম্ম বুঝা না যায়, ততক্ষণ কেই বা তাহার আদর করিয়া থাকে। যে কবি আপন সময়েতেই সম্যক্ আদর প্রাপ্ত হয়, আমার বিবেচনা এই যে, তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান কবি আর এ জগতে নাই।

বাঞ্ছারাম, তুমি এবং তোমার ন্যায় পণ্ডিতেরা এতক্ষণ আমার কথা শুনিয়া হয় ত মনে মনে ভাবিতেছ যে,—"কাব্যের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির ত সম্বন্ধ এই দেখিতেছি যে কাব্য আদর্শ, আমরা তাহার অনুগামী। কাব্যের আলোকে আকৃষ্ট হইবায়, তদনুগমনেচ্ছাজনিত উৎসাহে আমাদের সুপ্তবৃত্তি প্রবৃত্তি সকল জাগরিত হয়; তাহা হইতে স্বনিহিত যে শক্তি সকল উত্তেজিত হইয়া থাকে সেই আত্মশক্তি সহায়ে, কাব্যালোক প্রদর্শিত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা

তদভিমুখে ধাবমান হইব ও তাহা সাধন করিব। ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু কাব্যেতে সৎ অসৎ উভয় বিষয়ই বর্ণিত হইয়া থাকে; তবে এখন অসৎ বিষয়কেও কি সেইরূপ অনুগমন করিতে হইবে? তাহা হইলে শিক্ষা এবং জীবনগতির উন্নতিত দেখিতেছি অতি অপূর্ব্ব!" পণ্ডিত! আর আর যতগুলি কথা বলিয়া আসিলে সে সকলই সত্য, গোল কেবল যেখানে ভাবিয়াছ যে অসৎকেও সতের ন্যায় সমভাবে অনুগমন করিতে হইবে। শিক্ষা আমাদিগের দুই প্রকারে হইয়া থাকে, এক প্রবৃত্তিমার্গে, অপর নিবৃত্তিমার্গে; এক কি করিব, আর এক কি করিব না। কাব্য সৎ অসৎ উভয়েরই আদর্শমূর্ত্তি দিতেছে; কিন্তু সেই আদর্শমূর্ত্তির সহায়ে ও আমাদের সদসদ্ বিবেচক আত্মিকশক্তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন প্রভাবে, একটিকে লইব, অপরটিকে পরিহার করিব। আদর্শমূর্ত্তির প্রভাবে সৎকে সমগ্রত ও পূর্ণশ্রীতে দেখিতে পাইয়া, তাহাতে আকৃষ্ট হই ও তদনুগমন করি; অসতেরও তেমনি সমগ্রত ও পূর্ণমূর্ত্তি দৃষ্টে তাহার ভীষণতা ও বিরূপ ভাব উপলব্ধি করিতে পাইয়া, অমঙ্গলকর জ্ঞানে তাহাকে পরিহার করিতে সমর্থ হই। পরিহার করাইবার অভিপ্রায়েই কবি কর্ত্তৃক, জ্ঞানত হউক বা অজ্ঞানত হউক, সেই অসতের আদর্শমূর্ত্তির যোজনা। এরূপ যোজনা না থাকিলে, মানব নিজে, মন্দ অঙ্কুরের মূলাংশ মাত্র দৃষ্টে, তাহার সমগ্র আয়তন ও পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া, তাচ্ছিল্যে বা অনবধানে হয়ত তদনুগমনে তাহাতে অমঙ্গল ঘটাইয়া ফেলিত।

যাহা হইলে কাব্য হয়, তাহা উপরে যথাযথ বিবৃত করা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন কাব্যে বস্তুনির্দ্দেশ, ছন্দোবন্ধ, এবং কাব্যের শ্রেণী অনুসারে গল্পাদিরও আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল উপলক্ষ্য বা কাব্যপদার্থ প্রকটনের আনুসঙ্গিক উপকরণবিশেষ মাত্র। বস্তু নির্দ্দেশ নানারূপে হয়; কাল কোকিলের পাখনা বর্ণন হইতে আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ়দর্শন পর্য্যন্ত, সমস্তই বস্তুনির্দ্দেশের মধ্যে আসিয়া থাকে। ক্ষতি নাই। বস্তুমাত্রের ভাস, প্রতিভাস এবং রূপ, ইহারা পর পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, মিশ্রণ ও সংযোজন, এবং পরস্পরের প্রতি উত্তেজনা আদি সাধনে; মানব চিত্তের মধ্যে নানা রকম ভাব, ভাবান্তর, ধারণার বৈচিত্র, এবং সে সকলের

আবার কার্য্যে পরিণতি, এই সকলের সমুৎপাদন করিয়া থাকে। মানবচিত্তের শক্তি অপার বিস্তারযুক্ত, ধারণাশক্তিও দিগন্ত-প্রসারিত, বস্তুজগতও অনন্ত, অতএব এমনস্থলে বস্তুনির্দ্দেশেরই বা আদি অন্ত কোথায় থাকিতে পারে? সুতরাং ইতর হইতে উচ্চতম কেহই এখানে অনাদরে যায় না। কবিরা আপন আপন শক্তি অনুসারে, যথায় যে ভাবে ও যেরূপে দৃষ্টি চলে এবং সে দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বা মহৎ যেরূপ পদার্থ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়; তথায় সেরূপে ও সেভাবে তদ্বৎ ক্ষুদ্র বা মহৎ বস্তু নির্দ্দেশে আদর্শমূর্ত্তি প্রদান করিয়া থাকে। অনেকে কিন্তু তাহা পারিয়া উঠে না;—অনাগত আদর্শচিত্র প্রদান করা অতি দুরূহ কার্য্য! অধিকাংশের শক্তি উপস্থিত পদার্থের রূপ চিত্রণে পর্য্যবসিত হয়; ইহারা কবি নহে, তবে যে কবি বলা যায় সে কেবল আদর করিয়া; ইহারা সাধারণত কিঞ্চিৎ মন হরণ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে যেমন একই বস্তুর পাঁচটা ছবি উপস্থিত হইলে, তাহার ভালমন্দ অনুসারে দেখিতে লালসা হয় ও হইল বা চোখের একটু তৃপ্তিও হয়, সেইরূপ। প্রথমত বস্তুনির্দ্দেশ, তাহার পর আদর্শমূর্ত্তির পূর্ণতা, এই দুয়ের স্বভাব এবং সফলতা লইয়া কাব্য এবং কবিরও শ্রেষ্ঠত্ব বা তদন্যতর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বাঞ্ছারাম, কাব্য ও কবিদিগের সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব আদি বিভাগ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—দুইজন সমান শক্তি সম্পন্ন দর্শক আছে, একজন নিসর্গ গৃহে কোন একটি অভিনব পদার্থ দৃষ্টে আকৃষ্ট, অপর একজন কামিনীহৃদয় বিষয়ক যে কোন একটি অভিনবত্ব দৃষ্টে আকৃষ্ট; তাহার পর উভয়ে যে যাহা দেখিল, উভয়ে সফলতার সহিত তাহাদের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিল, এখন জিজ্ঞাস্য এখানে শ্রেষ্ঠতা কাহার? যদি বল নিসর্গদর্শী শ্রেষ্ঠ, তাহার পর আবার জিজ্ঞাস্য যে, যদি এমন ঘটনা হয় যে নিসর্গদর্শীর অপেক্ষা স্ত্রীহৃদয় দর্শীর মূর্ত্তিঅঙ্কণ অঙ্কণে অধিক সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা হইলেই বা শ্রেষ্ঠতা কাহার? কবি এবং কাব্যের শ্রেষ্ঠতাও তদ্রূপ।

ছন্দের দ্বারা ভাষা আকুঞ্চিৎ হইয়া সঙ্ক্ষেপে সমাবিষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং যথায় বহুবিক্ষিপ্ত পদার্থনিকরকে একাধারে সমাবেশ করিয়া, তাহাদের একায়ত্ত-দৃষ্ট পূর্ণমূর্ত্তি প্রদান করিতে হইবে, সেখানে অবশ্যই

ছন্দোময়ী বাক্যের যতটা উপযোগিতা, তত অন্যপ্রকার বাক্যের হইতে পারে না। যে কোন পদার্থের দৃষ্টরূপ সসীমতা যুক্ত, কিন্তু তত্ত্বভাগে তাহার অসীমতা। ছন্দোময়ী বাক্য সসীম, কিন্তু তদন্যতর বাক্য অসীম; এই জন্য একে ছন্দোময়ী বাক্যের প্রয়োজন হয়, অপরে তাহা হয় না। যে ব্যক্তি যথার্থ কবি হয়, তাহার এরূপ ছন্দোময়ী বাক্য আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে; তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ কোন যত্ন করিতে হয় না; অথবা তাহার চিত্তের চিন্তা ও ধারণা যাহা, তাহাই ছন্দোময়ীরূপে সু-সম্পাদিত হইয়া থাকে। ছন্দোময়ী বাক্যের অপেক্ষা না রাখিয়াও, কাব্য প্রবাহ চলিতে পারে;—এ সংসারে গদ্য কাব্যেরও কিছু অভাব নাই। কিন্তু সেরূপ ভাবে কাব্য প্রবাহিত করিতে আরও শক্ত্যাধিক্যের প্রয়োজন; এ পর্য্যন্ত অতি অল্পলোকেই তাহাতে সফলতা লাভ করিয়াছে। কাব্যের নির্দ্দেশিত বস্তু এবং তৎপ্রতি মানসিক দৃষ্টিচালনের ভাব ও প্রকরণ ইহাদের সংযোগে, যাহাকে কাব্যের রসবলে, তাহার উৎপত্তি হয়; অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে, কাব্যের মোহিণী শক্তি যাহা, বা যাহা অজ্ঞাত পদার্থকে চটকে জ্ঞাতক্ষেত্রে আনয়ন করে, বা যাহা আদর্শ প্রতিরূপে অর্থাৎ অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উৎকর্ষতায় চিত্তকে আকৃষ্ট করে; অথবা কাব্যে উদ্ভাসিত যে আভাসটুকুকে, অন্তর ও মন সত্য প্রতিরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট ও বিনত হয়; অথবা যাহাকে চৌম্বকীয় গুণ বলে এবং সমধর্ম্মী পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যাহা আকর্ষণ শক্তি নামে নামিত, রসও তাহাকে বলা যায়। কাব্যের মধ্যে যে গল্প বা উপাখ্যান আদির অবতারণা করা যায়, তাহা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; তদ্ভিন্ন তাহার আর কোন বিশেষ মূল্য নাই। অনেকে, বিভিন্ন কবিদ্বয়ে গল্পের একতা, ছন্দের একতা বা টুকরা পদ বিশেষের বা টুকরা ভাব বিশেষের একতা দেখিয়া মনে করিয়া থাকে যে, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কবি নিঃসন্দেহই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাণ্ডার হইতে সেই সেই বিষয় সকল চুরি করিয়া লইয়াছে; সুতরাং তাহার কবি-যশের পক্ষে সমূহ কলঙ্ক সমুপস্থিত। যাহারা এরূপ ভাবে, তাহাদিগের ভাবনা, তাহাদিগেরই নিকটে থাকুক; তাহাতে আমাদিগের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। ফল কথা, আদত যাহা কাব্যের বিষয়, তাহা

যাহার নিজের ; সে সহস্রবার গল্পাদির অনুকরণ করিলেও, সে ব্যক্তি কবি। ইংরাজ কবি কৃত সপ্তম রিচার্ড নামক নাটকে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকৃত অন্যূন তিন হাজার পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কালিদাসের উপাখ্যান ভাগ প্রায়ই পুরাণাদি হইতে গৃহিত। কুমারসম্ভবে দ্বিতীয় সর্গের বহুশ্লোক পুরাণে দৃষ্ট হয় ; বাঙ্গালী মহলে হইলে, উহাদের দুই জনের যেই হউক, এতদিন চোর নামে ঘোরতর লাঞ্ছিত হইত। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজী-সাহিত্য ব্যবসায়ীরা কেহই প্রায় তত অসার নহে, সুতরাং তাহাদের নিকট উহাদের দুই জনের কেহই আজিও চোর নাম প্রাপ্ত হয় নাই।

অতঃপর সাধারণ কবিত্ব সংসার পরিত্যাগ করিয়া, জাত্‌ কবিদের কাব্য যাহা তাহার আলোচন ও শ্রেণী নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের এ শ্রেণী নির্দ্দেশ প্রণালী, পূর্ব্বপূর্ব্ব নিয়ম হইতে কিছু ভিন্নতর, সুতরাং সাবেক শ্রেণীর আলঙ্কারিকেরা ইহাতে কি বলিবেন বলিতে পারি না।

কিন্তু কাব্যের শ্রেণী নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে হয়ত জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যেরূপ কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহাতে কবিরূপে পরিচিত বলিয়া গণিব কাহাদিগকে?—অনেক ছন্দোবদ্ধ বাক্য ব্যবসায়ীরাই ত সে লক্ষণের মধ্যে আইসে না। আমি বলি, যাহারা সে লক্ষণের মধ্যে না আইসে, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেও। সে লক্ষণের মধ্যে যাহারা আইসে এবং কাল স্বয়ং বিচারপূর্ব্বক যাহাদিগকে কবিখ্যাতি প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকেই কবি বলিয়া ধরিবে। অথবা এত কথাই বা বলি কেন ; প্রকৃত কবি যে হইবে তাহাকে চিনিবার জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না, সে আপনা হইতে সকলের নিকটে পরিচিত হইবে। কিন্তু এক কথা। 'আলোকধারী' বলিলে যেমন একদিকে কেবল চন্দ্রসূর্য্যকে বুঝায় না, দীপ ও জোনাকী আদিকেও বুঝায় ; তেমনি অন্যদিকে কেবল দীপ ও জোনাকী আদিকে বুঝায় না, চন্দ্র-সূর্য্যকেও বুঝাইয়া থাকে। এ জগতের যথার্থ সর্ব্বসম্পন্ন কবি, মানবকুলের ধর্ম্মদাতৃগণ ; কিন্তু তাহা বলিয়া, সাধারণ কবিনামধারী গণকেও কবি-খ্যাতি হইতে বঞ্চিৎ করিতে পারা যায় না। আলো অসীম হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক, সর্ব্বত্রই উহার নাম 'আলো' ; তবে পরিমাণ অনুসারে

ভক্তি, খ্যাতি ও আদরের তারতম্য এই মাত্র ভেদ। তবে, ঔষধ ব্যবসায়ের স্পর্শমাত্রে যেমন 'কবিরাজ' বা 'ডাক্তার' খ্যাতি; সেরূপ 'কবি' খ্যাতিও এ জগতে অনেক আছে; কিন্তু হাতুড়ে চিনিতে ও দূর করিতে কদিন লাগে?

এ জগতে যখন কোন বস্তু বা বিষয় বৃথা নহে, সকলই কর্ম্মের বিষয়ীভূত ও সকলই কর্ম্মে লাগিয়া থাকে; তখন সকল বস্তু বা বিষয়ই কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে; এখানেও, সেই সেই বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃতি, পরিমাণ ও উপযোগিতা অনুসারে, আবশ্যকতা এবং আদরের তারতম্য হইয়া থাকে।

এ জগতে কর্ম্মশক্তি দ্বিবিধ প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে, এক স্বরূপে অপর বিরূপে। স্বরূপে গড়ায়, বিরূপে ভাঙ্গে; ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, কি জড়াজড় কি আত্মিক কি ভৌতিক, সকলকেই এই দ্বিবিধ শ্রেণীর একতরের মধ্যে আসিতে হয়, কবিরাও আসিয়া থাকে। গড়নের চূড়ান্ত ভাবে যেমন উচ্চ শক্তির প্রয়োজন হয়, ভাঙনের চূড়ান্ত ভাবেও কিছু কম উচ্চ শক্তির প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তথাপি গড়ন শক্তিরই উপকারিতা ও আদর সুতরাং তাহার জয়-স্থান বেশী, যেহেতু উহা সৎ প্রতিরূপ;—অপরটি তদন্যতর! খৃষ্টীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, শয়তান আসিয়া বিগড়াইয়া দেয়; খৃষ্টীয় ঈশ্বর হইতে শয়তানের শক্তি ন্যূনতা কোথায়?—বিশেষত যখন খৃষ্টানের বিশ্বাস আলোচনা করা যায়, আর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াই খুন, কিন্তু ভোগে আসিবে অধিক সংখ্যক মানবীয় আত্মা শয়তানের। যাহা হউক, তথাপি খৃষ্টীয় ঈশ্বর সৎপ্রতিরূপে কল্পিত বলিয়া খৃষ্টীয় ঈশ্বরেরই জয় জয়াকার। তদ্রূপ পার্শিধর্ম্মে অহুরমজ্‌দ ও অঙ্গ্রমৈনু। যাহা হউক, ভাঙ্গা গড়া, উভয় শক্তি এক অপরের সমান স্পর্দ্ধী ও সম প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও; ফলে গড়ন শক্তিরই গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠতা ও উপকারিতা এবং সেই হেতু অপরের অতিক্রমে, সর্ব্বদাই তাহা ভক্তি ও আদরের বিষয় হয়। এ সংসারক্ষেত্রে যাবৎ কর্ম্মস্থলীতে, যাবৎ বিষয়ে, সুতরাং কাব্য বিষয়েতেও এই হিসাব। যথার্থ সত্য ও সৎস্বরূপের অবলম্বী ভিন্ন, কখন কেহ গঠন শক্তির অনুগামী হইতে পারে না; তথায় ফিকির ও বাটপাড়ী বুদ্ধি খাটে না। এখন জাৎ কবিদিগের কথা বলি।

যে কোন উপস্থিত বিষয়, তৎশ্রেণিস্থ ভবিষ্যৎ বিষয়ের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব ভিত্তিকে নষ্ট করিলে, আর ভবিষ্যতের আশা থাকেনা। যাহা স্বভাবত উৎপন্ন, তাহা স্বাভাবিক; সুতরাং স্বভাবোৎপন্ন ভিত্তির লোপস্থান আর যে কিছুদ্বারা পূরণ হয়, তাহা অস্বাভাবিক হওয়ায় সংসারকে কেবল আকুলিত করিয়া থাকে মাত্র। অতএব তাহার দোষ অসীম। যাহাদের শক্তি ভাঙ্গিবার, তাহারা উপস্থিত বিষয়ের দোষ যাহা তাহাই দর্শন করে, সে দোষকে শতগুণে রঞ্জিৎ করে; শেষে অলীক কিন্তু চিত্তাকর্ষক ভবিষ্যৎচিত্রে আকৃষ্ট করিয়া, সেই সামান্য মাত্র দোষের খাতিরে, যাহাতে সমস্ত বিষয়টি ভাঙ্গিয়া লোপ পায়, তজ্জন্য সকলকে আহ্বান করে এবং এইরূপে সুপথ যাহা তাহাতে কাঁটা দেয়। ইহা শয়তানী শক্তি; বল্টেয়ার প্রভৃতির এই শক্তি। অব্যবহিত পরেই যে বিপ্লবপাতে ফরাসীজাতি অধঃপাতে গিয়াছিল এবং সে সময়ে সর্ব্বত্র যে নাস্তিকতা ও তাহার ভীষণ ফলেরও প্রকাশ হইয়াছিল, বল্টেয়ার যে তাহার অন্যতর সাহায্যকারক ও প্রবর্ত্তক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গড়ান শক্তি যাহার, সে সেরূপ করে না; উপস্থিত বিষয় যাহাতে ধ্বংস না হয় তাহাই তাহার প্রধান যত্ন এবং দোষ গুলি নিরাকৃত হইলে যেরূপ পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহার আদর্শ প্রদানে আকৃষ্ট করিয়া, সত্যবুদ্ধিতে দোষ গুলির সংশোধন ও বিষয়টির অগ্রসর হওনে সহায়তা করিয়া থাকে। অথবা যে কোন উপস্থিত বিষয়ের অবস্থা কি ভাবে ও কি সত্যরূপে চালাইলে কিরূপ পরিণামে আসিবে, তাহাই সে দেখাইয়া দেয়। দান্তে এই শ্রেণীর কবি। উপরে বলিয়াছি যে এ ভাঙ্গা গড়া উভয়বিধ শক্তিই উচু শ্রেণীর, তন্মধ্যে গড়ানর শক্তি আরও উচ্চতর। এ শেষোক্ত শক্তিতে প্রয়োজনীয় পদার্থ অনেক গুলি, প্রথমতঃ উপস্থিত অবস্থায় পূর্ণ ভুক্তভোগী হওয়া, দ্বিতীয়তঃ তাহাতে অন্তঃ ও বহির্দৃষ্টি সংযুক্ত হওয়া, তৃতীয়তঃ কার্য্যকারণ ভাবে ও ভাবী পরিণামে পরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা হওয়া। কাজেই, এরূপ শক্তি সম্পন্ন কবি যাহারা, তাহারা স্বভাবতই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় হইয়া থাকে। ভাঙ্গা গড়া এ দুই শক্তিই, ভাক্ত না হইয়া সত্য হইলে, তাহার কেহই অনুকরণে স্ফুরিত হয় না।

মানবীয় জীবনগতির নিত্য এবং নৈমিত্তিক অবস্থা বৈচিত্র হেতু, কাব্যও নিত্য এবং নৈমিত্তিক উভয়বিধ। নিয়ত প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবিপাক যদ্বারা নিরাকৃত হয়, তাহা নিত্য; এবং যুগান্ত ও যুগারম্ভ প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-বিপাক যদ্বারা নিরাকৃত হয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেবল কর্ম্মজীবনের সহ কাব্যের এত ঘনিষ্ঠতা, এত যথাসর্ব্বস্ব ভাব সংযোজন করাতে হয়ত, বাঞ্চারাম, ভাবিতে পার যে 'প্রবন্ধলেখক স্বয়ং নিতান্ত নিরস এবং জমাখরচ বিজ্ঞানবিৎ ও কাব্যের বিষয় কিছুই বুঝে না; নতুবা যে কাব্য পড়িয়া নানা ভাবতরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া বেহুস ডুবিয়া থাকিবার কথা, তাহার সঙ্গে সুখশূন্য, শান্তিশূন্য, রসশূন্য, নিয়ত ব্যতিব্যস্তকারী কর্ম্মজীবনের সহ সম্বন্ধ বাঁধিতে যাইবে কি জন্য? মাতোয়ারায় অলসভাব, কিন্তু অপরে নিত্য ছট্‌ফটে অস্থিরতা, এ দুয়েও কখনও নাকি মিল হইতে পারে বা এক অপরের সাপেক্ষ হইতে পারে?' সহজ দৃশ্যে তোমার এরূপ ভাবনা খুব সঙ্গত বটে, কিন্তু মূলে উহা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তিপূর্ণ। মানবীয় কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, উভয়বিধ সংসারে যে কোন পদার্থ আছে, তাহারা যে কিছু নাম ও অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহা কেবল মানবীয় কর্ম্মজীবনের সহ তাহাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই। স্বয়ং 'নাম,' এবং 'অর্থ,' এ দুইয়েরও অস্তিত্ব কেবল কর্ম্মজীবন সহ সম্বন্ধ সূত্রে! সে সম্বন্ধ একবার ছেদ কর, দেখিবে সকল পদার্থই নাম ও অর্থশূন্য হইয়া যাইবে; নাম এবং অর্থ এদুই শব্দও লোপ পাইবে। হিন্দুযোগা যথার্থই বলিয়া থাকেন যে মানব যতক্ষণ সংসারক্ষেত্ররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে রত, ততক্ষণই সত্যা-সত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাবাভাব, পাপপুণ্য, পদার্থাপদার্থ, তুমি আমি, এ—সে, ভেদভিন্ন ভাব ইত্যাদি; কিন্তু আবার যখনই সে কর্ম্মক্ষেত্র অতিক্রম করে, তাহার পক্ষে আর তখন কিছুই নাই, সমস্ত শূন্যে পরিণত হয় অথবা সর্ব্বত্রেই দ্বিত্ব ঘুচিয়া যাওয়ায় একত্ব আসিয়া বিরাজ করিতে থাকে। ফলত মানবীয় সংসারের যাহা কিছু, তাহা কর্ম্মজীবন সহ সম্বন্ধযুক্ত; মানবের কর্ম্মজীবন আছে বলিয়াই তাহারা আছে, নতুবা থাকিত না। তাবৎ পদার্থই সাক্ষাতে হউক, অসাক্ষাতে হউক; স্পষ্টত হউক, অস্পষ্টত হউক;

নিকট ভাবে হউক, দূর ভাবে হউক; অথবা আশুভাবে হউক, গৌণভাবে হউক; সেই মানবীয় কর্ম্মজীবনের পরিপোষক, বর্দ্ধক, এবং তৎপক্ষে উপকরণ স্বরূপও বটে। সদিতর যে কোন ভাবেই হউক, তাহাদিগকে তাহার সাহায্য-কারক বলিয়া জানিবে। কর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য কর্ম্ম; সুতরাং তত্তাবতের উদ্দেশ্যও আশু বা গৌণ যে ভাবে হউক, একমাত্র কর্ম্ম বিধায়কতা ভিন্ন আর কিছু দাঁড়াইতেছে না। এখন বোধ হয় আর বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, কিজন্য আমি কাব্যের বিষয় বলিতে গিয়া, মানবীয় কর্ম্মজীবন ও কর্ম্মকে দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে পারিতেছি না। পুনর্ব্বার বলিতেছি, এ মানবীয় সংসারে যে কিছু পদার্থ মানবীয় কর্ম্মজীবন সহ সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহাই সার্থক এবং পদার্থ, তদতীতে আর সমস্ত অসার্থক এবং অপদার্থ।

উপরে বলিয়াছি কাব্য নিত্য ও নৈমিত্তিক। প্রথমটির দৃষ্টান্তস্থল ইংরেজ সেক্সপিয়ার এবং দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্তস্বরূপ ইতালীয় দান্তের নাম মাত্র উল্লেখ করা গেল। অপরাপর কবিদিগকে পাঠকেরা, ইচ্ছা করিলে, আত্মবুদ্ধি অনুরূপ এতদুভয় শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইবেন। যাহা এতদুভয়ের মধ্যে না আসিবে, তাহা শঙ্কর কাব্য। শাঙ্কর্য্যছাড়া এ পৃথিবীতে বস্তু নাই; তবে ন্যূনাতিরেকে, আধিক্যের নামানুসারে, বিশেষ নামে নামিত ও খ্যাত হয়। বাহারাম, শঙ্করবস্তুও কখন কখন মূল বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু সে উৎকর্ষ? অধম পদার্থের উচ্চাংশ যেমন; আর অশঙ্কর বস্তুর অপকর্ষভাব? যেমন উচ্চ পদার্থের নিচাংশ। তারতম্য বুঝিলে কি?

নিত্য, নৈমিত্তিক এবং শঙ্কর, এই ত্রিবিধ শ্রেণীনিবদ্ধ কাব্য আবার বিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত। বলা বাহুল্য যে, মানবীয় জীবনগতি ও কর্ম্মবৈচিত্র হেতু, উহার পর্য্যায়ও অনন্ত হইবে। সুতরাং তদ্বর্ণন করিতে বাহুল্যে যাওয়া অনাবশ্যক। কেবলমাত্র, আমাদিগের পৈতৃক কাব্যনিচয়ের পর্য্যায়ক্রম কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রথম পর্য্যায় ধর্ম্ম। উহার কাব্য সর্ব্বশাস্ত্র চূড়া বেদবিদ্যা। কবি, বৈদিক ঋষিগণ। পাশবরৃত্তি সম্পন্ন বা দারুণ সাংসারিকতায় নিগড়ে বদ্ধ বা আত্মসর্ব্বস্ব বা আত্মবলদৃপ্ত বা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মানবকুলের উহা উদ্ধার সেতু। আদি মানব আগে যে আত্মবলসর্ব্বস্ব হইয়া, অজ্ঞ পাশবভাব

অবলম্বনে, জীবনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল; কালপথে অগ্রসর হইবার আত্মিক জ্ঞানের প্রথমোদয়ে সে পাশবভাব এখন পরিহরণীয়। আত্মবল, এখন আর এক মহৎ অদৃষ্ট বলের সম্মুখীন হওয়ায় এবং তাহার প্রখর প্রভাব অনুভব করায়, পদে পদে আত্মন্যূনতা অবলোকন করিয়া ম্রিয়মান হইতেছে। জীবনের পূর্ব্বাবলম্বন যে আত্মবলসর্ব্বস্বভাব, তাহা এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন; অথচ নূতন অবলম্বন বস্তু এখনও কিছু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না। বিষম কর্ম্মবিপাক উপস্থিত। দারুণ অন্ধকার, কালের তরঙ্গে মানবজীবন তরঙ্গায়িত, সহায় শূন্য, সাহস শূন্য, উপায় জ্ঞান শূন্য; নিম্নে শান্তি নাই, উপরে সুখ নাই, অবস্থাসঙ্কুল দিক সমূহ ছিন্ন ভিন্ন ও বিকট তাড়নায় ভীতি উৎপাদন করিতেছে। কি ঘোর কর্ম্মবিপাক! এভাব দেখিলে কাহার না হৃদয় আতঙ্কিত হয়; এভাব দেখিলে কোন ক্ষমতাবানের বা দয়া উপস্থিত না হয়। সময় উপস্থিত,—করুণানিধান বৈদিক ঋষি দয়ার্দ্র হৃদয়ে, নরকনিবাসিত তিমিরজাল ভেদ স্বীকার করিয়াও, গগণ আলোকিত করত, উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধশিখা, পতিতগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, সুস্বর তান লহরী সমন্বিত বেদগান করিতে করিতে জগতক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। অমনি বসন্ত আসিল, কুসুম ফুটিল, আকাশে সূর্য্যশশি দিক প্রকাশিয়া প্রসন্নমুখে—গগণ-সুন্দর প্রসন্নমুখে, প্রসন্ন হাঁসি হাসিলেন। বৈদিক ঋষি সমাগত। বুঝাইয়া দিলেন, দেখাইয়া দিলেন, তোমাদিগের এ কর্ম্মবিপাক তোমাদিগের অজ্ঞানমূঢ়তার;—তোমাদিগের আত্মবল নির্ভরতার মৃত্যুযন্ত্রণা মাত্র, পশুত্ব হইতে তোমাদিগের মনুষ্যত্বে আসিবার ইহা পূর্ব্বসূচনা! এখন আর আত্মবল নির্ভরতায় চলিবেনা; যে অদৃষ্টবলসংলগ্নে বিপদগ্রস্থ বোধ করিতেছ, আত্মবল পরিত্যাগ করিয়া, সেই অদৃষ্টবলের উপর আত্মনির্ভরতা স্থাপন কর, তাহাতেই আবার সম্পদগ্রস্থ হইবে; ইন্দ্রদেব তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন, তাঁহার পূজা করিও। মানবজীবন অকূল সাগরে কূল পাইল; আত্মবল নির্ভরতা পরবলে ন্যাস্ত করিয়া, মানব পশুত্ব মোচনে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্যই বেদের এত আদর।

বেদের তুল্য উচ্চ নিত্যকাব্য ইহ সংসারে আর নাই। চরাচরগুরু

ধর্ম্মগ্রন্থশীর্ষ বেদকে কাব্য বলিলাম, তাহাতে দোষ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাব্য অত্যন্ত উচ্চ সীমায় উঠিলে, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বের বা ধর্ম্মশাস্ত্রের আকার ধারণ করিয়া থাকে। বেদ সেই কাব্যের উচ্চ সীমার চূড়ান্ত স্থান, উহা ঈশ্বরবাক্য, উহা আপ্তবাক্য। মনুষ্যোপযোগীরূপে মনুষ্যকণ্ঠ দ্বারা প্রকাশ বলিয়া, উহা সাধারণগৃহিত কাব্যের আকারও প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই আমরাও এখানে কাব্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিলাম এবং ইহাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, ভগবান বেদপুরুষ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আর বাপ্পারাম, তুমি যে বুদ্ধিমান, তুমি সেই বেদকে গাছ পালার স্তুতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাক; ভাল তাহাই হউক। সেই হিসাবে, তোমার সেই নিজের হিসাব ও তোমার নিজকৃত বেদ মহিমার পরিমাণ অনুসারেও জানিও যে, সেই গাছ পালার স্তুতিই তোমাকে ক্রমোন্নতি বিধানে এতদূরে মানুষ করিয়া আনিয়াছে; তাহারই প্রভাবে আজি আমি বলিতেছি, তুমি শুনিতেছ; নতুবা তোমার আমার আজি পর্য্যন্ত সেই গাছ পালা সার করিয়া থাকিতে হইত। এ হিসাবে দেখিতে গেলেও, বেদবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোভূষণ। ধর্ম্মপর্য্যায়ের কাব্য হিন্দুসংসারে অনেক; ধর্ম্মপর্য্যায়ের কাব্য বাইবেল আদিও।

দ্বিতীয় পর্য্যায় সামাজিক এবং গার্হস্থ্য, কাব্য জগতবিমোহক রামায়ণ, এবং কবি কবিগুরু বাল্মীকি। রামায়ণ নিত্যকাব্য। বাল্মীকির শিক্ষা রাম, বাল্মীকির শিক্ষা সীতা, বাল্মীকির শিক্ষা লক্ষ্মণ; অথবা পিতৃভক্তি, পতিভক্তি ও ভ্রাতৃত্ব; অথবা শান্ত এবং রৌদ্ররসের সমাবেশ, অথবা মহানাটকের কথায়;—

"বালক্রীড়িতমিন্দুশেখরধনুর্ভঙ্গাবধি প্রহ্বতা,
তাতে কানন সেবনাবধি কৃপাসুগ্রীবসখ্যাবধি।
আজ্ঞাবারিধিবন্ধানাবধি যশো লঙ্কেশ নাশাবধি,
শ্রীরামস্ত পুনাতু লোক মহিমা জানক্যপেক্ষাবধি ॥"

অথবা আর কি বলিয়াই বা রামায়ণের শিক্ষাকে বিশেষণযুক্ত করিতে সমর্থ হই! রামায়ণের আদর্শে এ পর্য্যন্ত হিন্দু নরনারীচরিত্র গঠিত হইয়া আসিয়াছে, এখনও গঠিত হইয়া আসিতেছে, এখনও হিন্দুকুলনারী সীতার

কথায় বলিয়া থাকে (যাহা আর কোন দেশের কুলনারীতে তেমন মুখ পুরিয়া বলিতে পারে না) ;—

" ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহপ্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব!
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্॥"

তৃতীয় পর্য্যায়ে বিদ্যা এবং রাজনৈতিক; কাব্য জগতস্তম্ভনকারী মহাভারত, কবি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী বেদব্যাস এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে কাব্যের খণ্ডৈকদেশ স্বরূপ। অখণ্ডনীয় ও অবিচলিত সত্য এ কাব্যের প্রাণ এবং অবলম্বন; উদ্দেশ্যভূত কর্ম্ম ইহার ভারতমণ্ডলকে ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যপদবীতে উন্নয়ন অথচ সাংসারিক সৌভাগ্যে এক ছত্রাধীন করণ। নায়ক যাহারা ইহার, তাহারা আদর্শ পুরুষ; দ্রৌপদী বীর রমণীর শ্রেষ্ঠাদর্শ। কর্ম্মের কর্ত্তব্যত্ব একবার স্থির হইলে, কিরূপে সত্যকে অবলম্বন করিতে হয় ও সেই সত্য হইতে তাহার পর কিরূপে অধ্যবসায় ও উপায় সকল স্বতঃউদ্ভব হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে; তাহাই ইহার চরমশিক্ষা। সমস্তের মূলীভূত ও চক্রী স্বয়ং নারায়ণ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সহায় কেন?—না পাণ্ডবেরাই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যপ্রিয়। দুর্ভাগ্যবান বাঙ্গালি কবি এই শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাসকে জুয়াচোর সাজাইয়া ভারত সাম্রাজ্য গঠন করিতে চায়! বেদব্যাস এমনি যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠীরকে 'হত ইতি গজ' বলাইয়াও, কোন মতে যুধিষ্ঠীরকে নরকদর্শন করান হইতে ব্যাসের হস্তে রক্ষা করিতে পারেন নাই; শ্রীকৃষ্ণও আবার এমনি যে তিনি সেই বেদব্যাসের উপাস্য। অধম বাঙ্গালা কবি এ সকলের মাহাত্ম্য বুঝিবে কিরূপে? সে, যে ইংরেজীনবিশীতে শিখিয়াছে যে লেনা দেনা ও খানা পিনাই এ জগতের সার, শিখিয়াছে যে স্বজাতীয় তাবৎ প্রাচীন বিষয় বুড়োবকেশ্বরের গল্প এবং শিখিয়াছে যে সংসারে যে বেশী চাতুরী খেলিতে পারে, তাহারই জিত; সে কেন না ওরূপ বলিবে ও সে তাহার ধ্যান ধারণা ও চলনা বলনায় কেন না সেইরূপ শিক্ষা উদ্গীরণ করিবে?

মহাভারত নৈমিত্তিক শ্রেণীয় হইলেও, উহা শাকর্য্য বহুল। সে যাহা হউক, চতুর্থ পর্য্যায়ে ঐশ্বর্য্য এবং ভোগ; শান্তিসুখের আদর্শ। ভারতীয় গণ, জাতীয় জীবনের একপর্য্যায় পূর্ণতায় আনিয়া, তাহার ফলভোগরূপ শান্তি-সুখে প্রবর্ত্ত, কবি ভারতীপুত্র কালিদাস।

বিষয় ভেদে উপরোক্ত কবি এবং কাব্য সকলের প্রতি, ভারতসন্তানগণের ভক্তিপ্রদর্শন ক্রিয়াও অনুরূপ। বেদকে কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে দেখিলে, উহা অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহবৎ; লোকে প্রায় উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবসর হইতে চাহে। এমন বৃদ্ধের নিকট, নবানুরাগী তরলমতি, চুট্‌কিরসের রসিক ও নব পন্থানুগামীর প্রবৃত্তি তৃপ্তিকর কথা শুনিবার সম্ভব অতি অল্প; অথচ এমন নিষ্পাপ করুণাময় পিতৃপুরুষের উপর হৃদয়ের পূর্ণভক্তির উদ্ভবও অনিবার্য্য। কিন্তু যতই বল, বেদের এ মানটুকুও আজ কাল্‌ টেনে বোনা! এখনকার দিনে, শিক্ষার গুণে, পিতা যখন ওল্‌ড ফুল ও সন্তানপোষণে ডিউটীর দাসমাত্র; তখন অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহকে কাজেই 'ওল্‌ড ইডিয়ট' বা কৃষকের গীত হইতে হয়।

রামায়ণ পিতৃ মাতৃ স্থানীয়, স্নেহময়, করুণাময়, যখনই নিকটে যাইবে তখনই স্নেহরসে ও ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইতে থাকিবে; যখনই নিকটে যাইবে তখনই স্নেহমাখা মধুর কথা শুনিতে পাইবে; সুতরাং লোকে রামায়ণে আকৃষ্ট সর্ব্বদাই, অথচ তাহাতে সর্ব্বদাই ভক্তিসংযুত। আর মহাভারত আমাদিগের গুরু, অন্য যে সে গুরু নহে, শিক্ষা বা দীক্ষা গুরু। যখন নিকটে যাইবে, তখনই হাঁসি আছে বটে, কিন্তু তিলক ছটার মিশালে! যখন নিকটে যাও তখনই হরিনাম; যখন নিকটে যাও, তখনই উপদেশের ছড়াছড়ি; এমন কি, এক এক সময়ে শুনিতে শুনিতে প্রাণ ঝালা পালা হইয়া উঠে। লোকে সহজে সে দিকে ঘেঁসিতে চাহেনা, অথচ গুরুর প্রতি ভক্তি অপরিহার্য্য, কেননা তিনি উদ্ধারের সেতু। আর কালিদাস বন্ধু, কালিদাস ইয়ার, মনের কথা বল, মনের কথা শুন; যাহা মনে আসে তাই বল ও তাই শুন, কালি-দাসের সহবাসে বিরসও সরস হইয়া থাকে। কালিদাসের সহবাসে এই দুরন্ত দুঃখসঙ্কুল সংসারও সুখের হইয়া যায়। কালিদাস কবির

মধ্যে ঔষধের মকরধ্বজ। যেমন অনুপান দিয়া যে রোগে প্রয়োগ করিবে, সেখানে সেই রোগেরই উপসম। সংস্কৃত কবিদিগের বিষয়ে, আরও ক্রমান্বয়ে পর্য্যায় আলোচনার আবশ্যক রাখে না; তাহা অধিকন্ত হইবে। বাঙ্গারাম বুঝিতে পারিয়াছ, আমাদিগেব এই নূতন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে কাব্যের পর্য্যায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, পর্য্যায়ের নামকরণটা সমালোচক ও ভাবুকের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে? মাইকেল মধুসূদন এবং কোন কোন ইংরেজ ও ইংরেজীনবিশগণ, কাব্যার্থ এরূপে বুঝিলে ও এরূপে কাব্যের মর্ম্মগ্রহ করিলে; ছটাকে কাব্য হোমার ও মিণ্টনকে, মহাকল্পবৃক্ষ রামায়ণ ও মহাভারতের সহিত তুলনা করিতে যাইত না অথবা হোমারকে শ্রেষ্ঠতর বলিতে নির্লজ্জ স্পর্দ্ধাও হইত না। কুকুরদৃষ্ট জগত অবশ্যই অতি অপূর্ব্ব, নতুবা নিউটনের কাগজপত্র পুড়িয়া তেমন ছারখার হইবে কেন?

উক্ত নিয়ম অনুসারে এক্ষণে একটু বাঙ্গালী কবিদিগের বিষয় আলোচনা করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বুঝি; কিন্তু সে মাখন-চোরা ননীগোপাল-দিগের বিষয় আলোচনা করিতে, মনে যেন কেমন একটা অপ্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। বাঙ্গালী কবিগণ দুইদলে বিভক্ত, এক ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্ব-স্থিত দল, অপর ঈশ্বর গুপ্তের পরস্থিত দল।

পূর্ব্বদলে কবি অনেক, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি। ইহাদিগের গ্রন্থে কবিত্ব শক্তির অভাব নাই এবং স্বভাবচিত্রণেও অনেকে অত্যন্ত পটু; কিন্তু উচ্চভাব, উচ্চ আদর্শ অথবা আর এক জগতের কথা এ জগতে আনিয়া প্রচার করা কাহাকে বলে, তাহা ইহাদিগের কাব্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। এমন সকল কথা, যাহাতে জন্মান্তরীন্ ভাবের উদয় হয়, যাহাতে অদৃষ্ট দৃষ্ট পথে আইসে, নূতন পৃথিবীর অপূর্ব্ব মাধুরী যদ্বারা নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহা বড় একটা ইহাদের কাব্যে দেখিতে পাই না। স্বাধীনতার দূর গগণ-বিহারী পক্ষ ইহাদের নাই; কেমন একটা বদ্ধ সংসারের মধ্যে সকলেই আবদ্ধ; সকলেরই অবলম্বন সেই একঘেয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান বা সেই উপাখ্যান বিষয়িনী ধরণ বিশেষ। উপমা, অলঙ্কার, রসাবতারণা আদি সক-

লই সেই এক ছাঁচের ও একঘেয়ে। তবে কিনা পার্শ্বস্থ এবং উপস্থিত বিষয়ের চিত্রণে অনেকে বিশেষ পটুতা দেখাইয়াছে; কিন্তু কেবল সেইটা লইয়াই ত বিশেষ সুখ্যাতি দেওয়া যাইতে পারে না। তখনকার হীন এবং ক্ষীণ বাঙ্গালী চরিত যাহা, ইহাদের কাব্য তাহারই যথাবস্থ চিত্রণ ভিন্ন আর কিছুই নহে; অনাগত চিত্রের সহ ইহাদের প্রায়ই কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাদের কর্তৃক বর্ণিত অংশে বা পুরাণ ঘটিত কথায়, কেহ কেহ বা অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখাইয়া, কবিদিগের উচ্চ প্রাণতার পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং বঙ্গবাসী প্রকাশিত ভারতচন্দ্রে, সেরূপ অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই প্রাণ ভরিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি যে, যদি সেরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বাভাসে কিছু বিশেষবাহাদুরীই থাকে, তাহা হইলে সে বাহাদুরীর অংশ ভাগী সেই বাঙ্গালা কবিরা নহেন; যেহেতু সে সকল তত্ত্বাভাস পুরাতন শাস্ত্রীয় কথা মাত্র। কবি, নিজ জীবনের এ নানা অবস্থা সঙ্কুল প্রবাহে, নিজে যে নূতন ও অপরিজ্ঞাত তত্ত্বাভাস অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কই? এরূপ নূতন ও অপরিজ্ঞাত তত্ত্বাভাস উপলব্ধি করার শক্তিকেই প্রতিভা কহে। উহাই সত্য প্রতিভা। প্রতিভা আরও এক রকমের আছে, অর্থাৎ উপস্থিত পদার্থ যাহা অন্যে ভাল অনুভব করিতে পারিতেছে না, তাহা অনুভব করা। বলা বাহুল্য যে এ কেবল ভেড়ার মধ্যে ওল পরামাণিক গিরি,—ইহা অতি নিকৃষ্ট প্রতিভা।

কিন্তু উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহার মধ্যে একটু ব্যতিক্রম আছে, সে ব্যতিক্রম কাশীদাসকে লইয়া। এরূপ উচ্চ ও এমন ধীর গম্ভীর এবং এমন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিশিষ্ট কবি আর উপরোক্ত দলের মধ্যে কেহ নাই এবং পরেও কেহ বাঙ্গালায় হয় নাই। কাশীদাসের সঙ্গে তুলনায়, কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাসাদিকে মানিকপীরের গীত শ্রেণীস্থ বলিলেও বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। কাশীদাস স্থিরসঙ্কল্প, অবিচলিত চিত্ত, দৃঢ় চিন্তাবেশযুক্ত অথচ আড়ম্বর শূন্য, স্থির, ধীর অথচ নিশ্চয়াত্মক, গাম্ভীর্য্যের অবধি নাই, অথচ সর্ব্বদাই বিনত ভাব ও সেই বিনতভাবে সর্ব্বদাই মহাপ্রাণতা উদ্ভাসিত। কাশীদাসের চিত্ত-ছায়ায় সমগ্র গ্রন্থই এরূপ গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ

যে, কাশীদাসের আদি বা অন্যান্য তরল রসকেও, তাহাদের স্বাভাবিকী তরলভাবে গ্রহণ করিতে কেমন যেন একটা আশঙ্কা হয়। কাশীদাসে ঊর্দ্ধ, অদৃষ্ট এবং অনাগত তত্ত্বাভাসও অনেক। ফলত কাশীদাস যে কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহাকেই অলঙ্কৃত করিতেন। কাশীদাসের সমগ্র গ্রন্থের প্রকৃতি যেরূপ, তাহা তাঁহার গ্রন্থারম্ভের প্রথম পদ কয়টিতেই ছায়াপাত হইয়াছে ;—

"সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরি নাম দ্বিঅক্ষর,
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর।
প্রণমহ পুস্তক ভারত নামধর,
শুনিলে যাহার নাম নিষ্পাপী হয় নর"। ইত্যাদি

এখানে আর একটি দ্রষ্টব্য, লম্বা লম্বা বন্দনার ঘটা এখানে নাই, অথচ গুটি দুই কথায় ভক্তি এবং বিষয়ের পূর্ণাভাস প্রদর্শিত। সত্যকথা! পুরুষত্ব হীনেরাই সর্ব্বদা দেবতার নাম করিতে বেশী পটু ; পুরুষত্ব পূর্ণগণের সে অবসর নাই ; প্রকৃতি-বিজড়িত হৃদিস্থিত নিত্য দেবরূপ ও সেই দেবরূপে নিত্যারূঢ় ভক্তিই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং কর্ম্মক্ষম ও কর্ম্মাবেশ কালে তাহাই হওয়া উচিত।

কাশীদাস ব্যবসায়ে গুরুমহাশয় ছিলেন, পাঠশালে ছেলে লেখাইতেন। বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় ডাঁইহাটের কাছে সিঙ্গি। ঐ গ্রামের প্রান্তভাগে একটা মাটির ঢিবি ও একটা পচা পুকুর আছে ; পুকুরের নাম কেশের পুকুর এবং ঢিবিটার নাম কেশের ভিটা ;—'কেশেই' বটে। 'কেশে' না হইলে বাঙ্গালী চরিত্রের যে ব্যত্যয় হয় ; 'কেশে' না হইলে, এ ভিটা ও ঐ পুকুর ওমনি থাকে! মুড়িমুড়কির গান গাহিয়া স্কচ বরণের স্মরণকীর্ত্তি ইউরোপের একটা দর্শনীয় পদার্থ ; আর মহাভারতের মহাধ্বনি করিয়া কাশীদাসের স্মরণ চিহ্ন 'কেশের ভিটা ও কেশের পুকুর'! কাশীদাসের পক্ষে তাহার কোন স্মরণকীর্ত্তি স্থাপিত হউক বা না হউক, দুইই সমান কথা ; যে হেতু তাহার নিজ কীর্ত্তি চিরস্থায়ী ও অগ্যাত্মশরীরময়ী ; কিন্তু তাহার যে কীর্ত্তি যাহাদের জন্য উদ্ভূত, তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনশক্তির চিহ্ন কোথায়?

বাঞ্ছারাম, তুমি বলিবে, কাশীদাসেরই বা এত প্রশংসা কিশে? কারণ মহাভারত লইয়া যে কিছু প্রশংসা, তাহা মূল মহাভারতের প্রাপ্য। তা বলিবে বটে, কিন্তু জানিও, কাশীদাসে তোমার এ কথা খাটে না। কাশীদাসের উপাখ্যান ভাগ মাত্র মূল মহাভারতের, তাহাও আবার সম্পূর্ণ ঠিক নহে; তাহার পর আবার তন্নিহিত কবিত্ব যাহা, তাহা সমস্তই কাশীদাসের নিজের।

কৃত্তিবাসের কেতাব উচ্চ নীচ সকলেই পড়ে, সকলেই শুনে সত্য; কিন্তু সেটা কৃত্তিবাসের গুণে তত নহে, সেটা বেশীর ভাগ নিত্য-মধুমাখা রামায়ণ জিনিসটার গুণে। কৃত্তিবাস কবি বটে কিন্তু নিঃসন্দেহই মেঠো কবি; ধারণা, বর্ণনা, সকলেতেই মেঠো ছায়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা এই রাজবিভূতি লইয়া দেখ। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস, উভয়ের কেহই কখন অবশ্য রাজসভা ও রাজবিভূতি দেখে নাই; অথচ দুই জনেই তাহা বর্ণনা করিতে গিয়াছে। দুয়ের মধ্যে কাশীদাসের বর্ণনা প্রকৃতই উচ্চ এবং প্রকৃত রাজবিভূতি যেরূপ হওয়া উচিত, প্রায় তদ্রূপ; আর কৃত্তিবাসের কাছে?—তাহা চাষা গাঁয়ের মোড়ল ও মোড়লের আখড়া। রেতের বেলা, আয়েস করিয়া, অন্ধকারে, বড়ঘরের দাওয়ার সম্মুখে, উঠানে মাদুর বিছাইয়া এবং কালু ভুলু আদি পারিষদ লইয়া, মোড়ল সরগরম করিয়া বসিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে পলের আগুনে খরসান তামাকের দম্ চলিতেছে; এমন সময় হনুমান হঠাৎ কালনেমীর মুণ্ডটা লেজে করিয়া জড়াইয়া, একধমকে তাহাদের সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। অমনি সকলেই চমকিত; কিন্তু তখন অন্ধকার, কালু ভুলু কাজেই তখন কাটি দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখিবেনা ত কি করিবে।

বসেছে রাবণ রাজা পাত্রমিত্র সনে।
অন্ধকারে কালনেমী পড়ে মধ্যখানে॥
কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে।
নেড়ে চেড়ে দেখে বলে কালনেমী বটে॥

অথবা এমন সময় হঠাৎ অঙ্গদ আসিয়া জড়াজড়ি করিয়া ঝাপ্টা ঝাপ্টিতে রাবণকে ফেলিয়া দিয়া পলাইল।

অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়ে॥

রাজসভায় না জানি কতই ধুলা জমিয়াছিল!—বড় ঘরের দাওয়া ভিন্ন এত ধুলা ঝাড়ার ব্যাপার আর কিরূপে সম্ভবিতে পারে। যাহা হউক, তথাপি কৃত্তিবাস কবি, চিরজীবী কবি এবং বাঙ্গালা ভাষার সহিতই তাঁহার নাম লোপের সম্ভাবনা।

তাহার পর ভারতচন্দ্র এবং মাইকেল। ভারতে লালিত্য এবং মাইকেলে অনুকরণ-গুরুত্ব আছে। ভারতচন্দ্রের মত মধুর পদবিন্যাস বোধ করি আর কখনও বাঙ্গালী কবি করিয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। মাইকেল আধুনিক দলের আদর্শ এবং গুরু। ঈশ্বরগুপ্ত সাময়িক জল-বুদ্বুদ মাত্র, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং বিলয় প্রাপ্ত। জীবিত দলেও দুই একজন প্রকৃত কবি আছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

উপরে যে কয়টি বঙ্গ কবিদিগের বিষয় বলিয়া আসিলাম, তাহা বঙ্গকাব্যারণ্য মধ্যে কেবল কয়টি মহাবৃক্ষ মাত্র। ক্ষুদ্র বৃক্ষ, কাঁটা গাছ, ঘাস পাতাড়, ইহাদের কথা কিছুই বলি নাই, বলিবার তত আবশ্যকও রাখে না। ফড়ে অর্থাৎ পাইকেড়ে কবি অনেক;—সকল দেশেই সকল কবিরই পাইকেড়ে বা ফড়ে আছে, তাহাদের শুধুমাত্র নাম লিখিতে গেলেও স্থানে কুলায় না। কিন্তু অন্য দেশের পাইকেড়ে আর বঙ্গভূমির পাইকেড়েতে কিছু প্রভেদ আছে। বাঙ্গালার পাইকেড়েরা বড় নিন্দিত ও বিরক্তিকর, প্রায়ই কলিকাতার বাখরগঞ্জে বাঙ্গাল ফেরিওয়ালা। সত্য বটে পৃথিবীর সকল বস্তুকেই আগে মলমুক্ত হইয়া তবে স্বস্বভাবে ও স্বাভাবিক উজ্জলতায় উঠিতে হয়; সকল দেশের সকল সাহিত্যকেই আনুষঙ্গিক অসারমলমুক্ত হইয়া তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হয়। বঙ্গসাহিত্যও যে সেই নিত্য নিয়মের বহির্ভূত হইবে এমন বলিতেছি না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাগ্যে যে এত কূটমল জমিয়াছিল, এবং তাহাকে যে তাহাদের সেই বৃহৎ পর্ব্বতরাশি ভেদ করিয়া উঠিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

ইতি কাব্য—কবি—বাঙ্গালা কবি।

খেলেনা।

১২৮০—১২৯৪।

(এই প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশ বহুদিন পূর্ব্বের ও খুট আখুরে অবস্থার লেখা। এখন লিখিতে হইলে, হয়ত ইহার অনেক কথা লিখিতাম না, অনেক কথা লিখিতে প্রবৃত্তি হইত না এবং হয়ত অনেক কথা মনেই উঠিত না। হয়ত এ গুলির মধ্যে কতই অসংলগ্ন, কতই অকথ্য, কতই আপত্তিজনক, কতই লিখিবার অযোগ্য এবং আরও কত কি আছে। কিন্তু, তাহা হইলে কথা হইতেছে, তথাপি এ গুলি এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া ছাপাই কেন। তাহার কারণ আছে। নির্ব্বোধেরও, এমন কি পাগলেরও পর্য্যন্ত, চিত্তের ক্রম পরিণতি, চিত্তের অবস্থা বিশেষ হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি, চিত্তের ভাব বিশেষ হইতে ভাবান্তরে আগতি, এ গুলি কৌতুকের স্থল, আমোদের স্থল এবং লোকতত্ত্ব ও লোকচরিত্র দর্শীর নিকট শিক্ষাস্থলও বটে। আমারও এ লিখন গুলি সেই হিসাবে এবং কেবল সেই হিসাবেই পাঠ্য। অন্যে যদি কেহ ইহাতে অন্য হিসাবও দেখেন, তাহাতে আমার হাত নাই, তাহাতে আমি নাচার। যে যে চক্ষে দেখিবে, তাহার পক্ষে তাহাই; কে তাহাকে বারণ করিতে সমর্থ হয়।

১। চিত্র-বৈচিত্র।

পলাসী যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে অবস্থান কালীন ডিয়ার নামক একজন ইংরেজ একরূপ লিপি রাখিয়া গিয়াছে;—"আমাদিগের পক্ষে এ দেশের পথে ঘাটে একা চলা ফেরা নেহাত আশঙ্কাজনক না হউক, বিরক্তিজনক ত বটে; আমরা পথে বাহির হইলে, মুসলমান রোষকষায়িত চক্ষে চায়, হিন্দু ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং বালকেরা ফিরিঙ্গী যাইতেছে বলিয়া পিছনে পিছনে করতালি দিয়া ছুটে ও গায়ে ধুলা নিক্ষেপ করিয়া থাকে।"

১৮০৮ খৃষ্টীয় সালে উইলকিনসন নামে একজন উচ্চ ইংরেজ এদেশীয় একটি উপাসনা মন্দিরের নিকট দিয়া গমন কালীন এরূপ লিপি করিয়া গিয়াছে;—"মন্দির মধ্যস্থিত অস্ফুট কোলাহল শুনিয়া, আমার দেখিতে বাসনা হইল। মন্দির প্রবেশে উদ্যত হইলে, দ্বাররক্ষক আমাকে জুতা খুলিয়া মন্দির প্রবেশের কথা জ্ঞাপন করিল। এরূপ জুতা খুলিতে বলায় আমি কিছুই হতমানের বিষয় মনে করি নাই; যেহেতু যে জাতীয় রিতি

নীতি যেরূপ, সেই জাতির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার অনুসরণ করাই সম্প্রীতি লাভের প্রধান উপায়, বিশেষ ভজনালয়ের সম্মান রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলে, প্রধান পুরোহিত আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল এবং আমি জানু পাতিয়া অন্যান্য উপাসকদিগের সঙ্গে উপবেশন করিলাম। উপাসনার পরে প্রসাদহালুয়া বণ্টিত হইল এবং আমিও তাহার একভাগ পাইয়া, স্বচ্ছন্দে উপাসকদিগের সঙ্গে একত্রে ও সৌভ্রাত্রভাবে জলযোগ করিলাম।" *

তৃতীয় বর্ত্তমান সময়ের চিত্র। কি বলিব, সকলেই ত দেখিতেছে। বালকেরা যে ফিরিঙ্গীর প্রতি উপহাস করিয়া এক সময়ে তাহার গায় ধুলা নিক্ষেপ করিত; এখন দেশমান্য বৃদ্ধ সেই ফিরিঙ্গীরই কিঞ্চিৎ পদধুলা পাইতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। সেই ফিরিঙ্গীর কাছে ভারতসন্তান এখন অসভ্য, অভব্য, মনুষ্য নামের অযোগ্য, সেই ফিরিঙ্গীর নিকট কুকুর বিড়ালের যে আদর, যে মান্য, ভারতসন্তান এখন তাহাতেও বঞ্চিত। "ভারতসন্তান খাইতে জানে না, পরিতে জানে না, পয়সা খরচ করিতে জানে না, পয়সার সদ্ব্যবহার করিতে জানে না।" তা বটে, কিন্তু কই? এত কৃপণতায় পয়সা বাঁচাইয়াও ত ভারতসন্তান সকল সময়ে হাতে মুখে এক করিয়া উঠিতে পারে না।

কালভেদে ইহাই চিত্র-বৈচিত্র। এ সংসারে নিয়তি নিয়তই এই চিত্র আঁকিতেছেন; কিন্তু কেন? ভারতভাগ্যে এতদুত্তরের উত্তরদাতা এখনও ভবিষ্যৎ গর্ভে।

২। অভ্যুত্থান।

ভারতসন্তান! ঘৃণায় নিন্দায় অত্যাচারে অনাচারে তাপে পাপে নানা অবস্থায়, নানারূপে, নিয়ত পিশিত ও পদদলিত হইতেছ; হও, হও! ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা কর, যেন আরও অধিক পরিমাণে হইতে থাক। বৈপরীত্য সমাবেশ ভিন্ন কোন অভ্যুত্থানই সাধিত হয় না। বিনা

* এই অংশ স্মৃতি হইতে লেখা, সুতরাং ঠিক সাল তারিখ ও বাক্য বিন্যাসে একটু আধটু তফাত হইতে পারে। ফলত সেরূপ তফাত বাদ হইলেও, মূল মর্ম্মের তাহাতে কিছুই হানি হইতেছে না।

ত্রেতাঘাতে অতি অল্প বালকই মনুষ্য পদবীতে গিয়া থাকে। কিন্তু কিছুই ভুলিও না, মনে সব থাকে যেন।

৩। জাতীয় অধঃপতন।

এ সংসারে প্রতি জাতিবিশেষে ন্যস্ত কর্ম্মভার পৃথক্‌বিধ। কর্ম্মভার দ্বিবিধ, এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বপ্রধান, অপর আধিভৌতিক তত্ত্বপ্রধান। উভয় তত্ত্বের সামঞ্জস্য-সংমিলন হইলেই কেবল, ইহলোক এবং পরলোকেও, শ্রেয়ঃ লাভ হয়; তদন্যতরে তদন্যতর।

প্রাচীন ভারতীয়েরা সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসরণে নিযুক্ত এবং এই কারণেই, অন্য তাবত জাতি হইতে, ইহাদের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য অত্যধিক।

অনুসরণ ক্রিয়ার আতিশয্য হইতে, যে দিন কথিত সামঞ্জস্য-সীমাতিক্রম করিয়া, ভারতীয়েরা আধ্যাত্মিক পথে অতি-প্রধাবিত হইয়াছিলেন; সেই দিন হইতেই তাঁহাদের ইহলৌকিক অধঃপতনের সূত্রপাত।

অতি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবিষ্কারে সক্ষম হইলেও, তৎসহ সামঞ্জস্য-কারক আধিভৌতিক কর্ম্মের অভাবে, তাঁহাদের ইহলৌকিক মলীনতা। উহাই জাতীয় অধঃপতন। ত্যক্ত আধিভৌতিক তত্ত্বের পুনঃ শিক্ষা ও পুনরালোচনের নিমিত্ত, আধিভৌতিক তত্ত্বান্বেষী অপেক্ষাকৃত হীন হইলেও, শিক্ষার্থে তাহার নিকট অধীনতার প্রয়োজন।

যেখান হইতে ভারতীয়েরা আধিভৌতিক তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইউরোপীয়েরা সেখান হইতে তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে এবং তাহারাও এখন সে পথে ক্রমে সামঞ্জস্য-সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদেরও অল্প ইহলৌকিক মলীনতা, সুতরাং জাতীয় অধঃপতনের দিন আগত প্রায়।

ভারতীয়েরা গুরুস্থান শীঘ্রই পুনঃ অধিকার করিবে। যে বেদ এবং হিন্দু শাস্ত্ররূপ মহাবৃক্ষে, বৈদিকখণ্ড, মক্ষমুলর আদি কৃষকের গীতাদি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না এবং যাহার যোগ প্রকরণাদি, তাহাদের বিশ্বাসে, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিকট কিছুতে দাঁড়াইতে পারে না; তাহাই তাহাদের বংশধরগণের নিকট একদিন অভাবনীয়

শিক্ষাস্থল হইবে ও অভাবনীয় রত্নফল প্রসব করিতে থাকিবে। খৃষ্টীয় বাইবেল নূতন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হইবে; প্রকৃত খৃষ্টীয় তত্ত্ব হিন্দুর দ্বারা উদ্ঘাটিত হইবে।

আধিভৌতিক অধীনতা এবং প্রাধান্য, উভয় সম্বন্ধ সংবর্দ্ধনে, আধিভৌতিক পাশব বলেরই প্রয়োজন। কিন্তু আধ্যাত্মিক অধীনতা ও প্রাধান্য স্থাপনে, সে সকলের অনাবশ্যক; একমাত্র জ্ঞানবলেরই প্রভূত প্রয়োজন। সুতরাং ভারতীয়ের নিকট ইউরোপীয়ের যে অধীনতা তাহা, ইউরোপীয়ের নিকট ভারতীয়ের অধীনতার আকারে হইবে না; হইবে যেরূপ তাহা পৃথক্‌বিধ; অধুনা তাহা কেবলমাত্র অনুভব করিবার বিষয়।

প্রাধান্যমোহে এবং বলোন্মত্ততায়, ভারত সম্বন্ধে যেটা যাহা নয় সেটাকে তাহা বলিতে, যেটা যাহা নয় সেটাকে তাহা হয় করিতে এবং যে কোন কথা দৃঢ়তা সহ ঘোষিতে, ইউরোপীয়ের সর্ব্বদাই অকুতো সাহস এবং অপরিমিত সন্দেহ রাহিত্য। এমনও সদর্প উক্তিতে ত্রুটি হয় নাই যে, ভারতীয়েরা আপন ধর্ম্মতত্ত্ব ও আপন শাস্ত্র পর্য্যন্ত বুঝে না; তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কালে ইউরোপীয়ের শরণাপন্ন হইতে হইবে; যতদিন সেরূপ শরণাপন্ন না হইতেছে ততদিন সে কেবল হিন্দুর বুদ্ধির দোষ মাত্র। পাশব বল মানুষকে কতই না মূঢ়তায় মোহিত করিয়া থাকে! ঈশ্বর করুন, ভারতীয়েরা যখন গুরুস্থান অধিকার করিবে, ওরূপ নির্লজ্জ মূঢ়তা ও মূর্খতা এবং বক্তামী ধৃষ্টতা যেন কখনও তাহাদিগকে আশ্রয় না করে।

উভয় তত্ত্বের সামঞ্জস্য ও সমীকরণ এবং জাতীয় অধঃপতন ও অভ্যুত্থান, তদুভয়ের হরণ পূরণ, এরূপেই এসংসারে নিয়তি নিয়োজনে সংসাধিত হইয়া থাকে।

৪। সত্যাবলম্বন।

যখনই শুনি ইংরাজ বাহাদুর সস্নেহে, সখেদে, সরোষে, সলগুড়ে, সার্দ্ধচন্দ্রে বলিতেছেন, 'ভারতসন্তান, তুমি বড় মিথ্যাবাদী,' তখন বড় হাসিপায়, তখনই বড় বিদ্রূপাত্মক কৌতূহলের উদয় হয়। বাঁহারা সাহেব বড় গণ্য মান্য, বড় উচ্চদরের ও বড় সদাশয়, আজি কালির মধ্যে তাঁহার 'কে-সি-এস-আই' এবং 'এক্সেলেন্সি' হইবার সম্ভব; তিনি গুরুগম্ভীরস্বরে তিরস্কার

করিতেছেন,—'সূচ্ বাবু, তুমি বড় অসভ্য,বড় অন্তজ,তোমার পিছনে ছিদ্র!' সূচ্ অবাক!—কিন্তু ঘাড় তুলিবার সাধ্য নাই, যেহেতু অমন গনের গণ্ডা সূচ্ ঝাঁঝ্রার এক এক ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট পূর্ব্বক বিলুপ্ত হইতে পারে।

বলিহারি যাই ভাষা ইংরাজের, বলিহারি যাই শিক্ষা ইংরাজের, মিথ্যা কথা কহিলেও ভাগার গুণে সত্য কথায় পরিণত হয়; মিথ্যা কার্য্য করিলেও, সত্য কার্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়। ম্যাক্স ও' রেল নামক এক ফরাসী লিখিতেছে;—

'বিলাতে একদা এক বিসপ (সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মযাজক) রেলগাড়ীর এক কুঠারীতে যাইতেছে। একটি স্ত্রীলোককে ঐ গাড়ীতে উঠিতে উন্মুখী দেখিয়া, বিসপ বাহাদুর গাড়ীর সমস্ত বেঞ্চে নিজের দ্রব্যাদি বিক্ষিপ্ত করিয়া তাহা জোড়া করিয়া ফেলিল এবং স্বয়ং গাড়ীর দরজায় আড় হইয়া পড়িয়া প্রবেশ পথ রোধ পূর্ব্বক বলিল—"ঠাকুরুণ, অন্য গাড়ীতে যাও, এখানে সব জোড়া হইয়া গিয়াছে।" তা দেখিয়া আর একজন বিসপকে তিরস্কার করিয়া বলিল যে, আপনি বিসপ হইয়া এমন মিথ্যা কথা বলেন ও মিথ্যা আচরণ করেন! বিসপ তখন সদর্পে উত্তর করিল—"তুমিত বড় বেল্লিক হে! আমি মিথ্যা বলিয়াছি কোথায়? সত্য কথাই ত বলিয়াছি, আমি বলিয়াছি 'স্থান সব জোড়া,' হয় নয় দেখ না কেন স্থান সব জোড়া কি না"?

বলা বাহুল্য যে বিসপই সত্যবাদী; মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাদর্শী বরং সে যে তিরস্কার করিতে গিয়াছিল। ইহা 'সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মযাজকী' সত্য! আর আর সত্য সুতরাং কেবলমাত্র অনুভব করিবার বিষয়।

ভারতীয়েরা যথার্থতই অসভ্য, যথার্থতই আহাম্মক; পোড়া কপাল তাহাদের ভাষার, পোড়া কপাল তাহাদের শিক্ষার? তাহারা সত্য কহিলেও মিথ্যা হয়; সত্য কর্ম্ম করিলেও মিথ্যা কর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হয়!

সেই ভাষাই সভ্য ভাষা, সেই শিক্ষাই সভ্য শিক্ষা, যাহা সকলকেই শোভন রঙে রঞ্জিত করিতে পারে, যাহা আবশ্যক মতে নানা মূর্ত্তি ও নানা দিগ্বিহারী; যাহা রাত্‌কে দিন, দিনকে রাত্ করিতে পারে! তেমন ভাষা ও তেমন শিক্ষা যাহাদের, তাহারা সুতরাং সভ্য ও সত্যবাদী; আর

সকলেই, বিশেষতঃ যাহার উপর কথা চলে ও বল চলে, তাহারা অসভ্য ও অসত্যবাদী।

সেই সুসভ্য ও সত্যবিধায়ক ভাষার গুণে, ইউরোপীয় জাতিরা কি না অদ্ভুত ও অভাবনীয় লীলা করিতেছে! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জগত উলট পালট করিতেছে, অথচ তাঁহাদের সত্যচ্যুতি হইতেছে না; টীক্‌বরণ মোক-দ্দমা করিতেছে, অথচ সত্যাবতার ভাবের ক্ষুণ্ণতা ঘটিতেছে না; সন্ধিপত্র ঘোষণাপত্র শব্দের মার-প্যাঁচে, বুদ্ধির মার-প্যাঁচে হজম করিয়া ফেলিতেছে, অথচ খৃষ্টীয় ঈশ্বর ও খৃষ্ট তাহাদের জন্য স্বর্গে স্থান মজুত রাখিতে বাধ্য! সত্যাবলম্বন এরূপ হারে বৃদ্ধি হইতে চলিলে, ঈশ্বরকে হয় ত ইহার পর বদলীল্ বেল্‌বিডিয়ার বা বকিংহাম প্যালেস্ মজুত রাখিতে বাধ্য হইতে হইবে! কে জানে, এবং ডিপ্লোমেসিতেই বা কি না হইতে পারে?

অবোধ বাঙ্গারাম কিন্তু রাজনৈতিক সন্ধি, ঘোষণা, এবং সেই ভাই, ইত্যাদি কত কি দর্শাইয়া আপন মনে বলে—'আমরা ত মিথ্যাবাদী বটে আর এমন মিথ্যাবাদী কোন জাতেই বা নাই; কিন্তু প্রভেদ এই, আমরা মিথ্যাবাদী ব্যক্তি বিশেষে, আর আমাদের যাহারা মিথ্যাবাদী বলে তাহারা মিথ্যাবাদী জাতি-নির্ব্বিশেষে?' বলা বাহুল্য যে অবোধ বাঙ্গারামের এ সকল বুঝিবার ভুল। এমন নিষ্কলঙ্ক চাঁদে এমন কলঙ্ক দাগ লাগান অঘোর মূর্খের কার্য্য ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিব।

হাল্ সময়ে সত্যাবলম্বনের নিগূঢ় ও সহজ সন্ধান।—ইংরাজ আমাদের শিক্ষাগুরু, তাহার অনুকূল ও অবয় পদার্থ যাহা কিছু, তাহা কখনও অসত্য প্রতিরূপ হইতে পারে না এবং এই যে কথা, এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম! অতএব সত্যাবলম্বনের সহজ ও নিগূঢ় সন্ধান এই যে, যাহা ইংরাজ বাহাদুরের রুচিকর ও রুটীকর, তাহা কহিলেই সত্য কথা হইবে; যাহা তাহার পক্ষ ও পক্ষার্থ বিধায়ক, তাহা করিলেই সত্যাচরণ হইবে। এ সন্ধানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসংখ্য পাইবে—বিশেষ চাকুরে মহলে। আবশ্যক বোধ করিলে, এই সন্ধান অনুযায়ী চলিতে পার এবং কে না জানে সত্যাবলম্বনে কতটা পরিমাণে ইহলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

একটা কথা— অত্যাশ্রম বা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম ইচ্ছুক যাহারা, তদনুগমন

জন্য যে কিছু আয়োজন তাহা যেন তাহারা অধুনাতন বিষয় কার্য্য হইতে চির অবশর হওয়ার পর অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করে; যেহেতু বিষয় কার্য্য হাতে থাকিতে, তাহার সমান আর কি হইতে পারে,—আদরই বা কাহার এবং আচরণীয়ই বা কে? সোনা ফেলিয়া কি আঁচলে গেরো!

বাঞ্ছারাম অনেক দেখিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তথাপি উক্ত বিষয় কার্য্যের অপূর্ব্ব সংসার ও তাহার যে সত্যানুরাগ, তাহা কিছুতেই অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। হয় মর, নয় বাঁচ, বলা বাহুল্য যে বাঁচিতেই বেশী সাধ!

যে বাঁচিতে চায়, তাহাকে বাঁচান উচিত; তাই তাহার উপদেশার্থে এতগুলি কথা বলিলাম। বাঞ্ছারামকে বিদ্রূপের উপর উপদেশ দানার্থেই নানা ছলে, নানা ভঙ্গিতে, নানা কথা বলিয়াছি; এক্ষণে সানুনয়ে প্রার্থনা যে সত্যাবতারেরা যেন তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করেন।

৫। চূড়ান্ত অধঃপতন।

১। যখন—ঔষধ খাইলে রোগ সারে, কিন্তু কিছুতেই ঔষধ লোকে খাইতে চায় না;—ভাবে যে ঔষধ না খাইলেই ভাল থাকিবে।

২। অবৈধ আহারে নানা অনর্থোৎপত্তি হয়, তথাপি লোকের অবৈধ আহারে অধিক রুচি;—ভাবে যে সেরূপ আহারেই আহারবিষয়ের পরম তৃপ্তি লাভ করিবে।

৩। কুসঙ্গ সর্ব্বদাই পাপক্লেশের অপরিহার্য্য পন্থা, তথাপি লোকে তাহাতে বেশী আকৃষ্ট হয়,—ভাবে যে অত্যানন্দ লাভের উহাই একমাত্র এবং প্রশস্ত আকর ভূমিস্বরূপ।

৪। আত্মম্ভরীতা অনন্ত দোষের কারণ এবং কখনও তাহাতে স্থায়ীভাবে শ্রেয়ঃলাভ হয় না, তথাপি লোকে আত্মস্বার্থ লইয়া পাগল;—ভাবে যে সাংসারিক শ্রেয়ঃলাভের পক্ষে উহাই একমাত্র এবং মুখ্য অবলম্বন।

৫। আত্মগরিমা ও আত্মঘোষণা কেবল লোকের উপহাস ও ঘৃণাই আকর্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি লোকে সেই আত্মগরিমাদি করিতে আত্মহারা ও পাগল;—ভাবে যে ইহা করিলেই লোকে জানিবে যে আমি 'একজন' এবং আমি অন্য তাবত হইতে মহৎ ও গণনীয় ব্যক্তি।

টী—তা বটে, কিন্তু আত্মগরিমা ও আত্মঘোষণা না করিলে লোকে আমাকে চিনিবে কি করিয়া?—বাঞ্ছারাম।

৬। আপন বুদ্ধি ও বাক্য আবশ্যকাধিক খরচ করিলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়, অথচ লোকে বুদ্ধি ও বাক্য অধিক খরচ করিতে মহাব্যস্ত;—ভাবে যে তাহা হইলে লোকে আমাকে ভারি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিবে।

৭। আপনাকে উচ্চ দেখিলে ও আপনাকে মানী ভাবিলে, ক্রমে লোকের কাছে বড়ই খাট হইতে হয় ও কেহ মানে না, তথাপি লোকে নিজেকে উচ্চ দেখিতে ও আপনাকে আপনি মানী ভাবিতে একেবারে হিতাহিতাজ্ঞ;—ভাবে যে তাহা না করিলে লোকে মানিবে কেন, গণিবে কেন অথবা চিনিবেই বা কেন?

৮। অর্থের সদ্ব্যয় না করিলেই অর্থনষ্ট হইয়া থাকে; তথাপি লোকে সদ্ব্যয়ে কাতর;—ভাবে যে সদ্ব্যয় করাই অর্থনষ্টের বিশেষ ও পরিশর পন্থা।

৯। মিথ্যার অবলম্বনে কেবল পাপের সঞ্চার ও কার্য্যহানী, কিন্তু তথাপি লোকে মিথ্যার অবলম্বন করিতেই বিশেষ আগ্রহবান,—ভাবে যে মিথ্যার অবলম্বন ভিন্ন আমোদ স্থলে আমোদও হয় না এবং কার্য্যস্থলে কার্য্য উদ্ধারও হয় না।

টী—সরকারী বিষয় কার্য্যাদিতে মিথ্যা কার্য্যহানীকর হয় না। তথায় কার্য্যসফলতা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য মিথ্যাই প্রশস্ত উপায়।—বাঞ্ছারাম।

১০। পরস্বাপহরণে ও লোকঠকানতে যে অর্থ লাভ, তাহা কখন স্থায়ীও হয় না এবং যথার্থ সুখেও কখন লইয়া যায় না, কিন্তু তথাপি লোকে পরস্বাপহরণে ও লোকঠকানয় অধিক প্রবৃত্তিশীল;—ভাবে যে অর্থ সম্পদ ও সুখ লাভের এমন সহজ উপায় আর নাই।

টী—সংসার এমনি যে না ঠকাইলেই নিজে ঠকিতে হয়; সুতরাং এ কথা রুমি কি করিয়া।—বাঞ্ছারাম।

১১। কপটাচরণে কেবল লোকের অবিশ্বাসভাজন ও ঘৃণীত হইতে হয়, কিন্তু তথাপি লোকে কপটাচারণ করিতে অধিক ব্যস্ত;—ভাবে যে লোক ভুলাইবার ও লোক ভুলাইয়া কার্য্য লইবার এমন প্রশস্ত পন্থা আর নাই।

১২। পরের অনিষ্ট ও পরের হানী করিতে গেলে আপনার অনিষ্ট ও আপনার হানী আগে হয় এবং বহুপরিমাণেই হয়, কিন্তু তথাপি লোকে

তাহা করিতে অত্যন্ত প্রবৃত্তিশীল ;—ভাবে যে পরের খরচে আপন গণ্ডা না বাড়াইলে, আপন গণ্ডা বাড়ে কই ?

টী—'আপন গণ্ডা বাড়ে কই ?'—ঠিক কথা, হয় না হয় কোন কোন জমিদারদিগকে জিজ্ঞাসা কর।—বাঞ্ছারাম।

১৩। চোর চুরি করিলেই শাস্তি পায়, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, কিন্তু তথাপি কখনও চুরি করিতে বিরত হয় না,—ভাবে যে যুগযুগান্তানুক্রমিক এমন বিদ্যাটা সামান্য একটু শাস্তির ভয়ে পরিত্যাগ করিব।

১৪। পরদার অভিগমনে পরমপ্রত্যবায়, শারিরীক ও মানসিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, তথাপি লোকে সেই পরদার নিমিত্ত বিষম ব্যাকুল ;—ভাবে যে নিত্য নূতন বর্দ্ধিত সুখ ও তৃপ্তিলাভের এমন পন্থা আর কি আছে ? যে একতানতা ও অক্ষুন্ন ভালবাসায় সুখ ও তৃপ্তিলাভের চরম, তাহাকেই মহা অসুখের মহৎ কারণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে।

১৫। চিত্ত বিক্ষেপ সর্ব্বদাই মহৎ অনর্থের বিধায়ক, কিন্তু তথাপি লোকে অতি সাগ্রহে তাহা বর্দ্ধিত ও বৃদ্ধি করিয়া থাকে ;—ভাবে যে অর্থ ও অর্থবৈচিত্র্য লাভের উহাই একমাত্র প্রশস্ত উপাদান স্বরূপ।

১৬। জ্ঞান সর্ব্বদাই সকল অনর্থের নিরসক ও সকল নিত্য সুখের বিধায়ক, কিন্তু তথাপি লোকে সহজে তাহার উপার্জ্জনে রত হইতে চাহে না,—ভাবে যে উহার উপার্জ্জন ও প্রয়োগ উভয়ই মহা ক্লেশকর এবং তাহাতে অর্থ সকল ঔদাস্যে পরিত্যক্ত হইয়া যায়।

টী—বলিতে কি, আমি সেই জন্যই জ্ঞান ও ধর্ম্মে এত নারাজ।—বাঞ্ছারাম।

১৭। যে যে কার্য্য পাপ বিধায়ক ও অনন্ত ক্লেশদায়ক, তাহাতেই লোকের প্রকৃতি-পরিচালিতবৎ নিত্য আসক্তি ;—ভাবে যে পাপ পথই সুগম সহজ এবং কমনীয়, পুণ্যের পথ বড় ক্লেশদায়ক।

১৮। যে ঈশ্বরের নাম করিলে সকল অমঙ্গল দূরে যায়, সকল ভয়ে নির্ভয় হয়, সে ঈশ্বরের নাম করিতে লোকের সহজে প্রবৃত্তি অতি কমই হয়। ফলত এ জগতে পাপীর প্রধান শাস্তিই এই যে, সে বুক পুরিয়া ও মুখ ভরিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে পারে না।

যখন—যাহা বিরুদ্ধ, যাহা অশুভকর, তাহাতে লোকের প্রবৃত্তির আধিক্য

এবং যাহা সানুকূল, যাহা মঙ্গলকর ও যাহা শুভকর, তাহাতেই লোকের প্রবৃত্তির কৃপণতা; তখন মানুষের সেই ভাবাত্মক অবস্থাকে কাজেই অধঃ-পতনের চূড়ান্ত ভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

উপরে যে কয়টি কথার উল্লেখ করা গেল তাহাই যথেষ্ট, আর অধিক উল্লেখের আবশ্যক নাই। ফলতঃ অতি অল্প ভাবিলেই অনুভব করিতে পারিবে যে, এ জগতে লোকের সকল রকমে বিরুদ্ধ বিষয়ে মতি গতি ও প্রবৃত্তি এত অধিক যে, বিরুদ্ধ পথানুসরণটাই যেন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তদন্তরে, সত্য এবং অনুকূল পথানুসরণ যাহা, তাহাতে লোকে এত বিমুখ এবং তৎপ্রতি তাহাদের মতিগতি আনত করিতে এতই যত্ন ও কৌশলাদির প্রয়োজন হয় যে, সহসা বোধ যেন সত্য এবং অনুকূল পথানু-সরণটা মানুষের পক্ষে কখনও স্বাভাবিক স্বরূপ নয়,—উহাই যেন কৃত্রিম এবং কৌশলকৃত ও যেন বলপূর্ব্বক মনুষ্য প্রকৃতির উপর আরোপিত হইয়াছে।

নীতিবশে যাহাকে আমরা অকর্ত্তব্য বলি, তাহাতেই মানুষের রুচি এবং যাহাকে আমরা কর্ত্তব্য বলি তাহাতে মানুষের অরুচি, এরূপ ঘটনা হয় কেন; এরূপ দৃশ্য দেখা যায় কেন? খৃষ্টান বলিবে, শয়তানের রাজ্য হেতু। খৃষ্টীয় ঈশ্বর বড়ই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ ঈশ্বর; স্বয়ং সৃষ্টি করিতেছেন, স্বয়ং সমস্ত করিতেছেন, লোকের মন ফিরাইতে আপন পুত্রকে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পাঠাইয়া বলি প্রদান করিলেন, তথাপি একটি লোকও স্বেচ্ছায় ও অক্ষুণ্ণভাবে তাঁহার দিকে যাইতে চাহে না। আর শয়তান? কোন শ্রম করিতেছে না, পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া কেবল তুড়ি দিতেছে, আর সকল লোক অমনি আলোক-আকৃষ্টবৎ তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছে। ক্ষমতা কাহার বেশী, ঈশ্বরের না শয়তানের? যদি বল ক্ষমতা ঈশ্বরেরই বেশী, কেবল কিন্তু তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেন না; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, আগে সৃষ্টিক্লেশ স্বীকার করিয়া শেষে এত উদাসী কেন? তিনি ভবিষ্যৎ-দর্শী,—কে মানুষ কিরূপ হইবে আগেই ত জানিতে পারেন, তেমনস্থলে যে পাপী হইবে, তাহাকে সৃষ্টি না করিয়া যে পুণ্যবান হইবে এমন মানুষকে সৃষ্টি করিলেইত পারেন। মানুষের পাপের জন্য পুত্রকে বলি দেওয়ার অপেক্ষা, উহা কি সহজ পন্থা নহে? সেই সৃষ্টিত করিতেই হইতেছে, তেমন স্থলে

একটু দেখিয়া সৃষ্টি করিলে ত সকল দিকের সততা এবং সৌন্দর্য্য সমস্ত রক্ষিত হইতে পারে। স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দে ও জ্ঞানত পাপী সৃষ্টি করিয়া শেষে শয়তানের হাতে দিয়া মজান, ইহা বড় একটা সুবিবেচনার ও ভাল কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। বলিতে কি, আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে উহা যেন কেমন একটু বাল্যক্রিড়ার ন্যায় বোধ হয়? ভাল, খৃষ্টান পাদরীরা আর একটা কাজ করিতে পারেন না কি?—আমার বোধ হয়, অন্যকে ধর্ম্ম-উপদেশ দানে বাধিত করার অপেক্ষা, তাঁহার ঈশ্বরকে যদি কিছু তিনি সৎপরামর্শ দেন তাহাতে বেশী কাজ হইতে পারে! খৃষ্টানের হাতে পড়িয়া খৃষ্ট এবং ঈশ্বরের কি দুর্দ্দশাই না ঘটিয়াছে।

শ্রুতি বলেন মানুষের এরূপ দুষ্ট স্বভাবের কারণ, জন্মান্তরীণ সদোষ কর্ম্মজনিত দুষ্ট কর্ম্মসূত্রের ফল। জন্মান্তরে দুষ্ট কর্ম্ম আসিয়াছিল কোথা হইতে? এইরূপ পর পর জন্মান্তরে এই একই প্রশ্ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে।

এরূপ পর পর জন্মান্তরগত সদোষ কর্ম্মের আদিমূল, মায়াপ্রকৃতি-বিমোহিত ভ্রান্ত উপভোগ বাসনার উদয়। এ সংসারে প্রকৃতির দ্বিবিধ গতি, এক ঊর্দ্ধ হইতে অধোমুখে; আর এক অধোমুখ হইতে ঊর্দ্ধমুখে; একবার সত্যযুগ হইতে অধঃপাতে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়, আর একবার কলিযুগ হইতে সত্য যুগের উত্থান হয়; অথবা কলিতে ও সত্যতে নিরন্তরই পতনও উত্থান চলিতেছে॥ তাহার পর প্রকৃতির শক্তিক্রিয়া দ্বিবিধরূপে, এক স্বরূপে ও অপর বিরূপে। একেবারে পতন ও একেবারে বিরূপ, কিম্বা একেবারে উত্থান ও একেবারে স্বরূপ, এজগতে নাই; উভয়ই বেগ সংমিশ্রণে সমান চলিতেছে এবং আমরাও জগতগত হওয়ায় তদুভয় বেগের বিষয়ীভূত। একারণে, যে যেমন বেগে পতিত সে সেইরূপ করিয়া থাকে এবং সেই বেগ বশাৎ যাহার যেমন দৃষ্টিশক্তি সে সেইরূপ দেখিয়া থাকে। মায়া প্রকৃতির এই মহাক্রিয়া সমুদ্রে আকুলিত হইয়াই, জ্ঞানী ব্যক্তি হৃদয়ের ব্যাকুলতায় এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

"জানাম্যধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

জানীর এই সাত্ত্বিক হৃদয়ব্যাকুলতা দর্শনে, সপুষ্পবৃষ্টি আকাশবাণি হইল,—

"উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণিনাং, তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।
যথা চন্দ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং, তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো।"

জয় জগদীশ হরে! তাহাই বটে,—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

৬। মনুষ্য-প্রকৃতির পরিচয় লক্ষণ।

১। নিরীহ ভাল মানুষ কে?—চেষ্টা ও বুদ্ধি শূন্য বোকা।

২। নির্ব্বোধ কে?—যে আপন পুঁজিতে কখন বুদ্ধির ন্যূনতা দেখিতে পায় না।

৩। অবিজ্ঞ কে?—যে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ ভাবিয়া থাকে।

৪। বিজ্ঞ কে?—যাহার অসর্ব্বজ্ঞতা জন্য ক্ষোভ কখনই তিরোহিত হয় না।

৫। গুণহীন কে?—যে সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে গুণি দেখিয়া থাকে।

৬। খুঁট আঁখুরে গুণি কে?—যে ঈর্ষা বশত গুণশালীকে গুণহীন প্রমাণ করিতে আগ্রহযুক্ত।

৭। যথার্থ গুণি কে?—যে অন্যের গুণানুসন্ধান করিয়া সেই গুণের প্রতিষ্ঠা করে।

৮। অধর্ম্মী জুয়াচোর কে?—যে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকে।

৯। ধর্ম্মী কে?—যে ধর্ম্মধ্বজী হইতে চাহে না।

১০। পাটোয়ারী ধর্ম্ম কাহার?—যে হিন্দু ভাবিয়া থাকে যে সন্ধ্যা-আহ্নিক ও গঙ্গাস্নানে তাহার সমস্ত পাপ কাটিয়া যাইবে।

১১। অত্যুন্নত ব্রাহ্ম কে?—যে পিতৃপুরুষ ও পিতৃপুরুষের তাবত বিষয়কে প্রাণ ভরিয়া তিরস্কার করিতে পারে।

১২। এ সংসারে অকর্ম্মা কে?—যে ব্যক্তি বচনবাগীশ।

১৩। কর্ম্মী কে?—যাহার বাক্যব্যয়ে সময়াভাব, অথচ কোনরূপ সঙ্কল্পিতকার্য্যেই যাহার সময়াভাব হয় না।

১৪। ভাক্ত কর্ম্মী কে?—সময় পাই না বলিয়া যে সদা সর্ব্বদা নাকে কাঁদিয়া থাকে।

১৫। অপদার্থ কে?—প্রতিবন্ধকতা যাহার পদে পদে।

১৬। কাপুরুষ কে?—যে সকল বিষয়ে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকে।

১৭। ঘৃণিত এবং অসারবান কে?—যে আত্মগরিমা প্রচারে রত।

১৮। পূজনীয় এবং সারবান কে?—যে ভুলিয়াও কথন আত্মপ্রচার করে না।

১৯। অসার এবং বোকা কে?—যে, জ্ঞানোন্নত ব্যতীত, অপর যে কোন উন্নতের সাহচর্য্যলাভ হেতু লালসাবান।

২০। মানী কে?—যে মানের গোড়ায় ছাই দেয়।

২১। যশোভাজন কে?—যে কর্ম্মস্থলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতীত যশের তোয়াক্কা রাখে না।

২২। হীনাত্মজ কে?—যে বিনীতের নিকট উদ্ধত এবং উন্নতের নিকট বিনীত।

২৩। মহদাত্মজ কে?—যে সর্ব্বত্রই বিনীত, কেবল আবশ্যক কালে উদ্ধত।

২৪। ভক্তির পাত্র কে?—যে ভক্তিভাজনকে ভক্তি করিতে জানে।

২৫। এ সংসারে বিশ্বাসী কে?—যে রোষে রোষ, তোষে তোষ, যখন যেমন মনোভাব, তখন তাহা গোপন করে না।

২৬। অবিশ্বাসী কে?—যে সর্ব্বদাই অভিমতানুগামী।

২৭। শয়তান কে?—যাহার মুখে ক্ষণে অক্ষণে সর্ব্বদাই মিষ্ট হাসি ও মিষ্ট কথা।

২৮। নারকী কে?—যে পরকুচ্ছা প্রণয়নে ও ঘোষণে পটু।

২৯। আশঙ্কার পাত্র কে?—যে খাম খেয়ালী বা অসাব্যস্তচিত্ত।

৩০। সত্যবাদী কে?—যে অন্যায় ঘোষণায় অকুণ্ঠিত।

৩১। আবশ্যকে মিথ্যাবাদী কে?—উৎপীড়িত এবং দুর্ব্বল।

৩২। অনাবশ্যকে মিথ্যাবাদী কে?—যে জন রসিকতার খ্যাতিলোলুপ।

৩৩। জাতীয় মিথ্যুক কে?—রাজনৈতিক।

৩৪। সাত্ত্বিক কে ?—যে শুনে অধিক, বলে অল্প।

৩৫। রাজসিক কে ?—যে বলে অধিক, শুনে অল্প।

৩৬। তামসিক কে ?—যে শুনিতে চায় না, কেবল বলিতে চায়।

৩৭। উত্তম কে ?—যে অপকর্ম্ম হইতে উদ্দেশে পলায়ণ করে।

৩৮। মধ্যম কে ?—যে অপকর্ম্মকে খুজে লয় না, তবে হাতে উপস্থিত হইলেও তাহাকে পরিহার করে না।

৩৯। অধম কে ?—যে অপকর্ম্মকে খুজিয়া লয়।

৪০। সামাজিক হিজ্ড়ে কে ?—বাঙ্গালী যখন সাহেব সাজে।

৪১। বীর প্রকৃতি কে ?—যে স্বজাতীয় অসুবিধাকে উপেক্ষা না করিয়া তাহাকেই সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক, অন্তর্ভূত সংস্কারের দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে।

৪২। ভীরু কে ?—যে স্বজাতীয় অসুবিধার ভয়ে দূরে পলাইয়া বিজাতীয়ের স্মরণাপন্ন হয়।

৪৩। অধঃপাতে যাওয়ার সহজ উপায় কি ?—ব্রাহ্ম ভেকধারী হওয়া।

৪৪। এ সংসারের মহাপাতকী কে ?—স্বধর্ম্মত্যাগী।

৪৫। লক্ষ্মীছাড়া কে ?—যে পরের টানিয়া আপনার গণ্ডা বেশী করিতে চায়।

৪৬। লক্ষ্মীবন্ত কে ?—যে নিজের মুষ্টী ভিক্ষার অর্দ্ধাংশও পরকে দিয়া সন্তুষ্ট হয়।

৪৭। এ সংসারের দিন্‌কাণা কে ?—যে আপনাকে অন্যায় বঞ্চিৎ করিয়া উত্তরাধিকারীর জন্ত অর্থ-সঞ্চয় করে।

৪৮। সন্তানের পরকাল খাইবার সহজ উপায় কি ?—বাল্যে নিরবচ্ছিন্ন আদর দান, যৌবনে ব্রাহ্ম ভেকধারী হইতে দেওয়া এবং তাহার ভবিষ্যতের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করা।

৪৯। অর্ব্বাচীন সুকর্ম্মপথে যাইতে সমর্থ হয় কখন ?—যখন রাজখ্যাতি ও উপাধীলাভের ব্যাকুলতা হইতে ক্ষান্ত হয়।

৫০। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হয় কখন ?—স্বামী যখন ছুঁচো না হইয়া স্ত্রীকে ভাল বাসিতে শিখে।

৫১। এ সংসারে সাধ্বী কে?—

"নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
নিজ পতি বিনা কভু অন্ত জনে চায় না।
হাস্ত অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্তদিগে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্তকাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেহ টের পায় না॥"

তথা

কুলরমণীর কাছে, সীমাবদ্ধ সব আছে,
কেবল প্রেমের তার সীমা কভু হয় না।"

ইতি লোক চরিত্রে একার পীঠক।

৭। জাতীয়-প্রকৃতির পরিচয়-লক্ষণ।

১। কোন্ জাতি স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত?—যখন দেশহিতৈষীর প্রাণের উপর লক্ষমুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত; অথচ দেশহিতৈষী ভিক্ষুক কুটীরে আশ্রয় লইলেও, ভিক্ষুক পুরস্কারের আশায় বিচলিত হয় না।

২। কোন্ জাতি স্বাধীনতা লোপের উপযুক্ত?—যথায় পরের উড়িয়া পুড়িয়া গেলেও আমার ক্ষতি হয় না; যথায় স্বজাতীয়কে পদদলিত হইতে দেখিলে, অপরে তফাতে দাঁড়াইয়া হাততালি দিয়া মজা দেখে।

৩। কোন্ জাতি পরকর্ত্তৃক পদদলিত হইবার উপযুক্ত?—যে জাতির মধ্য হইতে হিন্দু দারোগা, হিন্দু আমলা এবং হিন্দু অর্থশালী মিলে।

৪। অসার কোন্ জাতি?—যেখানে ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণকন্যা, অভূতপূর্ব্ব পৌত্তিক বধূ, হাল খৃষ্টান এবং ভবিষ্যৎ নাস্তিক, এরূপ ধুঁট আঁথুরে স্ত্রীলোকের ন্যায় জীবও বিদ্বৎমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া থাকে।

৫। অপদার্থ কোন্ জাতি?—যাহারা বিজাতীয়ের অনুকরণে আত্মজাতীয় সংস্কার করিয়া থকে

৬। জগতের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব লোকচরিত্র গঠিত হইতে পারে কোথায়?—কেবল যেখানে সৈয়দ আম্মদ, ঈশ্বরীপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ এবং চোগা চাপকানধারী সংস্কৃত কলেজের ন্যায় অপূর্ব্ব পুরুষ ও অপূর্ব্ব বিদ্যা-মন্দিরাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

৭। পুরুষানুক্রমে গোলাম জন্মে কোন্ জাতিতে?—যথায় বিজাতীয় ম্লেচ্ছানুকরণে ও ম্লেচ্ছ প্রবর্ত্তনায় স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৮। আশাশূন্য কোন্ জাতি?—যেখানে স্বজাতির প্রতি উপেক্ষা এবং বিদ্বেষে, বিজাতীয়ের প্রভুত্ব এবং পীড়ন শ্রেয়স্কর ও সুখকর বলিয়া বোধ হয়।

৯। উৎসন্নমুখ কোন্ জাতি?—অকর্ম্মশীলতায় যেখানে ভদ্র কুলের ক্ষয় এবং ইতরকুলের বৃদ্ধি হয় এবং ইতরলোক আর মানে না বলিয়া ভদ্র সন্তানেরা যেখানে নিরন্তর নাকে কাঁদিয়া থাকে।

১০। জাতীয় উচ্ছৃঙ্খলতার পূর্ব্বসূত্র কি?—জাতীয় শিক্ষাস্থলে ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে ঔদাস্যপূর্ণ নিরপেক্ষতা।

১১। জাতীয় অভ্যুদয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ কি?—জাতীয় সধর্ম্মে সাত্ত্বিক ধর্ম্মশীলতা।

১২। সাত্ত্বিক ধর্ম্মশীলতার পরিচয় কি?—শক্তি সীমান্তাবলম্বনে সাত্ত্বিক শ্রমশীলতা ও সাত্ত্বিক কর্ম্মশীলতা।

ইতি জাতীয় চরিত্রে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-বীক্ষণিকা।

৮। হৃদয় বল।

হৃদয় বল সকল অর্থ ও সকল অভ্যুদয়ের মূল। যাহার হৃদয় বল নাই, সে কাপুরুষ। যাহার হৃদয় বল আছে,তাহার নিকট হইতে কোন অর্থ ও কোন সৌভাগ্যই অধিকক্ষণ দূরে অবস্থান করিতে পারে না। কি স্বীয় অভ্যুদয়, কি জাতীয় অভ্যুদয়, সমস্তেরই মূল হৃদয় বল; এক হৃদয় বলকে অবলম্বন করিয়াই, তত্তাবৎ অভ্যুদয়ের উপকরণ ও উপায় উৎপত্তি লাভ করে ও কার্য্যকরী হইতে সমর্থ হয়।

স্বীয় স্ত্রীর প্রকৃতিকর্ত্তৃক সত্যজ্ঞানে অবলম্বিত যে নীতি যাহা, স্ত্রীর প্রতি

ভালবাসায়, পুত্রের প্রতি মায়ায়, আত্মীয়ের প্রতি স্নেহে, বান্ধবের প্রতি প্রণয়ে, শত্রুর প্রতি রাগে, নীচের প্রতি ঘৃণায়, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি জেদে, উন্নতের প্রতি ঈর্ষায়, দুর্দান্তের প্রতি ভয়ে, পূজনীয়ের প্রতি ভক্তি ও সম্মানে;—যাহা কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ, ক্ষত, সঙ্কুচিত ও আত্মলুপ্ত হইতে চাহে না ও হয় না। যাহা মহতের মহত্ব নিকটে নত, ধনীর গৌরবের নিকট জড়সড় এবং রাজ সন্নিধানেও তিলমাত্রের জন্ত আত্মক্ষুণ্ণ হইতে চাহে না। এরূপ স্বীয় প্রকৃতি-কর্ত্তৃক অবলম্বিত যে নীতি, যাহা কোন দেশ, কোন কাল ও কোন পাত্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সকল অবস্থাতেই সমান উন্নতশীর্ষে কর্ম্মপথে যথা-গন্তব্য মুখে ধাবিত হয়; সেই নীতিকেই হৃদয়বল বলিয়া থাকে। এ সংসারে সে হৃদয় বল যাহার নাই, সে কাপুরুষ, সে জড়পদার্থ, সে সকল নিন্দার ভাজন। যাহার হৃদয় বল নাই, তাহার আত্মসম্মান বোধও নাই; একটু উন্নত দেখিলেই সে বিনত হইয়া কাঁপিতে থাকে, তাহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইতে পার। ফলত, এ সংসারে কাহার কতটা হৃদয় বল আছে, তাহার আত্মসম্মান রক্ষার প্রকারই সে পক্ষে বিশেষ পরিচয় স্বরূপ হয়।

মাকিডুনিয়ার অধিপতি আলেকজণ্ডার জগতজয় করিয়া ভারতে সমা-গত। ইচ্ছা হইল ব্রাহ্মণবিজ্ঞ দেখিবেন; আজ্ঞামাত্রে বামন আনিতে দূত ছুটিল, দুই দিকে;—এক যে দিকে কল্যাণ শর্ম্মা; আর এক যে দিকে দণ্ডা-চার্য্য। আলেকজণ্ডারের হুকুম,—যে বামন আজ্ঞামাত্রে আসিবে, তিনি তাহাকে পারিতোষিক ও সম্মানদানে তুষ্ট করিবেন; আর যে না আসিবে, তাহার মাথা কাটা যাইবে। অতি লোভের হুকুম, অতি শক্ত হুকুমও বটে।

ভয়ে হউক, পুরস্কারের লোভে হউক, কল্যাণ শর্ম্মা হাজির! কিন্তু আলেকজণ্ডারের প্রতি দণ্ডাচার্য্যবৎ দণ্ডাচার্য্য লেংটা বামন, তাহার পাতা লতার বিছানা হইতে সসম্ভ্রমে না উঠিয়াই, অসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইল,—ওহে দূত, তোমার আলেকজণ্ডারকে বল গিয়া, বামনেরা মরিতে ভয় করে না; আলেকজণ্ডারের নিকট দণ্ডের ত কিছুই প্রার্থনীয় নাই; তবে আলেকজণ্ডারের যদি দণ্ডের নিকট কিছু প্রার্থনীয় থাকে, তবে সে নিজে দণ্ডের নিকট আসিতে পারে।

ভয়ে পুরস্কারের লোভে যাহাতেই হউক, কল্যাণ শর্ম্মা পঞ্জাস্য পর্য্যন্ত

আলেকজণ্ডারের অনুগমন করিয়াছিলেন; শেষে আর সহিতে না পারিয়া পাসর্গদা নগরে অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত জ্বালা নিবারণ করেন।

কিন্তু আলেকজণ্ডার দণ্ডের কথা শুনিয়াই অবাক্! শেষে যে জন্যই হউক, আলেকজণ্ডার স্বয়ং প্রার্থনাবান হইয়া দণ্ডের নিকট গমনপূর্ব্বক, তাহাকে ভক্তি উপহার দিয়া আইসেন।

তাই বিজ্ঞবর মিগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন—'এ জগতে এই বুড়ো লেংটা বামনই কেবল একমাত্র ব্যক্তি, যাহার নিকট সর্ব্বজাতি বিজয়ী জগজ্জেতা বীর আলেকজণ্ডারকে পরাজয় স্বীকার করিতে দেখা গিয়াছিল।'—আর এখনকার বামন বাবু, ম্লেচ্ছপদধূলি একটু পাইলে কিনা করিতে প্রস্তুত!

দণ্ডেরই হৃদয়বল!—হৃদয় বলের এমনই প্রভাব বটে! জয় জগদীশ হরে!—এবমস্তু,—কিন্তু কবে?

৯। যশ।

যে যশ চায় সে পায় না; যে যশ চায় না, সে পায়।—বাঞ্ছারাম শুনিয়া বলে, কথাটা কিছু বেথাপ গোছের লাগিল! যতনে রতন মিলে, এই ত কথা। বলা বাহুল্য যে বাঞ্ছারামের ভুল। রতন হইলে যতনে মিলিত, কিন্তু যশটাত যতনে রতন মেলার রতন নহে; কাজেই তাহা যতনে মিলে না। অথবা যতনেই যশ মিলে, কিন্তু সে সেই যতন যাহা রতনের অপেক্ষা রাখে না।

ফলতঃ যশোপ্রার্থী হইয়া যে ব্যক্তি কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয়, সে নিতান্ত ভ্রান্ত ও দুর্ভাগ্যবান। দুর্ভাগ্যবান এই জন্য যে যথেষ্ট শ্রম করিয়া মরে, অথচ তাহাতে বাঞ্ছিত ফলের লাভ হয় না; গূঢ় কারণ এই যে, শ্রমের পরিণাম যে কর্ম্ম সে কর্ম্মের প্রতি এখানে কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না, দৃষ্টি থাকে অন্যত্র। আরও দেখ, আকাঙ্ক্ষা এবং লোভের আধিক্য হইতে যশ প্রার্থনার উৎ-পত্তি। আকাঙ্ক্ষা এবং লোভ, অথবা যে কোন বৃত্তি বিশেষ বল, তাহার সামঞ্জস্যচ্যুত ও পরিমাণাতীত ক্রিয়াধিক্য হইলে, চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হয়। যে চিত্ত বিকৃত, তদ্দ্বারা কখনও সু বা মহৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ণভাবে হয় না, সুতরাং সুযশও আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ প্রাপ্ত হইয়া উঠে না। যে যশ বা

পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই অলীক এবং ভাক্ত; ক্ষণস্থায়ী অথবা সম্মুখে গীতকাল মাত্র তাহার জীবন।

মনে কর, দাতব্য বৃত্তি। যশোপ্রার্থীর দান কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। তথায় হয় পাত্রাপাত্র ভেদরহিতত্ব, নয় অপরিমাণ, নয় দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষীয় অবস্থায় অদৃষ্টি, ইত্যাদি নানা দোষ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং অসম্পূর্ণতা বা অব্যবস্থিত ভাব হেতু, দাতা এবং গ্রহীতা, হয় দূর নতুবা নিকট সম্বন্ধে, যেরূপে হউক, সম্যক সুফল এবং দান জন্য বিমল আনন্দভাব ও শান্তি কিছুই প্রাপ্ত হয় না। যাহা এই একটা দাতব্যবৃত্তি দিয়া দেখান গেল, তাহা আর তাবত বিষয়েও প্রযুক্ত হয়। কোনরূপেও কোনটাতেই শান্তি লাভ হয় না। সর্ব্বদা কামনার অভিঘাত হইলে, কার্য্য এবং ফল, উভয়ই বন্ধুর হইয়া থাকে। এই জন্যই, কার্য্য মাত্রে ফলের কামনা ত্যাগ করা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিচক্ষণ হিন্দু শাস্ত্র সর্ব্বদা এত ব্যাকুল।

বাইবেল শাস্ত্রে কথিত আছে, যখন দান করিবে, বাম হস্তকে জানিতে দিও না যে দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে। ইহাও সম্পূর্ণ কথা হইল না; এখানেও, কামনার স্বভাব যদিও উচ্চ হইল বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে অভিঘাত তাহার সর্ব্বক্ষণ; ইহাতে উর্দ্ধসংখ্যায় কার্য্যে সাত্ত্বিকতা ভাব আইসে মাত্র, তদতিরিক্ত আর কিছু আইসে না। ইহা খণ্ডনীতির কার্য্য। কিন্তু দ্বারা সমগ্র জীবন এক মহৎ পবিত্র উৎসের আকার ধারণ করে; যদ্দ্বারা বং খণ্ডনীতি একত্রে আসিয়া সংমিলিত হয়; যদ্দ্বারা তাবত কামনাভিঘাত র্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া একবিন্দুতে আগতিপূর্ব্বক, আধ্যাত্মিকবুদ্ধির ভক্তিস্থলে অবস্থান করে এবং যদুৎপন্ন কার্য্য মাত্রই মহত্ত্ব, সম্পূর্ণত্ব, বং পবিত্রতাযুক্ত হয়; সে কোন্ পদার্থ ও কোন্ অবস্থা?—যে অবস্থায় ঠিলে যখন দক্ষিণ হাতে দান করে, তখন বাম হাতে তাহা দেখুক বা । দেখুক, উভয়েতেই সমান ঔদাস্য; সেই অবস্থাই অবস্থা ও তাহাই প্রার্থনীয়।

পুনশ্চ কার্য্যস্থলীতে, সেই কার্য্যই কার্য্য, যাহা যাবতীয় বৃত্তি-বিষয়ের ামঞ্জস্য সংমিলনে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কর্ত্তার সদ্ভাব হইতে যাহা প্রবর্ত্তিত

হয়, কামনা ভাবের অবনমনে হয় না বা তাহার নিকট দিয়াও যায় না। ইহা কেবল সর্ব্বতোপরিচালিনী কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতেই সম্ভব হইয়া থাকে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি কেবল করণীয়কে মাত্র চায়, ফল বা পুরস্কার আর কিছুই চায় না। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে পরিমাণে ঈশ্বরে সংলগ্ন, সেই পরিমাণে শুদ্ধ এবং পবিত্র। শুদ্ধ কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা, শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্র জীবনই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। ইহা, একালের সৌখিন ও সভ্য বাহির চরিত্র এক ও ভিতর চরিত্র আর এক, ইহার প্রশ্রয় দেয় না। সৎ যাহা তাহার আবার ভিতর বাহির কি, তাহা সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্বাবস্থাতেই সমান ও একরূপ। শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্র জীবনে যে কোন মহত্ত্ব ও মহৎকার্য্য সম্ভব হইয়া থাকে; সুতরাং যশও এখানে অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু যশ সুসম্পাদিত কার্য্যের রশ্মিবিস্ফুরণ মাত্র। এখানে যশ চাওয়া হইল না, অথচ আপনা হইতে আসিয়া মিলিল।

বাঞ্ছারাম, কেবল যশের আশায় পরিচালিত হও কেন, উহা কয়দিনের ভোগ্যপদার্থ? প্রথমতঃ তোমার আয়ুঃ শতাধিক নহে,—তাহার পর ভোগী না থাকিলে ভোগ্যপদার্থের মূল্য নাই। কিন্তু হইল যেন, তুমি ও তোমার যশ উভয়ই দ্বিলক্ষ বর্ষস্থায়ী; কিন্তু কাল যথায় অনন্ত, তথায় দ্বিমুহূর্ত্ত ও দ্বিলক্ষবর্ষে প্রভেদ কি? তাই বলি, যদি সকল দিকে সফলতা ও মঙ্গল চাও, তবে যশের কামনা ছাড়িয়া দাও, পবিত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা তাহাকে অবলম্বন কর।

যশও অলীক এবং সত্য দুই প্রকার আছে। যশের দ্বারা ত কার্য্য সফলতার পরিমাণ কখনই করিতে নাই; তবে যদি কর, যে যশ যত্ন বা আয়োজনের দ্বারা হয় বা লোক কর্ত্তৃক বিবেচনা কালের অনপেক্ষে সহসা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা কখনই পরিমাণ করিও না; কারণ এরূপ যশ সম্পূর্ণই অলীক ও ভাক্ত। এরূপ যশের মূল, যশোপ্রার্থীর দিকে দেখিতে গেলে, অসৎভাব; যশোদাতাদিগের দিকে দেখিতে গেলে, অবিবেচনা। কিন্তু যে যশ অযাচিত ও অলক্ষিতভাবে কাল কর্ত্তৃক স্থির ও ধীর পদে আনীত, তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও। কিন্তু এক কথা, সেরূপ যশ যখন সমাগত হয়, তখন প্রায়ই যশোপ্রার্থী থাকে কোথায়? প্রায়ই ইহলোকচ্যুত। এখানেও আবার দেখ, যশ যদি সত্য সত্যই ভোগীর ভোগ্য বলিয়া স্থির হইত, তবে

এমন সময়ে তাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে কেন? আর কোন্ ভোগী এবং ভোগ্যের মধ্যে এরূপ অসংলগ্ন কালের সম্বন্ধ দেখিয়াছ? ফলত যশ কাহারও ভোগ্য নহে, তাই তাহা কাহার অপেক্ষাও রাখে না এবং তাই সে কারণে তাহা যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই বলিতেছিলাম, উহা সাধারণ ক্রিয়া-ব্রহ্মাণ্ড সুসম্পাদিত সৎকার্য্যের জ্যোতি বিস্ফুরণ মাত্র। তদন্ততরে উহাকে অন্য অভিপ্রায় ও ব্যবহারে লওয়াইতে যাওয়া অস্বাভাবিক; ফলেও তাহা প্রমাণ হয়।

জানিও, জীবন কালের মধ্যেই যদি সত্য যশ উপস্থিত হয়, তথাপি সৎকর্ত্তব্যবুদ্ধিশীল ব্যক্তি যে সে, তৎপ্রতি অনাস্থাযুক্ত থাকে; কারণ, সে বুঝে। যশোপ্রার্থী মাত্রকেই অতি অসার ও নীচ প্রকৃতি বলিয়া জানিও; তাহাপেক্ষা নীচ আর কেহই নাই, কেবল আর একজন ছাড়া অর্থাৎ যে কথায় কথায় আত্মপ্রচার করে।

১০। সন্ন্যাস।

সন্ন্যাসী হইয়া ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিলে, গৃহস্থের অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হওয়া যায় কি না? বাঞ্ছারাম বলে যে, যে প্রথা আবহমান কাল ধরিয়া ভারতে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহার উপর লোকের অচলা বিশ্বাস, সে কথার উত্থাপন, তাহার মীমাংসা বা তাহার বিপরীতে কোন কথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে! কিন্তু বাঞ্ছারামের কথা শুনিলে, সকল সময়ে কাজ চলে না। যে কোন বিষয় হউক, যথাজ্ঞান অনুশীলন করায় ক্ষতি নাই। বিষয় মাত্রের যে ভাল মন্দ ভাব, বিষয়টির কি কতটা মানুষের যথার্থ কাজে লাগে, তাহা লইয়া বিচার্য্য। ফলতঃ আমার বিশ্বাস এই, লেখা হউক, পড়া হউক, মত হউক, কথা হউক, কাজ হউক বা যাহাই হউক, যাহা মানবের আনুষ্ঠানিক জীবনে প্রযুক্ত না হইতে পারে, এবং যাহা জাগতিক কার্য্যের অংশকলা স্বরূপ না হইতে পারে, তাহাকে কর্ম্মনাশার জলেতে নিক্ষেপ করিও। এক্ষণে আলোচ্য বিষয়,—

আমি বলি, অকারণে বা কারণের প্রতিকূলে সন্ন্যাসী হইলে, কখনই অধিক ধর্ম্মোপার্জ্জন হইতে পারে না। বরণ ধর্ম্ম উপার্জ্জন হওয়া দূরে

থাকুক, অধর্ম্ম উপার্জ্জনই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। বিনা কারণে বা কারণের প্রতিকূলে সন্ন্যাসী হওয়া কাহাকে বলে, পরে বলিব।

এখন আর একটি জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কারণযুক্তে সন্ন্যাসী হওয়া কাহাকে বলা যায়। যে ব্যক্তি এ জগতে সংসারী হওয়ার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্ন এবং চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সফল হইতে পারে নাই, অথবা সংসারী হওয়ার পরে দৈব দুর্ব্বিপাকে যাহার সংসার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন করিয়া পাতাইয়া পুনর্ব্বার সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করার শক্তি বা সময় নাই; তাহারা যদি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে, সেই সন্ন্যাসকেই কারণযুক্ত সন্ন্যাস বলা যায়। কিন্তু তাহারাও কি চলিত সন্ন্যাসীর ভাব ও ভেক গ্রহণ করিবে, অথবা চলিত সন্ন্যাসভাব ও ভেককেই কি প্রকৃত সন্ন্যাস বলিয়া বলা যায়? তাহাও পরে বলিতেছি।

সন্ন্যাস ভাল কি মন্দ বা তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখিবার পূর্ব্বে, আগে দেখা উচিত যে আমাদের এই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণাম কি? এ কথাটা পরিষ্কার হইলে, অপরটি পরিষ্কার করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। প্রথমে দেখ, আমরা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কর্ম্মশক্তি পাইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি; সে শক্তি প্রতি ব্যক্তিভেদে পৃথক প্রকারের, সুতরাং তাহা ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক কর্ম্মসাধক বলিতে হইবে। জড় অজড় ও অপরাপর পদার্থ হইতে, মানবের পার্থক্য প্রধানত ঐ উচ্চ শক্তিমাহাত্ম্য হইতে। তাহার পর, বাঞ্ছারাম, তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি যে, ঈশ্বর কোন বিষয়ের সৃষ্টি নিষ্ফলে করেন না। এমন স্থলে তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সেই সকল শক্তির পূর্ণ সার্থকতায় কর্ম্মরাশির উৎপাদন করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য কিছু হইতে পারে না। ফলত সে সকল শক্তির সার্থকতার পরিণাম ও নামই কর্ম্ম!

তাহার পর, আর এক কথা আছে। আমরা ভূত এবং আত্মা উভয়ের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং উভয়েরই নিয়ম দ্বারা শাসিত। পরন্তু আমরা সর্ব্বতোভাবে এই ভৌতিক জগতে স্থাপিত হইয়াছি; এবং কি ভৌতিক, কি আত্মিক, সর্ব্ব বিষয়ে, সেই ভৌতিক জগতের অধীন হইয়াই চলিতে হইতেছে। দেশ কাল অবস্থা আয়োজন এবং প্রয়োজন, ইহারাই চিরকাল

দেখাইয়া দিয়া থাকে যে, আমরা কিরূপে চলিব বা কিরূপে চলিব না; কি করিব অথবা কি করিব না। দেখ, চাষ করিয়া আহারীয় উপার্জ্জন করিতে ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনকালেই হাত ধরিয়া শিখাইয়া দেন নাই, কিন্তু চাষের জন্য দেশ কাল অবস্থা আয়োজন ও প্রয়োজন যে যে গুলি, তাহা সমস্তই তিনি তোমার পার্শ্বে স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। মানব যখন সেই দেশ কাল অবস্থা আদিতে প্রবুদ্ধ হইল, তখন শারীরিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চালনে, আপনা হইতে চাষ কার্য্যের উদ্ভব করিয়া লইল। এই কর্ম্মস্থলী পৃথিবীতে এইরূপেই আমাদের তাবৎ বিষয়ে ঈশ্বর কেবল দেশ কাল অবস্থাদির নিয়োজন করিয়া দিয়া থাকেন; আমরা তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া আপন কর্ত্তব্য উপলব্ধি পূর্ব্বক, নিজের এবং জগতের মঙ্গলকর কার্য্যরাশির উদ্ভাবন ও উৎপাদন করি। এখানে আরও একটা কথা বলি; যে কেহ দেশ কাল আয়োজনাদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া তৎ-অবলম্বনে যখন কোন যথার্থ কার্য্যে পারগ হয়, সেই তখন সে পরিমাণে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ইহলোকে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হয় বলিতে হইবে; সুতরাং সেই পরিমাণে তাহাকে প্রত্যাদেশযুক্ত ঈশ্বরপ্রেরিতও বলা যাইতে পারে; ফলত, ইহারাই প্রত্যাদিষ্ট; ইহাদের মধ্যে তবে যে কিছু ছোটবড় প্রভেদ সে কেবল অনুষ্ঠিত কর্ম্মের গুরুত্বও লঘুত্ব অনুসারে পর্য্যায় ভেদ মাত্র। পুনশ্চ সেরূপে সম্পন্ন কর্ম্মকে স্বচ্ছন্দে অপৌরুষেয়ও বলা যাইতে পারে।

অতঃপর, এই হিসাবে ভূত-আত্মা নির্ম্মিত ও ভৌতিক জগতে স্থাপিত মানবের কর্ত্তব্য এবং কার্য্য কি? এ পৃথিবীতে আমরা বস্তুত দেখিতেছি যে নিরবচ্ছিন্ন ও শুদ্ধ আত্মিক জগতের সহিত আমাদিগের কোন ঘনিষ্ঠতা নাই, যে কিছু ঘনিষ্টতা তাহা কেবলই ভৌতিক জগতের সহ অন্বয়ে এবং ইহাও দেখিতেছি যে আমাদের প্রয়োজন যত কিছু, তাহাও প্রধানত ভৌতিক জগতকে অবলম্বন করিয়া স্থিত। অনেকে বলিতে পারে এবং অনেকে বলিয়াও থাকে যে, সে প্রয়োজনকে যত কমাইতে পারা যায়, ততই ভাল; কারণ তাহা হইলে, সেই পরিমাণে আমরা আত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হই। আমি জিজ্ঞাসা করি, বৃত্তি ও প্রয়োজন সমুদয়ের সামঞ্জস্য দ্বারা সমানীত ন্যূনতা ব্যতীত কেবল এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বশবর্ত্তীতায়, ইচ্ছা করিয়া

ভৌতিক ভাবের পরিমাণাতীত ন্যূনতা সাধন করিলে, তাহা ভাল হইতে পারে কি সে? যদি সেরূপেই সে সকল কমান উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সে সকলকে প্রয়োজন রূপে ঈশ্বর তোমাকে প্রদান করিবেন কেন? তাহার পর দেখ, কমাইলেই বা সেই সকল কমে কই? যদি কমাইতে যাই, আর একটা অভাবনীয় প্রয়োজন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। অধিকন্তু, যাহাকে কমাইলাম, অথবা অন্যকথায় যাহার বিকৃতি সাধন করিলাম (কারণ যে কোন বিষয়ের ন্যায়ানুগত সীমা কি উৰ্দ্ধ কি অধোমুখে অতিক্রম করিলেই, তাহা বিকৃত হইয়া থাকে) তাহার যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। তোমার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের প্রায় অনেককেই সেই রকম জ্বলুনির জ্বালায় ছুঁচোমি অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

অতএব যে যে প্রয়োজন ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত, সুতরাং সৎ ও অপরিহার্য্য, তাহাকে বলপূর্ব্বক নিপাত করিতে যাওয়া মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য। নিপাতও হয় না অথচ তাহারা বিকার প্রাপ্তে যন্ত্রণার আধার হয়। তবে দেখ, প্রয়োজন গুলির অনুসরণ করাই যদি এখন শ্রেয়ঃ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভৌতিক জগতই আমাদের প্রধান আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং তাহাতে যে সকল পদার্থ নিকর আমাকে অচ্ছেদ্য ভাবে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। এ হিসাবে আত্ম এবং পর, উভয় সম্বন্ধ ধরিয়া দেখিলে, সংসার এবং সমাজই সর্ব্বাগ্রে প্রধান অবলম্বন বলিয়া লক্ষিত হয়। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে এতদিনে মানুষ, সংসার এবং সমাজ, সকলইত লোপ হইয়া যাইত এবং সৃষ্টি থাকিত কোথায়? যাহা হউক, সংসার এবং সমাজ, এ দুয়ের মধ্যে, আবার সংসার অপেক্ষা সমাজই অধিক গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, সংসারের নিকট একটি মাত্র বাধকতা, অর্থাৎ কেবল নিজের প্রয়োজন পূরণ; কিন্তু সমাজের নিকট বাধকতা নানারূপে। সংসার যাহা, তাহাও কেবল সমাজের আশ্রয়ে সম্ভব হইতে পারিয়াছে এবং সমাজেরই উহা একটি ক্ষুদ্রতম ছবি ও অংশস্বরূপ মাত্র। সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখিতে গেলে প্রথমত দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের নিজের প্রয়োজন যাহা, তাহা সম্পূর্ণ

সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত; সমাজের উন্নতিতেই কেবল উন্নত সংসার সম্ভব হইতে পারে, নতুবা পারে না। দ্বিতীয়ত যে সমাজের অঙ্কে আমি মানুষ হইয়াছি,তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতারও একটি মহৎ বন্ধন আছে। সামাজিক হিতের সহ আত্মহিত সংমিলিত না করিলে, মানবের কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই পরিপূরিত হইতে দেখা যায় না। তোমার নিষ্কাম সাধু সন্ন্যাসীও সমাজের আশ্রয় না পাইলে, সমাজের দ্বারে ভিক্ষা না করিলে, সাধু সন্ন্যাসী হইতে পারিত না। সুতরাং এখন দেখ দেখি, সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয় এবং অবলম্বনীয় কে?

আবার দেখ পাপ পুণ্য একটা হাতি ঘোড়া নহে। ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনের নাম পুণ্য, তদন্যতরে পাপ। তুষ্টি সাধন তাঁহার কিরূপে হইতে পারে? অবশ্যই যাহা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা সিদ্ধ করিলে। তুমি ভাবিতেছ যে তোমার প্রয়োজন যে সকল তাহা কেবল মাত্র তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে, অতএব তাহা রাখিলেও রাখিতে পারি, অথবা ছাড়িলেও ছাড়িতে পারি। এটি তোমার বিষম ভুল এবং পূর্ব্বেও ইহার সূচনা করিয়াছি। সৎপ্রয়োজন মাত্রে, আত্ম, সংসার, সমাজ, ঈশ্বর, সকলকেই অবলম্বন করিয়া স্থিত হয়। অতএব তদ্রূপ প্রয়োজন কেবল তোমার নিজের নহে, এবং রাখিলেও রাখিতে পারি ছাড়িলেও ছাড়িতে পারি একথা, গুরুতর বিপরীত কারণ ব্যতিত, কথনই তোমার বলিবার অধিকার নাই। দেখ একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ—তোমার প্রয়োজনে তুমি স্ত্রী গ্রহণ করিতেছ, সন্তান হইতেছে—কিন্তু প্রজা বাড়িতেছে জগতের,প্রজা বাড়িতেছে ঈশ্বরের; বল বাড়িতেছে সমাজের; এইরূপ তাবৎকাজে। যে প্রয়োজন তোমার সৎ আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণও তাহাতে; কারণ তাহা যদি না হইবে, তবে তুমি যখন স্বার্থের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া যাও, তখন জগত এবং মনুষ্য সমাজ তাহাতে উপকৃত হইয়া থাকে কেন? প্রয়োজন মাত্রে তুমি যে স্বার্থ দেখিতে পাও, তাহাই তোমাকে এ কর্ম্ম ক্ষেত্রে আটক করিয়া রাখিবার নিগড় স্বরূপ এবং সেই প্রয়োজন পূরণে যে সুখ তাহাই তোমার আশু মজুরী; এবং সেই প্রয়োজন পূরণ হইতে জগতের যে উন্নতি তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধি। তাই আবার বলি,

তোমার প্রয়োজনকে যে কেবল নিজের স্বার্থসাধক জানিয়া ভাবিতেছ যে তাহার উপর যাহা খুষি তাহা করিতে পারি, সেটা তোমার বিষম ভুল। তাহা না ভাবিয়া তাহাতে বিনত হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

অতঃপর আমরা উলটিয়া পালটিয়া যেমন করিয়াই দেখিনা কেন, কেবল ইহাই নিরবচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সংসার এবং সমাজই আমাদের কর্ম্মস্থলী এবং উহাই পৃথিবীতে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আমরা স্বয়ং জড়পিণ্ড দ্বারা আবরিত, জড় জগতে স্থিত, এবং কেবল মাত্র এই জড় জগতের ভাস প্রতিভাসের সাহায্যেই চিত্তশক্তি পরিচালনে সক্ষম। তদতীতে, নির্ম্মল আধ্যাত্মিক দেহ ও প্রকৃতি আমরা পাইও নাই; এ জীবন পাইয়া নির্ম্মল আধ্যাত্মিক জগতে কখন বাসও করি নাই; সুতরাং নির্ম্মল আধ্যাত্মিক ধারণাও কখন করিয়া উঠিতে সমর্থ হইনা,—এক্ষণে নির্ম্মল অর্থে সর্ব্বপ্রকারে ভৌতিক সংস্রব শূন্যতাকে বলিতেছি। নিরাকার মূর্ত্তিধারণা, নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা, ইত্যাদি নিরাকার ব্যবসায় বাতুলের কল্পনা মাত্র। মানব স্বয়ং পুতুল, যাহার উপর বাস করিতেছে সে পুতুল, যাহা যাহা এ জগতে তাহার অবলম্বন স্থল তাহা পুতুল, সুতরাং মানব পুতুল পূজকের অতিরেক পথে যাইতে সমর্থ হইবে কিরূপে? মহম্মদীয় ধর্ম্ম ভৌতিক; খৃষ্টীয় ধর্ম্মে পুতুল গড়ান না হইলেও, খৃষ্ট পুতুলের বাড়া '—খৃষ্ট মানুষ! পুতুল সম্মুখে গড়ানভাবে উপস্থিত থাকা অথবা মনে মনে কল্পনায় রাখা একই জিনিস। আকৃতি ব্যতিত উপাসনায় আবেশ শরীরীর পক্ষে সম্ভবে না। হিন্দু ঋষিরা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গূঢ়জ্ঞ ছিলেন। যত যত জাতি এ জগতে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব অবধারণা করিয়াছে, তন্মধ্যে হিন্দুঋষিরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী, তথাপি সেই হিন্দুঋষিরা যখন চূড়ান্ত সাধনা ও যোগে রত হইতেন, তখনও তাঁহাদিগকে, অপরিহার্য্য হেতু, আকৃতি বিশেষকে অবলম্বন করিতে হইত। অষ্ট যোগাঙ্গের মধ্যে, ধ্যান ও ধারণা আকৃতি বিশেষের অবলম্বন ব্যতীত হয় না। আধুনিক ব্রাহ্মবর্গ, এ গূঢ়তত্ত্ব না বুঝিবার কারণেই, এরূপ ছন্ন, সম্বন্ধচ্যুত, এবং উপহাসের আস্পদ স্বরূপ হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, কি পূর্ব্ব পূর্ব্বসাধক নিরূপিত কি স্বকৃত নিরূপিত,

আকৃতি বিশেষের সাধক হইতেই হইবে ;—আমরা এতটাই আধিভৌতিক গুণ প্রধান জীব। পুনশ্চ, ইহাও তোমাকে বলি, জগৎস্রষ্টা, জীবস্রষ্টা ও বুদ্ধিস্রষ্টা ঈশ্বর প্রকারগ্রাহী নহেন, তিনি ভাবগ্রাহী ; 'বিষ্ণায় নম' ও 'বিষ্ণবে নম,' উভয়েতেই সমান তুষ্ট। ইট, কাট, পুতুল, পাথর যাহাতেই তুমি ঈশ্বরবুদ্ধিতে উপাসনা কর না কেন, তাহাতেই তিনি সমান ভাবগ্রহ করিয়া থাকেন ;—মাত্র তোমার অনুষ্ঠান ও যত্ন যদি সাত্ত্বিক হয়।

যে কথা নির্ম্মল আধ্যাত্মিক ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত, সেই কথাই নির্ম্মল আধ্যাত্মিক জীবন চালনা সম্বন্ধেও প্রযুক্ত। উভয়ই সমান অসম্ভব। আমরা সংসারের সকল পরিত্যাগ করিয়া যখন মনে করিতে থাকি যে, আমরা আধিভৌতিক সংস্রব ছাড়িয়া ক্রমেই আধ্যাত্মিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি ; তখন ইহা দেখিতে পাইনা যে, ততই কেবল প্রকারান্তরে ইহজীবন পরিচালক ভৌতিক ভাস প্রতিভাস আদির বিকৃতি সাধন করিতেছি মাত্র। ইহাতে দুকুল যায় ও ইহা কেবল অশান্তির আধার হয়। এই জন্ম আমরা দেখিতে পাই যে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হইয়াও ভিক্ষারত এবং ভিক্ষায় নানা সাংসারিক পদার্থের জন্য লালায়িত, অথচ সে লালসার পূরণ প্রায়ই হয় না। লালসা আছে পূরণ নাই, প্রয়োজন আছে সফলতা নাই, অথচ যাহার জন্ম এ ভেক ধরিয়াছিলাম, তাহারাও প্রাপ্তি অসম্ভব। কাজেই এখন বলিতে হয়, এ সন্ন্যাস আশ্রমের নাম দুকুল যাওয়া, এবং ইহা ষাঁড়ের গোবরের ন্যায় কি ঈশ্বর কি মানুষ উভয়েরই নিকট অকার্য্যকর ; বাড়ারভাগ এরূপ সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাপ্রয়াসিতায় জগতের গলগ্রহ হইয়া উঠে। অবস্থাচক্রে পড়িয়া যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের দুঃখ ও অশান্তি ততটা নহে ; যতটা অবস্থার বিপরীতে যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের।

সন্ন্যাসী হইলেই যদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম উপার্জ্জনের সম্ভব হইত, তবে ঈশ্বর সকলেরই প্রতি সে ব্যবস্থা করিতেন ; কিন্তু তদুপরি আর এক প্রশ্ন আছে যাহা এ সকলেরই উত্তর স্বরূপ হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা হইলে এ সৃষ্টি এতদিন থাকিত কোথায় ? মানববংশ কবে লোপ হইয়া যাইত না ? ফলত, কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসরণ করা যদি আমাদিগের জীবনের কোন অংশে উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরও আমাদিগকে সেইরূপ করিয়া

তাহার উপযুক্ত উপায় এবং ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাহা যখন দেন নাই, এবং যখন দেখিতেছি যে প্রয়োজনই আমাদের সর্ব্বকর্ম্মের উৎপাদক, তখন সেই প্রয়োজন যে দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করে, সেই দিকেই আমাদের পক্ষে যাওয়া মঙ্গল। তিনি যখন আমাদিগকে ভূত ও আত্মায় জড়িত করিয়া দিয়াছেন, তখন ভূত এবং আত্মা উভয়ে সংমিলিত হইয়া যে কার্য্য করিবে তাহাই অবশ্য তাঁহার অভিপ্রেত, অন্তত আমরা যতটা বুঝিতে পারি। এ দুয়ের মধ্যে আবার দেখা যায় যে, ভূত যাহা, তাহা আমাদিগের আয়োজন ও উপকরণ দিতেছে; এবং আত্মা যাহা তাহা, তাহা হইতে সে সকলের প্রয়োজন আকর্ষণী ও শাসননীতির উদ্ভাবন করিতেছে। একটি নিয়মিত, অপরটি নিয়ামক; একটি পরিচালিত অপরটি পরিচালক; অথবা অন্য কথায় একটি শরীর, অপরটি জ্ঞান। যেমন জ্ঞানের বেগে শরীর পরিচালিত হয়; তেমনি আত্মিকগুণের বেগে ভৌতিকগুণ পরিচালিত হইবে, এই সম্বন্ধ। মানব ভৌতিক শরীরের দ্বারা, ভৌতিক শরীর যত প্রকারে সক্ষম, ততপ্রকারে যথাসম্ভব কর্ম্মরত হইবে; তাহার আত্মিক অংশ সেই কর্ম্ম যাহাতে প্রয়োজন পূরক ও শুদ্ধসত্ত্বা যুক্ত এবং ঈশ্বর ও চিরন্তন সত্য ও সতের অভিপ্রেতহয়, তাহার নিয়ম বিধান করিবে। এইরূপ হইলেই, যেমন ঈশ্বর আমাদিগকে ভূত ও আত্মায় জড়িত করিয়াছেন, তেমনি উভয়দিকের নিয়ম ও মান যথাসম্ভব রক্ষিত হইতে পারে। যে এরূপ রক্ষা করে, সেও সুতরাং ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। যাহার কার্য্যে আত্মিক শাসন নাই, সে পাষণ্ড, আর যাহার আত্মিক বুদ্ধি আছে, কিন্তু কার্য্য নাই, সেও পাষণ্ড; অধিকন্তু বাতিকগ্রস্থ! তোমার সাধু সন্ন্যাসী আদির অনেককেই সেই বাতিকগ্র স্থ পাষণ্ড বলিয়া জানিবে।

এখন কথা এই, তবে কি এ সন্ন্যাসী সাধু আদিদলের পরলোক বা পরিণাম ভাল হইবে না।

বাঞ্ছারাম, তুমি মোক্ষ কাহাকে বল তাহা আমি জানি না; অথবা পরলোকে ভালমন্দ কাহাকে বল, তাহাও বলিতে পারি না। ধর্ম্মপ্রচারকেরা যে যেরূপে ও যতই পরলোকের চিত্র প্রদান করুন না কেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর কখনই স্পষ্টরূপে পরলোকের ভাব স্বভাবাদি

এ লোকে প্রচার করেন নাই; অথবা জীবন সেতুর এদিকে যাহারা বাস করে, ও পারে কি আছে তাহা কখন তাহাদিগকে স্পষ্ট জানিতে দেন নাই। আমার বোধ হয়, তাহা জানিতে না দেওয়ায় ভালই হইয়াছে; কারণ যদি জানিতে দিতেন, তাহা হইলে লোকজগতের মতি গতি ও চিত্ত এরূপ থাকিত না; এবং এরূপ মতি গতি আদি না থাকিলেও জগতে এরূপ লীলা বৈচিত্র ঘটিত না; অথচ আমরা দেখিতেছি, অথবা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যতদূর নিরূপণ করিতে পারি তাহাতে প্রতীত হয় যে, এইরূপ লীলা বৈচিত্রই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যখন এ সৃষ্টিস্থ তাবত-কেই স্ব স্ব স্বভাব ও ধর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন পথে গতি করিতে হইবে, তখন সকলেরই পরিণাম স্থলে একমাত্র চিত্র বিশেষ প্রদর্শন কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? পরলোকচিত্র যাহাই হউক, মোটের উপরে তোমাকে কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ঈশ্বর যাহাতে যে শক্তিবীজ নিহিত করিয়াছেন, তাহা যতক্ষণ অঙ্কুরিত ও ফলবতী না হইবে ততক্ষণ তাহার শান্তি নাই, কেজানে ইহলোকে কেজানে পরলোকে। পরলোকের অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য যাহা কিছু, তজ্জন্য নিজের আত্মিক শক্তিযোগে তাহার চিত্র বা আদর্শ উপলব্ধি করিতে পার ভালই; না পার শাস্ত্রে বিশ্বাস কর, তদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই। নিজ আত্মিক শক্তি যোগে উপলব্ধি করা, অনেক সাধনা ও অনেক ক্ষমতার কর্ম্ম। শাস্ত্রে বিশ্বাস সহজ উপায়।

অতঃপর যাহাকে বিপাকে পড়িয়া সংসার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; অথবা যে বিবেচনা করে যে আমি সংসার পরিত্যাগ করিলেই অধিকতর কর্ম্মসাধনের দ্বারা জীবনের প্রকৃত সার্থকতা করিতে পারিব; তাহার পক্ষে অবশ্য সন্ন্যাসই অবলম্বনীয় হইতেছে। কিন্তু সন্ন্যাসটা প্রকৃত কি? প্রকৃত সন্ন্যাস তাহাকেই বলি, যাহা আত্ম সুখ এবং আত্মস্বার্থে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া, জগত হিতেতে সম্যক প্রকারে জীবন উৎসর্গ করণ। সে যে পারে, সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তাহাকেই পূজা করিতে পারা যায়। নতুবা যাহারা কেবল চিতাভস্ম বিলিপ্ত জটাধারী, এবং কেবল দেবতার উপাসনা মাত্র করিব বলিয়া সন্ন্যাসী, তাহারা ভক্তির পাত্র নহে। তবে দয়ার পাত্র বটে, যেহেতু সেরূপ সন্ন্যাসী সৎবুদ্ধি

সত্বেও ভ্রমান্ধতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। আর যাহারা কেবল বেশমাত্রে সন্ন্যাসী এবং কার্য্যত লোভী ও দুষ্ট, সর্ব্বদা পথে ঘাটে যাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা না ভক্তি না দয়া, কেবল লাঠির পাত্র বলিয়া জানিবে।

যোগাভ্যাস এবং যোগাবলম্বনের জন্যও লোকে সন্ন্যাসী হয়, ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি যোগলব্ধ শক্তি জগতহিতে নিয়োজিত হইতে পারে। সংসার আমাদিগের আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণের স্থান; উহা কর্ম্মক্ষেত্রের মহা অংশ স্বরূপ হইলেও, প্রকৃত সর্ব্বাবয়ব যুক্ত পূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র যাহা তাহা সমাজ বা জগত। সৎভাবে যথাশক্তি সেই কর্ম্মক্ষেত্রের অনুসরণেই পরাগতি এবং পরামুক্তি, যেহেতু তাহাতেই ঈশ্বরতুষ্টি।

১১। বৃদ্ধাবস্থা।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"। বাঞ্ছারাম বলে, এ কথার অর্থ কি, এ কোন্ বন? জনপদ হইতে দূরস্থিত লোকশূন্য জন্তুগণ পরিবৃত অরণ্যাদি না আর কিছু?

বাপু, পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হইলে, সত্য সত্যই আর দূরবনে যাইতে হইবে কেন? তখন ত এই সংসারই বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। দেখ, যাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া এই দুর্গম জীবনপথ বাহনে প্রথম যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহারা একে একে বৃন্তচ্যুত পুষ্পবৎ স্খলিত হইয়া কাল কন্দরে লুকাইয়াছে; যাহাদিগকে দেখিয়া নিত্য হর্ষিত হইতাম, তাহারা একে একে দূর স্বপ্ন-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে; যাহাদিগকে ভাল বাসিয়াছিলাম এবং যাহারা এ ঘোর দুঃখসঙ্কুল অন্ধকারময় জীবনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল, তাহারা একে একে গত বা বিকৃত হইয়া যাইতেছে; পূর্ব্বে যে সকল পদার্থ তৃপ্তিকর বা হর্ষদায়ক ছিল, এখন আর তাহারা সেরূপ নাই; এবং পূর্ব্বে এ জীবনপথের দূরপ্রান্তে যে আশারূপী নিদর্শনী আলোক জ্বলিতেছিল, এখন তাহাও নির্ব্বাণ প্রায়,—ছন্ন ও মলীন সায়াহ্নিক সৌরকরের ন্যায় আমারও আশাজীবন ক্রমে মলীন হইতে মলীনতর, স্তিমিত হইতে স্তিমিততর হইয়া আসিতেছে; এত খুঁজি, তথাপি সে উজ্জ্বল মধ্যাহ্নকালের দেখা একটিবারও পাই না, যাহাতে ক্ষণেকের নিমিত্ত

এ জীবনে সেই উজ্জ্বলতা আবার ফিরিয়া আইসে, যাহাতে আবার ক্ষণেকের নিমিত্ত সেই সাবেক নিরাবিল ও মাতোয়ারা হর্ষে হর্ষান্বিত হইতে সক্ষম হই। এ সংসারক্ষেত্রের যে যে স্থানে আগে আমার বলিয়া সহর্ষে ও সদর্পে বিচরণ করিয়া ফিরিতাম, আমার বলিয়া কত কি করিতাম, এখন আর তাহা আমার নাই; নূতন নূতন লোক আসিয়া, সে সকল স্থান হইতে আমাকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে। সে সুখ নাই, সে আশা নাই, সে আমোদ নাই, সে প্রমোদ নাই, সে প্রণয় নাই, প্রণয়ে সে মাদকতা নাই, সে আহার নাই, সে বিহার নাই, আগে যে দশজন কাছে আসিত এবং কাছে থাকিতে ভাল বাসিত, এখন তাহারা দূরে গত; যদি কেহ কাছে আসে, সে দুঃখের দিনে দুঃখের কথা কহিতে,—"বুড়ো বেটা অনেক দিনের, অনেক দেখিয়াছে, অতএব উহার কাছে পরামর্শটা লওয়া ভাল।" সুখের দিনে, আমোদের সময়ে, কেহই ত কাছ দিয়া ঘেষে না!—"দূর-কর, বুড়ো বেটার সম্মুখে এ সকল কাজ নাই, এখনই ইহার মধ্যে কি ছল ধরিবে, এখনই ইহার মধ্যে বকেশ্বরী করিয়া কি নীতি আওড়াইতে বসিবে, সকল পণ্ড করিয়া দিবে।" আপনা হইতে ত কেহই কাছে আসিবে না, যদি বা আমি যাইব, অমনি সকল আনন্দের তুফান নিরব,সবাই ম্রিয়মান, সবারই মুখ বিষণ্ণ, সবাই ভাবে এ উড়ো আপৎ কতক্ষণে বিদায় হইবে। সেবা সুশ্রূষা যাঁহারা করেন, তাঁহারা তাহা করেন করিতে হয় বলিয়া; ঊর্দ্ধসংখ্যায় করায় পুণ্য আছে বলিয়া। তাই বলি বাপু, এরূপ অবস্থায় লোক কোলাহল পূর্ণ লোকালয়ে থাকিয়াও কি ইহা লোকশূন্য নির্জ্জন বনে বাস নহে? যাহা কিছু দেখিতে হয়, দূরে থাকিয়া দেখ; তুমি নিকটস্থ হইলেই সকল পণ্ড হয় এবং তোমার পক্ষে তাবত নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সে কাল আর নাই, কাল যিনি তিনিও এখন নূতন। আমার পক্ষে আর এখন প্রাতঃ বা মধ্যাহ্ন নহে। অপরাহ্ণ! এবং তাহার যে ক্ষীণ আলোকটুকুও শেষ প্রায়। দিবা শেষ হইয়া আসিয়াছে, আকাশ সায়াহ্নিক মেঘে ঘিরিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ধূষর অন্ধকার; মধ্যে মধ্যে ছন্ন মেঘের ভিতর হইতে রোগীর হাস্যবৎ অস্তো-মুখ সূর্য্যের বিকৃতবর্ণ লোহিতালোক, কখন বৃক্ষচূড়ে কখন গৃহচাতালে চকিত চমকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া, আমার মহাপ্রস্থান পথের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি-

তেছে। আমিও তাহা দেখিয়াছি বাপু, আর কেন? এ স্তিমিত দৃষ্টে হর্ষ দূরে থাকুক, থাকিয়া থাকিয়া আতঙ্কে প্রাণ যেন চমক-সুপ্তোত্থিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কালের যে দুর্জ্জয় তরঙ্গ এতদিন অদৃশ্যে প্রবাহিত ছিল, এখন তাহা ধিকি ধিকি দৃষ্টের দূর প্রান্তে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে; দৃষ্টি ক্রমে ইহ-লোক হইতে অপসারিত হইয়া, আতঙ্কে তৎপ্রতি দৃঢ়তর হইয়া বসিতেছে। পশ্চাতের তাবত, যাহাদিগকে এতদিন সত্যস্বরূপ জ্ঞানে অবলম্বন করিয়া-ছিলাম; এখন তাহারা মিথ্যাভাবে ও কবিকল্পনায় পারণত হইয়া গিয়াছে যে সংসার এত সুখের স্থান ছিল, তাহাই এখন এত দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সূর্য্যাস্তের সহ আমারও এ দিন ফুরাইবে। কিন্তু সূর্য্যকে এখন কালমেঘে ঢাকিল; কখন অস্ত, কখন আমার দিন শেষ, তাহাও ত জানিতে পাইতেছি না, দেখিতে পাইতেছি না, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তেই ফুরাণর ব্যাকুল-তায় ব্যাকুলিত। বাঞ্ছারাম, আরও অরণ্য কোথায় খুজিতে যাইব;—এই ঘরই যখন এমন দারুণ অরণ্য, মরুস্থল হইতেও কঠিনতর? তোমার প্রাকৃতিক অরণ্যে প্রাকৃতিক শ্রীদর্শনেও বরণ কিঞ্চিৎ সুখ ও শান্তি আছে, কিন্তু এ অরণ্যে তাহাও নাই। অরণ্যেই যদি বৃদ্ধবয়সের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে প্রাকৃতিক অরণ্য অপেক্ষা এই অরণ্যই উপযুক্ত এবং কঠিন স্থান।

পঞ্চাশ উর্দ্ধে বনভ্রমন হইল বেন, এখন কর্ত্তব্য কি? বাল্যের সে চাপল্য নাই, যৌবনের সে শক্তি নাই, হায় হায়! সে সাহস নাই, সে উপায় নাই, এখন করি কি? অন্যদিকে সংসারের সুখে বঞ্চিৎ, সুতরাং সংসারের বন্ধনও শিথিল এবং স্বার্থেরও হ্রাসতা। এখন আর কি করিবে, যোগী হও, সন্ন্যাসী হও। এ সন্ন্যাসী অর্থে চিতাভস্ম বিলিপ্ত জটাজুটধারী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া ভাবিবে? তাহা ভাবিও না। মানবের দুইটি অবলম্বনের মধ্যে, সংসারের মায়া যদিও গিয়াছে, সমাজ বা জগত এখনও যায় নাই। এ সন্ন্যাসের ধর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত;— যখন সংসারলিপ্ত ভাব অনেকাংশে দূর হইয়া আসিয়াছে, তখন অবশ্যই আত্ম-স্বার্থেরও আর বড় একটা উত্তেজনা নাই। সুতরাং এখন আর আত্মস্বার্থের বাধকতা তত না থাকায় জগতের স্বার্থে আত্ম উৎসর্গ করিলে অধিক সফল-কাম হওয়ার সম্ভব। এ অতি অপূর্ব্ব সন্ন্যাস, এবং ইহা নিতান্ত অতুলনীয়

ও পবিত্র। এ বয়সেও, পূর্ব্বলিপ্তির টান হেতু, সাংসারিক মায়া ও সাংসারিক ঘটনাবলির ছায়া হয়ত অনেক সময়ে আসিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে, যাহাতে তোমার সন্ন্যাসব্রতের ক্ষতিকর হয়! অতএব এমন অবস্থায়, ইচ্ছাপূর্ব্বকও কতকটা নির্জ্জনতার আবশ্যক হয় বটে, যাহাতে কথিত সন্ন্যাসভাবের ব্যাঘাত হইতে না পারে; সেই টুকু নির্জ্জনভাব অবলম্বন করিও। যত-ক্ষণ সংসার-শক্তি থাকে, সংসারে রত রহিবে; তদনন্তরে এই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, ইহাই যুক্তি। কিন্তু একটা কথা, তেমন বৃদ্ধ হইতে পারিবে কি?

যখন এ সন্ন্যাসেও বয়োধর্ম্মে অপারক হইবে, এবং যখন শরীর ও মনের বার্দ্ধক্য বশতঃ বা যে কোন কারণে কর্ম্মশক্তি সর্ব্বপ্রকারেই তিরোহিত হইয়া যাইবে; তখন সর্ব্ব সংশ্রবশূন্য হইয়া, একমাত্র ঈশ্বরে সর্ব্বসমাহিত করিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী মানুষ হইবে। ইহাই তৎকালের একমাত্র শ্রেয়ঃ ও কর্ত্তব্য, তখন ইহাই একমাত্র মহাকর্ম্ম। অথবা একথা কেবল এ কালের জন্যই বা কেন বলি; সকল কালেই ঈশ্বরে সর্ব্বসমাহিতভাবে থাকা বিধি। তবে অন্য কালের সহ একালের প্রভেদ এই যে, অন্যকালের সমাহিতভাব সকর্ম্মক, একালে তাহা অকর্ম্মক, এই মাত্র।

১২। পাপ্ সঙ্গ।

বাঞ্ছারামের বিচিত্র লীলা! বাঞ্ছারাম একবার এক চাকুরীতে মাতিয়া-ছিল। চাকুরী স্থানটি সোজা নহে, মুনিব যিনি তিনি অকর্ম্মা ও পাপের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ; তাহার সংস্পর্শেও পাপ অর্শানর কথা। কিন্তু পেটের দায়ে বাঞ্ছারামের এ কার্য্য ছাড়িবারও সাধ্য ছিল না, কারণ তাহা হইলে বাঞ্ছারামকে অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিতে হয়। মরণত আছেই, তজ্জন্য চেষ্টার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিকূল কারণ সত্ত্বেও, পাপের মধ্যে থাকিয়াও, যদি আজি জীবনটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে কালি হয়ত তাহা এ জগতের কাজে কিঞ্চিৎ লাগিলেও লাগিতে পারে; এবং একেবারে অকর্ম্মে জীবন নষ্ট করার অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ কর্ম্মেও তাহা পবিত্র করা ভাল। বাঞ্ছারাম এই ভাবিয়া চাকুরী ছাড়ে নাই। অধিকন্তু একটি কর্ম্মযোগীকে একদিন জিজ্ঞাসা করে যে, এ চাকুরীর ভিতরে থাকিয়া আমার কিরূপ ভাবে চলা উচিত, পাপ হইতে কেমন করিয়াই বা

আত্মরক্ষা করি। বাঞ্ছারামের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় দুইই সাধু। কিন্তু কর্ম্ম-যোগী, দেখিলাম, ক্ষণেকের জন্য যেন ফাঁপরে পড়ার মত হইলেন। যেহেতু, প্রশ্নটি বড় শক্ত; কর্ম্মযোগী বোধ করি ভাবিলেন যে, আমি বা কি বলিব, আর অন্যেই বা তাহার উপর কে কি বলিবে। তবে কি না ইহার মধ্যেও একটা ফিকির আছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার কাছে আপনি ঠিক হইতে পারে, এ জগতে সকলের কাছেই তাহার ঠিক হইবার সম্ভাবনা; এবং লোকে যদিও এই 'ঠিক ভাব' আপাতত বুঝিতে না পারে, কিন্তু কালে যে তাহা নিশ্চয় বুঝিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই!

১৩। বাঞ্ছারামের প্রতি উপদেশ।

পৃথিবীতে, বিশেষত আজি কালি আমাদের দেশে, যেরূপ প্রবল শয়তানের রাজত্ব; তাহাতে যদি বলি যে ভাগ্যে যাহাই হউক, তুমি যথাবুদ্ধি সুপথ ধরিয়া চলিবে, কুভাবের সংস্রবেও কখন যাইবে না, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় দেখিতেছি যে বাঞ্ছারাম অন্নাভাবে মারা যায়। কারণ, এক গোড়া-গুড়ি হইতে যদি সুপন্থা অবলম্বিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীও তাহাকে তদ্রূপ বলিয়া চিনিতে পারিত এবং নিজেও, আশ্রয়াতীত স্বয়ংক্ষম হইবার পূর্ব্বে, অন্যের আশ্রয়ের উপর ভর করিয়া আপনার স্বপথে দৃঢ় হইয়া বসিবার সময় পাইত; তাহার পর, একবার সে সুপথে বসিতে পারিলে, আর তাহা হইতে উচ্ছেদ করা শয়তানের সাধ্য হইত না! কিন্তু যদি আগে কিছুদিন শয়তানী দলে মিসিয়া, তাহার পর কেহ সুপথে যাইতে চাহে; সেটা তাহার পক্ষে আর তেমন সহজসাধ্য হয় না এবং কোন গতিকে কিছু সফলতা লাভ করিলেও, সহজে তাহাতে দৃঢ় হইতে পারা যায় না। কারণ, পৃথিবী তাহাকে এ পর্য্যন্ত অন্য রকম দেখিয়া আসি-য়াছে, এখন আর এক রকম দেখিলে, সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না; অন্যদিকে আবার লোক সমাজে শয়তানী প্রভুত্বের প্রাবল্য হেতু, লোকসমাজও তেমন স্থলে তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে; আবার শয়তান নিজেও, নিজের অনুচর একটি ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া, পশ্চাৎ হইতে প্রাণপণে তাহার চুলে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। সুতরাং

এ ঘোর সঙ্কট স্থলে, এতগুলি প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া, বিশেষত সে যদি কিছু দুর্ব্বল প্রকৃতির হয়, তাহার পক্ষে অন্য পথে যাওয়া সহজ হইয়া উঠে না। ফলতঃ একবার কুপথে আশ্রয় লইলে এবং অথবা বয়সে তাহা সুধরাইতে যাইলে, তাহা যে এতই কঠিন বলিয়া আমরা সর্ব্বদা এ পৃথিবীতে দেখিতে পাইয়া থাকি, তাহার কারণ এইগুলি। মনুষ্য সকলও সাধারণত অতি দুর্ব্বল প্রকৃতি, সবল প্রকৃতির ভাগ অতি কম। এজন্য মোটের উপর দেখা যায় যে মানুষ বয়সে প্রায় সুধরাইতে পারে না এবং যদি বা সুধরাইতে যায়, তবে তাহাকে সর্ব্বদা, অন্ততঃ আরম্ভে অপরিমিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু সে ক্লেশ স্বীকার করিয়া ও তাহা সহিয়াও যে অটল থাকা, তাহা সামান্য মনের কাজ নহে; সে সকল সবল ও দেবানুগৃহিত চিত্তের কাজ অর্থাৎ যাহারা কুপথে যাইবার নহে, অথচ ঘটনাচক্রে পড়িয়া গিয়াছিল, কেবল তাহারাই তাহাতে সক্ষম হয়। সাধারণ চিত্ত, একবার কুপথে গতি করিলে, তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ায়; পরিণাম ভয়ঙ্কর হইলেও, তাহার মোহ ও আশু প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা তাহাতেই থাকিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে আপনার দুরন্ত পরিণাম মুখে চলিয়া আসিতে থাকে। ইহাঁরই নাম পাপে পাপের বৃদ্ধি। একবার পদস্খলন হইলে, আর তাহা হইতে এড়াইয়া উঠা দায়।

আধাপথে অথবা আধা বয়সে, সুপথ অবলম্বন করিতে যে সকল প্রতিকূলতা দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম হইতে যে সুপথ ধরিতে চাহে, তাহাকে আর সে সকল প্রতিকূলতার দেখা পাওয়ার যে বেগ বা তাহাদের অতিক্রমের যে ক্লেশ তাহা পাইতে হয় না। উপরে দেখাইয়াছি যে, বিপথে একবার পতিত হইলে, তাহার পর সুপথ অবলম্বন সাধারণত নিতান্ত সন্দেহ স্থল। এ জন্য, সুপথের প্রাপ্তিপক্ষে সন্দেহ-রহিত হইতে হইলে, প্রথম হইতেই সুপথে গতি সকলের পক্ষে এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। প্রথম হইতে সুপথ অবলম্বিত হইলে, তাহাতে দৃঢ়হইয়া স্থির হওয়ার পক্ষেও কোন বিশেষ একটা প্রতিবন্ধকতা হয় না; তাহার পর, যেমন অন্যদিকে পাপে পাপের বৃদ্ধি, তেমনি আবার এদিকেও সতে সতের বৃদ্ধি হেতু, সৎপথাবলম্বী যে সে ক্রমে শুভ ও দিব্য পরিণাম মুখে চলিয়া আসিতে থাকে।

যে প্রথম হইতেই সুপথ অবলম্বন করে, সে শুভজন্মা। কিন্তু যে প্রথম হইতেই অধঃপাতে যায় এবং যে প্রবেশদ্বারে শয়তানের লোকভুলান মোহকর চাকচিক্যশালী প্রলোভনকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিতে সমর্থ না হয়; দেখ, শেষে তাহার সদ্গতিলাভের বিষয়ে কি কষ্ট. কি প্রতিকূলতা, কি সম্ভবে অসম্ভব ভাব; এবং সর্ব্বশেষে হয়ত কি দুরন্ত পরিণামই তাহার জন্য পুরোভাগে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। বাঞ্ছারাম একথায় বিলাপ করিয়া আত্ম অবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক বলিতেছে;—'হায়! আজি নিজে ভুক্তভোগী হইয়া, এখন কতই না দেখিতেছি যে, প্রথম কালের কুপথ-ছায়া কি দুর্দ্দমনীয় ভাবে আমাকে তাহার স্ববশে পাতিত করিয়াছে এবং এখন কত প্রকারেই না আমাকে ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিতেছে। আমি এখন কত চেষ্টা, কত অধ্যবসায় করিতে যাইতেছি; কত প্রতিজ্ঞা করিতেছি; কত রকমেই যত্ন করিতেছি, কিন্তু তথাপি কিছুতেই বাগ মানিতেছে না। কত কত বিষয়ে আমি স্পষ্ট জানিতেছি যে ইহা মন্দ, পাপ, ইত্যাদি; মনেও ভাবিতেছি যে তাহা আর করিব না, বিরত হইব, কিন্তু হায়! পরক্ষণেই মোহ আসিয়া আবরিত করিতেছে, আবার নাকফোঁড়া বলদের মত তাহাতেই যেন কে আমাকে টানিয়া আনিয়া ফেলিতেছে। প্রথম কালে যে পদস্খলন হইয়াছিল, আজি পর্য্যন্ত তাহার জের ও বেগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলাম না। প্রভু দীননাথ! তুমি অগতির গতি, আমাকে আত্মবান কর; বিকাশ হও যাহাতে এই শক্তি আবার বিকাশ লাভ করিয়া তোমার মহিমা প্রচার করিতে থাকে, যাহাতে অন্তে তোমার চরণে গতি লাভ হয়। প্রভু, কতদিনে আর আমি সেরূপ মহাব্রতে ব্রতী হইতে পারিব! ওঁ তৎসৎ জয় জগদীশ হরে।'

বাঞ্ছারামের বিলাপ থামিল। কিন্তু যোগীর পক্ষে বিষম সমস্যা; উপরেই তাঁহার চিন্তা সূচনা করিয়াছি। এখন যদি বাঞ্ছারামকে বলি যে, যেমন করিয়া হউক কুপথে যাইও না, চাকুরী ছাড়িতে হয় তাহাও নেহাতপক্ষে ছাড়িয়া দেও; সুপথে যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি চলিও, এবং কখনই সৎসঙ্গ ভিন্ন কুসঙ্গের দিকে যাইও না; তাহা হইলে দেখিতেছি এবং দেখাও প্রত্যক্ষবৎ যে, সে অন্নাভাবে মারা যাইবে,—সে

আবার একা নহে, পরিবার স্বরূপে তাহার পিছনেও মারা যাইবার জন্য অনেকে আছে; এবং বাঞ্ছারাম নিজেও এ বন্দোবস্তে সম্মত নহে। পুনশ্চ যদি বলি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সুপথ অবলম্বন কর, তাহাও ঠিক হয় না; কারণ অদৃষ্ট (যে অর্থে সাধারণে তাহাকে বুঝে) অকর্ম্মার এবং ভবিতব্য আহাম্মকের প্রবোধ স্থল মাত্র, তদ্ভিন্ন এ জগতে তাহাদের বস্তুত কার্য্যকরী অর্থ কিছুই নাই। অদৃষ্ট অর্থে আমার নিকট, "কুরুপৌরুষমাত্মশক্ত্যা"। কিন্তু 'কুরুপৌরুষমাত্মশক্ত্যা' আমাদের এদেশে বড় সহজ কথা নহে; কারণ নানা কারণে আমরা ছন্ন ও গোলামের জাতি। গোলামের জাতির দ্বারা স্বধর্ম্ম কখনও সম্পূর্ণত ও স্বচ্ছন্দত অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; তদভাবে সুকর্ম্ম সকলও কখনও সম্পূর্ণত সুসম্পাদিত ও সফলিত হয় না; তদন্বয়ে মানবীয় উপায় ও গতি সকলও নিরন্তর ছন্ন ও ক্ষুণ্ণভাবে অবস্থান করিয়া থাকে; পুনশ্চ সর্ব্বথা জাতিগতভাবে ভিন্ন, কেবলমাত্র একৈক ব্যক্তিগত 'কুরুপৌরুষমাত্মশক্ত্যা' সকল সময়ে সকল বিষয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। এমন স্থলে তবে উপায় কি?—উপায় সম্ভবতার মধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা! অথবা এসমস্যায় হাত দেওয়ার শক্তিও আমার নাই এবং হাতও দিই না; আমি তাহাকে কেবল এই কয়েটি কথা মাত্র বলিলাম!

"যে স্থলে এবং যে ঘটনাচক্রে তুমি পতিত হইয়াছ, তাহা নিতান্ত মন্দ, অযশস্কর এবং পাপবর্দ্ধক; কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মধ্যে প্রধান সুখের ও আশার বিষয় এই যে, তুমি তৎপ্রতি নিতান্ত নারাজ এবং তাহা হইতে উদ্ধারের জন্যও তোমার বাসনা অতি প্রবল! ইহা শুভচিহ্ন। তোমার যখন ইচ্ছা এবং আগ্রহ উভয়ই আছে, তখন কালে তাহাতে ফল ফলিবার সম্ভাবনা। 'অবিলম্বে উদ্ধার হইব' এ চেষ্টায় অনেক ক্লেশ; তাহা সহ্য করিতে আপাতত তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং তুমি তাহা পারিবেও না। ফলত পাপে হউক বা পুণ্যে হউক, কি নিবৃত্তি কি প্রবৃত্তি মার্গ, একেবারেই সম্পূর্ণত হটাৎ অবলম্বিত হইতে পারে না; সাধারণ দুর্ব্বল মানুষের তাহাতে সাধ্য নাই; যাহাদের সে সাধ্য আছে, তাহাদের ভাগ অতি অল্প। নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি মার্গের অবলম্বনও, অপরাপর বিষয়ে যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম, তদনুসারে ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং এরূপ ধীরে ধীরে যাহা

সম্পন্ন হয়, তাহাতে ক্লেশের ভাগ বড় একটা টের পাওয়া যায় না, বা ক্লেশাদি ধীরে ধীরে সহ্য হইয়া আইসে; এ দিকে অনুষ্ঠিত কার্য্যও অগ্রসর হইতে থাকে। উপরন্তু সৎপথাভিমুখে যত অগ্রসর হওয়া যায়, পর পর তত সুখানুভবের বৃদ্ধি হইয়া মন আরও শান্তি এবং শান্তির আধার হইতে থাকে। পাপ হইতে তুমি সেই ধীর নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিতে শিখ; সুতরাং বলা বাহুল্য যে সুপথের প্রবৃত্তি মার্গ, তাহা হইলে, আপনা হইতেই প্রশস্ত হইয়া আসিবে। আপাতত তোমার যে কুকার্য্য বা কুসংস্রব, তাহা অনিবার্য্য; সুতরাং এখানে তোমার এখন কর্ত্তব্য এইমাত্র দেখিতেছি যে, যদিও তোমাকে তাহাতে আপাততত লিপ্তের ন্যায় দেখা যাইবে বটে, কিন্তু তুমি তাহার মধ্যেও, আপনাকে আপনি এরূপ সতর্কভাবে চালাইবে, যেন সেই সকল তোমাকে কোনরূপে স্পর্শ করিতে না পারে, তুমি তাহাদিগে স্পর্শ করিবে এই মাত্র। এ কুযোগের মধ্যেও,—যদি তুমি নিজে ভাল হও,—এ কুযোগের মধ্যেও আর একটি সুযোগ আছে, যদ্বারা কু-সংসর্গানিপ্তি হইতে উৎপন্ন অপরাধও তোমার কতকাংশে ক্ষালন হইয়া যাইতে পারে; অর্থাৎ কুসংসর্গের ভিতরে থাকিয়া, অথচ কুসঙ্গীদিগকে কুকার্য্যের দ্বার দিয়া ও কৌশলে তৎপরিণাম দর্শাইয়া সুকার্য্যে মতি লওয়াইয়া, ক্রমে তাহাদিগকে সুপথে আনয়ন করা। তুমি তাহাদের সঙ্গী, এজন্য তোমার দ্বারা তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্ধোরত হওয়াই সম্ভব। পুনশ্চ, তুমি বাধ্য হইয়া বাহিরে অনীতিপথে পতিত থাকিলেও, অভ্যন্তরে যদি সুনীতি বিষয়ক ইচ্ছা যথার্থতই সাত্ত্বিক ভাবে পোষণ করিতে পার; তাহা হইলে, তোমার বাহ্য কদনুষ্ঠানের মধ্যেও তোমার সাত্ত্বিকতা স্বতই এরূপভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে, যাহাতে জগত এবং নিয়োজক, উভয়েরই নিকট তোমার প্রকৃত পরিচয় পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। উভয়েই তখন তোমাকে ক্রমে সম্মান করিতে শিখিবে এবং উভয়েরই নিকট হইতে সুতরাং তোমার উদ্ধারের পথ অতি নিকট হইয়া আসিবে। সৎকে সৎ বলিয়া একবার জানিতে পারিলে, কোন অসৎই তাহাকে জোর পূর্ব্বক অসৎপথে নিয়োজন করিতে চায় না; যদিবা নিয়োজন পক্ষে কিছু চেষ্টা করে, সে অতি সামান্য। তাহার পর এমন কোন অসৎ নাই যে সৎকে একবারে সম্মান

না করিয়া থাকিতে পারে ;—জগৎ আজিও তত উৎসন্নমুখ হয় নাই। এতদুপায়ে, অসৎপথে নির্লিপ্তভাবে কিছু দিন চলিতে হয় বটে, যেহেতু তাহা অপরিহার্য্য; কিন্তু মুক্তির দিনও অতি সত্বরেই নিকটস্থ হয়। তৃতীয় উপায়, কোন এক সৎপন্থা ক্রমে সংগ্রহ করিয়া, পূর্ব্ব অসৎপন্থার পরিহার করণ ; চতুর্থ উপায় সর্ব্বসৎস্বরূপকে মনের সহিত ডাকিতে পারিলে, তিনিই অসৎ হইতে মুক্তির উপায় করিয়া দিয়া থাকেন। শেষ কথা, যে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সৎকে কামনা করে, তাহার অসৎ হইতে উদ্ধার পন্থা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। উদ্ধারের দিন আগত হওয়া পর্য্যন্ত, অনিচ্ছাসত্বে ও নির্লিপ্তভাবে যে অসৎপথে বিচরণ, তাহাতে বিশেষ কোন প্রত্যবায় ঘটনা হয় না।

কুপথ হইতে উদ্ধারের এরূপ ধীর উপায়ে, বিরক্ত বা ফলের প্রতি নিরাশ হইও না। ধীর হউক, অধীর হউক, চেষ্টা মাত্রেই ফল আছে। প্রকৃতি নিজে কোন বিষয়েরই সহসা উৎপাদন করেন না, সমস্তই ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করিয়া থাকেন। ধীর পারিবর্ত্তণের পরিবর্ত্তে সহসা পরিবর্ত্তণ যাহা তাহাকে বিপ্লব বলে। বিপ্লব মাত্রে বড় ক্লেশদায়ক, বড় দুঃখের আকর। তবে মানব যখন ঘোর অত্যাচারে দগ্ধ,—কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কি অপর বিধ ; তখন কখনও কখনও বিপ্লব মঙ্গলের নিদানস্বরূপ হইয়া থাকে ; "এবং তেমন স্থলে বিপ্লবের আনুসঙ্গিক ঘোর দুঃখ ও ক্লেশ, নিত্য সহনীয় অত্যাচারের তুলনায় তুচ্ছের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং মানবও তখন অকাতরে তাহা সহ্য করিয়া থাকে। সুতরাং মানব যখন ঘোর পাপরাশীতে এইরূপ গাঢ় মগ্ন হয়, তখনও এইরূপে তদবস্থায় বিপ্লব উপস্থিত হইলে, প্রায় তাহা উপকারী হইতে দেখা যায়।

১৪। ক্রমশঃ বিজ্ঞতা।

"লোকে বিজ্ঞতম ক্রমশঃ হয়।" ঠিক কথা। সংস্কৃত কবির এ কথাটি অমূল্য এবং অতুল্য। এ পৃথিবীতে বিজ্ঞ হওয়ার পূর্ব্বে মানুষকে কত উঠা পড়া, কত দেখা শুনা, কত মান অপমান, কত মনের সুখ কত মনের দুঃখ, কতই কি ভোগ করিতে হয়, তাহার ঠিকানা নাই। বিজ্ঞ

হইতে হইলে, অনেক কাঠ খড়ের আবশ্যক। ইহার একটি উদাহরণ দিতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু কোথায় পাইব। যাহাহউক, অভাবে পড়িয়া আমাদের বাঞ্ছারামের একটি জীবন কাহিনীর কথা এ স্থানে অবতারিত করিব, কারণ তাহা এ স্থানের পক্ষে ঠিক যোজনীয় বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে।

বাঞ্ছারামের নিজের উক্তি।

"আজি কালি আমি কেমন চমৎকার বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি। সে কথা কাহাকে শুনাইয়া স্থির হইব? আগে আমার কাহারও সঙ্গে বনিবনাও হইত না, কিন্তু এত দিনের পর এখন আর আমার লোকের সঙ্গে মনান্তর হয় না, মত বৈপরীত্ব ঘটে না; যাহারা শত্রু ছিল তাহারা সানুকূল হইয়াছে, সকলের সঙ্গে এখন হাসি খুসিতে আমার দিন যায়,—বল দেখি, এ আনন্দের কথা কাহাকে শুনাইয়া সুখী হইব!

"আগে আমার কেমন একটা রোগ ছিল;—আগে আমি লোকের কাপট্য, ভণ্ডাচার, দুর্নীতি বা তথাবিধ বিষয় দেখিলে, বড়ই অসহনীয় বোধ করিতাম এবং বলিতে কি, একেবারেই সহ্য করিতে পারিতাম না; তাহার উপর টিপ্‌নী কাটিতাম,লোকে চটিত,এবং আমিও হয়ত একেবারে সে লোকের দিক দিয়া হাটিতাম না। ইহাতে দেখিলাম ক্রমে ফল এই হইল যে, একে একে সকলের সঙ্গে আমার ঘোর মনান্তর উপস্থিত হইল;—সকলের সঙ্গেই, যেহেতু ঠক বাছিতে গ্রাম উজুড়। ক্রমে আমি একা হইয়া পড়িলাম; আমিই একঘরে হই, আর সবাই দশ ঘরে থাকে। মহাবিপদ! আমিও একা থাকিতে পারি না; একা হইয়া মানুষ কয় দিন কাটাইতে পারে, নিঃসন্দেহ দুদিনেতে পেট ফাঁপিয়া উঠে। এ সকলের জন্ত এবং অসতের সংস্রব ভয়ে, সকল ছাড়িয়া সে কালের মত বনেও যাইতে পারি না। এরূপ বিড়ম্বনাস্থলে বনে যাওয়াকে যে যত প্রসংশাবাদ করিতে হয় করুক, আমি কিন্তু বনে যাওয়াকে দুর্ব্বল মনের কাজ বলিয়া গণি। ভয়ের কারণ দেখিয়া দূরে পলায়ন দুর্ব্বল ও ভীরু লোকের কাজ; সবল ও সাহসী যে সে ভয়ের কারণ দেখিয়া দূরে পলায় না; সেইখানেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বা ভয়াবৃত হইয়াও, অবিচলিত

ভাবে ভয়ের নিরাকরণ করিয়া থাকে। যাহাহউক, আমার এ একঘরে হওয়ায় আমার কার্য্যক্ষেত্রও দেখিলাম ক্রমে সংক্ষেপ হইয়া আসিতে লাগিল; সেও ত বড় ভাল কথা নহে! কার্য্যক্ষেত্র সংক্ষেপ হইলে ও কার্য্য কমিলে তবে থাকিব কি লইয়া? মহাবিপদ! আমার বিশ্বাস, অনেক পূর্ব্ব পূর্ব্ব সদভিপ্রায়শালী মানবও এরূপ বিপদে যে না ঠেকিয়াছিলেন এমন নহে।

"যাহাইহউক, আমি বিষম ভাবনা ও বিষম সমস্যায় পড়িলাম। শেষে অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে, এ পৃথিবীতে সত্যযুগ আসিতে অনেক বিলম্ব, অভাবে ত্রেতা অথবা অভাবে দ্বাপর যদি খুঁজিতে যাই, তবে তাহার বিলম্বও তদ্রূপ অধিক। এ কলি, ঘোর কলি, এখনও অনেক দিন ইহার সময়; সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কলিরই স্মরণাপন্ন ভিন্ন এখন উপায়ান্তর নাই। এ ঘোর কলিতে, এ পুরা শয়তানের রাজত্বে, শয়তানী ছাড়া আর কোন জিনিষের খোঁজ বাহির হইলে, কেবল লাঞ্ছনা ভোগ মাত্র সার হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া এখন হইতে আর এক প্রকারের বন্দোবস্তে মন দিলাম;— এখন হইতে আর কাহারও কিছুতে দোষ দেখিতে পাই না, কাহার কোন কথায় দোষ ধরি না, বা নিজেরই অজ্ঞতা স্বীকার করি। সকলের সকল কথাতেই সায় দিই, এবং সকল আমোদেই আমোদিত হই। এই বন্দোবস্ত!— এদিকেও অমনি দেখিতে দেখিতে আগেকার তাবত বিষয়ের ভাব-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে আবার আমি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম; যাহারা আগে আমার উপর বিরূপ ছিল, তাহারা আমার উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। আমিও এখন হইতে আর ভ্রমেও কোন কথা কাহার রুচি বা মতিগতির বিপরীতে বলি না। যদি বলি, সেও বিদ্রূপ ও আমোদের স্থলে। কিন্তু একটি তামাসা দেখিলাম যে, সেই আমোদ ও বিদ্রূপের কথা কয়টিতে যেরূপ কাজ করিতে পারে, সমস্ত নীতিশাস্ত্রের নির্দ্দয় তাড়না যদি একত্র হয়, তবু তাহার বহুলাংশের একাংশও করিয়া তুলিতে পারে না। পুনশ্চ, আগে যাহারা আমার গম্ভীর মুখ দেখিলেই চটিয়া যাইত, এখন তাহারাই আবার সুধু আমার গম্ভীর মুখ দেখে না, গম্ভীর মুখের কথাও দুই একটা শুনে, এবং দেখিতেছি সে কথায় কাজও কিছু কিছু না হইয়া আসিতেছে এমন নহে।

"তাহার পর, আমি অকর্ম্মা ও আলস্য পরায়ণ লোক আদৌ দেখিতে পারি না; তাহাদের দেখিলে আমার যত রাগ হয়, তত রাগ আমার আর কিছুতেই হয় না। এজন্য আমার ভৃত্যগণকেও তাড়না করা আমার এক প্রকার রোগের স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। অকর্ম্মা বাঙ্গালির ছেলে চাকর; সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাহাদের অকর্ম্মাগিরী ও আলস্যের অভাব ছিল না, আমারও কাজেই তেমনি তাড়না করারও ফাঁক ছিল না। শেষে ফল এই ঘটিল আমি আর চাকর পাই না; কিন্তু যে যে চাকর আমার নিকট হইতে যায়, তাহারা স্বচ্ছন্দে অন্যত্র চাকুরী পায়। চাকরদের কিছুই ক্ষতি হইল না, কিন্তু আমার ক্ষতি যথেষ্ট হইল, শেষে দুর্ণামও হইয়া উঠিল যে আমি বড় বদ্ মেজাজী লোক। দেখিলাম এ ভাল কথা নহে; তাহার পর, আমারই বা চাকর না হইলে চলে কদিন? শেষে মেজাজ পরিবর্ত্তন করিয়া ভালমানুষ হইলাম এবং ভাবিলাম. ভালমানুষীর দ্বার দিয়াই চাকরগুলাকে দুরস্ত ও কর্ম্মশীল করিয়া লইব। ফলে কিঞ্চিৎ সফল হইয়াছি কি? বোধ হয় হইয়াছি।

"তদনন্তর বিদ্বানগণের সঙ্গে মত বিনিময়। এ বড় কঠিন ঠাঁই ও বড়ই কঠিন ব্যাপার। একটা কথা কাহাকে বলিতে গেলে, কেহই তাহা শুনিয়া কিছুমাত্র চিন্তা করে না। সকলেরই বুদ্ধি, বিদ্যা, চিন্তা, মতামত ও তর্কঅস্ত্র, করাঙ্গুলীর অগ্রভাগে। এমন অবস্থায়, কোন কথা কোথাও বলিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আরও এক কথা, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিকৃত বিষয় লইয়া, দোষাদোষ বলিতে যাওয়া, তাহাতেও নানা অসুখ ও তাহাও মনান্তরের কারণ হইয়া উঠে। আবার এক তামাসা এই. দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তৃতীয় কোন একব্যক্তির বিষয়ে কথা হউক এবং সে কথায়, কথা পড়িলে, অবশ্যই দোষও বলা যায়, গুণও বলা যায়; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে সে কথার পরিচয় দিবে, তখন আমি যে গুণের কথাগুলি বলিয়াছি তাহা একটাও বলে না, কিন্তু দোষের কথাগুলি সমস্তই পরিচয় দেয়, এবং কেবল পরিচয় নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অলঙ্কারেরও যোজনা করিয়া থাকে। ইহাতে অবশেষে ফল এই হয় যে, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দারুণ মনান্তর ঘটিয়া যায়। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ও এ সকলে অসুখ ভোগিয়া, এখন ধরিয়াছি সকলেই ভাল এবং সকলেরই সকল ভাল।

ফলও ইহাতে অনেক ফলিয়াছে, কারণ এখন আর কাহারও সঙ্গে কোন মনান্তর হয় না, ও সকলের সঙ্গেই হাসি খুসিতে চলিয়া যায়। মত ব্যাখ্যা ও তর্কও আর কাহার সঙ্গে করি না। কারণ আমি যে দৃষ্টিতে বিশ্ব দর্শন করি, সকলে সে দৃষ্টিতে এবং অধিকাংশ কোন দৃষ্টিতেই করে না। অথবা আমার দর্শন প্রকরণ বুঝাইয়া তাহার পর কাহাকে আমার মতে আনিতে যাওয়া, তাহাও কিছু এক ঘণ্টায় ঘটিয়া উঠে না; আরও এক কথা, বুড়া বানরকে নাচন শেখান সহজ কথা নহে। এমন স্থলে সাধারণত কোন কথায় কোন তর্ক না করিয়া, তর্কস্থলে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। এখন আমি এই সকল জীবন-ঘটনায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি যে, কি জন্য জিয়ান পাউল রিস্তার সকলের সকল কথাতেই হাঁ দিয়া যাইতেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত পক্ষে একজনকে আর একজনের কথার বশে আনিতে গেলে, সুমিলন ভাব প্রধান সহায়; বিবাদী তর্ক সে পক্ষে সহায়তা করাদূরে থাকুক, বিষম বিপরীতাচরণই করিয়া থাকে।"

বাঞ্ছারামের জীবনের এই ঘটনাগুলি দর্শনে, আমার দুইটি সহজ জ্ঞান হৃদয়ে উপলব্ধি হইয়াছে। একটি সংস্কারকদের সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টি সাধারণের সম্বন্ধে। সংস্কারকদের সম্বন্ধে যাহা, তাহা আগে বলি। যে সকল সংস্কারক সংস্কার গরমে এবং মনের আবেগে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া সামাজিক সরহদ্দের বাহিরে গিয়া নির্লিপ্তবৎ সট্কাইয়া পড়েন; এবং তাহার পর ঝাঁঝাল উপদেশক অথবা প্রকৃতপক্ষে নিন্দুকের মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ডাল ছাড়া বানরবৎ দলছাড়া হইয়া অতি অল্পই কার্য্যসিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন; যেহেতু বিদলস্থ হইবায় সবাই তাহার উপর ঘৃণা বর্ষণ করিয়া থাকে, কেহই তাহার কথায় কাণ দেয় না। এরূপে ইহারা ছুকুলগতে, দুর্গন্ধময় এক অদ্ভুত জীবের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এরূপ সংস্কারকদের ইচ্ছা যদিও শয়তানী হাট হইতে তফাত হওয়া, কিন্তু কার্য্যত তফাত না হইয়া আরও জড়াইয়া পড়িয়া থাকে। মানবে বিশেষ দেবত্ব চিহ্ন কিছু প্রকটিত না থাকিলে, দলছাড়া লোকের কথা লোকে প্রায়ই কাণে করে না; অনেক সময়ে দলছাড়া দেবতার কথাও লোকে কাণে করেন; সুতরাং সেরূপ সংস্কারকের উপদেশে

কোনই ফল হয় না, লাভের মধ্যে সংস্কারককে নিজে একঘরেও ছন্নছাড়া হইতে হয়। লোকে সাধারণত শুনে তাহার কথা, যে আমাদের সঙ্গে সমসুখদুঃখভাগী, বন্ধু, অথচ বিজ্ঞতায় যে স্পষ্টত গুরুস্থানীয়; যে আমাদের দুঃখসঙ্কুল অবস্থা হইতে শুষ্ক সংস্কারকের ন্যায় দূরে পলায়ন করা দূরে থাকুক, বরং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা আরও অধিক—আমাদের আগে আগে দুঃখ ঠেলিয়া যাইতেছে এবং কিরূপে সে দুঃখ ও অমঙ্গল রাশি ঠেলিতে হয়, তাহারও পথ হাতে কলমে দেখাইয়া দিতেছে। তাহার সঙ্গ ও তাহার কথায়, সাহানুভূতি ও ভক্তিও লোকের অপরিসীম; সুতরাং সেরূপ লোকের দ্বারা সংস্কারকার্য্যও অপরিমিতরূপে সাধিত হয়। বাহিরে দাঁড়াইয়া উপদেশ দেওয়া, আর সাঁতারে অনভিজ্ঞ জলমগ্নকে 'তোমার পূর্ব্ব পুরুষ অতি ইতর, তুমি অতি ইতর অশিক্ষিত ও অতি বোকা, সাঁতার কাট উদ্ধার হইবে' বলা দুইই সমান; কেবল কট্‌কটে অশ্রাব্য বচনের পসরা মাত্র। সে বচনের পসরা লোকের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়া বিরাগ মাত্র আকর্ষণ করিয়া থাকে। আরও দেখ পর অতিক্রমেই 'অসতের নাশ; কিন্তু যদি সট্‌কাইয়া বাহিরেই পড়িলাম, তবে অতিক্রম আর করা হইল কোথায়? অতিক্রমের অর্থ যে কোন বিষয়ের ভিতর দিয়া তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হওয়া। ফলতঃ আমার সমাজ দৃষ্টি যতটা আছে, তাহাতে আমি দেখিতেছি যে সট্‌কা সভ্য ও সট্‌কা সংস্কারককে লোকে অবিকল সেইরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে, যেরূপ চক্ষে এসপের গল্পের সাধারণ শৃগালবর্গ লেজকাটা শৃগালের প্রতি দেখিয়াছিল। সমাজে এরূপ সট্‌কা লেজকাটা শৃগালের দল যত কম হয় ততই মঙ্গল।

সাধরণ সম্বন্ধে, সাধরণের সহ মিলে মিশে মিষ্টকথায় ও প্রকারান্তরে যে ব্যবহার ও উপদেশ, অন্যান্য চটা ও সট্‌কা গুরু গম্ভীর ব্যবহার ও উপদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইহাও জানিও, সমাজস্থলীতে সকল সময়েতেই সে নিয়ম খাটাইলে চলে না; তবে ইহাও বলি, সেরূপ অখাটনস্থলেও, সট্‌কা সংস্কারকদের আবশ্যক হয় না; ইহারা দুয়ের বাহির। এখানে যাহা আবশ্যক হয়, তাহা ক্ষমতার সমাবেশ, * ক্ষম-

* দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পারেগুয়া সাধারণতন্ত্র রাজ্যে ডাক্তর ফ্রান্সিয়া (Dr: Francia) সাধারণতন্ত্র সমিতির চিরন্তন সভাপতি ছিলেন। সে সময়ে পারেগুয়ার অতি হীন অবস্থা;

তার তাড়না। দেশ কাল পাত্র অনুসারে, কখনও কখনও ডাক্তার ফ্রান্সিয়ার নিয়োজিত ফাঁসিকাট প্রদক্ষিণ করান, অথবা আরও গুরুতর, ফাঁসিকাঠে লট্‌কানরও আবশ্যক হওয়া উচিত। আমার বোধহয়, এ আলস্য ও অকর্ম্ম পরায়ণ দেশে, যদি তেমন কঠোর ও অনুকূল ক্ষমতার আস্তিত্ব কিছু থাকিত, তাহা হইলে অনেকটা উপকারের সম্ভাবনা ছিল। আসল কথা কি, কি মিষ্ট কি মন্দ যে কোন উপায়ে, যখন যাহা প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্দারা মানুষের ভূত ঝাড়ান কর্ত্তব্য। এখানেও আবার বলি, যেমন ও যে জাতীয় ভূত তেমন ও সেই জাতীয় ওঝা হওয়া চাই; তাহা না হইলে ঝাড়ানকে ভূত গ্রাহ্য করে না। আমি দেখিয়াছি, একবার এক মুসলমান ওঝা হিন্দুর ভূত ঝাড়াইতে অক্ষম হইয়া, হিন্দু ওঝা আনিতে উপদেশ দিয়াছিল। স্কট জাতীয় মহালেখক কার্লাইল কিছু যথেচ্ছাচার রাজশাসনের গোঁড়া, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না যে উহা কি জন্য, কিন্তু তাহা কেবল এই অর্থে। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে রাজতন্ত্র শাসন না থাকিলে, মনুষ্য সমাজ একালে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত কি না তাহা সন্দেহ স্থল।

সভ্যতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাণিজ্য ব্যবসায়, যে দিকে দেখা যাউক, সকল দিকেই পারেগুয়া একটি নগণিত রাজ্য ছিল। সাধারণতন্ত্রের সভ্যগণও অনুরূপ মূর্খ এবং অকর্ম্মা ছিল। সুতরাং এই সময়ে, অসাধারণ বুদ্ধি ও শক্তিসম্পন্ন ফ্রান্সিয়া, রাজ্যের একমাত্র অন্তরাত্মা স্বরূপে, এই রাজ্যকে যদৃচ্ছা পরিচালন করিয়াছিল। ইহারই প্রসাদাৎ কালে পারেগুয়া একটি গণনীয় রাজ্যের পদবীতে উত্থিত হয়; কিন্তু ইহার শাসন বড় কঠোর ছিল, কিন্তু ইহাও বলি যে সে কঠোরতা কেবল অকর্ম্মা ও আলস্য পরায়ণ লোক সম্বন্ধে। ইহার রাজত্বকালে সর্ব্বদা একটি ফাঁশিকাষ্ঠ টাঙান থাকিত; প্রথম দুই একবারে কেহ কোন অভীষ্ট কার্য্যে অপারক হইলে বা তাহা যথোচিত ভাবে সুসম্পাদন না করিলে, তাহাকে সতর্ক করণ স্বরূপ এই ফাঁশি কাঠ প্রদক্ষিণ করাইয়া লেওয়া হইত। এরূপ বারম্বার সতর্কের পরও যদি কাহার অকর্ম্মাগিরী না সুধরাইত, তবে তাহাকে আরও গুরুতর শাস্তি; অথবা তেমন তেমন গুরুতর ত্রুটিস্থলে এই ফাঁশিকাঠে ঝুলানও হইত। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে পারেগুয়ার অনেক আলস্য পরায়ণ ভাব সংশোধন হইয়া যায়; এবং যে সকল দ্রব্যের জন্য আগে পারেগুয়াকে অন্যদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হইত, ফ্রান্সিয়ার শাসনকাল হইতে নিজ পারেগুয়াতেই তাহা অত্যুৎকৃষ্ট ও অপর্য্যাপ্ত ভাবে উৎপন্ন হইতে থাকে; এবং অধিবাসীগণও সাবেক অর্দ্ধবন্য অবস্থা হইতে প্রচুর সভ্যতাশ্রীসম্পন্ন হয়। ফ্রান্সিয়ার ফাঁশিকাঠ প্রদক্ষিণের কল্যাণে, এক অকর্ম্মা চাষার শেষে পারেগুয়া রাজ্যের চাষাব জেনারল পদে উঠিয়া প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বলিতে কি, বড় ইচ্ছা করে যে বচনপসারী বাক্যসর্ব্বস্ব অকর্ম্মার বাদ্‌সা বঙ্গসন্তানকে এক একবার সেই ফ্রান্সিয়ার ফাঁশিকাঠ ঘুরাইয়া আনি! ইতি—রাহারাম।

অবশেষে বাঞ্ছারাম আমাকে বলিতেছে যে, "আমি উপরে যে কথাগুলি বলিয়াছি, তাহা খাঁটি আমার জীবন-ঘটনা হইতে, তাহার ভিতর অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত কিছুই নাই। অতএব তাহা অধ্যয়ন ও অনুধাবন করিলে ফল আছে।" পূর্ব্বতন কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, যেমনই মানুষ হউক না কেন, এমন কি সে যদি উন্মাদও হয়, তথাপি তাহার জীবন ঘটনাগুলি যথাসত্য বিবৃত করিতে পারিলে, তাহার পাঠ ও অধ্যয়নে মানবের অসীম উপকারের সম্ভাবনা আছে। ঠিক কথা, তাহাতে ভুল নাই।

১৫। আমোদপ্রমোদ।

আমোদপ্রমোদ, বিশেষত মন খুলিয়া ও মনেরবেগ ছাড়িয়া যে আমোদ প্রমোদ, তাহা বড় ঘৃণার বিষয়, বড় উপহাস ও বড় অবহেলারস্থল,—ইহাই এখন আমাদের এই ছন্ন সমাজে একরূপ সর্ব্বজনীন্ ধারণা। এ ধারণায় আবার ষোল আনার উপর আঠার আনা ধারণা পাঁড়াগায়ের সহুরে বা খুঁট আঁথুরে ইংরাজীনবিশ বাবুর, স্কুল মাষ্টার বাবুর এবং আঠার আনার উপরেও আবার পাঁচশিকা ধারণা তোমার গিয়া সেই সুরুচি সম্পন্ন ও সভ্যতম ভঙ্গিমা-কিশোর ব্রাহ্ম বাবুর; হয় না হয়, তাহাদের মুখের দিকে একবার তাকাইলেই, সত্য কি মিথ্যা তাহা বুঝিতে পারিবে। আমোদপ্রমোদ ছেলেমী, তাহাতে মন তরল হয়, রুচি বিগড়াইয়া যায়, গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় এবং ভার কমিয়া গিয়া থাকে। তাই বলিয়াই কি এখন দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে স্থৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যে সুতরাং আমোদপ্রমোদশূন্যতায়, ছেলেও বৃদ্ধ; যুবাও বৃদ্ধ; এবং বৃদ্ধও বৃদ্ধ! সকলেই নিরানন্দ, স্ফূর্ত্তির চিহ্ন কাহারও মুখে নাই; সে পক্ষে শরীর ও শিরা চালনে যে যতটা বিরত হইতে পারে, সেই আপনাকে ততটা সভ্য ও নিজেকে ততটা দশের উপরে মনে করিয়া থাকে। অবশ্য অধুনাতন দেশব্যাপী ঘোরতর অন্নচিন্তাটা সে সাধারণ নিরানন্দের পক্ষে একটা প্রধান কারণ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কারণের উপরেও আবার বিষম কারণ স্বরূপে জুটিয়া, দারুণ আকুলিত করিতেছে তোমার সেই স্কুলপণ্ডিতী এবং ব্রাহ্মসভ্যতা ও সুরুচি। এ কথায় এমন বুঝাই-

ভেছে না যে, সত্য সত্যই দেশশুদ্ধ ব্রাহ্ম মতস্থ হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে; সে পক্ষে সৌভাগ্যক্রমে অনেকেই বিরূপ। তবে কি না নিরানন্দটা এরূপ প্রকারের যে, তাহাকে 'ব্রাহ্ম' শব্দ ভিন্ন অন্ত উপযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিবার নিমিত্ত আর শব্দ খুজিয়া পাই না; তাই 'ব্রাহ্ম' বিশেষ-ণের প্রয়োগ। ব্রাহ্মরা অবশ্যই তজ্জন্ত লেখককে অনেক আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাত্রীয়, স্কুলপণ্ডিতী এবং ব্রাহ্ম, এ সকল প্রায় একই ভাববোধক শব্দ; এ জন্য স্কুলপণ্ডিতী শব্দ ব্যবহার করার জন্য আর স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না।

এখন হারাণ সুতার খেঁই ফিরিয়া গ্রহণ করা যাউক। বলিতে কি, লোক-সমাজে কেমন একটা কুমতি আসিয়া জুটিয়াছে যে, তাহারা এই অপ্রার্থনীয় নিরানন্দ লোকমূর্ত্তি দেখিলেই যেন পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; ভাবে, হাঁ লোকগুলি এখন সত্য সত্যই একটু সভ্য হইয়া আসিতেছে, রুচি ফিরিয়াছে;—বলা বাহুল্য যে অবশ্যই সে সুরুচি। 'সুরুচি' এবং 'কুরুচি' এ দুই এ যুগের নূতন সৃষ্টি; সেকালের সেই সোণারকাটি এবং রূপার কাটির মত কতকটা,—যাহার এক কাটিতে মরিত, আর কাটিতে বাঁচিত। একালেও এমন কতকলোক আছে, যাহারা ঐ দুয়ের এক রুচিতে মরে, আর রুচিতে বাঁচে। ইহা স্বতঃ সিদ্ধ সত্য, যে যাহার বেশী বড়াই করে সেটা তাহার নাই; যে বেশী মরিতে চাহে, বাঁচিতে তাহার বড়ই সাধ; যে বেশী সুরুচির চিৎকার করে, কুরুচিনরক তাহার মনে সর্ব্বদাই জাজ্জ্বল্যমান; কিন্তু হইলে কি হয়, আপাতত কুরুচি চিৎকারে পাড়ার লোকের ঘুমান দায়। বলিতে কি, এই 'সুরুচি'—'কুরুচি' চিৎকারে আজি কালি বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। এ বৃদ্ধ হিন্দুসমাজ, কুরুচি অবলম্বী হইলেও, সকল জাতি ও সমাজ গত হইয়াছে তথাপি যখন গত না হইয়া যুগারম্ভ হইতে এখনও জীবিত আছে এবং তোমার ন্যায় সুরুচি সম্পন্ন মহাপুরুষকেও যখন জন্ম দিতে পারি-য়াছে; তখন বলি কি বলি একটু থাক, আর কাজ নাই, তোমার সে 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' রুচির ফাঁকরে ফেলিয়া মিছামিছি বৃদ্ধকে আর জ্বালাতন করিও না।

সুরুচি-কুরুচির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া যে সুরুচি শিখাইতে আইসে, সেত মাথার মনি শিরোধার্য্য! কিন্তু তাহা কোথায়? এই সুরুচি-যণ্ডেরা যদি আমোদার্থে এক পয়সা ব্যায় করিতে দেখে, অমনি চিৎকার করিয়া উঠে—'দেখচ দেখচ, কুরুচির প্রাবল্যে দেশ উৎসন্ন গেল, এ পয়সাটা একটা সদভিপ্রায়ে ব্যায় করিলে দেশের কতটা মঙ্গল হইত?' যে ছেলেটা এখন জড়ভরত জুজু হইয়া বসিয়া থাকে, সে বাপ মা এবং দশজনেরও বড় প্রিয় পাত্র—ছেলেটি কেমন শিষ্ট শান্ত! যুবা জুজু হইলে তাহার সুখ্যাতি তুফানের ত আর কথাই নাই। হ্যাদে এই গরুর রাখালেরা,—আগে আগে ইহারা ঘাটে মাঠে কত কত দাণ্ডাগুলি প্রভৃতি খেলা খেলিত; মেঠো গাণ, ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, কত আমোদে ফিরিত; কিন্তু এখন ভদ্রের অনুকরণে ভদ্র হইতে গিয়া তাহারাও আর খেলেনা; গরুর রাখালেরা পর্য্যন্ত সুরুচিবানও সভ্য হইয়া উঠিল! বোধ করি সুরুচি-সিপাহিদিগের আকাঙ্ক্ষিত দেশ উদ্ধারের পক্ষে, আর বড় একটা অধিক বিলম্ব নাই।

কিন্তু আমি দেখিতেছি, এই নিরানন্দ, এই স্ফূর্ত্তিবিহিনতা ভাব, এই সুরুচি সম্পন্ন ভাব, ইহারা কি সভ্যতা কি দেশোদ্ধার, ইহার কিছুরই চিহ্ন নহে; ইহা প্রকৃতপক্ষে যাহার চিহ্ন সে অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ। দুরন্ত সর্ব্বহর কৃতান্তের ছায়া যে লোক সমাজকে আপন ক্রোড়ে পাতিত ও আবরিত করিতে বসিয়াছে, ইহা তাহারই চিহ্ন; ইহা ধ্বংসাবর্ত্তের তরঙ্গলীলা মাত্র। সবল জাতির সংঘর্ষে দুর্ব্বল জাতির যে পরিণাম হইয়া থাকে, ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা। একেই লোকে কাল মাহাত্ম্যে অন্নচিন্তায় ও আত্মহীনতা বোধে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে; তাহার উপরেও আবার, তুমি সুরুচি সম্পন্ন সভ্য বাবু, তুমি তোমার সভ্যতা ও রুচি ঘোষণায় সে নিরানন্দ ভাবের বৃদ্ধি করিয়া ধ্বংসাবর্ত্তকে ত্বরিতগতি করাইতে যাও কেন? এখন তোমায় মিনতি-বাপু সুসভ্য দেশের-মঙ্গল-প্রার্থি, তুমি একটু স্থির থাকিতে পার? তোমার সুরুচির জাল একটু গুটাইয়া লও। লোককে মন খুলিয়া, প্রাণ খুলিয়া, যে যেরূপে চাহে, তাহাকে সেরূপে আমোদ প্রমোদ করিতে দেও; হয়ত সে আমোদ প্রমোদ সূত্রে রুগ্নমনে স্বাস্থ্যভাব আবার ফিরিয়া আসিতে পারে, আবার হয়ত লোকে মনুষ্যগতিকে যাইতে পারে। আমোদ প্রমোদ সূত্রে মানসিক

স্বাস্থ্যের প্রত্যাবর্ত্তন ধ্রুবতত্ত্ব। কেবল এই পর্য্যন্ত দেখিও ও নজর রাখিও যে, সে আমোদ প্রমোদ শরীর পক্ষে অসাস্থ্যকর না হয় এবং আমোদই জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া না পড়ে।

খোলা আমোদ, অর্থাৎ মন খুলিয়া আমোদ প্রমোদ, স্বাস্থ্য সম্পন্ন মনের চিহ্ন। মন আসাস্থ্যযুক্ত থাকিলেও, উক্তরূপ খোলা আমোদের সংলগ্নে আসিলে, সাস্থ্য সম্পন্ন হয়। দেখ খোলা আমোদের কল্যাণে দুই এক পুরুষ আগেকার লোক কেমন সাস্থ্য সম্পন্ন ও সুস্থমনা ছিল; যদিও তাহাদের জ্ঞান সীমা সঙ্কীর্ণ ছিল বটে, তথাপি তাহারা সুখী ছিল, সবল ছিল। আর এখন তদভাবে? দাড়ি চসমাধারী বেগুণ গাছে আংসী দেওয়া ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ক্ষুদ্র মন 'ফিলসফার' বর্গে কি পদার্থ আছে, বল দেখি? বল গিয়াছে, বচন হইয়াছে; গম্ভীরতা গিয়াছে, বাচালতা বাড়িয়াছে। তাই বলি, সুরুচি কুরুচি যৎযুক্তে হউক, মানুষকে মন খুলিয়া আমোদে মাতিতে দেও; কুরুচির হেঁপা তুলিয়া আদত জিনিসটার ধ্বংস করিও না। সোণার অলঙ্কারে ময়লা জমিয়াছে বলিয়া, অলঙ্কার পরিত্যাগ করা নির্ব্বোধের কাজ। তৎ পরিবর্ত্তে পার যদি, মনে পরিচ্ছিন্নতা বুদ্ধির উদয় করিয়া দেও, যদ্বারা অলঙ্কারের ময়লা কাটিয়া উজ্জ্বলতা হইতে পারে। কেবল ময়লা ময়লা বলিয়া চিৎকার, এবং অলঙ্কার ময়লা হইয়াছে বলিয়া তাহা ত্যাগ করার জন্য তাড়না করা কি ভাল। কিন্তু আমার আর একটা সন্দেহ,আমার বোধ হইতেছে তুমি অলঙ্কারের মর্ম্মেই আদৌ অনভিজ্ঞ। পূর্ব্বকার লোকের মনে যতটা আমোদ আহ্লাদ ও তদ্ধেতু স্ফূর্ত্তি বিরাজ করিত, এখনকার লোকের মনে স্বভাবতই আর ততটা হইবে না। আগেকার লোকে, জ্ঞানসঙ্কীর্ণতা হেতু, প্রবলের সংঘর্ষে যে আত্মহীনতা তাহা ততটা অনুভব করিতে পারিত না, সুতরাং মন তত দূষিত হইতে পারে নাই; অন্নচিন্তাও তাহাদের এখনকার মত এমন প্রবল ছিল না। এখন সকলই তাহার বিপরীত;—অন্নচিন্তা ঘোরতর, আত্মহীনতা বোধ পদে পদে! তাই বলি, একেইত বিধাত মারিতেছেন; সভ্যবাবু, তুমি আবার অধিকন্তু মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা লাগাও কেন?

চেতনাময় মানবজীবনে অচেতনাবস্থা নিদ্রার যেরূপ আবশ্যকতা; কর্ম্মময় মানবজীবনে কর্ম্মশ্রান্ত আমোদ আহ্লাদেরও সেইরূপ আবশ্যকতা জানিও।

নিদ্রার অভাবে যেমন চৈতন্যজীবন অবসন্ন হইয়া থাকে ; আমোদ অভাবেও কর্ম্ম-জীবন অবিকল সেইরূপ অবসন্ন হয়। মানবজীবনে কর্ম্মাবেশ এবং আমোদ প্রমোদ উভয়েরই সমান আবশ্যকতা। তবে পরিমাণ আছে। আট প্রহরের মধ্যে যেমন দুই প্রহর মাত্র নিদ্রা হইলে, চৈতন্যজীবন নূতনত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আমোদ প্রমোদও, সেইরূপ বহুব্যপী সময়ের জন্য চাই না, ক্ষণেকের জন্য অবলম্বিত হইলেই কর্ম্মজীবন নূতনত্ব ভাব প্রাপ্ত হয়। আমোদ প্রমোদ পরিমিতের অতিরিক্ত হইলেই দূষ্য হয় ; অধিকন্তু হইলে, জগতের সৎ অসৎ, ভাল মন্দ তাবত বিষয়ই দূষ্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকে।

আর আর তাবত বিষয়ের ন্যায়, আমোদ প্রমোদেরও উন্নত অবনত, উৎকর্ষ অপকর্ষ, সুরুচি সম্পন্ন বা কুরুচি সম্পন্ন,সরল বা জটিলতা ভাব আছে, যাহা আমোদে রত ব্যক্তিগণের চিত্তের উন্নতাবনত আদি অবস্থা অনুসারে প্রযুক্ত এবং উপকারী হইতে পারে ;—যাহাকে, আমোদরত ব্যক্তি, নিজের স্বীয় প্রকৃতিসহ সামঞ্জস্যযুক্ত বিধায়, স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে। যে চিত্ত যখন যেরূপ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট, তখন তাহার কর্ম্মাবেশ এবং আমোদ প্রমোদও, তদনুসারে প্রকার এবং পরিমাণ প্রাপ্ত হয়। এমন স্থলে যে চিত্ত যেমন, যদি তাহাকে তাহাপেক্ষা কোনরূপ অপর বিধ, অথবা কোন কূট ও বহ্বা-ড়ম্বর উপায় সম্ভূত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত করা যায় ; তাহা হইলে সে চিত্ত সেখানে এ আমোদ আমার,আমি ইহাতে লিপ্ত ও ইহার পূর্ণ অংশভাগী বলিয়া কখনই আপনাকে বিবেচনা করিতে পারিবে না ও সুতরাং যথার্থরূপে কখনই তাহাতে আমোদিত হইবে না। এরূপ আমোদস্থলে সে মোহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে মোহিত হওয়া স্বজাত আমোদ-মোহ নহে , এ মোহিত হওয়া অদ্ভুত-স্তম্ভিত হওয়া মাত্র ; সুতরাং আমোদের উদ্দেশ্যভূত ফলও ইহাতে কখনও হয় না। পুনশ্চ, সেরূপ আমোদে যতই তাহার চিত্ত আকর্ষিত হউক না কেন, তথাপি সে আমোদ প্রমোদ তাহার নিকট "কেমন যেন "পরপর" বলিয়া বোধ হয়। চিত্ত সখা ভাবে সে আমোদ প্রমোদকে দর্শন ও গ্রহণ করিতে পারে না। সে যথার্থ আমোদিত হইবে ও আমোদকে সখা ভাবে গ্রহণ করিবে তখন,যখন কোন আমোদ তাহার সমান ওজনের ধারণা ও শক্তি ও উপায় হইতে

উদ্ভব হইয়া থাকে। ফলত আমাদের নিজের অথবা আমাদের সমশ্রেণীর শক্তি হইতে যে আমোদের উৎপত্তি, তাহাতেই আমরা যথার্থ আমোদিত হই; আমাদের অপেক্ষা উন্নত শক্তির সৃষ্ট আমোদ যাহা, তাহাতে কেবল মোহিত ও স্তম্ভিত হই; এবং নিকৃষ্ট শক্তির সৃষ্ট যে আমোদ, তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করি না অথবা তাহাকে কেবল উপহাস করিয়া থাকি মাত্র। আমি দেখিয়াছি, দাঁড়াগুলি খেলিয়া একজন চাষার মনে যতটা স্ফূর্ত্তি ও সজীবত্ব আইসে; নাট্যালয়ের রং তামাসা দেখিয়া তাহা তাহার হয় না, বরং তাহার বেকুবের ন্যায় স্তম্ভিত ভাব দৃষ্ট হয়। মানবকে, ঘটনাচক্রের গতিবশে, আমোদের উক্ত ত্রিবিধ মূর্ত্তিই প্রায় দেখিতে হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে নিজ বা নিজ সমানশক্তি সৃষ্ট যাহা, তাহাই মানবের প্রকৃত নিজ সম্পত্তি এবং তাহাই চিত্তের যথার্থ নূতনত্ব সম্পাদন করিতে পারে ও স্বাস্থ্য যাহা তাহাও তাহারই দ্বারা সম্পাদিত হয়। অপর যে দুইটি, তাহারা ক্ষণিক উপর চাপ ও আসবাবের স্বরূপ; উহা নিত্য ভাতভোজীর পক্ষে পোলাও কালিয়া বা ভাত অপেক্ষা নিকৃষ্টতর আহারীয়ের ন্যায়, স্বাদু বা তদন্যতর কিন্তু প্রকৃত পোষক কখনও নয়।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, আমোদও নিত্য এবং নৈমিত্তিক আছে। নিত্য শ্রমের পর, গতক্লম হইবার জন্য কিঞ্চিৎক্ষণ ধরিয়া বিরাম ও সেই সময়ে যাহা কিছু আমোদকর বিষয়ের সংঘটন হয়, তাহার উপভোগের নাম নিত্য আমোদ;—যতক্ষণে শ্রান্তিভাবের পূর্ণরূপে দূর না হয়, ততক্ষণ ইহার আবশ্যকতা। অপর নৈমিত্তিক আমোদ; বহু-দিন ধরিয়া কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিলে, মন কেমন যেন বিকৃত হইয়া উঠে ও খিজিয়া যায়। সেই দীর্ঘকালের শ্রমশীলতা হইতে উৎপাদিত বিকৃতি ভাব অপনয়নের জন্য, নৈমিত্তিক আমোদের প্রয়োজন। নৈমিত্তিক আমোদ কেবল শ্রমজনিত বিকৃতিকে নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; সাময়িক যে কেন উপসর্গ উপস্থিত থাকে, যেমন মহামারী আদি, তাহা হইতেও লোকের চিত্তকে বহুলাংশে অপসারিত করিয়া, চিত্ত ও শরীরকে সবল এবং তৎসূত্রে আসন্ন উপসর্গকে বহুলরূপে উপসম করিয়া থাকে। অতএব দেখ, নৈমিত্তিক আমোদ উপকারী নানা

প্রকারে; ইহার আরও একটি মহৎ গুণ এই যে, ইহা ছোট বড় সকলকে লইয়া ও সকলকে সমান মাতাইয়া ও সন্তুষ্ট করিয়া, সর্ব্বজনীনভাবে সম্পন্ন হয়। অতএব এমন উপকারী যে নৈমিত্তিক আমোদ, তাহার জন্য কাহাকে যথাশক্তি অর্থব্যায় করিতে দেখিলে, কুরুচি বা অপব্যায় বলিয়া চিৎকার করিও না। নৈমিত্তিক আমোদ বহ্বাড়ম্বর যুক্ত, সুতরাং তাহা অর্থব্যায় ভিন্ন সাধিত হইবে কেন? আমাদের দেশের বারোয়ারী প্রভৃতি এই নৈমিত্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

কেবল উৎসন্নমুখ দেশ ভিন্ন আর সকল দেশেই,—যে যতই সভ্য হউক না কেন, সকল দেশেই ব্যায়সাধ্য নৈমিত্তিক আমোদের তুফান বহিয়া থাকে। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে বারোয়ারী পূজা প্রভৃতি ও নানা পরব পার্ব্বণ প্রচুর পরিমাণে হইত এবং লোকও তাহার জন্য অনেক স্বচ্ছন্দে থাকিত; তদর্থে অর্থ ব্যায় করিতে লোকে কুণ্ঠিত হইত না। এখনকার সাধারণ লোকের সেরূপ ব্যায় করিবার অর্থও নাই, যেহেতু অনেকেরই আয় প্রায় স্থির ভাবে আছে কিন্তু খরচ যাহা তাহা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যাহা হউক, তথাপি যদিই বা কেহ একালে ব্যায় করিতে চাহে, অমনি কেহ বা তাহাতে সভ্যতা ঠমকে বিমুখ হইয়া বইসে, কেহ বা ধিক্কার দিতে থাকে এবং কেহবা 'এ টাকা সদ্ব্যায় করিলে কতটা দেশের মঙ্গল হইত' বলিয়া তিরস্কার করিতে আইসে। একেইত নিরন্নতায় ও নিরানন্দতায় আমোদ,স্বাস্থ্য,আয়ুঃ,সকলই আপনা হইতে হ্রাস হইয়া যাইতেছে; এখন আমি বলি এই যে তাহার উপরেও, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যদি আপনাপনি কিছু উজ্জ্বল হইতেই চেষ্টাবান হয়, তাহা হইলে তুমি কেন তাহাতে বিমুখ হইয়া, ধিক্কার করিয়া ও তিরস্কারের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সাধিয়া, সর্ব্বনাশকে শীঘ্র জুটাইয়া দিতে আইস। ইহা নিশ্চয় ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, যাহাদের আমোদ যত উচ্চতুফানময়ী, তাহারা তত অধিক শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন। যাহারা যত অধিক শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন, তাহারা তত অধিক কর্ম্মরত হইতে পারে।

এসংসারে জড় অজড় সকলেতেই নিত্য ও নৈমিত্তিক বিরাম

আছে। বিরামের আবশ্যকতা, উপযোগীতা ও কার্য্য এই যে, তাহা ক্ষয়িত শক্তি ও সামর্থ্যকে পুনঃ সংগ্রহ ও পুনর্জ্জীবিত করিয়া থাকে; বিরাম না থাকিলে শক্ত্যাদি ক্রমক্ষয়ে অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইত। বিরাম হেতুই সেরূপে বিনাশ পাইতে পায় না; প্রতি পদেই পুনঃ পূর্ণিত ও পুনঃ জীবিত হইয়া আবহমান কাল প্রবাহিত হইতে থাকে। স্বয়ং এ সৃষ্টিরও, খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়াদিতে নিত্য ও নৈমিত্তিক বিরাম আছে। জীবলীলায় এই নিত্য বিরাম নিদ্রা; নৈমিত্তিক বিরাম মৃত্যু। লোকে ভাবে মৃত্যু হইতেই মানব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঠিক উহার বিপরীত। মৃত্যু না থাকিলে মানবের জীবলীলা ধ্বংস হইত, কিন্তু মৃত্যু আছে বলিয়াই ধ্বংস না হইয়া আবহমান কাল প্রবাহিত হইতে পারে। মৃত্যু না থাকিলে, লোকে অচিরে জীবনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিত ও আপনার অস্তিত্বকে জড়তায় পরিণত করিত এবং জীবনাভিপ্রায় স্থলে অনস্তিত্বযুক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু মৃত্যু থাকাতেই. প্রতিকাল অন্তে নবীনতা প্রাপ্ত হইয়া নবশক্তির অনুরাগে এবং উৎসাহে, নবজীবলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া, জীবনাভিপ্রায়কে পরিপূরণ করিতে সমর্থ হয়। প্রমসংসারে সেই নিত্য এবং. নৈমিত্তিক বিরাম, নিত্য আমোদ ও নৈমিত্তিক আমোদ।

১৬। নাটকাভিনয়।

বাক্যে যাহা না হয়, দৃশ্যে তাহা হয়; উপদেশ শ্রবণে যাহা না হয়, দৃশ্য দর্শনে তাহা হয়। ব্যক্তি বিশেষকে কৌশলে লজ্জা দেওয়া, ধিক্কার দেওয়া বা দোষ বিশেষকে তিরস্কার করা বা লোক সকলকে আমোদ দেওয়া; অথবা ব্যক্তি বিশেষের হউক বা সমাজ বিশেষের হউক, কোন কলঙ্ক বিশেষকে দূরকরা, এ সকল নাটকের উদ্দেশ্য নহে। এ কথাগুলি বলা অধিকন্তু মাত্র, কিন্তু তথাপি বলিলাম; তাহার কারণ, এখনকার অনেক লোকেই নাটক অর্থে তাহাই ভাবিয়া থাকে এবং সমালোচকে পর্য্যন্ত তাহাই ঘোষণা করিয়া থাকে। কতকগুলি সমালোচকের স্থির বিশ্বাসই এই দাঁড়াইয়াছে যে, সমাজিক কলঙ্ক বিশেষকে ধিক্কার দেওয়া ও তিরস্কার করাই নাটকের

মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, বঙ্গীয় সমালোচকের মামুলি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কথা ত আছেই।

যে উদ্দেশ্য কাব্যের এবং কাব্য যাহা; নাটকেরও সেই উদ্দেশ্য এবং নাটক তাহা। কাব্য কর্ণকে সন্তোষ করিয়া থাকে; নাটক চক্ষুকে সন্তোষ করে, এই মাত্র প্রভেদ। কাব্য মানস চক্ষুযোগে অন্তরে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে; নাটক তদতিরিক্ত সাধারণ দর্শনেন্দ্রিয় যোগেও হৃদয়ে বহুলাংশে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। মানসচক্ষু সকলের থাকে না, কিন্তু শরীরে শারীরিক চক্ষু সকলেরই আছে; সুতরাং ক্রিয়াস্থলে কাব্যাপেক্ষা নাটকের কর্ম্মোপযোগিতা বেশী এবং বেশী লোকের উপর কার্য্য করিতে সক্ষম হয় বলিয়া তাহার ক্রিয়া-আয়তনও বেশী। সুতরাং এমনস্থলে, যথার্থরূপে যে নাটক লিখিতে পারে ও যথার্থরূপে যে নাটক দেখাইতে পারে, তাহারা উভয়েই শ্রদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠার পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার নিজ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপার গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করিয়াও যে ফল না পাইয়াছিলাম, নাটকাভিনয় দর্শনে সে ফল পাইয়াছিলাম। চিত্তের গুটি দুই মহৎ ভাবান্তর,নাটকাভিনয় কখনও না দেখিলে, কতদিনে যে তাহারা ঘটিত,অথবা একেবারেই কখনও ঘটিত কিনা,তাহাকেবলিতে পারে?

যেখানে সর্ব্বসাধারণের চিত্তকে আকর্ষণপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে, সেখানে তাহা আমোদ ও কৌতুকের দ্বারা না দিয়া হইতে পারে না। অতএব নাটকাভিনয়ে আমোদ কৌতুকেরও যথেষ্ট প্রয়োজন। অথবা আমোদ কৌতুকে দোষটাই বা কি? তাহারও ত এ কর্ম্মজীবনে প্রভূত প্রয়োজন। অতএব আমোদ ওশিক্ষা, উভয়ই যদি এককালে যুগপৎ সুসম্পাদিত হইতে পারে, তাহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে। নাটকাভিনয় সকলেরই দেখা উচিত; কেবল দেখা উচিত নয় এরূপ পাঠার্থী বালকের, দৃশ্যকেও দর্শন করিবার শক্তি যাহাদের হয় নাই।

নাটকাভিনয় দেখিবে যাহারা তাহা ত শুনিলাম; কিন্তু অভিনয় করিবে কাহারা?—যাহাদের প্রকৃতিতে গুরুত্ব আছে, কিন্তু তদবরোধক তরলতা যাহাদের ঘুচে নাই; যাহাদের স্বাভাবিকী কর্ম্মশক্তি আছে, কিন্তু নীতিদ্বারা তাহা ঘটনাচক্রে নিয়মিত হয় নাই; যাহাদের অন্তরে মনুষ্যত্ব আছে,

কিন্তু বাহিরে বিকশিত হইতে পায় নাই। তদ্রূপ প্রকৃতিকে যথাপথে পরিবর্ত্তন করিতে অন্য শিক্ষাস্থলী যাহাদের নিকট হারি মানিয়াছে, অভিনেতৃত্বই তাহাদের পক্ষে অবশেষ-অবলম্বনীয় শিক্ষাস্থলী ; যেমন নানারোগ জড়িতের পক্ষে, যখন সকল ঔষধ হারি মানে, তখন আফিং আসিয়া শেষ অবলম্বন স্বরূপ হয়। আফিং নেশা এবং দূষনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা রোগীর উপকার যথেষ্ট করে এবং রোগীও অনেক সময়েই তাহার কল্যাণে প্রকৃত স্বাস্থ্যের মুখ না দেখিতে পায় এমন নহে।

অনেকে হয়ত যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলতায় কাটাইত এবং বার্দ্ধক্যেও তাহার হাত হইতে ছাড়াইতে পারিত না। কিন্তু অভিনেতৃত্বের অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ ব্যবসায়ে, উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে যৌবনে অপসারিত হয় ; শেষে, বয়সে অভিনেতৃত্বে বিরাগ উপস্থিত হইলে, অতি সামাজিক সজ্জন হইয়া সজ্জনগণের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। কালে তদ্রূপ বিরাগ ও বিরাগ হইতে তদ্রূপ সজ্জনতার উপস্থিতি, প্রায় ধ্রুব বলা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যরূপে, উচ্ছৃঙ্খলকে সাধু হইতে অতি কমই দেখা যায়। আমি জানি, অনেক উচ্ছৃঙ্খল এইরূপে অভিনেতৃত্ব সূত্রে কালে সজ্জনতাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

আজি কালি যে সুরুচি সংগ্রাম চলিতেছে, নাট্যালয়কেও তাহা আক্রমণ করিতে ক্রটী করে নাই। সুরুচি সংগ্রামে নাট্যালয়ের প্রধান নিন্দা,—তাহাতে নীতিভ্রষ্টা ও ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের প্রবেশ। একজন স্কুলপণ্ডিতী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, স্কুলপণ্ডিতীনীতি সম্পন্ন, সভ্যভব্য ও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী কায়স্থ সুতরাং শান্ত শিষ্ট ও অলোকপ্রাপ্ত, সুরুচিধ্বজী ও গুণাকর বাঙ্গালা সম্বাদপত্র সম্পাদকের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়। যখন তিনি পুরা তোড়ে নাট্যালয়ের উক্ত নিন্দা তাঁহার কাগজে ঘোষণা করিতেছিলেন, সেই সময়েতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম —"নাট্যালয়ে ভ্রষ্টধর্ম্মা স্ত্রীলোকের প্রবেশ বিরুদ্ধে যে ক্রমাগত লিখিতেছেন ইহার অভিপ্রায় কি ?"

উ। "লোকের রুচি খারাপ হয় ও চরিত্র খারাপ হয়।"

প্র। "সকল দেশের নাট্যালয়েই ত এইরূপ স্ত্রীলোক লইয়া কারবার ; সতীসাধ্বী কোথাও মিলে না। তবে ইউরোপাদি দেশে বেশ্যা-বিবাহ

প্রথা আছে এবং বিবাহিত হইলে বেশ্যারাও সাধুমধ্যে গণিত হয় তাই তত জানায় না; এ দেশে সেটা হইতে পায় না বলিয়াই বেশ্যারা এত লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। নতুবা নাট্যালয়স্থ স্ত্রীলোকের অবস্থা সকল দেশেই সমান। সে যা হউক, এদেশের নাট্যালয়ে সতী সাধ্বী মিলিবার সম্ভব আছে কি?—হিন্দুর ঘরেত মিলিবে না নিশ্চয়, তবে ব্রাহ্মদের মধ্য হইতে হয় ত মিলিতে পারে এবং আপনিও হয়ত তাহার কোন সন্ধান অবশ্য রাখেন।"

উ। "না সতী সাধ্বী মিলিবার সম্ভব নাই। মিলিলেও ভাল থাকার সম্ভব নাই।"

প্র। "কোন একটাকে দোষ বোধে, তাহা ঘোষণা করিতে হইলে, তাহার প্রতিকারও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইয়া থাকে। অতএব কি প্রতিকার স্থির করিয়াছেন।"

উ। "নিরুত্তর।

প্র। "তবে কি নাটকালয় উঠাইয়া দিতে বলেন?"

উ। "তাও বলি না।"

প্র। "তবে প্রতিকার কি?"

উ। "তাহাও ত কিছু দেখিতে পাই না।"

প্র। "তবে আগে প্রতিকার চিন্তা না করিয়া একটা বিষয়কে দোষী করা কি ভাল।"

উ। "লোকের রুচিও চরিত্র খারাপ হয় যে?"

প্র। "কলিকাতার রাজপথে বারাঙ্গনাদিগের হাবভাব বিলাসাদি দেখিয়া খারাপ হয় না?—তাহার উপায় কি?"

উত্তর। "তা হয় বটে, কিন্তু তত নয় যত নাট্যালয়ে।"

প্র। "রাজপথে যে হাবভাব, তাহা প্রকাশ্য খোলাখুলি বারাঙ্গনারই হাবভাব; আর নাট্যালয়ে হয় ত সিতা সাবিত্রী প্রভৃতি চরিত্রাভিনয়, অধিকতর দূষ্য কোন্‌টা? রাজপথে নিত্য বারাঙ্গনার কাণ্ড কটাক্ষ ও ইঙ্গিতাদি দেখিয়া যদি রুচি ও চরিত্র খারাপ না হয়; তবে কালে ভদ্রে একদিন সিতা সাবিত্রী আদির অভিনয় দেখিয়া খারাপ হইবে? নাট্যালয়ের দৌরাত্ম্যে

কতগুলি এ পর্য্যন্ত খারাপ হইয়াছে বলিতে পারেন? আমার বোধ হয়, নাট্যালয় অপেক্ষা রাজপথ অধিক সঙ্কটস্থল; অতএব সঙ্কটস্থস বন্ধ করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাজপথ আগে বন্ধ করা উচিত।

উ। "তা বটে তথাপি সকলেই এ বিষয়ের নিন্দা করে কেন?"

প্র। "সকলে নিন্দা করে বলিয়াই কি আপনিও করেন।"

উ। "তা বই কি?"

অবশ্যই ইহার উপর আর প্রশ্ন চলিতে পারে না। এ প্রশ্নোত্তর সত্য ঘটনা। ইহার কিছু কাল পরেই,সম্পাদকের হইয়া এক নূতন নাট্যালয় স্থাপিত হওত ইহার উত্তর দিয়াছে। অপরাপর নাট্যালয়ে, যেখানে বালকের অংশ স্ত্রীলোকে অভিনয় করিত, এ নাট্যভূমে শিশু বালকেই সে বালকের অংশ অভিনয় করে; যেখানে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকে অভিনয় করিত, এখানে ছোকরায় স্ত্রীলোক সাজিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। অপূর্ব্ব রুচির কাজ ও অপূর্ব্ব বুদ্ধির কাজ বলিতে হইবে! রুচি ও সভ্যতার চূড়ান্ত হইয়াছে!

বালক অভিনেতা যে, তাহার পরকাল ত চিরদিনের তরে মাটি! তাহার পর স্ত্রীর অংশ অভিনয়কারী যুবা যে, তাহার তুল্য প্রকৃতি-বিদ্রোহী আর কেহ কোথায় হইতে পারে না;—পুরুষের প্রকৃতিকে স্ত্রীপ্রকৃতিতে অবনমিত করার অপেক্ষা, মহাপাতকগ্রস্থ প্রকৃতি-বিদ্রোহ আর কি কিছু হইতে পারে? এখন মনে ভাবিতেছ, স্ত্রীপ্রকৃতি অভিনয় করিলেই কি প্রকৃতি বিকৃতিতে প্রকৃতি বিদ্রোহ ঘটে?—তাও কি কখনও হয়! আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহাই হয়। যে প্রকৃতি নিত্য অভ্যাস ও অভিনয় করা যায়, স্বীয় প্রকৃতি বিকৃত হইয়া তাহাতেই বহুলাংশে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এক্ষণে ফলের অঙ্কে দেখিতে গেলেও, স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেই যাহাদের অন্তরের নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, স্ত্রীচরিতের অবিকল অনুকরণকারী পুরুষ দেখিলেই কি তাহাদের সে নরকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে? তাহা নহে, উহা বরং অথবা নিশ্চয়ই অন্যরূপে অধিকতর জ্বলিয়া, অন্য প্রকারের অপেক্ষাকৃত লঘুপাপের পরিবর্ত্তে, আর একপ্রকার গুরুতর পাপের সৃষ্টি করিবে ও তাহার স্রোত অনবিতর সমাজে প্রবাহিত করিয়া তুলিবে। এরূপ পাপের সৃষ্টি, পুরুষ-প্রধান যাত্রার দলাদিতে

হইয়াও গিয়াছে অনেক। আপাততঃ, অর্থাৎ যতদিন স্ত্রীসম্বলিত নাট্যা-লয়ের সঙ্গে জেদাজিদি আছে, ততদিন হয়ত কিছু তাপ থাকিবে; কিন্তু কালের সমতা সহ জেদাজিদি যখন শিথিল হইয়া আসিবে, এবং লোকচিত্তও যখন এরূপ নীতি সংগ্রামে শান্ত ও অনাস্থাভাবযুক্ত হইবে, তখন এবং তখনই নিশ্চয় সে নূতন মহাপাপের সঞ্চার হইতে থাকিবে। নরকাগ্নি যাহাদের হৃদয়ে জ্বলে, তাহাদের সে অগ্নি কোথাও নির্ব্বাপিত হয় না; বরং নূতনত্ব দেখিলে আরও অধিকতর পরিমাণে জ্বলিয়া থাকে। ফলত ভ্রষ্টধর্ম্মা স্ত্রীলোক দূর করিতে গিয়া, যাহারা বালকের পরকাল খায় এবং পুরুষের প্রকৃতি স্ত্রীত্বে অবনমিত করিয়া তাহার অবমাননা ও বিরূপতা সম্পাদন করে, তাহারা এ সংসারে মহাপাতকী। যে প্রকৃতি যাহা নয় তাহাতে তাহাকে যাহারা অবনমিত ও বিকৃত করিয়া থাকে; যে উজ্জ্বল নর প্রকৃতি জগতের গৌরব, সৃষ্টির গৌরব এবং জগদ্বিধাতারও মহিমানিবাস, সেই নরপ্রকৃতিকেও যাহারা স্ত্রীত্ববিরূপতায় লাঞ্ছিত ও নিপাতিত করিয়া থাকে; বলিতে পারি না তাহাদের কিরূপ রুচি, কিরূপ নীতি ও কিরূপ ধর্ম্ম। শুনিয়াছি নাকি, অধুনাতন নীতিবাদীগণ তাহাকেই ভাল নীতি বলিয়া থাকে। বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যতদূর বুঝি এবং নিত্য নিয়ম যদি বাতুলের খেলা না হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে যাহারা নর প্রকৃতিকে সেরূপ অবমানিত করে, তাহারা মহাপাতকী, তাহারা নারকী এবং তাহারা ঘোলঢালামাথায় সমাজ হইতে বিদূরিত হইবার যোগ্য। যাহারা এরূপ বিরূপতা সাধন বিষয়ে স্বয়ংকৃতী, তাহারা ত মহাপাতকী বটেই; আর যাহারা ইহাতে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেয় তাহারাও তদ্রূপ ও সমান মহাপাতকী বলিয়া জানিও! পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঘোর মহাপাতকী!!

কোন দেশেই কোন নাট্যালয়ে সতী সাধ্বী লইয়া কারবার নাই এবং হইতেও পারে না। যেরূপ প্রকারের স্ত্রীলোক এ দেশের নাট্যালয়ে, তাহাই সর্ব্বত্রে। অন্য কোথাও যদি তাহাতে লোক কুরুচিগ্রস্থ ও নীতি বিচ্যুত হইয়া মারা না গিয়া থাকে; তবে এখানেও যাইবে না। বিশেষতঃ যে ননীর পুতুল রুচি ও নীতি একটুও আঁচ সহিতে পারে না এবং মনুষ্যোচিত শক্তি যে রুচি ও নীতিতে নাই, তাহা লইয়া এ সংসারে অতি সামান্য কার্য্যই

সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং সেরূপ রুচি ও নীতি থাকুক বা যাউক তাহাতে কিছুমাত্র সংসারের আসে যায় না। নাট্যাভিনয় দেখিতে হইলে, যেখানে বালক ও স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকে অভিনয় করে, সেই নাট্যাভিনয় দেখাই উচিত। তদ্ভিন্ন অন্যবিধ দেখায় মহাপাপ। আর যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা নরকাগ্নি জ্বলে, যাহার রুচি ও নীতিকে অনেক যত্নে রক্ষা করিতে হয়, তাহার পক্ষে যে কোন উপায়ের ও যে কোন প্রকারের নাট্যাভিনয় দেখাই নিষিদ্ধ।

সাধারণতঃ, ভ্রষ্টধর্ম্মা স্ত্রীলোকের সংমতি হওয়ার পক্ষে আর অপর কোনই উপায় তেমন বিশেষ কার্য্যকারী হয় না, যেরূপ অভিনেতৃত্ব। সৎচরিত্র সকলের অভিনয় করিতে করিতে, কাল ও অভ্যাসবশে ক্রমে মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং সেই ভাবান্তর কালে সৎপথাভিমুখে ও সৎমতিগতি অভিমুখে লইয়া যায়। ইহাদের সম্বন্ধেও, পুরুষ অভিনেতৃগণ পক্ষে যাহা বলিয়াছি, তাহা বর্ত্তে।

যথার্থরূপে চরিত্র অভিনয়ে সক্ষম হওয়া, অতি উচ্চ শক্তির কার্য্য। কবিরও যে শক্তি, যথার্থ অভিনেতারও সেই শক্তি; প্রভেদ কেবল কবির শক্তি সকর্ম্মক ও নেতৃত্বপূর্ণ, আর অভিনেতার শক্তি অকর্ম্মক ও নীতৃত্বপূর্ণ; অথবা অভিনেতার শক্তি নানাকারণে সকর্ম্মকভাবে অস্ফুটিত এইমাত্র প্রভেদ। শক্তি যাহা তাহা উভয়েতেই উচ্চ।

১৭। মহামেলা।

কলিকাতার আজি মহাদিন, মহাদিনে আজি মহামেলা উদ্ঘাটিত। অপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার!

যথায় যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই, তথায় তাহাই অপূর্ব্ব এবং আশ্চর্য্য। এ জগতের তাবৎ অপূর্ব্ব এবং তাবৎ আশ্চর্য্য এই রকমের। যাহা আজিকে অত্যাশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব, তাহা দুই বা ততোধিকবার ঘটনা হইতে থাকিলেই, আর তাহাদের অত্যাশ্চর্য্যত্ব ও অপূর্ব্বত্ব থাকে না; সাধারণ কাণ্ডের মধ্যে গণিত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে সৌভাগ্য এই যে, এ অনন্ত বহুলা পৃথিবীতে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা উদয়েরও অন্ত নাই এবং তাহা সাধারণকাণ্ডে পরিণত হইয়া যাওয়ারও অন্ত নাই।

এ সংসারে উক্ত অত্যাশ্চর্য্যের উপরেও অত্যাশ্চর্য্য আর একটি ব্যাপার আছে, তাহা এই ;—যে জন যে আশ্চর্য্য ঘটনা বিশেষ দেখে নাই, সে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না ; অনেকে দেখিয়াও আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করে না ; অনেকে দেখিবার সুযোগ থাকিতেও পোষিত অবিশ্বাস বশে দেখে না, যেমন ইউরোপীয় জড়বৈজ্ঞানিক। নিসর্গগৃহ-দৃষ্ট আশ্চর্য্য ঘটনা সম্বন্ধেই মানুষের অবিশ্বাস ব্যাপারটা কিছু বেশী বেশী ! অবিশ্বাসে মানুষ উৎসন্ন গিয়াছে ও যাইতেছে, তবু মানুষ অবিশ্বাসের মায়া ছাড়াইতে পারে না। ফিকির যুক্ত অবিশ্বাস ও ফিকির যুক্ত বিশ্বাস, উভয়ই মানুষকে সমান প্রতারণা করিয়া থাকে।

সামান্য একটা কথা পাড়িতে গিয়া এতটা ভূমিকা কেন ? হরি ! হরি ! ঐত দোষ, কথাটা কিনা মহামেলা !

যাহাহউক, মহামেলাও আমাদের পক্ষে, অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত জগতের সমস্ত ভূত ও বর্ত্তমান এই কালদ্বয় ব্যাপী সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি, দূরদেশান্তরের বিঘা কয়েকে যেন ভেল্কী চক্রে আনীত হইয়া সমাগত ও সমাবিষ্ট, ইহাপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ! যাহারা না বুঝে, তাহারাই ভাবে যে তুড়িতে একটা তাল-গাছ উৎপন্ন করা অধিক আশ্চর্য্য। মনুষ্য হৃদয়ে যে ঐশীশক্তি নিত্য গতায়াত করিয়া থাকেন, তাহার যে কি ঐশী ক্ষমতা, এই মহামেলা অংশত তাহারই পরিচয়।

ফ্রান্স, জর্ম্মানি ও বিলাত আদি দেশে যে মহামেলার কথা শুনিতে পাই, এই মহামেলা তাহার সঙ্গে সমান না হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এ দেশে ইহার সমান কাণ্ড ও আশ্চর্য্য পরম্পরার সংযোগ ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কখন দেখে নাই। যাহাদের পক্ষে চক্ষু দুইটি জড়পদার্থ চস্‌মা প্রতিরূপ, তাহাদের পক্ষে এ মহামেলায় মহাক্ষতি, কারণ তাহাদের বিশ্বাসে অনর্থক অর্থব্যায় ইহাতে বিস্তর। যাহাহউক, আর কোন সার্থকতা যদি নাও থাকে, তথাপি ঐ যে লক্ষ লোক যাইতেছে, আসিতেছে ও দেখিতেছে, ইহাই ঐ মেলার সার্থকতা। কিন্তু কে কি দেখিতেছে, আর আমিইবা কি দেখিলাম ?

দেখিলাম অপূর্ব্ব। দেখিলাম, ঈশ্বর এই মানব সৃষ্টিতে কি দিব্যশক্তিই না নিহিত করিয়াছেন। কে বলে মানবীয় শক্তি সসীম? মানবীয় শক্তি সর্ব্বতোভাবেই অসীম। বিশ্বচরিত্র মহাশক্তি পার্শ্বে এ মানবীয় শক্তিও দ্বিতীয় সৃষ্টি রচনাক্ষমশক্তি। মহাপ্রকৃতি নিজশক্তিতে যে চক্ষুকে মোহিত করিয়া থাকেন, মানবীয় শক্তিও সে চক্ষুকে মোহিত করণে কোন কম পটু? এই প্রভূত দ্রব্যরাশি মানবীয় শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এখানে যাহা উপস্থিত, তাহা ব্যতীত আরও কত কত অনন্ত সংখ্যক ও অনন্ত প্রকার দ্রব্যরাশি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অনুপস্থিত রহিয়াছে। গত তাবৎকালে আরও কত অনন্তসংখ্যক উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং পরে আরও কত অনন্ত সংখ্যক উৎপন্ন হইবে! মানবের পক্ষে ইহা, কি গৌরব, কি আনন্দ, কি হর্ষের বিষয়! কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মবশে এ গৌরব, এ আনন্দ ও হর্ষও পরিতাপ শূন্য নহে। পরিতাপ এই যে, এ মানবীয় বিষ্ণুশক্তিও,রাম অবতারের ন্যায় প্রায় সর্ব্বদাই আত্মা বিস্মৃত, আপন মর্ম্ম এবং আপন মর্ম্মের মহান্ উৎস আপনি বুঝিতে পারে না; এবং বুঝিতে না পারিয়া কখন কখন বনচর নিশাচরের লাথি ঝাঁটাও মাথা পাতিয়া খাইয়া থাকে। এ প্রদর্শনীতে লাথি ঝাটা খেগো প্রদর্শিতেরও অভাব নাই; অথবা এ প্রদর্শনিতে তাবৎ দেশীয় দর্শকই তদ্রূপ প্রদর্শিত। কপাল গুণে এদেশীয়েরা, এ মেলাস্থলে দর্শক হইতে আসিয়া, প্রদর্শিতের পদবীতে পড়িয়া গিয়াছে। যাহারা দলে অধিক, তাহারাই প্রায় দর্শকের পদবী পায়; কিন্তু এ দেশীয়ের কপালগুণে তাহাতেও বিপরীত নিয়ম ঘটিয়াছে। বোম্বাই,মান্দ্রাজ, পঞ্জাব ইত্যাদি ভারতের নানা দিগ্দেশস্থ দর্শকগণের সেরূপ উন্নত চেহারা, বিশালবক্ষ, মনুষ্যত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী; অথচ কার্য্যকালে সেই সেরূপ মূর্ত্তিমধ্যে কেবল ছাগ অবতার আবরিত দেখিলে, কেনা বলিবে যে ইহারা সর্ব্বথা আত্ম বিস্মৃত নহে? ইহারা যদি আপনারা আপনি নিজের সত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত; আত্মজ্ঞান ও আত্মমর্য্যাদা যদি ইহাদের কিছুমাত্র বোধ থাকিত, তাহা হইলে কি কখন ইহারা এরূপ ছাগ অবতার হইয়া এবং ছাই গাদায় পড়িয়া, এরূপ লাথি ঝাঁটা খাইত না এরূপ প্রদর্শিত হইতে আসিত? বিধাতঃ, যদি মনুষ্যত্বদানে কৃপণই হইবে, তবে তুমি ইহাদিগকে সেরূপ মনুষ্যত্ব-

ব্যঞ্জক চেহারা কেন দিয়াছিলে?—উহা তাহাদের পক্ষে যে নিতান্ত বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়াছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? প্রভু, তুমি আপন সৃষ্টি, আপনি তিরস্কৃত করিতেও কি এত মজবুত; দয়া মায়া মমতা কি তোমার নাই?—সেই একই উত্তর!—প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! বলা বাহুল্য যে, প্রদর্শনির এই দর্শক-প্রদর্শিতবর্গ আমার প্রথম-দৃষ্ট দৃশ্য; এবং বলিব কি, ইহাদের দেখিবা মাত্র মন যে কি পরিতাপ সাগরে মগ্ন হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে। ভাবিলাম, আর কত দিন?

"আরও একবার এই পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছিল, ভারত গৃহ দেখিয়া। ইহা দেখিয়া আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, যতটা মনে করা যায়, ভারত সত্য সত্যই এখনও ততটা অধঃপাতে যায় নাই। যে ভারত এখনও এরূপ অপূর্ব্ব শিল্পপূর্ণ দ্রব্যরাশির উৎপাদন করিতে পারে, সে ভারতকে কখন একেবারে মৃত বা উৎসন্নমুখ বলা যাইতে পারে না। সত্য সত্য ভারত-সন্তানেরা এখনও একেবারে শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে নাই। এখনও শক্তি আছে,—যদিও তাহা বিপথে ও ভিন্ন দিকে চালিত। দেখিলাম, এখনও একটু যত্ন করিলে, একটু মাত্র যত্ন করিলে, এই মুমূর্ষপ্রাণ ভারতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারা যায়, এবং পুনর্জ্জীবিত করিয়া এখনও তাহার দ্বারা মহত্ব সংসাধিত করান যাইতে পারে। কিন্তু মাতৃভক্ত সেরূপ সুসন্তান কোথায়? ম্লেচ্ছভক্ত সুসন্তান অনেকই মিলে, কিন্তু ফল? যাহা হউক, তথাপি আশা—"কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলাচ পৃথ্বী।" ভারত সন্তান! তথাপি আশাশূন্য হইও না। সুসন্তান এবং সুভিষক আকাশ হইতে পড়ে না; তুমি আমি বা দৃশ্যমান মানবশ্রেণীর মধ্যেই তাহারা জন্মিয়া এবং তৈয়ার হইয়া থাকে; চেষ্টা কর, তোমরাও নিজে সে সুসন্তান এবং সুভিষক হইতে পারিবে, এবং মাতৃভূমিও রোগমুক্ত এবং পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবেন। চেষ্টাও কিছু যে বিশেষ কষ্টসাধ্য, তাহা নহে; আলসবিমুখতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, এবং আচারে সাত্বিকতা, কেবল এই তিন সহজ পদার্থের তদর্থে প্রয়োজন। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, যে জাতি এরূপ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব পদার্থ রচনে এখনও পটু, সে জাতিকে ঈশ্বর

ক্ষণিক শান্তিরতল ভিন্ন একেবারে বিড়ম্বিত করিবেন না,—"দেবতা নিজ সৃষ্টি নাশ করেন না।" তবে যদি বিড়ম্বিত হই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে সে একান্ত আমাদের দোষে।

ভারত গৃহ দেখিয়া আমার অপর একটি ধারণা এই।—আমার পূর্ব্বাপর হইতে জ্ঞান ছিল যে আমাদের এটি মেয়ের দেশ; এখানে মেয়েও মেয়ে, পুরুষও মেয়ে। অদ্যকার ভারত গৃহ দৃষ্টে আমার সেই জ্ঞানের এই পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, আমাদের এদেশ মেয়ের দেশত বটেই, অধকন্তু সে বয়স্থা মেয়ে নহে; কচি মেয়ে! ৫।৭ বৎসরের কচি মেয়ে; আবদেরে অজ্ঞান মেয়ে যদি না হইত, তবে ঘরে এমন অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নানা শিল্পপূর্ণ মূল্যবান্ পদার্থরাশি থাকিতে, চাকচিক্যের মোহে বৈদেশিক অকিঞ্চিৎকর পদার্থরাশির জন্য সর্ব্বস্ব ব্যায় করিয়া বসে কি জন্য? ভারত গৃহ একে একে দেখিলাম, সামান্য গৃহস্থ হইতে রাজ্যেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেরই, সময় অসময়, সম অসম, সৌখিন অসৌখিন, আবশ্যক অনাবশ্যক, সকল অবস্থার জন্য, সর্ব্ববিধ পদার্থে সজ্জিত রহিয়াছে; মূল্য এবং গুণে অপরাপর দেশজ দ্রব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট ভিন্ন ন্যূন নহে। দেখ, তথাপি আমরা তাহার দিকে না তাকাইয়া, বিদেশীয় দ্রব্যের চাক্‌-চিক্যশালী মোড়ক দেখিয়া, তাহার ঝলসে ভুলিয়া যাই। একটা কাচের ডিকান্টার পাইলে যত আনন্দ, একটা কটক নির্ম্মিত গোলাপপাস পাইলে তাহার শতাংশের এক অংশ আনন্দ হয় না। কে না জানে ছেঁড়া কাপড় ও কাচের পুঁতুলে বালিকার নিত্য আনন্দ। বিধাতা যদি মেয়েই করিলেন, তবে কেন বয়স্থা মেয়ে করেন নাই; তাহা হইলেও বা কতকটা বলিবার কথা থাকিত, তবু কতকটা লোকে চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিত এবং ঘরও তাহা হইলে, নিতান্ত ছেঁড়া কাপড় ও কাচের পুঁতুল সংগ্রহে পরিপূর্ণ হইত না। বিধাতাকেই বা কেন দোষ দেই, পাপের উপর আবার পাপ কেন? দোষ আমাদের!

কোন্ জাতির প্রকৃতি কিরূপ, এ মেলাস্থলে প্রত্যেক জাতীয় গৃহ তাহরাও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অন্যান্য জাতীয় কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাহাদের সঙ্গে আমাদের সর্ব্বসম্বন্ধ—সেই ইংরেজ এবং ভারতগৃহ,

এ উভয়ের বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। এই মেলাস্থলে যতদূর সাজান হইয়াছে, তাহাতে কেনা বলিবে যে ভারতগৃহ অতি মূল্যবান্; আর ইংরেজগৃহ?—বোতল ও দেসলাইয়ের ভাগই অধিক! কিন্তু তথাপি দেখ, ইংরেজগৃহ কেমন চাক্‌চিক্যশালী ও মনোজ্ঞ; ইহার চাক্‌চিক্যশালিতায়, ইহার দেসলাইয়ের বাক্স ও বোতলের ঝলসে, বহুমূল্যশালী ভারতগৃহ, বলিতে কি, কেমন যেন মলিন মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে; এত কাশ্মীরি শাল, এত সোণাদানা, ইহার কিছু লইয়াই ভারতগৃহ ইংরেজ গৃহের কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ইহার কারণ আছে;—ভারতীয় কারিকর যাহা করে, তাহা আপনার নিজের মন ভুলাইতে; আর ইংলণ্ডীয় কারিকর যাহা করে, তাহাতে আপনার নিজের মন যত ভুলুক বা না ভুলুক, কিন্তু সর্ব্বথা পরের মন ভুলাইতে; পরের মন ভুলাইতেই তাহার প্রধানত যত্ন। ইংরেজের মধ্যে নিজের সাত্বিক যত্ন এবং পরের রুচি ও প্রয়োজন, এই দুই মিলাইয়া দ্রব্য সমুদয় নির্ম্মিত; এজন্য দ্রব্য মূল্যে সামান্য হইলেও, তাহা সর্ব্বদা সুকৌশল নির্ম্মিত এবং লোকরঞ্জক হইয়া থাকে। আর ভারতীয়ের মধ্যে যত্ন যথেষ্ট আছে, কিন্তু রুচি ও প্রয়োজন বিচারের বেলায় পরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই—তাহা নিজের; এজন্য দ্রব্য বহু মূল্যবান ও সুকৌশল নির্ম্মিত হইলেও তাহা লোকরঞ্জক হয় না। বোধ করি বাজারে ভারতীয় শিল্পের অধোগতি পক্ষে,ইহাও অন্যতর কারণ এবং এই কারণেই প্রধানতঃ ঘরের এত মূল্যবান ও বিবিধি প্রকারের দ্রব্য সমস্ত ফেলিয়া, লোকে সামান্য ইংরেজী ফষ্টিনষ্টি পাইবার জন্য এতটা ব্যস্ত হয়। ইংরেজের স্বভাব অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ; আর ভারতীয়ের স্বভাব কেবল অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি; সুতরাং এখানে একদেশদর্শী ভারতীয়ের উপর, কেননা ইংরেজ পুরুষ প্রভুত্ব বিস্তার করিবে? হইতে পারে এবং সত্যও যে ভারতীয়ের অন্তঃপ্রকৃতিতে দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, কিন্তু তাহাতে ফল কি? একা অন্তঃপ্রকৃতি যতই তীক্ষ্ণ হউক, তাহাতে কাজ হয় না; তৎপরিবর্ত্তে, তীক্ষ্ণতার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা সত্বেও, যদি অন্তঃ ও বহিঃ উভয় প্রকৃতির সামঞ্জস্য-সংমিলন সাধন করিতে পারা যায়, তাহাতে

ফলের আশা প্রভৃত। ভারতসন্তান, এই একদেশ দর্শন হেতু, উৎসন্ন গিয়াছ এবং যাইতেছ, এখনও বহিঃপ্রকৃতিতে প্রবুদ্ধ হও, তোমার মঙ্গল হইবে; নতুবা ঐ দেখ, তোমার এমন হুনর, এমন বুদ্ধি কৌশল, সে সকলই ঐ মেলাস্থলে আসবাব ও খেলেনা স্বরূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছে। এ মেলায় ইংরাজ-গৃহ লোক দেখিতেছে প্রয়োজনের অনুরোধে, আর ভারত-গৃহ দেখিতেছে কেবল কৌতুহল ও আমোদের অনুরোধে!

তাহার পর কলকারখানার গৃহ। ইংরেজের প্রকৃত বল এইখানে, কিন্তু এ বল কি ইংরেজের একচেটিয়া? তাহা নহে। এ যুগের সৌভাগ্য এই যে, যথায় যাহাই উদ্ভূত হউক না কেন, তাহা অবিলম্বে সাধারণ-প্রাপ্য হইয়া থাকে। তবে যদি কেহ তাহা না পায়, তাহা উদ্ভাবকের দোষ নহে; যাহার প্রাপ্ত হওয়া উচিত, দোষ তাহার। এই সমস্ত কল, যাহা এখানে দেখা যাইতেছে, ইহাদের সকলই ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয় নাই; নানা দিগ্‌দেশে নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে; অথচ দেখ ইংলণ্ডীয়গণ সে সমস্তই কেমন আপনার করিয়া লইয়াছে এবং অপর সকল জাতিও সে সমস্ত সেইরূপ আপনার করিয়া লইয়াছে বা লইতেছে! কিন্তু ইহাতে বাদ কেবল আমরা! আমরা সেরূপ আপনার করিয়া লইতেছি না বা লইতে পারিতেছি না। কিন্তু কেন পারিতেছি না?—তাহা কি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া? তাহা নহে। দুষ্প্রাপ্য ত তাহারা নহে। উহারা দূরে ও দেশ বিশেষে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু উদ্ভবের পরক্ষণ হইতেই যখন সর্ব্বজনীন্ আকার ধারণ করিয়াছে, তখন উহারা যে দুষ্প্রাপ্য তাহা কেমন করিয়া বলিব। দুষ্প্রাপ্য হয় দুই কারণে, এক বস্তুর বিরলতা ভাব; অপর যাহার প্রাপ্ত হওয়া উচিত তাহার অসমর্থতা। কিন্তু আমাদের প্রতি ও দুইটার একটাও খাটে না। আমাদের পক্ষে সকলই উল্টা নিয়ম। অধঃপাতগত বা প্রকৃতি-বিচ্যুতের পক্ষে সকলই উল্টা হয়; যথানিয়মিত ক্রিয়া কারণ ও ফলসম্বন্ধ তাহাতেই কেবল লক্ষিত হইয়া থাকে, যে প্রকৃতিস্থ। ফলত, আমাদের পক্ষে কথিত দুইটা নিয়মের একটাও খাটে না; প্রথম উহারা বিরল নহে; দ্বিতীয়

আমরাও অসমর্থ নহি, যেহেতু একটা উপাধীক্রয়ে যে অর্থ বৃথা ব্যয় হয়, একটা রাজপুরুষের অভ্যর্থনে যে অর্থ উড়িয়া যায়, তাহা এবিষয়ে ব্যয়িত হইলে, যাহা এখন অপ্রাপ্য ও অপ্রাপ্ত তাহা সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এরূপে অর্থ ব্যয়িত হইলে, দেব ও মানুষ উভয়েই রাজী হইয়া থাকেন ; ভবিষ্যৎ মঙ্গলও পূর্ণ পরিমাণে হয় এবং কত শতগুণ অর্থের পথ অবারিত হইয়া থাকে ; কিন্তু তথাপি আমরা তাহা করিব না বা করিতে জানি না এবং অর্থব্যয় করিব এরূপে যাহা লোকের হানীকর, নিজের হানীকর ও দেবতার হানীকর। অতএব সে সকল জিনিস্ যে আমাদের নিকট দুষ্প্রাপ্য, সে কেবল আমাদের মতিচ্ছন্ন জন্য। সমবেত চেষ্টাও আমরা জানিনা বা পারিনা, কারণ এখনও আমরা মতিশূন্য, ধর্ম্মশূন্য সুতরাং আপনাতে আপনি বিশ্বাস শূন্য। যাহাকে বিশ্বাস করিবে, এবং যে মুহূর্ত্তে বিশ্বাস করিবে; সেই অমনি দেউলিয়া আইনের ধারা-গুলি সেই মুহূর্ত্ত হইতে অধ্যয়ন করিতে থাকিবে, অথবা এমনভাবে চলিতে থাকিবে যে কেহ কাহাকে ধরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। গণ্য বাবু মহলে এ অভিনয়ও হইয়া গিয়াছে! ইহা আধুনিক সভ্যচরিত্র ও সভ্য ধর্ম্মের ফল, প্রাচীন হিন্দু চরিত এরূপ ছিল না। যে ভাবেই গ্রহণ কর, পরাধীন যাহারা, তাহারা স্বধর্ম্মপ্রতিপালনে কখন সম্পূর্ণত সক্ষম হয় না, কিন্তু তাহা হইলেও, অধর্ম্মপথের যে একটা সীমা না হইতে পারে এমন নহে। সে যাহা হউক, কপালগুণে সভ্যধর্ম্মী বাবু অতি ভয়ানক পদার্থে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা ইহাদের বাহির চরিত্র ও ভিতর চরিত্র সমেত যতদিন না উৎসন্ন এবং হিন্দুনীতি যতদিন না আবার পুনঃ প্রতিষ্টিত হইতেছে, ততদিন লোকের প্রতি লোকের বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

এই সূত্রে আরও একটা কথা। অনেকে বিদেশজাত আবশ্যকীয় শিল্প-দ্রব্য ব্যবহার করিবনা বলিয়া, এক একটা ধর্ম্মঘটের হাওয়া তুলিয়া থাকেন। এও কি আবার কথা! এ ছেলেমী বুদ্ধি যে স্থান পায় ইহাই আশ্চর্য্য। যেখানে কোটি কোটি লোক লইয়া কথা, সেখানে কয়খানা নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া ধর্ম্মঘট করিবে বাপু! তাহার পর ধর্ম্মঘট রক্ষায় নিঃস্ব ব্যক্তিকে কি তুমি অর্থসাহায্য করিয়া উঠিতে পারিবে? তাহা না পারিলে, সস্তার বাজার ফেলিয়া দুর্ম্মূল্যের বাজারে সে যাইতে পারে কই? অথবা সে তাহার

আবশ্যক বন্ধ রাখুক, একথাও কিছু বলিতে পার না! না বাপু, নিশ্চয় জানিও ওরূপে ধর্ম্মঘটও কখন সাধিত হয় না, অথবা ওরূপ ধর্ম্মঘটে দেশীয় শিল্পও কখনও রক্ষা হয় না। লোকের আবশ্যক ও তদনুসারে ক্রয় বিক্রয়, প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় স্বেচ্ছা ও সহজগতি, তাহাতে কেহ যুক্তি করিয়া প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। প্রতিবন্ধকতা করিতে চাও, উপরোক্ত কলকারখানায় বলীয়ান হইতে চেষ্টা কর এবং সেই বলে বাজারদরের উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা কর; অন্যের অপেক্ষা সস্তাদরে জিনিস দিতে বা সমানদরে অপেক্ষাকৃত ভাল জিনিস দিতে পারক হও; তাহা হইলেই কেবল দেশীয় শিল্প রক্ষায় সক্ষম হইবে, অন্যথা নহে, অন্যথা নহে। কল-কারখানার উদয়ে, হস্তজাত শিল্পের মৃত্যু ধ্রুব নিশ্চিত, ইহা জ্ঞাত হইবে।

মহামেলায় শেষ দেখা দেখিলাম, এ ভারতক্ষেত্রে কত কত অতুল্য, অমূল্য, সুন্দর, সুগন্ধ বনকুসুম, আপনাপনি নিত্য ফুটিয়া, দেশকালাদির প্রতিকূলতায়; আপনিই অযত্নে, অনাদরে, অজ্ঞাত ভাবে নিত্য বিলীন হইয়া যাইতেছে। এবং ভারত, বিধাতৃ সৃষ্টিতে নিত্য বিফলতার আধার স্বরূপ হওয়ায়, সুদুস্তর পাপপঙ্কে নিত্য নিম্ন হইতে নিম্নতায় নিমজ্জিত হই-তেছে! উদ্ধারের দিন কতদূরে?—লোকে যত দিন কর্ম্মবান, সাত্বিক ভাবে ও স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্মবান হইতে যতদিন না শিখিবে।

১৮। ইংরেজরাজ্য—কল্পতরু।

"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।"

ইংরেজ রাজ্য এই ভারতে কল্পতরু। যে তাহাকে যেরূপে ভাবে, সে তাহাকে সেইরূপে দেখে; যে তাহাকে যেরূপে ভজনা করে, সে তাহার নিকটে সেইরূপ ফল পায়; কেহই অভীষ্টফলে বঞ্চিত হয় না! কম কথা কি?

১। দেশীয় খৃষ্টান ভাবে।—ইংরেজরাজত্বের সার খৃষ্টানধর্ম্ম। আহা! ইংরেজ এদেশে না আসিলে, এমন যে উদ্ধারপন্থা তাহা কোথায় থাকিত? এহেন খৃষ্টধর্ম্মের বিনিময়ে আমরা কি না দিতে প্রস্তুত! সুতরাং বলাবাহুল্য যে ইংরেজেরা এদেশে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত।

২। ব্রাহ্মভ্রাতা ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার স্ত্রীস্বাধীনতা এবং বয়স্থাবিবাহ। আহা! ইংরেজ এদেশে না আসিলে আমাদের নকল করিবার আসলটি কোথায় থাকিত? হয় ত তদভাবে এতদিন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইত! অথবা মূলের কথা;—তাহাদের ধর্ম্ম ভিন্ন, এ পবিত্র ও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালীই বা কাহাকে দৃষ্টে নকল করিয়া লইতাম।

৩। সভ্য বাবু ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার হোটেল এবং ফ্রেণ্ডসীপ, কোট ক্যাপ এবং প্যাণ্টলুন বা তরবতর হরকিসম পোষাক। আহা! ইত্যাদি।

৪। ভদ্রলোক ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার বিলাতি মদের আমদানী। আহা ইত্যাদি।

৫। ছোটলোক ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার খোলাভাটী। আহা ইত্যাদি।

৬। জমীদার ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার উপাধী লাভ ও সাহেব সেবা। আহা ইত্যাদি।

৭। প্রজায় ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার খাজনা আইন। আহা ইত্যাদি।

৮। মধ্যবিত্ত ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার সুখের ব্যয়ে ডাহিনে আনিতে বাঁয় খালি, সুতরাং চোর চোট্টার ভয়ের তোয়াক্কা হইতে নিষ্কৃতি। আহা ইত্যাদি।

৯। সাধারণ লোক ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার বিনা আয়োজনে শরীর শোষণ ও শরীর শোষণ হেতু চিত্তসংযমন, সুতরাং সমাধি সিদ্ধির দিন অতি নিকট। আহা ইত্যাদি।

১০। রাজনৈতিক ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার সভাসমিতি ও বচনবাগীশী। আহা ইত্যাদি।

১১। শিক্ষার্থীর ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার স্কুল স্থাপনে অর্থলাভ। আহা ইত্যাদি।

১২। শিক্ষাবিভাগীয়বীর ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার অপাঠ্য কেতাব তৈয়ারে স্কুলাদিতে অক্লেশ কাট্‌তি। আহা ইত্যাদি।

১৩। বরের বাপ ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার পাস করা ছেলে। আহা ইত্যাদি।

১৪। বাঙ্গালী বিদ্বান ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার ডিপুটীগিরি, অভাবে দারোগাগিরি। আহা! আশঙ্কায় স্বজাতিগণ সতত সশঙ্কিত, ইহা কি কম কথা, কম গৌরব, কম অভিমানের সুখ! ইংরেজ-রাজত্ব না হইলে, আমাদিগের কোষ্ঠীর এ উচ্চফল কি ফলিবার কখন সুযোগ হইত?

১৫। বাঙ্গালী গ্রন্থকার ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার সুলভ ছাপাখানা, কাব্য নাটক নবেল যাহার ইচ্ছা সেই লেখ, এবং যেমন লেখ তেমনি ছাপাও। আহা! এমন সুগম ছাপাখানা না থাকিলে, আমরা বা কোথায় থাকিতাম এবং আমরা কোথায় থাকিলে নিরভরণা বাঙ্গালা ভাষাকে, পাল পার্ব্বণে কতজনের চুড় চন্দ্রহারের ঝলসে, হয়ত শাঁখা থাড়ু লুকাইয়া কোণঠাসায় কাঁদিতে দিন যাইত!

১৬। প্রেমিক ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার বৃত্তিপাসকরা গৃহিণীর প্রেমলিপী। আহা ইত্যাদি।

১৭। প্রেমিকাভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার ডাইমনকাটা মন ভুলানে গহনা এবং জামাজোড়া ও বডীস্।—প্রেমিক যেথানেই পাউক ও তাহার ভাগ্যে যাহাই থাকুক! আহা ইত্যাদি।

১৮। ধর্ম্মধ্বজী ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার বাহির চরিত্র ও ভিতর চরিত্র। আহা ইত্যাদি।

১৯। উকিল ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার ইংরেজী আইন আদালত। আহা ইত্যাদি।

২০। মক্কেল ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার আদালতে অর্থথোলসা। আহা ইত্যাদি।

২১। ধনী ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার ইংরেজ ম্যানেজার। আহা ইত্যাদি।

২২। নির্ধন ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বে সার, কি বলিব? আহা ইত্যাদি।

২৩। রাজ্যযুক্ত রাজাভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার পলটিকেল এজেণ্ট। আহা ইত্যাদি।

২৪। রাজ্যশূন্য রাজা ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার তোপ খাওয়া। আহা ইত্যাদি।

২৫। বাঞ্ছারাম ভাবে।—ইংরেজ-রাজত্বের সার এই পঞ্চবিংশ আহা তত্ত্ব। আহা! ইংরেজরাজত্ব না হইলে আমার এ পঞ্চবিংশ আহা-তত্ত্ব কোথায় থাকিত; আমাকেও হয়ত তদ্ভাবে উপরে কথিত স্ত্রীস্বাধীনতা প্রার্থীদের ন্যায় মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইত!

এহেন যে কল্পতরু ইংরেজরাজত্ব তাহা চিরজীবী হউক।

খেলেনা সম্পূর্ণম্।

মদ্যমোদক।*

(বাঞ্ছারামের শেষ বাঞ্ছা।)

১২৮৫।

"বম্ বম্, হর হর হর,
মত্ত—দেবগণ সুরার লাগিয়া ;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাসিয়া।"—কবি।

বিকার।

দাদা জলধর!

'বম্ বম্ বম্ হর হর হর,'—কিন্তু ভায়া, তুমি বড় নিরেট বোকা! নতুবা তোমার নিরানন্দ সংসারে আজি হটাৎ কেন এত আনন্দ ;—গণ্ডস্থল স্ফীত, চক্ষু দুটি ছুটিয়া বাহির হইতেছে,—কেন আজি এ হাঁসির লহর এমন উথলিয়া উঠিতেছে ;—কি দেখিয়াই বা চলিয়া যেন সেই লহরে ভাবে গদ্‌গদ্, গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে? আবার এ কি রকম!—বাঁকা চখের ও কুটিল চাহনি'কেন? এযে হাসি, এযে আমোদ, এই কটাক্ষ, এযে আদর ধরে না! কি ইঙ্গিত করিতেছ?—কি আহ্লাদ! হরি হরি! তাই বটে, তবেকি মদ দেখিয়াছ! মদের প্রিয় মাতাল দেখিয়াছ বলিয়া? ভাল, তাহাই হউক ; অথবা তুমিই মাদকমত্ত, অধঃপাত-পথের ত্বরিত যানে বসিতে পাইয়াছ

---

* ভাবিতব্যশূন্য ভাষাপ্রিয় সাম্প্রদায়িক সমালোক উন্মাদ করিবার ইহা মহৌষধ। মূল্য ৩॥০, অপাঠ্য গ্রন্থরচকগণের নিকট অর্দ্ধ মূল্য। কমিসন শতকরা ১০্, অর্থাৎ ঘরের কড়ি দিয়া বিদায় ;—এবং সমালোচক বাবুকেও সেই সঙ্গে।

সাধারণের উপকারার্থে এই প্রকাশিত মহৌষধ 'গ্রীক এবং হিন্দু' লেখকের পচা কাগজের থলির ভিতর পাওয়া যায়। ইহা কাহার প্রস্তুত, থলির মালিকই বলিতে পারেন। ইহা বহুরূপী জলধর দাদার মদের লড়াইয়ের কোন কাহিনী হইবে, কি অন্য কিছু, তাহা বড় একটা ঠিক বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক মালিকত্বের অস্থিরতা হেতু, আমিই ইহাতে সহি করিয়া মালিকত্বের প্যাটেন্ট লইলাম, অতঃপর আর যেন কেহ ইহার অনুকরণ বা নকল না করেন ; তাহা হইলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ইতি।—বাঞ্ছারাম।

বলিয়া ? কিন্তু, মূর্খ! আমি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, এত আনন্দ, এত হাসি, ভাল নহে—চির নিরানন্দ মধ্যে এত তুফানময়ী আনন্দ ক্ষণিক ও ক্ষণ-স্থায়ী হইয়া থাকে ; উহাতে শয়তানী—শয়তানী গন্ধ কয়, তাই বলি হঠাৎ এত তোলপাড় আনন্দ ভাল নহে। তুমি দুর্ভাগ্য ! হায় হায়, তুমি দুর্ভাগ্য!—মধুক্রম পাইয়া, মধুক্রমে বসিয়া, মধুপান তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না ; কেবল মাছির বিষ্ঠায় দন্ত-ওষ্ঠ আঠায় জড়িত করিয়া মুখ বিকৃত করিতেই তোমার জীবন শেষ হইল। কি আক্ষেপ! আমোদে মদে সুখে দুঃখে দিন যেতেছে মন্দ নয় ; নির্ব্বোধের দিন এইরূপেতেই গিয়া থাকে, কিন্তু দিনান্তে ? দিনান্তেও এ আমোদ থাকিবার উপায় পুঁজি কিছু আছে কি, কিছু করিয়াছ কি ? না সেখানেও ফিকির ফাকারে, ঐশ্বর্য্য পদ বা ডিপ্লোমেসী এবং হুকুম হাকামে হাঁসিল কাজ হাতে আনিবে ভাবিয়া রাখিয়াছ ? দেখ, বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে দুঃখও হয়, হাঁসিও পায় ! তুমি বলিতেছ রাগও হয় ?—না, তাহা হইলে নিরাগ হইব কখন !

অবিনশ্বর অনন্ত গর্ভদিয়া আমার জীবনগতি হইলেও, নশ্বর সময়চক্র আমার অধিষ্ঠানভূতা ও অবলম্বনীয়া। এবং সেই চক্রের নিয়ত আবর্ত্তন-শীল স্বভাব হেতুই আমার এই গতিবৈচিত্র ;—এজন্য কখনও উঠি, কখনও পড়ি ; কখনও দেখি, কখনও দেখাই ; কখনও হাঁসি, কাখনও কাঁদি ; তাই আমি এ সংসারে কখনও জ্ঞানী, কখনও পাগল ; কখনও আমীর কখনও ফকির ; কখনও বা হরিবোল দিয়া হাটের মাঝে ভাবতরঙ্গে গড়াগড়ি দিয়া থাকি ! আমার এ জীবনগতির পরিমাণ ?—আদি ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু অন্তভাগে অনন্ত। মধুর মদ্য,—মদিরা এ অনন্ত গতির উদ্দেশ্য এবং সঙ্গিনী, উভয়ই। বারুণি সুন্দরি ! তুমি আমার পক্ষে দান্তের বিয়াত্রিশ, মহম্মদের জিব্রেইল। মূর্খে তোমার মর্ম্মই কি কর্ম্মই কি কিছুই বুঝেনা, কি বুঝিবে! তোমার মানসমূর্ত্তি মানসনেত্রে যে একবার দেখিবে, সে কি তোমায় কখনও ছাড়িতে না ভুলিতে পারে ?—ভাবে ঢগাঢগ, তাতেও কি আবার সন্দেহ ? তুমি না থাকিলে, না জানি এ দুরন্ত কাল-তরঙ্গে কে আমার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত ; না জানি তোমার অভাবে সে তরঙ্গের কোন্ অজ্ঞমত

গুহায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম! তুমি আমার এমনি রত্ন,—চিরং জীব। কিন্তু আজি তুমি এমন হইলে কেন? টক্, তিক্ত, কটু, কষায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোন্ পাষণ্ড আজি তোমার এ মূর্ত্তিবৈরূপ্য সাধন করিল! কেন তুমি আজি এরূপ বিরূপ মূর্ত্তিতে উদর গুহায় জড়সড়, লুকায়িত; আবার থাকিয়া থাকিয়া এমন তোলপাড় আরম্ভ করিয়া ফিরিতেছ; কিজন্য! স্থিরোভব। স্থির হইবে না?—কেন?

অবলম্বনভূতা সময়-চক্রের গতি প্রভাবে, আমার এই জীবন-গতি কখনও স্বর্গের ঊর্দ্ধ প্রান্ত, কখনও বা নরকের অধঃপ্রান্ত দিয়া। নরক মার্গে নরকচরগণের স্পর্শ বারণার্থে, আমাকে কতই না হো হা করিয়া নরকচর তাড়াইতে তাড়াইতে যাইতে হইতেছে; কিন্তু ঐ দেখ, তথাপি তাহারা খেউ খেউ শব্দে পশ্চাতে পশ্চাতে আমার পদসঞ্চার অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আবার ঐ দেখ, মদিরে আহ্লাদিনি! তোমাকে দেখিয়া কতই হাঁসিতেছে, কতই হাত তালি দিতেছে, কত কি বলিতেছে, কত অঙ্গভঙ্গি করিতেছে! ছি ছি ছি! তুমি ও সকল শুনিও না; তুমি ও সকল শুনিও না, ও সকলে কাণ পাতিও না, মাথার দিব্য; কিন্তু কই? চোখের মাথা খাও! তুমি কি তাই ভবে এত ভয় পাইয়া, আজি আমার এই উদর-গুহায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া তোলপাড় করিতেছ? অধঃপাতে যাও! ভয় নাই, ভয় নাই, উন্মাদিনি! আদরিণি! বলি একবার ভেবে দেখ দেখি, ভয় কি! উহাদের ঐ খেউ খেউ, খেউ খেউ মাত্র; স্পর্শ করিতে পারিবে না। ক্ষণেক স্থির হও, এভাব বেশীক্ষণ থাকিবে না; বলি একবার ভেবে দেখ দেখি, এখানেই যদি ভয় বিস্ময়ে অধঃপাতে যাও, তবে গন্তব্য স্থানে যাইবার উপায়?—জানিতেছ না, তাহা হইলে যে তুমি আমি দুজনেরই পতন মরণ হাতে হাতে; দুজনেরই যে গয়া গঙ্গা এইখানে,—একেবারে যে রসাতলে যাইতে হইবে তাহা কি বারেক ভাবিতেছ না? তাই বলি, আবার বলি, স্থির হও। পার্শ্বস্থ এ নরক দৃশ্য, এ নরক রব, না সহিতে পার চক্ষু ঢাক, কাণে আঙ্গুল দেও; দেখিয়া দেখিও না, শুনিয়া শুনিও না; যাহা সাহসে না পারিলে, তাহা কৌশলে সম্পন্ন কর; কৌশলেরও সার্থকতা আছে, সে সার্থকতা এইরূপে;—উদ্দেশ্য ভুলিও

না। এই দেখ, আবার এই আমরা দেখিতে দেখিতে উচ্চমার্গে উঠিলাম। প্রিয় সজিনি! এখন তোমার ভয় ছাড়,—উদর গুহা ঠাণ্ডা হউক। এখন একবার তোমার সেই ভাব-গম্ভীর মোহিনীমূর্ত্তি খানি বারেক বাহির কর দেখি; সকলকে একবার দেখাও, দেখুক সকলে; দেখুক যে, তোমার সে মূর্ত্তি কি মনোমোহিনী, প্রমোদিনী, মনঃ-প্রমোদবানর পক্ষে তাহা কখনও ভুলিবার জিনিস কি না। নরক মার্গের ন্যায় এখানে দর্শকের সংখ্যা অধিক নহে! এখানে দেখিবার লোক অল্প বটে। কিন্তু যতই অল্প সংখ্যক হউক, যে কয়টি লোক দেখিবে তাহারা দেবতা; এবং যে চক্ষে তোমায় দেখিলে ভুলিতে পারা যায় না, যে চক্ষে দেখিলে মাধুরীতে তোমায় মোহিত হইতে হয়, তাহারা তোমাকে সেই চক্ষেই দেখিবে। সজিনি! প্রিয়তমে! তবে উঠ উঠ, স্বীয় মনোরমা মূর্ত্তি একবার ধারণ কর, চরাচর শীতল হউক। "দে মদ্,—দে মদ্; বম্ বম্ বম্ হর হর হর, দেও বাবা, দে মদ্!"

উচ্ছ্বাস।

ভালকথা, মদিরে! আমার সে দিব্য চক্ষু কোথায়? বাড়ী ফেলিয়া আসিয়াছি! ছি ছি, এমন কাজও করে;—যাও, তবে আবার যাও, সেই অনন্তধামে আমার পিতৃভবনে, যথায় বিদেশগামী যাত্রিগণ বিদেশ গমনার্থে সমবেত হইয়া অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে, তথা হইতে আমার সেই দিব্য চক্ষু লইয়া আইস।—আমি একবার এই উচ্চ গগণমার্গে অনন্ত শোভা সন্দর্শন করিব।

মেঘের সঙ্গে সূর্য্য এতক্ষণ অনেক হাতাহাতি করিয়া, এই কতক্ষণ হইল, অস্তপর্ব্বত শিখরে গমন করিয়াছে। রৌদ্র কিছুমাত্র নাই। আকাশে যে দু একখানি মেঘ সূর্য্যরঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে পাংশু, পরে ধূম্র, শেষে ঈষৎ নীলিম ভাব ধারণ করিয়াছে। সান্ধ্যসমীরণ নূতন জলকণায় মন্থর গতি। থাকিয়া থাকিয়া শালবন হইতে কুসুম গন্ধ আনিয়া নাকের কাছে ধরিতেছে। দৃশ্যের দূরপ্রান্তে গগণসোপানে আলম্বিত নবীন মেঘমালা পর্ব্বতচূড়া অতিক্রমে ভূমিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। উহাদের নীলবর্ণ নবীন রাগে প্রদোষের অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া দিবমরকে

কেমন ঘোরাল করিয়া তুলিতেছে। পাখিটি ডাকিতেছে,—তাও ধীরে ধীরে, তালে তালে; পাতাটি নড়িতেছে,—তাও আস্তে আস্তে, বিনা রবে।—প্রকৃতি যেন আজি শ্যামসোহাগীনী বৃন্দাবনের রাধাসুন্দরী হইয়া শ্যামের অশাম রূপের ছটা বিস্তার করিতে বসিয়াছেন; ঠোঁটে ঠোঁট লাগাইতে পারিতেছেন না, পাছে তাম্বুল রাগ নষ্ট হইয়া শ্যামের দৃষ্টিতে না পড়ে। অথবা ইনি আমাদের আফিস-বাবু, আটপহরে পোষাক ছাড়িয়া, পোষাকি বেশে থরে থরে আফিস সাজাইয়া, চটক-চটুল ঢিমে গম্ভীর কাঁদ কাঁদ-বিনীতভাবে তত্ত্বাবধায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; প্রকৃতি! তোমার আফিসের তত্ত্বাবধায়ক কে? এত জিজ্ঞাসা করি, এত দেখিতে চাই, তথাপিত একটিবারও তাহাকে ভাল করিয়া দেখাইলে না।

এই সন্ধ্যারাগে ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গে, মদিরে! দেখ দেখি, যথায় ঐ আকাশে পাহাড়ে মিশামিশি, অন্ত এবং অনন্তের আজি কেমন সমাবেশ সাধন হইয়াছে। * দেখ দেখ, একবার চাহিয়া দেখ, এ যুগল দৃশ্যে তোমার জন্মান্তরীণ কথা মনোমধ্যে উদয় হয় কি না। কি অপূর্ব্ব ভাব,—মায়া দেবীর লীলা কি অদ্ভুত! অন্ত মুচকে হেঁসে, আড় নয়নে, আধ ঘোমটায়, নাচিয়া নাচিয়া, অনন্তের গলা ধরিয়া খেলা করিতেছে, দেখিলে আমাতে আমার জ্ঞান থাকে না। আর অনন্ত?—বিরাট দেহ, বিরাট বেশ; মুকুটচূড় আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, পদতলে শেষনাগ, গম্ভীর গর্জ্জনে দিগ্বলয় কম্পমান—হিমাদ্রি ডুবিতেছে, মন্দর উঠিতেছে। ভাব-গম্ভীর মাধুর্য্যে ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ, ইত্যাদি যুগপৎ সমুৎপাদন করিয়া দর্শকের হৃদয় আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তথাপি অনন্ত অন্তে এ বিরোধী-স্বভাবে এমন মিল? —এমন লৌহ চুম্বকের প্রণয়?—আবার এত মনোহর? হায়, হায়! কি বলিব! ওরে আমার আষরিণি, তাহাইত বটে; নতুবা সন্ন্যাসী এবং সংসারী

* নিগেটিব এবং পজিটিব এদুয়ের মিলন হইলেই ফলের উৎপত্তি হয়। অন্ত অনন্তের এ মিলনে আজি যে এই প্রবন্ধরূপ অপূর্ব্ব ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, পাঠকবর্গকে বোধ করি তাহার আর অধিক পরিচয় দিতে হইবে না। এখন এ ফল ভোগে আসিবে কার? বাঁশ হইলেই যে ঠাকুরের কাঠামর উঠে এমন নহে;—সৌভাগ্য ক্রমে বঙ্গভূমে মেথরও অনেক! পুনশ্চ,লেখারভাবে বোধ হইতেছে, এ প্রবন্ধটি বর্ণিত অবস্থাযুক্ত কোন এক সন্ধ্যায় সময় চতুর্দ্দিক পর্ব্বতবেষ্টিত নির্জ্জন প্রদেশে লিখিত হয়।—বাহারাম।

উত্তরই কি একেবারে ও একাধারে হইতে পারিতাম, না হইবার দরকার হইত! বল এবং তেজ, কাঠিন্য এবং কোমলতা, রৌদ্র এবং শান্তি, হর্ষ এবং বিষাদ, চৈতন্য এবং জড়, কাল এবং কালী, পুরুষ এবং প্রধান,—ইহারই উহা সামঞ্জস্য ইহারই উহা সমাবেশ। এখন একবার দেখ দেখি, এযুগল দৃশ্য কি অদ্ভুত! এ মিলনপার্ব্বণে আনন্দে একবার হরিহরি বোল দেও। দেও একবার "দে মদ—দে মদ, বম্ বম্ বম্ হর হর হর, দেও বাবা, দে মদ!"

বাসনা।

উন্মাদিনি! আইস তবে আজি আমরা অনন্তকে ধরিব। উহা যে রোজ্ রোজ্ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়, দেখিও আজ যেন তাহা হইতে না পারে। আইস তবে, আজি উহাকে ধরিবই ধরিব,—এমন সুযোগ আর হইবে না; সুধু ধরিব না, আজি উহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিব। বল কি? অনন্তকে এমন হাতে নোতে দেখা পাইয়া, আজি কখনই উহাকে পলাইতে দেওয়া হইতে পারে না। দিব্য চক্ষুত আছেই আছে—লুকাইবে কোথায়? কিন্তু মদিরে, ষড়দর্শন বা ষড়সহস্র দর্শনের রজ্জু গাছটি একবার লইয়া আইস, উহাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিব যে, পুলিস হারি মানে; কোন মতেই পলাইবার সুযোগ না পায়। কিন্তু এ কি! এ কি! সহসা কে এমন গহন গম্ভীর মুখ ব্যাদান করিয়া রক্ত চক্ষে আস্ফালন করিতে করিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে!—কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যেন কৃষ্ণ-রেখা বেষ্টিত দিগদাহী, বিশ্বদাহী জ্বলন্ত সৌরমূর্ত্তি, আদি নাই, অন্ত নাই; সূর্য্য উপাড়িয়া, নক্ষত্র গিলিয়া, অঘোর নৃত্য; বেগপ্রকম্পনে বিশ্বচরাচর টলটলায়মান, নক্ষত্র নীহারিকাপুঞ্জও লূতাতন্তুবৎ বসনাঞ্চল সংলগ্নে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বোম্ কেদার! বাবা তারকনাথ, উহা কি আমাকে তবে গ্রাস করিতে আসিতেছে? আবার এ কি! এ আগুনের ঝলক কোথা হইতে আসিল,—কোথা হইতে আসিয়া এমন ঝলসাইতে লাগিল! হায়, হায়! দেখিতে দেখিতে এক ঝলকেই আমার ষড়দর্শন-রজ্জু, মদিরে, আমার ষড়দর্শনরজ্জু কোথায়? আমার ষড়দর্শন রজ্জু পুড়িয়া ছাই খাক! কি বিষম বিপদ, দুর্গা দুর্গা দুর্গা,—দায়ে পড়িয়া পুঁছুল দুর্গাকেও

* ডাকিতে হইল গা! হায় হায়, ক্রমেই, ক্রমেই জ্বালা জ্বলিত হইতে চলিল। অগ্নি অঙ্গস্পর্শ করিল!—অনন্ত জ্বালা জ্বলিল; আগুণ, আগুণ, জ্বলিয়া মরি! জ্বলিয়া মরি! অনন্ত, ক্ষান্ত হও, আমি নহি—ক্ষান্ত হও, দোহাই তোমার দোহাই আমার, আমার আমিত্ব লোপ করিও না! রক্ষা কর—রক্ষা কর!—দোহাই—দোহাই!—আর না—আর সহে না—আমার আমিত্ব যায় যে!

মদিরে! সঙ্গিনি! ম্রিয়মাণ হইও না। উপহাস করিতেছ? ঠেকিতে ত বুঝিতে! বিশেষ কাপুরুষ ভেল্কীদারের উপর উপায় কি?—অনন্ত ভেল্কী দেখাইয়া পলাইয়া গেল, কি করিব?—ভেল্‌কীর উপর শক্তি থাকে না। নতুবা পাষণ্ড যদি একবার দাঁড়াইয়া সম্মুখযুদ্ধ করিত, তাহা হইলে একবার দেখাইতাম, এবং তুমিও একবার দেখিতে পাইতে যে আমি কত বড় বীরপুরুষ, এবং আমার বীরত্বই বা কি দুষ্কর! ভাল, অনন্ত পলাইয়াছে, পলাক; যাহা গিয়াছে তাহাতে আর হাত নাই! কিন্তু ঐ যে অন্ত দেখিতেছ, উহাকে ধরিয়া তোমার দাসানুদাসী করিয়া দিব,—কেমন তাহা হইলে তোমার মন উঠিবে না? তোমার আঁকা বাঁকা হাসির রেখা কাটিবে না? অন্ত আসিলেই অনন্ত আপনা হইতে আসিবে, কাণ টানিলেই মাথা আসিয়া থাকে। আইস, আমরা আজি এই অন্তময়ী অবনীকে আমূলত পরিদর্শন করিয়া উহাকে আয়ত্ত করিব। কিন্তু এক কথা, তদুপযুক্ত স্থান কোথায়?—কোথায় বসিয়া দেখিলে সমস্ত এককালে আয়ত্ত এবং নজরে আসিবে?—চিন্তাকুলতায় সংজ্ঞাশূন্য! স্নেহময়ী মায়াদেবী সানুকূলা, দর্শনস্থানের উপযুক্ত ধ্রুবতারায় নীত করিয়া অদৃশ্যা। আহা, এ উপযুক্ত দর্শন স্থানই বটে! আনন্দে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ—স্বভাবজ ও তদুপলক্ষিপ্ত চিত্রযুক্ত মনকে সহকারী করিয়া, ধ্রুবতারার কিনারা ঘেঁসিয়া বসিলাম। আমার নিত্য সহচরীরূপিণী বুদ্ধিদায়িকা হুঁকা তামাকের সুখের হাটে, ছেঁড়া

---

* একদা এক জাহাজাধ্যক্ষ মুনসেফ, সমুদ্রে গমনকালীন জাহাজের ওলট পালটে ভীত হইয়া, যে দুর্গা নাম ডাকিয়াছিল; এখনও তাহা মনে করিলে আমার হাসিও পায়, দুঃখও হয়।—গ্রন্থকার।

চটে খাটিয়া পৃষ্ঠে,তোড়—জোড় সঙ্গে, সুখাসনে সমাবিষ্ট! আমূলত অবনী পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমুদ্যত; এখন দেখ একবার, কেমন দেখায়।

ভাবিয়াছিলাম, এক দৃশ্যে আমূলত অবনীদর্শনে নাজানি কতই শোভা সন্দর্শন করিতে পাইব।—এদিকে ধবলকুট হিমাদ্রি শৃঙ্গ, শত শৃঙ্গে গগণ পরিমাণ করিতেছে; ওদিকে ঐ সমুদ্র তরঙ্গ ষষ্টি হস্ত উচ্চতায় ভিষণ বেগে, আমেজনের পথে প্রবিষ্ট হইয়া, মেরু হইতে মেরু ব্যাপ্ত আণ্ডি-সের চরণ ধৌত করিতে চলিয়াছে। উত্তরে ঐ তুষারধবল মেরু-স্থান, বৈধব্যম্লান ক্লিষ্টমনে, জন্মান্তরীণ সুখ কামনায়, আরোরা বোরিয়ে-লিস্ রূপ দীপ দানে, অনন্ত-পদে পূজোপহার প্রদান করিতেছে; আবার অন্যদিকে ঐ পূর্ব্ব সমুদ্রে, সাধুগণের পূজন উপলক্ষ্য নারায়ণশীলা নির্ম্মাণ করিয়া, পলাকীটেরা গগণস্তূপে স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে। এদিকে গহন গিরি হেক্লার ঐ গগণমার্গে ঘন গম্ভীর অগ্নি-উদ্গীরণ; ওদিকে আবার ঐ শত বজ্র নির্ঘোষে, পর্ব্বতশির লঙ্ঘন করিয়া, সহস্র ইন্দ্র-ধনু-বিনিন্দিত নায়াগ্রার জলপ্রপাত। দুলিতে দুলিতে, ভাসিতে ভাসিতে, উত্তর সমুদ্র বাহিয়া, ভল্লুক-চূড় দুরন্ত হীমশিলা তাপ আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণ সমুদ্রমুখে চলি-য়াছে; আবার ওদিকে ঐ উহাকে আহারীয় জ্ঞানে দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া অজগর তিমি করাল মুখ বিস্তার করিয়া উত্তরসমুদ্র মুখে ছুটিয়া আসিতেছে। পর্ব্বে পর্ব্বে, স্তরে স্তরে, স্থল, জল, বন, পর্ব্বত, নদী, গুহা, ক্ষেত্র, মরু, পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থলে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান; আর মাঝে মাঝে তাহার শ্বেত পীত নীল লোহিত দ্বিপদগণের বিচরণ,—সুখ, দুঃখ, শোভা, বিলাস, দ্বন্দ্ব, কলহ, ভয়, ত্রাস, প্রেম, কুচ্ছ, পরিবাদ আদি নানা রঙের বিবিধ ভঙ্গিতে, যেন টু দিয়া দিয়া বিশ্বগৃহে বালকের দল লুকচুরি খেলায় উন্মত্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের চক্ষে ধুলা দিবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। হরি হরি! কিন্তু কই? কোথায় বা সে জলকল্লোল,—কোথায় বা মেঘবাহনে বিদ্যুৎঘোষ! কোথায় বা সে নদী পর্ব্বত গুহা বন, আর কোথায় বা সে হীমশিলার দক্ষিণ গমন! ভাবিয়া-ছিলাম, এ সুবিস্তারময়ী অবনী এক নজরেই, পুতুল সাজান সুন্দর একটি মণিহারির দোকানে পরিণত হইয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে,—আমার আয়ত্তাধীনে আসিবে! বোম্ ভোলা!—কিন্তু কই?

অশান্তি।

কিন্তু কই?—কত কি দেখিব বলিয়া যে বসিয়াছিলাম, সে সকল কোথায় ? সম্মুখে এ কি দেখিতেছি,—এত যাহা দেখিতেছি সে কাঠ আঁটা কাগজের উপরে দুইটি গোলক মাত্র অঙ্কিত। সে নায়াগ্রা কোথায়, আমেজন কোথায়, উত্তর সমুদ্র কই, শতশৃঙ্গে সে হিমালয়ই বা কোথায় ? আর সে পলাকীট, সে পলাদ্বীপ, সে সকলই বা কই ? এযে দেখি কেবল হিজি বিজি রাঙা কাল রং মিশান কালির আঁচড় ! গ্রাম কই, নগর কই ?—এযে কেবল ছোট বড় রাশি রাশি বর্ণযোজনা,—কালির আঁচড় ! লুকোচুরি খেলাপ্রিয় সে শিশুর দল কই ? যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কই ? এযে কিছুই হইল না, সত্য সত্যই আমার বীরত্ব কি তবে এই পর্য্যন্ত ! অন্ত আয়ত্ত করাই এত কঠিন, আমি আবার অনন্তকে আয়ত্ত করিতে যাই ! আমায় ধিক্, আমার বাসনায় ধিক্ ! যে বাসনা শক্তির সঙ্গে পরিমাণ রাখিতে না পারে, সে বাসনা যে মূল হইতে উঠিয়া অনাহত নাহক নাহক আমাকে জ্বালাতন করিয়া যাইতেছে,—যাহা জ্বালাতন করা ভিন্ন আর কিছুই জানেনা,—তাহার মূল, নির্ম্মূল না হয় কেন ?

আর মদিরে ! কালামুখি ! তুমিইত যত নষ্টের গোড়া ! তুমিই আমাকে অযথা প্রলোভনে এরূপ মজাইতে বসিয়াছ। জানিয়া শুনিয়া মজাইতে বসিয়াছ ; না জানিলে, ওরূপ বাঁকা হাসি হাসিতে না। যদি জানিতে আমার সামর্থ্যের অতীত, তবে কেন তুমি আমাকে এমন করিয়া মাতাইয়া এ শঙ্কটে, এখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলে ? যাও, এই তুমিও অধঃপাতে রাঁড়ি !—তবে যাও ! বোতল শূন্যগর্ভে নিক্ষিপ্ত। বোতলটি খেদে, অভিমানে, রাগে ঘুরিতে ঘুরিতে, ফুলিতে ফুলিতে, কোথায় যে লুকাইয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। তখন বিষাদভরে অনেকক্ষণ তাহার সেই পতন-পথে চাহিয়া রহিলাম, দৃষ্টি বিস্ফারিত হইল, তথাপি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; কেবল গগনের দূরপ্রান্তে মোহ-তিমির ভেদ করিয়া কালসমুদ্রের একটি মাত্র তরঙ্গঝলক আকাশে আস্ফালিয়া বিদ্যুৎবৎ নয়নপথে পড়িল, আর কিছুই পড়িল না ! তাহাও মেঘনষ্ট সায়াহ্নিক স্তিমিত সৌরকরবৎ মলিন প্রভায় দেখিতে দেখিতে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। এখন বুঝিলাম, বোতলটি সেই তরঙ্গঝলকের

আকাশ-আস্ফালনে নিমজ্জিত। হায়! এখন সে নষ্ট ধনের মর্ম্ম আমার হৃদ্গত হইতেছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘা দিয়া দিয়া হৃদ্গত হইতেছে। হায়, সুধাবদনে, কোথায় তুমি, তোমার অভাবে এখন আমি হৃতযষ্টি কাণা হইতেও কাণার দশায় পরিণত! আমি সহায়শূন্য! সঙ্গিশূন্য, এই অপরিচিত দেশে একাকী। ইহার উপরেও আবার বিপদ হইতে বিপদ! চারিদিকে ঐ তিমিরজাল গাঢ়তর হইয়া আবরিত করিল; প্রলয় বায়ু বেগভরে স্বন্ স্বন্ করিয়া বহিতেছে, ওদিকে ঐ থাকিয়া থাকিয়া নরকচরগণের দূর অস্ফুটশব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিম্নে ঝঞ্ঝাবায়ু, উপরে প্রলয় ঘনঘটা, দিক্সমূহ অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। আমি পথশ্রান্ত, জীবনশ্রান্ত, কোথা যাই, কে আমায় রক্ষা করে। স্নেহময়ি মায়াদেবি! মা তুমি কোথায়।

গহনাবর্ত্ত।

"স্নেহময়ি মায়াদেবি! মা তুমি কোথায়!"—মাকে কোথায়ও দেখিলাম না! মায়ের পরিবর্ত্তে, ঘোর প্রলয়াবর্ত্তগর্ভে জলিত-জ্বালা শূন্যকোটর হইতে উত্থিত একটা অস্ফুট বিকট শব্দ আমার ডাকের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল; সেই শব্দে বধির কর্ণ, উৎক্ষিপ্ত হৃদয়, প্রাণ অমনি নিদারুণ চমকে চমকিয়া উঠিল। ভয়ে ত্রাসে কাতরে আবার ডাকিলাম, "স্নেহময়ি মায়াদেবি, মা তুমি কোথায়?" মা তবু শুনিলেন না। কিন্তু মাকে ডাকিতে এ কে?—কালরাত্রী!

আর বাক্ সরে না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে; কালরাত্রী ধীরে ধীরে কিন্তু স্থিরপদে ভীষণ মূর্ত্তিতে সমাগত। ধীরে—ধীরে, ক্রমে ফুস্ ফাস, সর্-সর্, তর্-তর্, স্বন্-স্বন্, গম্-গম্, গুম্-গাম্, শেষে ধূমধামের গুরুতায় জীবজগত চমকিত! অমনি দেখিতে দেখিতে, কে যেন নীলদ্যুতি বিকটশিরা ভীষণ বাহুসঞ্চালনে, কোটী কোটী অমাবশ্যার জরাসন্ধকারাগার সহসা উন্মুক্ত করিয়া দিল। বেগতিক দেখিয়া সূর্য্যশশী অস্তগিরি গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। আকাশগায়ে স্নে গগণগহনা জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা নিকর আজি কোথায়?—বিকট নীলনিরদের কালিমা রেখায় তাহারাও আজি লুকায়িত! দেখ দেখ, কি ভয়ঙ্করী দৃশ্য! মেঘ সকলের নিবিড় তিমির, কোটী অমাবশ্যার শ্যামাঙ্গে মিলিয়া, আঁধারে কঠোর অন্ধকারকেই

যেন গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে ; ভয়ে দিগঙ্গনাগণ পলাইত, বসুন্ধরা চকিত চমকে আবরিত! চরাচর ভ্রংশদৃষ্টি, দৃষ্টি স্বয়ং যেন দৃষ্টিশূন্য হইয়া ভীত ও কম্পিত হইতেছে। স্থিরে, ধীরে, অর্দ্ধোদ্ধত, রৌদ্রবেগে, দেখিতে দেখিতে তুমুল কোলাহলে ভূত সংঘর্ষণের আরম্ভ ; বিষম বায়ুর বেগবিকম্পনে ঘর উখাড়িয়া, বৃক্ষ উৎপাটিয়া, দিগ্বলয় ছিন্ন ভিন্ন। আকাশে কাল মেঘে থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিবর্ষণ, বায়ুর বিকট শব্দ ; জলের অস্ফুটঝর্ঝর ; আবার থাকিয়া থাকিয়া ঘন উদ্ধতঘোষে কৃতান্তের বিকটহাস্যবৎ লোহিতনীলাভ বিদ্যুৎঝলস, বিধ্বস্তদৃশ্যে, যেন ঘোর ঘূর্ণায় ঘুরাইয়া জগতকে রসাতলমুখে নিক্ষেপ করিতে চলিয়াছে। ঘন ভূকম্পনে ধীরা অবনী অধীরতায় টলটলায়মান ; উর্দ্ধে শত শত বজ্রনিনাদের গভীর নির্ঘোষ ; এদিকে এই অধে অভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতের কঠোর কল্লোল ; ওদিকে ঐ দূরে গিরিশৃঙ্গপতনের নির্ঘাতশব্দ ; আবার সর্ব্বোপরি বিপন্ন জীবের হৃদয়ভেদী কর্ণভেদী অন্তিম কোলাহল, কি এ ভয়ঙ্করী দৃশ্য ; কি এ সকলের ভয়ঙ্করী যুগপৎ বিকট সংমিলন। অঘোর নৃত্য অট্ট হাসে ভীষণা উন্মাদিনী মহারৌদ্রী, যেন গলদ্রক্তবদনা, যেন করালমুখ-ব্যাদানে জগত গ্রাস করিবার নিমিত্ত, উন্মাদবৎ বিকট হুঙ্কারে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া বসিয়া ছুটিতেছে। বধির কর্ণ, বধির হৃদয়, তথাপি শব্দে শব্দে প্রাণ চমকিত ; বিপদ কোলাহলে হৃদয় উদ্বেলিত, প্রাণ যেন অন্তিমত্রাসে ত্রাসিত, দেহ পিঞ্জরে ছটফটে আকুলিত হইয়া উঠিতেছে। উর্দ্ধে কালাগ্নি ভীতি ; নিম্নে সর্ব্বসহাবসুন্ধরাও আজি অসহ্য হইয়া ঘন কম্পনে নিষ্ঠুর উৎক্ষেপ করিয়া ফেলিতেছে। ঘরে আশ্রয় নাই, বাহিরে নিরাশ্রয় নাই, দিক্ সকলও গতিবিরোধী হইয়া বসিয়াছে। সঙ্গী সকল আপন আপন চিন্তায় কে কোথায় পলাইল ; অর্দ্ধাঙ্গিনী যে সেও আর এখন অপর অর্দ্ধাঙ্গের মায়া করিল না! কি স্থান, কি অবস্থা, কি কাল! হায়, হায়,—একা! একা!! একা!!! জগত একা, আমিও একা! একা দৃষ্টি—দেখিতে দেখিতে ঐ ভূমিকম্প, উল্কাপাত, অগ্নিবর্ষণ, বজ্রপাত, পতিতগিরির গভীর নির্ঘাত, জলের তর্ তর্ রব, বায়ুর গম্ গম্ শব্দ, বনস্পতির অন্তিম শ্বাস, গৃহপতনের গভীর ঘর্ঘর, বিপন্ন চরাচরের অস্ফুট বিপন্ন কোলাহল,আলো আঁধারে বিকৃতির বিকট মিলন, প্রকৃতির সঘন চমক,—সমবেতে কি এক

অদ্ভুতমূর্ত্তি ধারণে,লেলীহমান লক্ লক্ জিহ্বায় আকাশ লেহন করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। যেন যুগান্ত সময়ে মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত, যেন মহারৌদ্ররূপে একাদশ রুদ্র প্রলয়শূল আস্ফালন করিতে করিতে প্রধাবিত! যেন সে শূল আমাকেই লক্ষ্য করিয়া সমাগত হইতে লাগিল। চকিত দৃষ্টিমাত্রেই আমার অন্তরাত্মা শুকাইল, চঞ্চল চক্ষু অচল হইয়া উঠিল; যেন অন্তিমকাল ভাবিয়া বহু আয়াসে চিৎকার করিয়া উঠিলাম,—'জয় জগদীশ হরে'; ইহার পর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অন্তভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, শরীর যেন ক্রমে স্পন্দ রহিত হইয়া আসিল; কণ্ঠরোধ হয় হয়, বাহ্যজ্ঞান হরিয়াছে, অন্তঃজ্ঞান এখনও যেন একটু একটু আছে বলিয়া অনুভূত হইতেছে; এমন সময় সহসা, কে যেন আমার হাতে গলে বাঁধিয়া, সেই রুদ্র শূলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল; অস্ফুট ভাবে শুনিতে শুনিতে, সে হাসিও যেন কোন দূর বায়ুস্তরে মিলাইয়া গেল। আমিওসংজ্ঞা শূন্য হইলাম।

কতক্ষণ এরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। চৈতন্যের অস্ফুট পুনরুদয়ে বোধ হইতে লাগিল যেন, কি এক নিবিড় তমঃরাশির ভিতর দিয়া, কাহারা যেন আমাকে কোথায় কেন দূরান্তরে লইয়া যাইতেছে। এখনও সে পথান্ধকার ঘুচে নাই; কিন্তু তথাপি অন্ধকারের দূরপ্রান্ত হইতে কি যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দেশের আভাস অল্পে অল্পে, ক্রম ক্রমবর্দ্ধিত আকারে, আসিতে লাগিল। যতই নিকট হইতে লাগিলাম, ততই সে দেশও প্রকাশ হইতে প্রকাশতর হইতে লাগিল। ততই যেন কি এক অপূর্ব্ব শ্রুতিমধুর বংশীবাদনের রব কাণে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল; পৃথিবীতে এমন মধুর রব কখনও শুনি নাই। গোপনন্দনের যে মধুর বংশীরব শুনিবামাত্র, গোপিনীগণ অসমাপ্ত কার্য্য অসমাপ্তে ফেলিয়া, স্নেহের সীমা সন্তানাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ছুটিত; ইহা সেইরূপ মধুর বংশীরব। যতই কাণে পশিতে লাগিল, ততই যেন শিরায় শিরায়, ধমণীতে ধমণীতে শান্তি সঞ্চালিত করিয়া তুলিল। উহা কি দিব্য এবং অপৌরুষেয়?—তাই এমন মধুর!

আকাশ বাণি।

"ভ্রান্ত! নির্ব্বোধ! তুমি বোতলের প্রতি যে অবমাননা প্রকাশ করিয়াছ, তোমার কখনও মঙ্গল হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু এ বিশ্বরাজ্যের রাজা যিনি তিনি স্বয়ং মঙ্গলময়, তিনি শিব, তাই তোমার রক্ষা। এ বালকের ন্যায়, এ কাপুরুষের ন্যায়, তুমি এখন কেন কাঁদিয়া আকুল হইতেছ? উহা তোমার আপন দোষ, উহা তোমার স্বীয় কর্ম্মফল, উহা তোমার স্বীয় কর্ম্মসূত্র। সূত্রাংশ ছেদে কর্ম্মরত হও, বোতলকে পুনর্ব্বার উঠাইয়া লও, গলায় বাঁধিয়া রাখ, ভয় যাবে মঙ্গল হইবে। দোষ তোমার বোতলের নহে, দোষ তোমার দিব্য চক্ষের নহে, দোষ অন্য কাহারই নহে, দোষ তোমার নিজের। দোষ তোমার বাসনার; দোষ তোমার দর্শনাতীত যে অবলম্বন ভিত্তি, তাহার অভাবের। সেই এক অভাব দোষে, সকলই দোষের আকার ধারণ করিয়াছে; সে অভাবে সভাব আসিলে, তাহারাই আবার গুণাকর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। গন্তব্য স্থানের ঠিক থাকিলে, পথিককে পথ বাহনে প্রতিপদক্ষেপ জরিপ এবং পথ প্রতিরোধক প্রত্যেক কুকুর শিয়ালকে বিদূরিত করিয়া যাইতে হয় না; প্রত্যুত যে করে, সে কখনও যথাকালে যথাস্থানে পৌছিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ করিও; যেহেতু আকাঙ্ক্ষা অনন্ত, কিন্তু জগতগত সামর্থ্য অন্তবিশিষ্ট। আকাশে ফাঁদ পাতিতে যাইও না, আপন ফাঁদে আপনি পড়িবে। শতপর্ব্বে যে পর্ব্বত আরোহণসাধ্য, তাহার প্রথম পর্ব্বেই পদ দিয়া, দ্বিতীয় পদে শততম পর্ব্ব আরোহণ করিতে যাইও না। স্বীয় পদ বিক্রমে চলনক্রিয়া আবদ্ধ রাখিয়া উঠিতে থাক, তাহা সময় সাপেক্ষ বটে, কিন্তু চূড়ায় উঠিতে পারিবে; নতুবা পর্ব্বতগায় চূর্ণ হইয়া অধঃপাতে যাইবে। অতএব যাও, যষ্টিহস্তে, পদসঞ্চারে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, স্বচ্ছন্দে গমন কর; কি অন্ত কি অনন্ত কেহই তোমাকে গন্তব্যপথ দানে আপত্তি করিবে না। পৃষ্ঠ পার্শ্বে দৃষ্টি করিতে গিয়া অন্যমনস্ক হইও না। সোজা বুদ্ধি ও সহজ অবলম্বনে গন্তব্যপথ অতি সুগম ও অতি সহজ প্রাপ্য হয়; কেবল বহুবুদ্ধি ও কূটবুদ্ধির নিকটেই তাহা কুটীলতর এবং হয় ত সে বুদ্ধির বহুচালনে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া থাকে। যাও এখন, সোজা মনে সোজা পথে স্বচ্ছন্দে গমন কর, অবিলম্বে অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইবে।

মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

তোমার মঙ্গল হউক।"

আকাশবাণি থামিল, থামিবার সঙ্গে কি এক যেন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। সহসা দিব্যারণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহা একটু ঠাহর করিয়া দেখিলাম, তাহাতে কি দেখিলাম?—কি বলিব! বলিতে বাক্ সরেনা, লজ্জায় মুখ যেন চাপিয়া চাপিয়া ধরিতেছে! বলিতে কি, দেখিলাম যাহা তাহা সেই পোড়াকপালে গোপনন্দনের কুটীলকালমূর্ত্তি, যাহার বেণুরবের কথা এই এখনই কোথায় বলিতেছিলাম, মনে হয় না। সেই গোপনন্দন, যাহার বৃন্দাবনে অসংখ্য গোপিনী লইয়া রাসলীলা; দ্বারকায় যাহার ষোড়ষ সহস্র কামিনী লইয়া খেলা! আবার শুনিলাম সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিই না কি তোমার সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হিরন্ময়বপুধৃত মহাবিষ্ণু বৈরাজ পুরুষ স্বয়ং! আরও শুনিলাম কে বলিতেছে নাকি,—"আমিই বিষ্ণু, আমিই কৃষ্ণ, আমিই খৃষ্ট, আমিই বুদ্ধ! চরাচর যাহাকে ও যে মূর্ত্তিকে, যেখানে ও যে ভাবে, যে কিছু উপাস্যরূপে পূজে, তাহাও আমি; যথায় এবং যে কোন সাত্ত্বিক উপদেষ্টা, তাহারাও আমার অংশ এবং আমি স্বয়ং।" হরি, হরি, বাঞ্ছারাম, এ দেখি কেবল 'আমিরই' প্রকাণ্ড হাট বাজার!

কিন্তু ভ্রাতাগণ আশস্ত হও, আমি কি তেমন যে পৌত্তলিকতা স্পর্শ করিতে দেই! তবে যে এই দোষী কেবল চক্ষু এবং কর্ণ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সত্বরে তাহাদিগকে শাস্তি দিব; চক্ষুতে সূঁচ ফুটাইব এবং কাণকে কাটিয়া ফেলিব; কিন্তু এক কথা, আমার সেই সাধের মদের বোতলটি আনিয়া দিতে পার কি? পারিবে না? তবে কেবল বাজে কথায়, বাজেহাসি ও বাজে নিন্দায় পেট ভরে কি—বোতল কই?

শান্তি—মদের বাজার।

আকাশবাণি নিরস্ত হইল।—দূরশ্রুত গীতবাদ্যধ্বনি যেন ধীরে ধীরে দূর আকাশে মিশাইয়া গেল। আমার ও পূর্ণ চটক হইল, চৈতন্য নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসিল। পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি, ধ্রুব তারা আমার খাটিয়ার তল হইতে সরিয়া গিয়াছে। আমি সেই শূন্যমার্গে 'নযযৌ নতস্থৌ'

খাটিয়া বাহনে ঝুলিতে লাগিলাম। ভায়া, হরিশ্চন্দ্রের আজি কি শুভ স্বর্গারোহণ! ওদিকে ও আবার ঐ কি দৃশ্য? চরাচর সৃষ্টিসহ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রবলবেগে স্থানচ্যুত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম ও ঘাত প্রতিঘাতে খণ্ড খণ্ড, দীপিতে দীপিতে দপ্ দপ্ করিয়া, ভূতসাগর গর্ভে ছুটিয়া তাহাতে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত চুরমার, শেষে এক বিশাল অনন্ত ধ্বংসাবশেষ! তখন ত্রিবিক্রমরূপী এক বিরাট পুরুষ সেই সাগর তটে বসিয়া হুঙ্কারে সমস্ত সাগর শোষণ করিয়া ফেলিলেন;—কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, কি দুষ্কর কার্য্য! সেই পুরুষ প্রভাবে ভূত-সাগরও ভূতে মিশাইয়া গেল!

ওদিকে আবার ঐ গহণ-গম্ভীর কাল তিমিরাবৃত আকাশ গর্ভ ভেদ করিয়া কোন্ জ্যোতিষ্কের ঐ জ্যোতিস্পুঞ্জ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে যে, যাহার দৃষ্টিমাত্রেই এদারুণ তিমির এরূপ ম্লান হইয়া গেল? আবার সম্মুখে একি! আমি একাল ধরিয়া যাহা কিছু করিয়াছি, বলিয়াছি ও ভাবিয়াছি, তাহা দারুণ দুই অগ্নি শিখারূপে লক্ লক্ জিহ্বায় আকাশ লেহণ করিতে করিতে আমার দিকে প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। একটি বিমল স্বর্ণকান্তি, যত উর্দ্ধে উঠি-তেছে, ততই যেন স্ফীত হইয়া আসিতেছে; আর একটি নীল দীপ্তি লোহিত লৌহ-জ্যোতি, উত্তরোত্তর যত উঠিতেছে ততই যেন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; শেষে স্বর্ণকান্তি শিখার প্রাবল্যে উহা পরাস্তহইয়া,এক বিকট মূর্ত্তি বিকট বেশ বিকটদৃষ্টি অগ্নিজিহ্ব পুরুষের অঙ্গে গিয়া লয় প্রাপ্ত হইল। স্বর্ণকান্তি শিখা তখন উজ্জল হইতে উজ্জলর, তাহা হইতে আরও উজ্জল হইয়া আমাকে আবরিত করিল। আহা! কি মধুর সুস্নিগ্ধ শিখা,স্পর্শে যেন দেবত্ব লাভ! পরে যে আমাকে সেই শিখা আবরিত করিয়া অনন্ত প্রভাবে কোথায় লইয়া চলিল, তাহা অনন্ত দেবই জানেন। আমি চলিলাম, হাঁসিতে হাঁসিতে চলিলাম, দুলিতে দুলিতে খাটিয়া বাহনে সুখাসনে বসিয়া চলিলাম। কি তৃপ্তি! কি শান্তি! কিন্তু কই? আমার মদের বোতল?—তাকাইয়া দেখি আমার ওষ্ঠেই সংলগ্ন! হরি হরি! দে হরিবোল! "দে মদ! বম্ বম্ বম্ হর হর হর,—দে মদ, দেও বাবা, দে মদ!" শ্রীবাঞ্ছারাম।

ইতি মদ্যমোদক।

সাময়িদ জাতি।

(প্রথম বয়সের লেখা।)

সাময়িক জাতি।

ধর্ম্ম বিশেষ, আচার বিশেষ, সকলেই এই মত ঘোষণা করিয়া থাকে যে, তদনুবর্ত্তী হও হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে; অননুবর্ত্তী হও নরকে যাইবে। শুধু এখানে ক্ষান্ত নহে, তৎসহ পুনঃ নিয়ন্তার নাম যোজিত করিয়া, আত্মবিধি দৃঢ়ীকৃত করিয়া থাকে; পালক তাহাতে ভীত হয়, নেত্র নিবদ্ধভাবে যথা প্রদর্শিত পথে বিনা বাক্যব্যয়ে গমন করিয়া থাকে। নিয়ন্তারই কি এরূপ ইচ্ছা, তাঁহার বিধিই কি এবম্ভূত? বুঝিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তবে সঙ্কেত-শূন্য ইঙ্গিত-শূন্য এ অস্থিত পঙ্ককে মানবীয় বুদ্ধিকে হাবুডুবু খাওয়াইয়া নিয়ন্তার কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহা তিনিই জানেন, আমরা জানি না, বুঝিতে পারি না। কোন এক ধর্ম্ম ও আচার বিশেষই যদি নিয়ন্তার একান্ত অভিপ্রেত হইত; তাহা হইলে সমগ্র জগৎ এক প্রকৃতির, সমস্ত মানব এক স্বভাবের, সমস্ত ঐশ্বরিক মায়া ও অবতার সর্ব্বজনীন্, সর্ব্বকালীন্ ও সর্ব্ব-ব্যাপীন্ করিলেন না কেন? তাহা হইলে শুধু বুঝিতে পারিতাম তাহা নহে, পৃথিবীও তাহা হইলে স্বর্গভূমি হইত; শোক তাপ পাপ অবিশ্বাস প্রভৃতি অসুখের মূলীভূত কারণ সমূহও কণমাত্র এ পৃথিবীতে স্থান পাইত না। যখন এ জগতে সেরূপ ভাবের অভাব, তখন এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, যথাপ্রকৃতি যথাস্বভাব ও তদুৎপন্ন যথারীতি জীবনলীলা নির্ব্বাহ করিলেই জীবন কার্য্যের প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইহার পরেও যে কিছু মহান্ ও মুখ্য উদ্দেশ্য, যদভাবে জীবন-কার্য্য একরূপ বিফল বলিতে হইবে, যদি তাহা সফল করিতে চাও,; তবে তাহার একতর উপায় স্বরূপ জগৎ-বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন স্বাভাবিক জীবন-তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক, তাহার সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা সাধারণ জীবনতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া, তদ্দ্বারা পরিচালিত হও। এখানেও অভীষ্ট সাধনপক্ষে নিয়ন্তা যদিচ অস্থিত পঙ্ককে ফেলিয়াছেন বটে, কিন্তু এ অস্থিত পঙ্কক সঙ্কেত-শূন্য, ইঙ্গিত-শূন্য নহে।

আধুনিক ইউরোপীয়দিগের অনেকেই কিয়ৎপরিমাণে এ সাধারণ জীবন-তত্ত্বের তত্ত্বী, তাই তাঁহাদিগের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি। আমাদিগের অব্যবহিত পূর্ব্বগত পূর্ব্ব পুরুষদিগের এ তত্ত্ব-পরিজ্ঞান একেবারে ছিলনা বলিতে হইবে।

তাঁহাদিগের আত্ম-দেশ-নিবদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে, সীমান্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিকোণময়ী ভারত ভূমিতেই সমগ্র পৃথিবীর সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট পার্শ্বস্থভূমিই পুণ্য ভূমি, তাহাতে আবার যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তাহাই দেবানুগৃহীত ও যাজ্ঞিকস্থান। তদ্ব্যতীত আর সমস্ত অস্থান, অগম্য, ভয়াবহ বা তদ্রূপ; সে সকল স্থান জগতের অন্তর্ভূত থাকিয়াও তদ্বহির্ভূত এবং মানবীয় সংস্রবের অতীত, অথবা সে সকল যক্ষরক্ষ বা একপদ এককর্ণ ইত্যাদি জীবের আবাস এবং কিন্নর মিথুনের বিচরণ স্থল। প্রাচীনেরা বহিস্থ দেশসকল হইতে এতদুর ছেদ-সম্বন্ধ ছিলেন যে, নিয়ন্তার নিয়ম বশে এবং তাঁহার রোষ তোষের সমবশবর্ত্তী হইয়া, এই পৃথিবী-মণ্ডল ব্যাপিয়া যে অপরাপর মানবীয় স্রোত নিরন্তর পরিভ্রামিত ও পরিচালিত হইতেছে এবং অনুরূপ কার্য্যে অনুরূপ ফলোৎপাদন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধিতেই কখন আসিত না। তাঁহাদের আত্মপ্রকৃতি দৃষ্টেই জীবন-কার্য্যের সমস্ত তত্ত্ব নিরূপিত হইত। তাঁহারা তদনুসারে চলিতেন এবং অপরকে কোন গতিকে প্রাপ্ত হইলে, তদনুসারে চালাইতে বাধ্য করিতেন। তাঁহারা যে ইহা, কুমনে করিতেন তাহা নহে, সুমনেই করিতেন; দোষ তাঁহাদের নহে, কিন্তু দোষ তাঁহাদের কার্য্যোৎপাদিকা কারণের মূলভাগে, কিন্তু তাঁহারা তাহা সঙ্কীর্ণ দর্শন বশতঃ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা জানিতেন না যে এরূপ নিরূপিত তত্ত্ব, কার্য্যকারণসমবায়ে সর্ব্বজনীন্ না হইলে, উৎকর্ষাভিলাষী সমকালিক জাতি-গণের প্রভায় সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, সংসার স্থলীতে ক্ষীণজীবন ও লোপ-যোগ্য হইয়া থাকে; সুতরাং সেই সঙ্কীর্ণ তত্ত্ব প্রতিপালকেরা কালক্রমে হীনতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, স্থানভেদে স্থানীয় প্রকৃতি-ভেদ, স্থানীয় প্রকৃতি ভেদে শীতাতপ-ভেদ, শীতাতপ-ভেদে বস্তু-ভেদ, বস্তু ভেদে মানবীয় প্রকৃতি-ভেদ, মানবীয় প্রকৃতি ভেদে সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্ব ভেদ, যথায় যথায় এই সকলের সামঞ্জস্য করিয়া জীবনতত্ত্ব নিরূপিত না হইল, সে তত্ত্বের প্রয়োজন নাই; তাহা সর্ব্বজনীন্‌ভাবে হৃদয়গ্রাহী ও সাধারণ কল্যাণ-কর হয় না, তাহা ফলে মঙ্গলকর হয় না। দেখ, তুমি বঙ্গসন্তান, তোমার পক্ষে তোমার জাতীয় অখাদ্য-ভোজন-নিষেধ নিতান্ত দোষের নহে, বরং মঙ্গলকর; কিন্তু তাই বলিয়া অপর কোন অখাদ্য-ভোজী জাতিকে যদি তোমার সংস্পর্শে

আসিতে না দেও, তাহা দোষের। এ দোষ ইহলৌকিক ত বটেই, পারলৌকিকও কি না তাহা ধর্ম্ম জানেন; এ প্রস্তাবে পারলৌকিক দোষ গুণের কোথাও বিচার হইতেছে না। যাহা হউক, প্রত্যেক বিষয়ের এইরূপ একদেশদর্শী দোষ যথায় পরিহার হইয়া বিভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে সখ্যতা বিনিময় হয়, তথায় তথায় জীবনতত্ত্ব সর্ব্বজনীন্ হয় এবং সেই তত্ত্ব-অনুচরেরা মঙ্গল পথে প্রধাবিত হইয়া অচিরে ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। তুমিও তদ্রূপ এই জগতের হিতকার্য্যে রত হও এবং সমস্ত জগৎকেও তোমার কার্য্যে নিয়োজিত কর, অভীষ্ট লাভ হইবে। অতএব এই উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য, বিভিন্ন জাতীয় জীবনের সমালোচনা আবশ্যক। তাহাতে পুণ্যও আছে।

আজিকার প্রস্তাবে আমরা ভারতের সহ সর্ব্ব প্রকারে সম্বন্ধ-বিহীন এবং পৃথিবীর দূরপ্রান্ত-নিবাসী একটি নগণ্য জাতীর জীবন-তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পৃথিবীর অতি উত্তর প্রান্তে হিম সমুদ্রতীরে সিবীর বা সাইবিরিয়া নামে এক দেশ আছে। এই দেশের উত্তর ভাগ প্রায় চির-নিহারাবৃত এবং তুষার-ধবল অতি বিস্তৃত ক্ষেত্র; এথানে উদ্ভিজ্জাবলী অতি বিরল ও ক্ষুদ্রতম; কেবল মাত্র কোথায় ক্ষুদ্রগুল্ম, কোথায় ঈশদুন্নত বৃক্ষ মুর্ত্তিমান্ হ্রাসতারূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেশ নিস্তব্ধ, ভীষণ ও ভয়ানক; অন্তক যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া ইহাকে স্বক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ ইহার প্রতি সলালস্ দৃষ্টিপাত করিতেছে। প্রকৃতি সতী বস্তুতঃ এথানে চিরবৈধব্য-বেশে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। এ স্থানের মুর্ত্তি শীতাগমে সহস্রগুণে ভীষণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন ইহা দেখিতে বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর। দিক সমস্ত তমসাচ্ছন্ন, রাত্রিভাগ অসম্ভব পরিমাণময়ী ও নিরন্তর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন; কেবল মধ্যে মধ্যে অরোরারোরিয়েলিস্ নামক উত্তর কেন্দ্রস্থ বৈদ্যুতাগ্নিভাসে কথঞ্চিৎ কদাচ প্রতিভাসিত হইয়া, দিক্ সকল ঈষৎ আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। এই সময়ে নিরন্তর তুহিনপাতে পৃথিবী আকুলিত এবং শৈত্যবিকম্পিত হইয়া থাকেন। উদ্ভিজ্জাবলী একে বিরল, এ সময়ে আরও বিরলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, গুল্মাবলী বরফে প্রোথিত হইয়া অস্তিত্ব শূন্য হয়; বৃক্ষাবলী একে ক্ষুদ্র, তাহাতে এক্ষণে অর্দ্ধ

প্রোথিত; হিমানীপাতে পল্লব দল শ্বেতবর্ণতা লাভ করায়, সমস্ত প্রদেশ নিবিড় শ্বেত ভূমিরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। এসময়ে জীব নাই, জন্তু নাই, জীব কণ্ঠ-নির্গত শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রাভিভূত; কেবল উত্তর কেন্দ্রজাত দক্ষিণবাহি ভীষণ শীত বায়ুর স্বন্ স্বন্ শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় এবং মধ্যে মধ্যে, শীতাগমে বিদেশ-গমনোন্মুখ বিহঙ্গরবে দিগ্বলয় ক্ষুণ্ণ-চমকিত হইয়া থাকে। এই দেশে ঋতু ভেদ দুই প্রকার, শীত ও শরৎ। শরৎকাল অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী। শরদাগমে প্রকৃতির এই ভীষণ মূর্ত্তি কিয়দংশে দূরীভূত হয়। তখন দিক্ সকল কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হইতে থাকে; বরফরাশি কিয়দংশ বিগলিত হওয়াতে প্রোথিত গুল্মাবলী পুনঃ প্রকাশিত এবং বিটপ-দেহে কৃষ্ণকায় পল্লবপুঞ্জ হিমানীমুক্ত হইয়া পুষ্প-গুচ্ছে সুশোভিত হয়। বরফ আস্তরণে শৈবাল দল উদ্ভূত হইয়া, বিবিধ-বর্ণে রঞ্জিত ক্ষুদ্রকায় নানাপুষ্পে পুষ্পিত হওত, বৈধব্য বেশিনী প্রকৃতিকে যেন তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও, অলঙ্কারদামে কথঞ্চিৎ অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। উল্কামুখী শ্বেতভল্লূক প্রভৃতি জীবকুল চকিতবৎ প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া আহারান্বেষণে বিচরণ করে। বন্য হরিণের পাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। এসময় দেখিতে একরূপ নেহাত মন্দ নহে। এই প্রকৃতিময়ী প্রদেশ সমূহকে তন্দ্রা কহে।

এই স্থান আমাদের দেশের সহ যদি তুলনা করা যায়, তবে আমি-প্রকৃতি দৃষ্টে অবশ্যই বিবেচনা করিব যে, এস্থান কখনই মনুষ্যের বাসযোগ্য নহে এবং এখানে কখন মনুষ্য চিরবাস স্থাপনপূর্ব্বক তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার কৌশল এবং প্রকৃতিসতীর যোগ্যতা ও যোজনা অপরিসীম! এখানেও মনুষ্য বাস স্থাপনপূর্ব্বক তোমার আমার ন্যায় আহ্লাদ, আমোদ, শোক, দুঃখ, বিলাস, কলা, কৌতুকাদি বিস্তার করিয়া মানবীয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই সাইবিরিয়া দেশের উত্তর প্রান্তে এবং ইউরোপীয় রুশিয়ার উত্তর খণ্ডে, শ্বেতসমুদ্রের পূর্ব্বতীর হইতে ইনিসী নদীর পশ্চিম তট পর্য্যন্ত, সমগ্র তন্দ্রাপ্রদেশে সামরিদ্ নামে একজাতীয় মানব বসতি করে। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্রকায়, ঈষৎ ধূম্রাভ ও পাতবর্ণ, ইহাদের ওষ্ঠদ্বয় স্থূল, চক্ষু ক্ষুদ্র, ললাট

দেশ অল্পায়তন ও নিম্ন। গণ্ডাস্থি অতিশয় উচ্চ, নাসিকা এত চাপা যে অগ্রভাগ উচ্চতায় গণ্ডাস্থির সহ সম-সূত্রস্থ। ইহাদের শ্মশ্রু বিরল উদ্ভূত, কিন্তু মস্তকের কেশাবলী ঘন, রুক্ষ এবং কর্কশ। ইহারা স্বভাবতঃ যদিও কুরূপ, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সাধারণ মানবীয় স্বভাবের বিপরীতে, বেশভূষা প্রভৃতি দ্বারা তাহার উন্নতিসাধনকল্পে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন-বিহীন। স্ত্রীলোকেরা যতদিন অবিবাহিত থাকে, ততদিনই শ্রীর উন্নতি করিবার নিমিত্ত বেশভূষার প্রতি কথঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু একবার বিবাহ হইয়া গেলে জাতীয় শিথিলতায় গা ঢালিয়া দেয়।

ইহাদের আকৃতি যেরূপ, রুচি ইহাদের তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। রুচি যতদূর কদর্য্য হইতে পারে, তাহাই। ইহাদের আহার্য্য বিষয়ে মৎস্য এবং হরিণমাংসই প্রধান, কিন্তু উভয়ই ইহারা বিনাপাকে কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি এত ক্ষীণ যে যত বড় দুর্গন্ধই হউক না কেন, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র অসুখ বোধ নাই। এই নিমিত্ত অগ্রাহ্য ভাবে, তাহাদের গৃহের চতুষ্পার্শ্বে, চর্ম্ম মাংস বা অস্ত্রাদি নিরন্তর পচিতে দেখা গিয়া থাকে।

মানবীয় মনোবৃত্তি বহিঃপ্রকৃতির অনুসরণ করে এবং তাহার পরিমাণ অনুসারে, সুখ দুঃখ মায়া মমতা প্রভৃতি বৃত্তি-সমূহ পরিমিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সামরিদেরা এই দূরস্থানে বাস হেতু বহিঃ-শিক্ষার অভাবে ও জাতীয়শিক্ষার অপকর্ষতায় নিরন্তর অজ্ঞানজড়িত এবং আহার্য্য-বিরলতা হেতু সর্ব্বদা দুঃখ ও ক্লেশে বিদ্ধ; এজন্য ইহারা জীবনের উপর একপ্রকার মমতা-শূন্য। বস্তুতঃ ইহাদের এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহার আকর্ষণে জীবনের উপর ইহাদের মমতা জন্মিতে পারে; এ নিমিত্ত ইহাদের আকৃতি ও মুখশ্রী সর্ব্বদাই ম্লান এবং স্বভাবও ম্রিয়মাণ; কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি তাহা বলিয়া নিতান্ত অসৎ নহে। ইহাদের পূর্ণ মূর্খতা হেতু সত্যাসত্য ও সদসদ্ জ্ঞান যদিও অতি সামান্য; কিন্তু নিষ্ঠুরাচার, ক্রূরকর্ম্মের প্রতিশোধ হেতু বিপক্ষের উপর ক্রূর প্রতিবিধান চেষ্টা বা ভয়ঙ্কর পাপ-ক্রিয়া, এ সকল ইহাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল বা একেবারে নাই বলিলেই হয়। ইহাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা গুণ অপরিসীম; হৃদয় অকৃতজ্ঞ নহে; ইহাদের কেহ কোন আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, দুঃখী প্রতিবেশিবর্গের সহিত অংশ না করিয়া আহার করে না। কিন্তু

ইহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত; কিন্তু তাহা ইহাদের স্বীয় দোষোদ্ভূত নহে, পরপদদলিত ও প্রতারিত জাতিমাত্রেরই এই দশা। এরূপ ঘোরতরমূর্খতা পূর্ণ জাতিমাত্রের আশু উন্নতিকল্পে, সভ্যজাতির সংস্রব বহু পরিমাণে ফলপ্রদ। কিন্তু ইহাদের প্রভু যাহারা ও ইহারা যে সভ্যজাতির সংস্রবে আসিয়া থাকে, তাহারা একমাত্র ব্যবসায়দার রুসিয়ান্। এই রুসিয়ান্ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা সামিয়িদেরা এতদূর প্রপীড়িত প্রতারিত ও উত্ত্যক্ত হইয়া থাকে যে, তাহাদিগের দ্বারা যদি বা কখন সাময়িদ্‌দিগের মঙ্গল কল্পে কোন সংকার্য্যকৃত হয়, তাহাও সামিয়িদেরা প্রতারণা ও প্রপীড়নের পন্থা বলিয়া তাহার প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিয়া থাকি। সুতরাং এ সভ্য জাতির সংস্রবে ইহাদের কোন উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাদের স্বাভাবিক সৎগুণগুলিই বহুলাংশে দূষিত হইয়া যাইতেছে।

ইহাদের ধনবত্তাও অবস্থা অনুরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গৃহস্থের ভোগ দখলে বন্য হরিণের সংখ্যা অনুসারে, ধনী বা নির্ধনী নির্ব্বাচিত হয়। যাহার যত সংখ্যক আছে, সে সেই পরিমাণে ধনী। ইহারা অব্দ্‌বস্ক ও পস্তসিরস্ক প্রভৃতি স্থানের বাৎসরিক মেলায় পশু-চর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা কখন কখন বিনিময় ও ব্যবসায় করিয়া থাকে। কিন্তু হতভাগ্যেরা এস্থানে রুসিয়ান্ ব্যবসায়দার দ্বারা অপরিমিত ভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, সাধারণতঃ জীবজন্তু শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের কি শ্রবণেন্দ্রিয় কি দর্শনেন্দ্রিয়, উভয়ই অতিশয় তীক্ষ্ণ থাকায় এবং বাহুর স্থিরতাবশতঃ, ইহারা শিকারে অতিশয় পারগতা দেখাইয়া থাকে। ইহাদের অস্ত্রের মধ্যে ধনুর্ব্বাণ অতি প্রধান, কিন্তু তাহা অতি কৌশল ও সফলতা সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা দৌড়িতেও অত্যন্ত পটু। ইহাদের শ্বেতভল্লুক শিকার অতি কৌতুকাবহ। ইহাদের এরূপ বিশ্বাস আছে যে শ্বেত ভল্লুক যদিও পশুর আকার বিশিষ্ট বটে, কিন্তু সেই পশ্বাকারের মধ্যে লোকাতীত জ্ঞান ও দর্শন অবস্থান করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত তাহারা ভল্লুককে অন্তরের সহিত ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে এবং ভল্লুকশিকারে যাইবার পূর্ব্বে, বহুবিধরূপে তাহার স্তুতিবাদ করিয়া তবে পদক্ষেপণ করে। ইহাদের এরূপ বিশ্বাস যে মনুষ্য গোচরে অগোচরে যাহা কিছু করে, ভল্লুক তাহা সকলই জানিতে পারে,

সুতরাং তাহার স্তুতিবাদ না করিলে অসন্তুষ্ট হইয়া সে শিকারীকে উল্টিয়া হত করিতে পারে। ভল্লুকের দ্বারা কেহ হত হইলে, জন্তুর প্রতি ভক্তি-বিহীনতা বা স্তুতিবাদে অশুদ্ধি, এই সকল কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ ভ্রান্তিতে যে কেবল সামযিদেরাই দোষী তাহা নহে। সাইবিরিয়ার উত্তর প্রান্তনিবাসী প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই শ্বেতভল্লুক সম্বন্ধে এইরূপ। তন্মধ্যে ওস্তয়াক নামক জাতির মধ্যে শ্বেতভল্লুকের প্রতি ভক্তি এত প্রবলা যে, ইহারা প্রথমে তাহার যথারীতি পূজা না করিয়া তৎ-শিকারে বাহির হয় না। আবার শিকারীরা যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের স্ত্রীগণ চিৎকার স্বরে ভল্লুকের মহিমা গান করে এবং ভল্লুকের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে যেন তিনি শিকারীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়েন। যখন শিকারীরা শিকার সহ ফিরিয়া আইসে, তখন স্ত্রীগণ ভল্লুকের মহিমা গান করিতে করিতে বহুদূর অগ্রগামী হইয়া তাহাদিগকে লইয়া আইসে। তৎপরে যথারীতি ভল্লুকের মাংস বন্ধুবান্ধব সহ মিলিয়া আহার করে।

সামযিদ্‌দিগের গৃহকার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয়। পিতা গৃহস্বামী, আর সমস্ত তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। গৃহস্বামী নাবালগদিগের জীবনমরণের কর্ত্তা। রুসিয়ার অধিকারে তাহাদের এ ক্ষমতার অধিকাংশই এক্ষণে যদিচ লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি এখনও যাহা আছে,তাহা অন্যান্য স্থানের তুলনায় অপরিমিত। ইহাদের বিবাহপ্রণালী অতি কদর্য্য, এবং স্ত্রীলোকের অবস্থা ইহাদের মধ্যে অতিশয় হেয়। কন্যার বিবাহ কালীন কন্যাকে কোন যৌতুক দেওয়া দূরে থাকুক, বরং কন্যা হস্তান্তর হইলে গৃহ কার্য্যের যে কিছু ক্ষতি হইবে, কন্যাকর্ত্তা বিবাহপ্রার্থীর নিকট তাহার পূরণ প্রত্যাশা করি[illegible] এ নিমিত্ত জামাতাকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়া আত্মস্থ [illegible] এরূপ ক্রয়-[illegible] উপর [illegible] থাকে, এমন কি স্ত্রীর জীবনমরণ পর্য্যন্ত স্বামীর রোষ তোষের উপর নির্ভর করে। ইহারা আত্মস্ত্রীর হত্যাকে এতদূর সামান্য অপরাধ মনে করে যে, একদা একজন সামযিদ স্ত্রীহত্যার অপরাধে রুসিয়ার আদালতে আনীত হইলে, সে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রকাশ করে যে, সে স্ত্রীহত্যা দ্বারা এমন কি দোষ করিয়াছে যে তদ্দ্বারা দোষী সাব্যস্ত

হইয়া আদালতে আনীত ও দণ্ডনীয় হইতে পারে; কারণ সে যখন যথোপযুক্ত মূল্যপ্রদানে আপনার স্ত্রী ক্রয় করিয়াছে, তখন স্ত্রীর রক্ষণে বা বধ সাধনে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। ফলতঃ অসভ্য জাতিমাত্রেই, স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা পশুবৎ এবং পুরুষগণ কর্ত্তৃক তাহারা নিকৃষ্টভাবে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং উত্তর মার্কিনদেশস্থ ডগ্‌রিব ইণ্ডিয়ান্‌দিগের মধ্যে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার চরমাবস্থা।

এই পৃথিবীতে সভ্যসমাজে যত আইন ও আদালতের আবশ্যক হয়, অসভ্য সমাজে তত নহে; অসভ্যজাতি সকলে আইন আদালতের সম্পর্ক অতি বিরল। আধুনিক কোন অসভ্যজাতির মধ্যেই বাঁধা ছাঁদা আইন আদালত নাই; অর্দ্ধ-সভ্য প্রাচীন জর্ম্মাণজাতির মধ্যেও তাহা ছিল না, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ কি ক্ষতি? যদি কেবল চিত্তপ্রসাদই সুখের পরিমাণ হয়, তাহা হইলে তোমাপেক্ষা একজন নিকৃষ্ট অসভ্য অধম হইবে না! যদি অপরাধের প্রকৃতি এবং অপরাধীর সংখ্যা সামাজিক উৎকর্ষ অপকর্ষের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলেও একজন নিকৃষ্ট অসভ্য তোমাপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবে না। সে যাহা হউক, আইন আদালতের আবশ্যকতা সভ্যতাযুক্ত সমাজেই বেশী। অপরাধের বৃদ্ধি সহ তাহার নিবারণ উপায়ও নিত্য এবং বহুতর সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং পর পর যত বৃদ্ধি হয়, সেই উপায়ও পর পর ততই কঠোরতর হয়। কিন্তু যেখানে সেখানে এরূপ বৃদ্ধির অভাব, তথায় সামান্যমাত্র উপায়ে শান্তি রক্ষণ হয়,—অসভ্যসমাজ মাত্রে প্রায় এরূপ। সভ্যতায় ভাল যত, মন্দও তত!—তোমার সমাজ যে অত্যন্ত অপরাধী তাহার প্রমাণ তোমার আইন আদালত। সভ্যতার সহ পাপ-স্রোত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সভ্যতা যেমন লৌকিক এবং মানবীয়, তদ্দ্বারা বৃদ্ধ পাপও সেইরূপ অপ্রাকৃতিক এবং তন্নিমিত্ত অপ্রাকৃতিক উপায় স্থাপনও আবশ্যক। কিন্তু তা বলিয়া কি সভ্যতা নিন্দনীয় বলিবে? যদি বল, তবে তুমি একদেশদর্শী। মুষ্টিমাত্র স্বর্ণরেণুতে মলভাগ অতি সামান্য এবং সাধারণ রকমের, তাহার পরিষ্করণেও অল্প যন্ত্র প্রয়োগ করিলে কার্য্য সুসাধিত হয়; কিন্তু এখানে যেমন মলভাগ অল্প, রত্ন ভাগও সেইরূপ অল্প। আর ৯৯৯ স্বর্ণরেণু যদি পর্ব্বত

প্রমান হয়, তাহার মলভাগও সেইরূপ রাশি এবং বিকট রকমের; সুতরাং পরিষ্কারার্থে বহুব্যয়তন উপায়েরও আবশ্যক এবং সে উপায়াদি কষ্ট-দায়ক ও কষ্টসাধ্য হইলেও, রত্নাধিক্যে প্রার্থনীয়। যাহাহউক, সমাজ যথায় সঙ্কীর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত অকলুষিত, তথায় অপেক্ষাকৃত প্রাকৃতিক শাসনেই শান্তিরক্ষণ হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক শাসন দৈবে ভয় ও ভয়। ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল সামযিদ্দিগের অপরাধের প্রতিবিধান-প্রণালী। ইহাদের মধ্যে গুপ্ত অগুপ্ত সর্ব্বপ্রকার অপরাধ শপথের দ্বারা প্রতিবিধানিত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে শপথ দিবার জন্য প্রতিপক্ষ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার। সাক্ষ্যদ্বারা দোষ সপ্রমাণের রীতি নাই। শপথের দ্বারা দোষ সপ্রমাণ হয় এবং যে দোষী সাব্যস্ত হয়, সে অপরাধের পরিমাণ অনুরূপ মূল্য প্রদান করিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহাদের শপথ করণ প্রণালী এইরূপ—যদি কাষ্ঠ বা প্রস্তর নির্ম্মিত কোন দেবমূর্ত্তি নিকটে না থাকে, তাহাহইলে প্রতিপক্ষ ব্যক্তি মৃত্তিকা বা বরফের দ্বারা একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহার নিকট আগে একটি কুক্কুর বলিদান পূর্ব্বক তাহাকে যথারীতি পূজা করে; পরে অপরাধীকে কহে—"তুমি যদি যথার্থ অপরাধী হও, তাহা হইলে স্বীকার কর, নতুবা তুমিও এই কুক্কুরের ন্যায় ধ্বংস হইবে।" অতঃপর অপরাধী সর্ব্বজ্ঞ ভল্লুকের চর্ম্মে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক শপথ করিয়া থাকে। ইহাদের মিথ্যা কথায় বড় ভয়, কিন্তু এ ভয় পরলোকের দুঃখাতিরেকের আশঙ্কায় নহে; তাহাদের বিশ্বাস আছে যে মিথ্যা কহিলে, হয় তাহাদের বিকট মৃত্যু হইবে, নতুবা তাহাদের হরিণ চুরী যাইবে; এ নিমিত্ত যথার্থ অপরাধী যাহারা, তাহারা প্রায় আত্মদোষ অস্বীকার করে না।

সামযিদদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সামান্য। ইহাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হইতে ত্রুটি হয় নাই এবং খৃষ্টানও অনেক হইয়াছিল, কিন্তু নামে মাত্র। কার্য্যত ইহারা সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় প্রাচীনধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতার নাম নমৃ বা জিলিবিয়াম্ বিয়ার্ত্তজি।* এই

* Jilibiambœrtji.

দেবতা বায়ুমণ্ডলে বাস করেন, বিদ্যুৎ ও বজ্র ইহার অস্ত্র, রামধনু ইহার অঙ্গাবস্ত্রের উপান্তভাগ। এই দেবতা মনুষ্য হইতে এত অন্তরে অবস্থান করেন যে, দূরত্ব হেতু মনুষ্যের শুভাশুভ সাধন করা ইহার পক্ষে ঘটিয়া উঠেনা। এ নিমিত্ত সামায়িদের ইহার প্রতি, কি প্রার্থনা কি পূজা, কিছুই প্রদান করেনা ও তাঁহার কোন খোজ খবরই লয় না। নুম্ ব্যতাত অপরাপর ক্ষুদ্র দেবতা অনেক আছেন, তাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের শুভাশুভ বিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা মানবের আবশুক মত, প্রার্থনা বা পূজার দ্বারা বা যাদুগুণে বশীভূত হইয়া, অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সামায়িদেরা এক সাংসারিক আবশুক না পড়িলে, ইহাঁদিগের কোন তত্ত্বই লয় না।

সাময়িদদিগের প্রধান দেবমূর্ত্তি বেগাৎস নামক দ্বীপে স্থাপিত আছে। এই মূর্ত্তি একটি বৃহৎ প্রস্তর, ইহার ঊর্দ্ধভাগে মোচাগ্রবৎ কোণাকারে মস্তক ও মুখ। সামায়িদেরা ইহার এই আকৃতির নমুনা অনুসারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সকল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট রাখে এবং হরিণচর্ম্ম ও নানাবর্ণ রঞ্জিত বস্ত্র বা চর্ম্মখণ্ড দ্বারা সুশোভিত করিয়া থাকে। সাময়িদদিগের স্থান হইতে স্থানান্তর গমনকালিন, যদি এই মূর্ত্তির কোনটি বেশী ভার বোঝা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে পথিমধ্যে কোন স্থানে তাহাকে ফেলিয়া যায়; এরূপ পরিত্যক্ত দেবতা যেখানে পড়িয়া থাকে তাহাও দেবস্থান মধ্যে গণ্য হয়। এরূপ পরিত্যক্ত দেবতাকে সাদারি বলে; আর যে যে মূর্ত্তি বহন সুলভ হয়, তাহাদিগকে হোহি কহে। প্রত্যেক ব্যক্তির আবশুক অনুযায়ী, তাহার নিকট তত সংখ্যক দেবতা থাকে। কোনটি বন্য হরিণের পাল সুরক্ষিত হওনের কামনায়, কোনটি উপাসকের স্বাস্থ্য কামনায়, কোনটি দাম্পত্যপ্রণয় বর্দ্ধন কামনায়, কোনটি উপাসকের জাল মৎস্যে পরিপূরিত হওয়ার কামনায়, ইত্যাদি অর্থে স্থাপিত, রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল দেবতার পূজা নিত্য হয় না; আবশ্যক অনুযায়ী, দেবতা বিশেষকে ঝুলি হইতে বাহির করিয়া পূজা করা হয়। আবশ্যক মত পূজা হইয়া গেলে, আবার ঝুলিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দেবতাটি আর পাঁচ দ্রব্যের সহ অতর্কিতভাবে পড়িয়া থাকে। পূজার পদ্ধতি

এইরূপ। পূজার সময় ঝুলির বাহির করিয়া মূর্ত্তিটিকে নিকটস্থ কোন বৃক্ষতলে স্থাপিত করা হয়, তাহার মুখ তৈল ও রক্তের দ্বারা ম্রক্ষিত হয়, তৎপরে তাহার সম্মুখে একপাত্র কাঁচা মৎস্য স্থাপনপূর্ব্বক যথা অভীপ্সিত বস্তুর কামনাসহ উপাসনা কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত দেবতাগণ ব্যতীত আরও বহুতর অনিষ্টকারী দেবতা আছেন, ইহারা কেবল যাদুকার্য্যের দ্বারা বশীভূত হইয়া দুষ্টস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভফল প্রদান করেন।

ঘোর মূর্খ সাময়িদদিগের উপরিউক্ত দৈবে বিশ্বাস, তদ্দ্বারা তাহাদের সমাজ পরিচালন এবং উৎকৃষ্ট খৃষ্টধর্ম্মে তাহাদের অনাস্থা, এতৎত্রয়ে আমাদিগের কি অনুভূত হয়? ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু নিত্য নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু মানসিকবৃত্তি বিশিষ্ট মনুষ্যমণ্ডলে যদি ধর্ম্মবন্ধন না থাকিত, তবে এসংসারে না জানি কি বিশৃঙ্খলাই ঘটিত; হয়ত মনুষ্যজাতি এতদিন পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইত। মনুষ্য হইতে অধম জীব সকল পশুমধ্যে গণ্য; পশুদিগের তাদৃশ মানসিকবৃত্তির অভাব বলিয়া, ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে তাদৃশ বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং যথাপরিচালিতভাবে তাহাদের জীবন প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। মানবজাতির ধর্ম্মবন্ধন ভ্রমবন্ধন হইতে পারে; কিন্তু এ ভ্রম সুখের, শুভসাধক, কল্যাণকর। যাহা মানবজীবন প্রবাহপক্ষে কল্যাণকর, প্রকৃতি যাহার বিরুদ্ধবাদিনী নহে, তাহাইত সত্য। প্রকৃতি অসত্য সহনে অপটু, অসত্যের আবির্ভাব হইলে তখনই তাহার প্রতিকারে উদ্যত হইয়া থাকে। কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে প্রকৃতি ধর্ম্মবন্ধনরূপ ভ্রমের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে; বরং ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার সপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে। অতএব এ ধর্ম্মবন্ধনকে ভ্রম না বলিয়া সত্য বলিতে আপত্তি কি? মানবীয় ধর্ম্মবন্ধনের উদয়, জনসমূহ সংঘটনে প্রতিজ্ঞাবন্ধনের ফলে সাধিত বা শিক্ষকের শিক্ষাদ্বারা সম্পাদিত নহে; উহা প্রাকৃতিক ও মানবপ্রকৃতি হইতে স্বতঃই উদিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা পারলৌকিক বিশ্বাস, লৌকিক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; মনোমধ্যে স্বীয়স্বভাবজাত লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ব বোধই উহার মূল এবং সেই তাহা

হইতে ধর্ম্মবন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে। ডারবিনের মতে এ লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ব বোধ, আদিম মানবের স্বপ্নদর্শন ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বস্তুত তাহাই কি?—কিন্তু সে আদিমকাল নিরেখ হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সে সময়ের এ বিষয়সম্বন্ধে যে কিছু নিরূপণ, তাহা কেবল প্রমাণশূন্য অনুমানের উপর নির্ভর করে; এরূপ শূন্যগর্ভ অনুমানের দ্বারা চিরপোষিত ও স্বভাবজাত চিরবিশ্বাসিত বিষয়ের অপলাপ করা কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? বিতর্কবিহীন স্বতঃপ্রবৃত্ত সহজ অনুভূতিই পদার্থের সত্য ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে, তর্ক তাহার বিকৃতাভাস মাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। যাহা হউক, বর্ত্তমানে এই পৃথিবীতে যত যত মানবজাতি বসতি করে, উচ্চ হইতে অধমতম সকল জাতিতেই, কোন না কোন আকারে, লোকাতীতশক্তির অস্তিত্ব বোধ বিরাজিত আছে। অনেকানেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীবর্গ বলিয়াছে যে, তাহারা এমন অনেক অসভ্যজাতি দেখিয়াছে, যাহাদের মধ্যে ঈশ্বর বাচক কোন শব্দের অস্তিত্ব নাই; কিন্তু ইহা কোথাও তাহারা বলে নাই ও বলিতে পারে নাই যে, কোনরূপ লোকাতীত শক্তিতেই বিশ্বাস-শূন্য মানবজাতি কোথাও তাহারা দেখিতে পাইয়াছে। আমাদের বোধশক্তির অনুরূপ ঈশ্বরকে, সে সকল জাতিরা চিনে না বটে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহারা অনেকানেক অলৌকিক দেবতা বা ভূতের উপাসনা করে ও তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে যত হীন প্রকৃতির মানব এ জগতে বাস করে, তন্মধ্যে ফিজি দ্বীপ বাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম এবং পশু হইতে অতি অল্পই বিভিন্নতা যুক্ত; তাহাদের মধ্যেও, মঙ্গলময় ঈশ্বর যদিও অপ্রচারিত,কিন্তু অমঙ্গলময় দেবতার বহুলতা দেখা গিয়া থাকে। সভ্যতম সমাজে, প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত, অনেক নাস্তিকের কথা শুনা যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত নাস্তিক আছে কি না সন্দেহ। সন্দিগ্ধ চেতা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত নাস্তিক হয় না, ইহাই আমার বোধ হয়। ঘোর নাস্তিক বলিয়া যাহাদের আপাততঃ ভান, কোন দুরন্ত বিপদে তাহারা তাহা রক্ষা করিতে পারে না; হয়ত তাহা বাল্যশিক্ষার ফল! অতএব বলিতে হইবে যে স্বপ্ন হইতেই হউক আর যে কারণেই হউক, মনুষ্য বংশের উৎপত্তির দিন হইতে, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এই জগতে একাধিপত্য

করিতেছে। এই বিশ্বাস হইতেই সমাজ এবং সমাজের উন্নতি অনু-সারে ধর্ম্মবন্ধন, উন্নতি ও পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

মানবের মানসিক উন্নতি বা অবনতি অনুসারে, ধর্ম্মভাব ও দৈবে বিশ্বাসও উন্নত বা অবনত ভাব প্রাপ্ত হয়। উহা অবস্থাভেদে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে মনুষ্যময় রক্তদন্তী অমঙ্গলকর দেবতায় বিশ্বাস। মন্দকার্য্য করাই এসকল দেবতার বৃত্তি, কেবল উপাসনা বা যাদুবশে তাহারা বশীভূত হইয়া তাহাতে নিরস্ত থাকে বা শুভফল দেয়। ইহা ঘোর মূর্খতাময় পশুবৎ আদিমসমাজের ধর্ম্ম। লোকচরিত্র এবং দেবচরিত্র একই ছাঁচে নির্ম্মিত হইয়া থাকে! সামাজিক শান্তিরক্ষণে এক্ষণে একমাত্র ভয়ই কার্য্যকরী। দ্বিতীয় অবস্থায় ভয় ও ভক্তি, তদুন্নতিতে ভক্তি, পরে ভালবাসা, তাহার পর জগৎকে আত্মাধিকায় জ্ঞান, ইহাই চরম মানসিক বৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। মানবচিত্তের উৎকর্ষও, উক্ত বিভাগ সহ সাহানুভূতি বশতঃ, পঞ্চবিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। উভয়ের সমপর্য্যায় পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন; তদন্যথায় সম্মিলন অসম্ভব। যে মানসিক উৎকর্ষতায় হীন, তাহাকে কোন উচ্চরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রদান কর; কিন্তু সেই হীনোৎকর্ষ মানব যতক্ষণ সে তত্ত্বকে আপন সমতায় না আনিবে ততক্ষণ তাহার ক্ষান্তি নাই। পুরাতন বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর স্বয়ং বারম্বার ভয়প্রদর্শন, উত্ত্যক্ত ও উত্তেজনা করিয়াও, য়িহুদিজাতির পৌত্ত-লিকতা নিবারণ করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। সামিয়িদ্‌দিগের নষ্টবুদ্ধি দেবতাদিগকে যাদুর দ্বারা বশ করিবার নিমিত্ত যাহারা নিয়োজিত হয়, তাহা-দিগকে তাদিবী বলে। ইহাদের কার্য্য আমাদিগের দেশীয় ভূতের ওঝার ন্যায়। ইহারা হরিণচর্ম্ম এবং রক্তবস্ত্রে ভূষিত হইয়া, চীৎকারব ও গীতদ্বারা দেবতার আবির্ভাব কামনা করিয়া থাকে। ক্ষণেক এইরূপ করার পর সমস্ত নিস্তব্ধ হয় এবং সেই সময় তাদিবীর সহ দেবতার কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। কখন কখন ইহারা দীপ নির্ব্বাণপূর্ব্বক অন্ধকার মধ্যে, আগত দেবতাকৃত অভূতপূর্ব্ব শব্দ ও নানাবিধ দৌরাত্ম্য দেখাইয়া থাকে।

যাহারা তাদিবী, তাহারা বংশ পরম্পরা ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। অপরাপর

ব্যক্তিও আবশ্যকমত নিয়ম রক্ষা করিলে, তাদিবী হইতে পারে। নির্জ্জন স্থানে বাস, নিরন্তর বিভীষিকা চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, উপবাস, মাদক সেবন ইত্যাদি দ্বারা শরীর সংশোধন করিতে হয়। তৎপরে যখন তাহার মনে প্রত্যয় হয় যে, সে বস্তুতই দেবতাদের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকে; তখন সমাদর পূর্ব্বক, কোন এক নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে ও নির্জ্জন স্থানে, ঢক্কারব ও বিবিধ দেব মহিমাগান মধ্যে, তাদিবী শ্রেণীতে গৃহীত হয়। তাদিবীরা সচরাচর দেখিতে রক্ত-চক্ষু, তীব্রদৃষ্টি, অস্থিরপদেগতি এবং নিস্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ। হৃত হরিণের অনুসন্ধান, কোন সংক্রামক পীড়া নিবারণ, অধিক পরিমাণে মৎস্য প্রাপণ বা কোনরূপ পীড়া নিবারণার্থে তাদিবীর সাহায্য গৃহীত হয়। পীড়া উপস্থিত হইলে, সাময়িদেরা তাদিবীর দ্বারা ভূতঝাড়ান ভিন্ন, অপর কোন প্রকার ঔষধ প্রাণান্তে গ্রহণ করে না। শারীরিক নিয়মভঙ্গে রক্ত দূষিত হইলে যে পীড়া উপস্থিত হয় ও বস্তুজাত ঔষধে যে তাহা ভাল হইতে পারে, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহারা জানে যে কোন অপরাধ হেতু কোন দেবতা তাহাদিগকে এরূপ শারীরিক ক্লেশ দিতেছে, সেই দত্তক্লেশই পীড়া; সুতরাং ঝাড়ান প্রভৃতি উপায় দ্বারা সে দেবতাকে বশীভূত না করিলে, কেমন করিয়া সে পীড়ার উপশম হইতে পারে? এ বিশ্বাস কেবল এখানে নহে, দক্ষিণ-সমুদ্র-গর্ভস্থ প্রায় সমস্ত দ্বীপাবলীতেই তাহা প্রবল।

পরলোক সম্বন্ধে সাময়িদ্‌দিগের এরূপ বিশ্বাস যে, কেবল তাদিবী ও যাহারা অপঘাতমৃত্যু সহ করিয়া থাকে, তাহাদের আত্মাই মৃত্যুর পর ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না এবং বায়ু ভর করিয়া ভ্রমণ করে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এরূপ মৃতব্যক্তির আত্মা, জীবিতাবস্থায় যেরূপ, মৃত্যু অবস্থায়ও তদ্রূপ ক্ষুৎপিপাসা ও অভাব প্রভৃতির বশবর্ত্তী থাকে। এ নিমিত্ত ইহারা, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি মৃত হইলে, বরফময়ভূমিতে ভ্রমণের উপযুক্ত ডোঙ্গা, ধনুক, রন্ধনপাত্র, ছুরি ও কুঠার, পরলোকে আবশ্যক হইবে বলিয়া, ঐ ব্যক্তির দেহ সহিত ভূমিসাৎ করে এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া এক একটি হরিণ সমাধি স্থানে বলি দেয়। যখন কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহার সমাধিকালীন মহা সমারোহ হয়, এবং জীবিতাবস্থায় সে যেরূপ সম্মানিত ছিল, তখনও তদ্রূপ সম্মান প্রদত্ত হয়। মৃতের একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হয়,

এবং প্রতিদিন ঐ মূর্ত্তির নিকট আহারীয় দ্রব্য প্রদান, উহার বেশভূষা করণ ও উহাকে শয্যাশায়ী করণ প্রভৃতি জীবনের নিত্যকার্য্য সকল সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এইরূপে তিনবৎসর অতীত হইলে, ঐ মূর্ত্তিও সমাধি-সাৎ করা হয়।

এই জাতির প্রধান আমোদকর বস্তু প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত গীত শ্রবণ। এই গীত শুনাইবার নিমিত্ত জাতীয় কবি নিয়োজিত আছে। যখন এই গীত আরম্ভ হয়, তখন নিয়োজিত কবি তাম্বুর মধ্য-স্থলে আসন গ্রহণ করে, এবং শ্রোতৃবর্গ চতুর্দ্দিকে তাহাকে ঘিরিয়া বইসে। অনন্তর কবি, পূর্ব্বপুরুষগণ ও সিয়াক, তাতার প্রভৃতি জাতির সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল ও যুদ্ধে কিরূপ জয় পরাজয় লাভ করিয়াছিল, তাহা স্থল বিশেষের রসোদ্ভাবন অনুরূপ অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা, গান করিতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করে। গীত মধ্যে যখন শত্রুবর্গের ষড়যন্ত্রে নায়কের মৃত্যু ঘটনা হয়, তখন শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, একেবারে ডাকছাড়িয়া চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। আবার যখন শুনে যে নায়ক মৃত্যু দ্বারা শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, বায়ুভরপূর্ব্বক মেঘমণ্ডল মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না, হরিধ্বনি করিয়া সভাভঙ্গ হয়।

বঙ্গসন্তান? বলিতে পার, এ হতভাগা জাতিরা এরূপ হইল কেন?— ইহাদের জীবনতত্ত্বের সহিত কি তোমাদের সাহানুভূতি জন্মায়?

ইতি সামিয়িদ্ জাতি।